বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডি. লিট.

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
১২ই ফাল্গুন, ১৩৬৯

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রাকর
শিখা চৌধুরী
রূপা প্রেস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬

৪০·০০

বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শের মূর্ত বিগ্রহ
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ
পরমপূজনীয়
স্বামী বিরজানন্দ মহারাজজীর
পুণ্যস্মরণে

সূচনা

(প্রথম সংস্করণ)

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর পুণ্যবৎসরে নানাজনে নানাভাবে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার কথা আলোচনা করেছেন। এ-গ্রন্থে স্বামীজীর সাহিত্য-প্রতিভা এবং বিশেষভাবে বাংলাসাহিত্যে তাঁর দানের কথাই আলোচিত।

সন্ন্যাসগ্রহণের আগে স্বামী বিবেকানন্দ কোনো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এমন প্রমাণ পাই নি। তবে একটি সংগীত-সংকলন-গ্রন্থের সংকলনকার্যে তাঁর অনেকটা হাত ছিল, এ কথা নিশ্চিত। বইটির নাম "'সঙ্গীতকল্পতরু'—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সংগৃহীত।" এই সংগীত-সংকলনটির প্রথম সংস্করণের ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি নরেন্দ্রনাথের লেখা হওয়াই স্বাভাবিক।

পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রতিভার সূত্রপাত তাঁর পত্র-সাহিত্যে। 'পরিব্রাজক' ভ্রমণকাহিনীটিতেও এই পত্রসাহিত্যের লক্ষণ আছে। পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ভাব্‌বার কথা, বর্তমান ভারত, এবং পত্রাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করে শেষ কয়েকটি অধ্যায়ে বিশেষভাবে স্বামীজীর কবিসত্তাসম্বন্ধে বক্তব্য নিবেদন করতে চেয়েছি।

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী একবার বলেছিলেন যে, 'শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইরে থেকে কেবল ভক্তিময় মনে হলেও, ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী, আর বাইরে থেকে তাঁকে (স্বামীজীকে) কেবল জ্ঞানী মনে হ'লেও অন্তরে অন্তরে তিনি পরিপূর্ণ ভক্ত।' বিবেকানন্দ-সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর মনীষার অন্তর্নিহিত কবিসত্তাই আমাকে বেশী মুগ্ধ করেছে।

এ প্রসঙ্গে যাঁদের চিন্তাধারা ও সস্নেহ উৎসাহের কাছে আমার ঋণ সবচেয়ে বেশী, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ছে স্বামী নিরাময়ানন্দজীর কথা। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধনে'র বর্তমান সম্পাদক স্বামী নিরাময়া-নন্দজী-সম্পাদিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' আজ বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে স্বামীজীর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছে। আশৈশব তাঁর সস্নেহ পথনির্দেশ আমার জীবনে মহাসম্পদস্বরূপ। স্বামীজীর সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনার প্রেরণা আমি তাঁর কাছেই পেয়েছি।

আলোচনার মধ্য দিয়ে আর যাঁদের চিন্তাধারা আমাকে ধন্য করেছে, তাঁদের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী মহারাজ এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারিক স্বামী ত্যাগানন্দজী মূল্যবান সাহায্যদানে উপকৃত করেছেন। এঁদের সকলের উদ্দেশে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীগিরিজাশঙ্কর শুক্লা স্বামীজীর প্রতিকৃতির ব্লকটি দিয়ে এ গ্রন্থের সৌষ্ঠববর্ধন করেছেন। আশ্রমের শিল্পী শ্রীঅশেষ মিত্র ও কর্মী শ্রীনির্মলকান্তি গুহের উৎসাহ ও নির্দেশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গ্রন্থাকারে এই প্রবন্ধসমষ্টি প্রকাশের জন্য সতীর্থ বন্ধু অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং করুণা প্রকাশনীর প্রকাশক শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে শিল্পী শ্রীগণেশ বসু ও সাহিত্যরসিক শ্রীতুলসী দাসের সশ্রদ্ধ সহযোগিতা সানন্দ চিত্তে স্মরণ করি। গ্রন্থরচনায় অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সান্যাল যে উৎসাহ দান করেছেন, এ উপলক্ষে সে কথা মনে করে আমি গৌরবান্বিত। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ পাণ্ডুলিপি-রচনায় সাধ্যমত সাহায্য করে আমার উৎসাহবর্ধন করেছে।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ; আজ তাঁর শুভ জন্ম-তিথিতে গ্রন্থ সমাপন করেছি, এই আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ
অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি
শুক্লাদ্বিতীয়া
১১ই ফাল্গুন, ১৩৬৯
কর্মিভবন
নরেন্দ্রপুর, চব্বিশ পরগণা

'সঙ্গীত কল্পতরু' প্রসঙ্গে আলোচনার অবশিষ্ট দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট-২ অংশে স্থানান্তরিত

সূচনা

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছে বছর তিনেক আগে। দ্বিতীয় সংস্করণ যদি সঙ্গে সঙ্গে ছাপানো যেত, তাহলে তা পুনর্মুদ্রণের বেশী কিছু হতো না। বিলম্বিত হলেও এ সংস্করণ-প্রকাশে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, নবলব্ধ ও পুনর্বার চিন্তিত যাবতীয় তথ্য ও বিশ্লেষণের সমাবেশে এখন এ বইখানিকে প্রামাণ্য আলোচনাগ্রন্থে পরিণত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ থেকে পৃষ্ঠসংখ্যা দু'গুণ এবং অধ্যায়-সংখ্যা দেড়গুণ বর্ধিত। বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান-প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে যাঁরা আরো বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করবেন, তাঁদের চিন্তাধারায় যদি এ গ্রন্থের মনন ও অনুভব কোনো সহায়তা করতে পারে, তাতেই লেখকের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৫-১৩০৬) ২৩শ ও ২৪শ অর্থাৎ সর্বশেষ সংখ্যাদুটিতে বাংলা গদ্যসাহিত্যে স্বামীজীর দান নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয় 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ভাষণের সমালোচনা উপলক্ষে। "১৫ই আশ্বিনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (সমালোচনা)" নামে এই লেখাটি খুব সম্ভব 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের লেখা। যতদূর মনে হয়, এই সমালোচনা-সূত্রেই দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন'-পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় কালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলেস থেকে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে লেখা স্বামীজীর চিঠির অংশবিশেষ "বাঙ্গালা ভাষা" নামে রূপান্তরিত হয়ে মুদ্রিত।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আলোচনার নিদর্শন 'উদ্বোধন'-পত্রিকা থেকে স্বামীজীর ধারাবাহিক রচনাগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হবার সময়ে 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র স্বামী সারদানন্দ-লিখিত ভূমিকা। 'বর্তমান ভারতে'র ভূমিকার তারিখ ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, 'পরিব্রাজকে'র ভূমিকার তারিখ ১লা মাঘ, ১৩১২, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রথম সংস্করণের স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দজীর নাম বা তারিখ না থাকলেও এটিও যে তাঁরই রচনা, তা ভাষাভঙ্গীর দ্বারা প্রমাণিত। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের যথার্থ মূল্য-অনুধাবনে স্বামী ত্রিগুণাতীতা-নন্দ ও স্বামী সারদানন্দ—দু'জনের অভিমতই বিশেষভাবে প্রণিধেয়।

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনার নিদর্শন পাই রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষের (১৩১৪ সাল) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে। সাহিত্য-বিচারে অসাধারণ সিদ্ধির পরিচায়ক এ প্রবন্ধে লেখক শ্রীচট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও কাব্যকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর কবিতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার এই সূচনা।

'রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প' এবং 'বিবেকানন্দের কথা ও গল্প' রচয়িতা স্বামী প্রেমঘনানন্দ পরবর্তীকালে 'কিশোর বাংলা' নামে একটি শ্রেষ্ঠ কিশোর পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সময় স্বামী প্রেমঘনানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় যথাক্রমে 'বাংলা ভাষা ও স্বামী বিবেকানন্দ', 'স্বামীজীর বাংলা রচনা' এবং 'সাধু ও চলতিভাষা' নামে তিনটি প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের দান সম্বন্ধে গবেষণাধর্মী আলোচনার সূত্রপাত করেন। লোকান্তরিত সাহিত্যসাধক স্বামী প্রেমঘনানন্দের সাহিত্যকীর্তির পুনরালোচনা আজ বিশেষ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় সংস্করণের সূত্রপাতে এই পূর্বসূরীদের কাছে লেখকের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার্য। ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের ভাবপ্রেরণা উপলব্ধির চিরন্তন দিশারী ভগিনী নিবেদিতা। বিবেকানন্দ-হোমানলের এই শিখারূপিণীর উদ্দেশে বিবেকানন্দসাহিত্য-পাঠকমাত্রেরই প্রণাম নিবেদিত।

অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে প্রথম সংস্করণের 'সূচনা' এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত। বিশেষত সে 'সূচনা'র অন্তর্গত স্বামীজীর প্রথম জীবনে লেখা 'সংগীতকল্পতরু' নামে সংগীতসংকলনের ভূমিকা ও সংগীত-সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা অংশটি এ সংস্করণে পরিশিষ্ট (২) অধ্যায়ে পরিবর্ধিতরূপে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জনাপ্রসঙ্গে এক বৎসরের কিছু বেশীকাল রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নানা কেন্দ্রে অতিবাহিত করেছি। ১৯৬৯-এর মে মাসে বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্যসন্ধ্যায় মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বুধানন্দের সঙ্গে মায়াবতী যাত্রার সময় এ সংস্করণের কাজের সূত্রপাত। তারপর ১৯৭০-এর গ্রীষ্মাবকাশে বাগবাজারের উদ্বোধন কার্যালয়ে এবং জুলাই মাসে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে থেকে বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারে এ সংস্করণে ব্যবহৃত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। এই বইয়ের অধিকাংশই লিখিত এবং পুনর্লিখিত হয় নরেন্দ্রপুর

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মিভবনে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূর্বোক্ত কেন্দ্রসমূহের প্রধান ও সহকারী কর্মিবৃন্দ সকলের কাছেই লেখক কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রাচীন সন্ন্যাসীদের অন্যতম পূজনীয় স্বামী অভয়ানন্দ, মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী কৃষ্ণময়ানন্দ, আশ্রম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরের পরিদর্শক স্বামী ক্ষমানন্দ, বেলুড় মঠের স্বামী অমৃতত্বানন্দ, স্বামী প্রথমানন্দ, স্বামী শান্তিদানন্দ, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক স্বামী উমানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের শুভেচ্ছা ও নানাবিধ সহায়তা এ গ্রন্থের পরিমার্জনাকালে লেখককে নিশ্চিন্তমনে বিবেকানন্দ-অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ের শুভেচ্ছা ও অনুপ্রেরণা বর্তমান সংস্করণ-প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করি।

এ সংস্করণে নবলব্ধ দুটি মূল্যবান উপাদানের আলোচনা লক্ষণীয়—প্রথমত স্বামীজীর লেখা "ধর্মমীমাংসা ও শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন" নামে অমূল্য রচনা ('সাধুগন্ত ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায় এবং পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়ত হার্বার্ট স্পেন্সারের Education গ্রন্থের বিবেকানন্দকৃত অনুবাদ 'শিক্ষা' গ্রন্থটি সম্বন্ধে আলোচনা ('অনুবাদক বিবেকানন্দ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের এই বিস্মৃত অধ্যায় দুটির পুনঃসংযোজনার সৌভাগ্যের জন্য লেখক স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দিত। সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে এ দুটি রচনার পুনরাবিষ্কারের দাবী তাই সঙ্গত। এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের আরো কিছু বিস্মৃত অধ্যায় যোগ্যজনের দ্বারা আবিষ্কৃত হবে—এই প্রার্থনা।

স্বামীজীর 'ধর্মমীমাংসা ও শ্রীরামকৃষ্ণদর্শন' নামে অমূল্য দর্শনসূত্র কয়টি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের সুযোগ্য কৃতী পুত্র বৈজ্ঞানিক ডঃ সুধীরনাথ সান্ন্যালের স্নেহানুকূল্যে প্রাপ্ত। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীশিশিরেন্দু ভট্টাচার্য একাধিক মূল্যবান উপকরণ-সংগ্রহে অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিদর্শক শ্রীরাধাশ্যাম সাহা এবং বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ—দু'জনের

অগ্রজপ্রতিম স্নেহ ও সৌজন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। বেলুড় মঠের বর্তমান গ্রন্থাগারিক স্বামী ত্যাগানন্দজী লেখকের শিক্ষাগুরুদের অন্যতম। প্রথম সংস্করণের উপকরণ-সংগ্রহেও তিনি শুভেচ্ছা ও সহায়তার দ্বারা লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের পুথিশালার বিভাগীয় কর্মী শ্রীসুকুমার মিত্র লেখকের মতো অনেকেরই অগ্রজকল্প —তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ধন্যবাদের উর্ধ্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী সারদাদেবীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত বাগবাজারের রামকৃষ্ণ মঠ ও উদ্বোধন-কার্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দজীর কাছেই বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রথম পাঠ গ্রহণ করি, আজ অবধি সে পাঠগ্রহণ চলেছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণেও সর্বত্র তাঁর প্রভাব ওতপ্রোত। তাছাড়া 'উদ্বোধন' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও সহকারী সম্পাদক স্বামী জীবানন্দ, উদ্বোধন-কার্যালয়ের প্রকাশনা-বিভাগের স্বামী অতন্দ্রানন্দ এবং সামগ্রিকভাবে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ের সকল সন্ন্যাসী ও ভক্ত কর্মিবৃন্দ নানাভাবে লেখককে প্রীতিপূর্ণ সহায়তার দ্বারা ব্রত-উদ্‌যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার আগেই বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অভাব অনেকেই বোধ করতে থাকেন। দ্বিতীয় সংস্করণে তাই স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনার যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হ'ল। বাংলার সাহিত্যিক ও অধ্যাপকবৃন্দ এ আলোচনায় অগ্রসর হয়ে এলে লেখকের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

ইংরেজী সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের দান প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে 'বিবেকানন্দের কবিতা' অধ্যায়টিতে তাঁর ইংরেজী কবিতার আলোচনাও স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনার জন্য 'বিশ্ববিবেক'-গ্রন্থে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Vivekananda as an English Speaker and Writer' প্রবন্ধ ; 'Vivekananda Centenary Memorial Volume'-এ 'Vivekananda—Orator, Writer and Art critic'—শীর্ষক শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এবং ১৩৭৬ সালে প্রকাশিত 'বিবেকানন্দ শিলাস্মারকগ্রন্থে' ডঃ অমলেন্দু বসুর 'Vivekananda—Lord of Language' প্রবন্ধ কয়টি আগ্রহশীল পাঠকেরা অবশ্য দেখবেন। সর্বোপরি ভগিনী নিবেদিতার লেখা বিবেকানন্দ-

সাহিত্যের ভূমিকা* (Preface to Complete Works of Swami Vivekananda : Ist Edn) রচনাটি তো কালজয়ী সাহিত্য।

আলোচ্য সংস্করণে সর্বত্র যথাসম্ভব স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার প্রথম সংস্করণ থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত সংস্করণে সর্বত্র অনুবাদকের নাম দেওয়া নেই। সহকারী সম্পাদকরূপে 'বাণী ও রচনা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে যে যে ক্ষেত্রে অনুবাদকের নাম মনে আছে, সেই সেই ক্ষেত্রে তা দেওয়া হ'ল। ইতিহাসের অনুরোধে এর প্রয়োজন ছিল। যদি এ বিষয়ে আরো নতুন আলোকপাত কেউ করতে পারেন তা সাদরে স্বীকৃত হবে। 'বাণী ও রচনা'র অনুবাদ যেখানে মূল ভাবপ্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় নি, সেক্ষেত্রে নূতন অনুবাদ সংযোজিত হ'লেও পাঠকের সুবিধার জন্য 'বাণী ও রচনা'র পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশিত। এ জাতীয় পাঠান্তরের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাসংখ্যার সঙ্গে 'দ্রষ্টব্য' কথাটি যথাসম্ভব সংযোজিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে আর যাঁদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লেখকের স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোক্তা সতীর্থ শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু, প্রকাশক শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অগ্রজ শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, বন্ধুবর শ্রীতুলসী দাস এবং এ সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীখালেদ চৌধুরী—এঁদের কথা তো সর্বাগ্রে মনে জাগে। এ সংস্করণ উপলক্ষ্যে শুভার্থী ও সহযোগিতাকারীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম—অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, পুণ্যস্মৃতি ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ নরেশ গুহ, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, সুমণি মিত্র, অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল, অধ্যাপক শ্রীশংকর ধর, অধ্যাপক শ্রীপ্রবাল সেনগুপ্ত, শ্রীশান্তি রায়চৌধুরী, শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরিতোষ সরকার, শ্রীহরিপদ আচার্য, শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীশরদিন্দু ঘোষ, শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী গীতা ঘোষ।

প্রথম সংস্করণের আলোচনা শেষ হয়েছিল, স্বামীজীর কবিতা-আলোচনায়। এ সংস্করণে কবিতার আলোচনা আগে শেষ করে, স্বামীজীর মৌলিক গদ্য রচনার আলোচনায় গ্রন্থপ্রান্তে চারটি অধ্যায় বিস্তৃতভাবে সংযোজিত। অবশ্য

* বাণী ও রচনা : ১ম খণ্ড : 'আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী' : অনুবাদক : স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ।

কবি ও মনীষী বিবেকানন্দের কবিসত্তার প্রতি আমার পক্ষপাত আগের মতোই অবিচলিত।

প্রথম সংস্করণ 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্যে'র 'সূচনা' লেখা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথিতে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা সমাপ্ত হ'ল শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুরাগীদের কাছে এ শুভসংযোগ তাৎপর্যমণ্ডিত।

বাংলা ও ভারতের এই চরম দুর্দিনে শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করুক—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

প্রণবরঞ্জন ঘোষ।

সূচনা

(তৃতীয় সংস্করণ)

প্রখ্যাত বিদেশী লেখকের সেই বাজীকরের গল্পটি হয়তো অনেকেরই মনে আছে। পথে পথে বাজীর খেলা দেখিয়ে তার দিন কাটতো, খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদের এক মঠে আশ্রয় পেয়ে, সবার চোখের আড়ালে সে মঠের গির্জার মধ্যে মা মেরীকে নিজের খেলা দেখিয়ে আপনভাবে পূজো করতো। গল্পে আছে, স্বয়ং মা মেরী তাঁর বেদী থেকে নেমে এসে সন্তানের সে পূজা গ্রহণ করেছিলেন। যার যা সম্বল তাই পরমেশ্বরের চরণে সে সমর্পণ করতে পারে। একদা স্বামীজীকে তাঁর সাহিত্য-কৃতির আলোচনার মধ্য দিয়ে পূজো করতে চেয়েছিলাম, তারই ক্রমবিকশিত রূপ এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ।

দ্বিতীয় সংস্করণে এ গ্রন্থের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ প্রকাশিত হ'লে, বইটি পড়ে সুচিন্তিত অভিমতের দ্বারা অনেক বিদগ্ধ পাঠকই লেখককে উৎসাহিত করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ, বিশিষ্ট মনীষী দু'জন—ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এঁদের মতানুকূল্যে ১৯৭৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের নবরূপায়িত গ্রন্থখানিকে ডি. লিট. উপাধিলাভের যোগ্য গবেষণাকর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেন। সে বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে (রবীন্দ্রসদনে উদ্‌যাপিত) বাংলায় সমাবর্তনভাষণ দেন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। রবীন্দ্রনাথের পর এই দ্বিতীয়বার মাতৃভাষায় সমাবর্তন-ভাষণ দেওয়া হলো। ঐ উৎসবে উপাধির অভিজ্ঞানপত্রলাভ ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে চিরস্মরণীয় ঘটনা। ঘটনাচক্রে ঐদিনই চন্দননগরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত স্নেহভাজন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবে তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনায় আহুত হয়েছিলাম। সভাপতি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ। 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' যাঁকে উৎসর্গ করা, তাঁরই শতবর্ষ-জয়ন্তী স্মরণোৎসবের দিনে এ বইয়ের জন্য উপাধি-লাভ সেদিন স্বভাবতই পরম সৌভাগ্যের বলে মনে হয়েছিল।

এ বিষয়ে আর যাঁদের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে তাঁদের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁর সহধর্মিণী

শ্রীযুক্তা শান্তি সেন; বাংলাবিভাগের তদানীন্তন বিভাগীয় প্রধান রবীন্দ্র অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং বর্তমানে বিভাগীয় প্রধান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুরূপকল্প গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র উল্লেখযোগ্য।

সবার আগে এবং সবার আড়ালে রয়েছেন যাঁর কাছে বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য বিষয়ে আশৈশব পথ নির্দেশ পেয়ে আসছি সেই স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ (বর্তমানে বোম্বে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ)। তাঁর দ্বারাই বর্তমান লেখক সর্বাধিক অনুপ্রাণিত।

তৃতীয় সংস্করণের তথ্যসংগ্রহে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল, সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীশিশিরেন্দু ভট্টাচার্য; উক্ত গ্রন্থগারের কর্মী শ্রীঅমিয়ভূষণ মাইতি ও শ্রীঅমরনাথ দত্ত; উক্ত আশ্রম পরিচালিত মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী; আশ্রম বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীহরিপদ আচার্য; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার; জাতীয় গ্রন্থাগার; উদ্বোধন-কার্যালয় ও গ্রন্থাগার; বিবেকানন্দ সোসাইটি; বোম্বের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের গ্রন্থাগার, এ আশ্রমের ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক স্বামী জগন্ময়ানন্দ এবং বর্তমান গ্রন্থাগারিক শ্রীমান গৌতম চট্টোপাধ্যায় কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দ প্রমুখ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এ সংস্করণের পূর্ণতাসাধনে পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বেদান্তানন্দ মহারাজ ও বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ ও 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ মহারাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর আকস্মিক প্রয়াণের কথা গ্রন্থপ্রকাশের মুহূর্তে বিশেষভাবে মনে জাগছে। বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষরূপে এবং তারও আগে থেকে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁর সান্নিধ্যের মধুময় স্মৃতি অনেকের মতো আমারও চিরদিনের সম্পদ।

এ গ্রন্থের তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী ধ্যানানন্দ মহারাজ ও সহকারী সম্পাদক স্বামী বিবিক্তানন্দ মহারাজের উদার সহায়তা লাভ লেখকের বিশেষ সৌভাগ্য।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ

(বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচারের অধ্যক্ষ), দ্বিতীয় সম্পাদক স্বামী মুমুক্ষানন্দ মহারাজ (বর্তমানে বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ) তৃতীয় সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দ মহারাজ, আশ্রমের প্রবীণতম সন্ন্যাসী স্বামী কৃষ্ণময়ানন্দ মহারাজ, সহসম্পাদক স্বামী শিবেশ্বরানন্দ মহারাজ, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ মহারাজ, রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী উমানন্দ মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসিবৃন্দের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা এ গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে যে সহায়তা করেছে, সেজন্য এঁদের কাছে লেখকের কৃতজ্ঞতা সাধারণ সাধুবাদের ঊর্ধ্বে।

পূজনীয় ও সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, শ্রীমহেশ্বর দাস, শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখদের উৎসাহ ও আশীর্বাদ এই মুহূর্তে স্মরণ করছি। প্রকাশক শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়, তাঁর অগ্রজ শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যসুহৃদ শ্রীতুলসী দাস—এঁদের প্রীতি ও সহযোগিতার জন্য লেখকের কৃতজ্ঞ নমস্কার। শ্রীঅনিল দত্ত, শ্রীতাপস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসমর পাল, শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসতীপ্রসাদ মাইতি প্রমুখ স্নেহভাজন ছাত্র ও বন্ধুরা নানাভাবে সহযোগিতার দ্বারা এ সংস্করণ সম্ভব করে তুলেছেন।

এই নবসংস্করণে একটি নূতন অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে। পরিশিষ্টে অন্যান্য অধ্যায়েরও কিছু পরিবর্ধন ও পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাও এ সংস্করণে অনেক নূতন তথ্য ও বিশ্লেষণ পাবেন।

তৃতীয় সংস্করণ-প্রকাশের পুণ্যলগ্নে বিশ্বের যিনি যেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুধ্যানরত, তাঁর উদ্দেশে লেখকের সশ্রদ্ধ নমস্কার। এ জীবনে সব শুভ প্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার মাকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

সূচীপত্র

বাংলাসাহিত্যের যুগসন্ধি ও স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলাদেশের ইতিহাসে একদা অগণিত নক্ষত্রসমাবেশ ঘটেছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি প্রায় দেড়শো বছরের চিন্তাধারায় ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতির নানামুখী আন্দোলন বাঙালীর মনন ও সাহিত্যে যে অসাধারণ সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে, তা নিয়ে বিশ শতকের মধ্যাহ্নমুহূর্তে আমাদের একান্ত স্বাভাবিক গৌরববোধ নানা শতবার্ষিকী পালনের আয়োজনে প্রকাশিত। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা যখন রূপায়িত হতে চলেছে, ঠিক সেই সময় সমগ্র দেশের চিন্তা ও ভাবনা আর একবার স্বাধীনতার মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সংঘর্ষ, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘাত, এবং ১৯৭১ সালে বাংলা-দেশের অভ্যুদয় উপলক্ষে ভারতের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের ঐক্য দেখে ধারণা হয়, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাধনার ঐতিহ্য আমরা এত অল্পদিনেই ভুলে যাই নি। তবু একথা সত্য যে, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার জন্য আমাদের অনেক বেশী সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র অতীতের গৌরববোধ নয়, মহিমান্বিত বর্তমান এবং মহত্তর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকটি ভারতবাসীর।

স্বাধীনতার শত্রু স্বৈরাচারীদের উদ্দেশে রাজা রামমোহন বলেছিলেন—'Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successfull.'[১] স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের সমর্থকেরা কোনদিন সফল হয় নি, এবং শেষপর্যন্ত কোনদিনই সাফল্য লাভ করবে না।

কিন্তু এই শত্রুকে সম্পূর্ণ চিনতে পারা সব সময় সহজ নয়। ইংরেজ-রাজত্বে সুশাসনের ছদ্মবেশ ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের আপাত-

---

১ Calcutta Journal-এর সম্পাদক শ্রীবাকিংহামকে লেখা পত্রাংশ।

প্রগতির উন্মাদনা আমাদের জাতীয় চেতনাকে অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হতে দেয় নি। সাম্যবাদের ছদ্মবেশধারী সাম্রাজ্যক্ষুধাও তেমনি অনেকের চোখে পুরোপুরি ধরা পড়ে নি। আধুনিক জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য সংস্পর্শের ফল হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনায় আমাদের হীনমন্যতা আজও অনেক পরিমাণে বিদ্যমান—একথা শিক্ষিতসমাজের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমাদের বাইরের শত্রু ছিল ইংরেজ, অন্তরের শত্রু ছিল আমাদের অনিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়। চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের নানামুখী আন্দোলন সত্ত্বেও জীবনের উৎকর্ষ নির্ধারিত হ'ত পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে।

আমাদের জাতীয় চেতনায় সেই বিলুপ্ত আত্মবিশ্বাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন—"He is an atheist who does not believe in himself. The old religions said that he was an atheist, who did not believe in God. The new religion says that he is an atheist who does not believe in himself."[১]

"If you have faith in the three hundred and thirty millions of your mythological gods, and in all the gods which foreigners have introduced into your midst, and still have no faith in yourselves, there is no salvation for you. Have faith in yourselves and stand upon that faith and be strong."[২]

"নিজের উপর যার বিশ্বাস নেই, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্মমতে, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক; নবীন ধর্ম বলে, নিজের উপর যার বিশ্বাস নেই, সেই নাস্তিক।

"পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতা ও বিদেশীদের আমদানী যত দেবতা আছে—সকলের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও যদি তোমার নিজের উপর বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার মুক্তি নেই। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে উঠে দাঁড়াও, বীর হও।" বিবেকানন্দের বীরবাণীকে অবলম্বন করে বাংলার স্বদেশী যুগ ও ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন অনেকখানি শক্তিসঞ্চয় করেছিল। পরানুবাদ ও পরানুকরণে নয়, স্বধর্মে প্রতিষ্ঠাই ভারতবর্ষের নবজাগরণের মূল কারণ।

কিন্তু বিগত দুই দশকের চিন্তাজগতে বিবেকানন্দের মূল্যায়নে াধুনিক মনের কিছু কিছু সংশয় দেখা দিয়েছিল। বিবেকানন্দের ন্ন্যাস জীবনবিমুখ, ধর্মচিন্তা মধ্যযুগীয়, দেশপ্রেম—শুধু অতীতের ্মৃতিচারণ—এ জাতীয় সমালোচনায় চিন্তাশীল হিসাবে খ্যাতিমান ়'চারজনও যোগ দিয়েছেন। সমালোচনার স্বাধীন অধিকার স্বীকার করেও বলা যায়, এ ধরনের আলোচনায় ভারতবর্ষ বা ভারতীয় ানীষাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ভারতীয় সভ্যতার পরিপূর্ণ অভ্যুদয়ের যুগেই পার্থিব সুখসমৃদ্ধির বহিরাবরণ ভেদ করে জাতির অন্তরতম সত্তার বাণীমন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।' ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই পর্যায়ক্রমে ারা জীবনকে ক্রমবিকশিতরূপে দেখেছিলেন, তাঁরা ফুলকেই গাছের কমাত্র লক্ষ্য মনে করতেন না। তাঁরা জানতেন ফুলের পরিণতি যেমন ফলে, তেমনি সম্ভোগের পরিণতি পরিপূর্ণ ত্যাগে। জীবনের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিতে নিরাসক্ত মনেরই অধিকার।

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে।[১]—রবীন্দ্রনাথের পরিণত মানসের

সঞ্চয়িতা : সেঁজুতি : জন্মদিন

এই উপলব্ধিই ভারতবর্ষের বাণী। যাঁরা ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তা, অধ্যাত্ম-সাধনা ও বৈরাগ্যের পরম উপলব্ধিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনা করতে চান, তাঁরা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অন্তরাত্মার পরিচয় কখনো পাবেন না—একথা নিশ্চিত। পৌরাণিক দেবদেবতার রূপান্তর হয়, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি দেশের ও জাতির মানসসম্পদ। যুগে যুগে তাই পুরাণকাহিনীর নব নব রূপায়ণ সম্ভব। কিন্তু পরমসত্যের জন্য মানুষের সর্বস্বত্যাগের আদর্শ চিরকালের অপরিবর্তনীয় আদর্শ। ওই মহত্তম আদর্শের স্পর্শ পাই বলেই মানবসভ্যতার যুগসঞ্চিত গ্লানি ও কলুষের ঊর্ধ্বে মানবাত্মার উদার উন্মুক্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা বিশ্বাসী হতে পারি।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও সভ্যতার তুলনায় ভারতবর্ষ এই সত্যটিকে বিশেষভাবে অনুভব করেছিল। তাই পতনঅভ্যুদয়বন্ধুর-পন্থায় চিরযাত্রী ভারতাত্মা আপন অন্তরে এই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির আলোকশিখাটি সদাজাগ্রত রেখেছে। কিন্তু বাস্তব জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের ধর্মচেতনা কতখানি সহায়ক হয়েছে, এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে একথা মনে রাখতে হবে যে, বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সামনে রেখে জীবনের প্রতিটি কর্তব্য অবিচল নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে সাধন করাই ভারতবাসীর 'ধর্ম'। ব্রহ্মচিন্তা যাঁদের ধ্যানোপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই শুধু ঋষি নন, রাজর্ষি।

একটি আত্মবিস্মৃত জাতির সুপ্ত আত্মপ্রত্যয়কে জাগ্রত করার জন্য অতীতের গৌরবচেতনা নতুন করে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। আজকের দিনেও ভারতবাসীকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ শুধু আত্মসমাহিত ধ্যানের দেশ নয়, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রামেরও দেশ। ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত সেই পুণ্যসংগ্রামের অমর কাহিনী। অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে বিবেকানন্দ

নূতন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যে ভারত সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে উঠবে।

কিন্তু আত্মবিস্মৃতি আমাদের জাতির স্বভাবজাত। তাই বিবেকানন্দের সাধনা ও সংগ্রামকে ভ্রান্ত বিকৃতির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যার অপপ্রয়াস এদেশে অনায়াসে অঙ্কুরিত হতে পেরেছে। এমন সময় ইতিহাসের পটপরিবর্তন হ'ল। আমরা অনুভব করলাম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সাহিত্যের ইতিহাসেও ঘটে। অন্তত বাংলাদেশের ও সাহিত্যের মননভূমিতে আজ বিবেকানন্দের পুনরাবির্ভাবে সেকথা সুপ্রমাণিত। সাহিত্যের জগতে এই পুনরাবৃত্তির কারণ বোধ করি এই যে, মানবমনের চিরন্তন অনুভূতিগুলি নানা আকারে রূপান্তরিত হয় মাত্র, কখনো বিলুপ্ত হয় না। তাই দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না থেকে, যুগে যুগে মানবসভ্যতার বিচিত্র প্রয়োজনে সাহিত্যের এক একটি বিস্মৃত অধ্যায় আবার আগ্রহদীপ্ত পাঠকচক্ষুর সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্তিমিত চেতনার অবসাদে যাকে অনায়াসে ভুলেছিলাম, নিষ্ঠুর সংঘাতের আলোকে তার মধ্যে আত্মীয়তম বন্ধুকে আবিষ্কার করা —ব্যক্তি ও জাতির ইতিহাসে সুপরিচিত কাহিনী।

শতবার্ষিকী-পালনের উন্মাদনায় বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজে বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে কৌতূহল সঞ্চারিত হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আসন্ন দুর্যোগের পটভূমিতে আমরা যখন জাতির জীবনে একটি বলিষ্ঠ প্রাণদ বীরমন্ত্র অনুসন্ধান করে ফিরছি, তখন পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে একথা ভেবে আশ্বস্ত হতে পেরেছিলাম যে স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যে ও জীবনাদর্শে আমরা আমাদের অন্বিষ্ট মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামচেতনার বাণী লাভ করেছি। এ মহাস্ত্র আমাদের উত্তরাধিকার—কেবল আলস্যে অবিশ্বাসে অলস ভাববিলাসে আমরা সেকথা ভুলে গিয়েছিলাম।

সমগ্র দেশ জুড়ে আজ সাহিত্যিকসমাজের কাছে এই দাবি—জীবনযুদ্ধের মানস-অস্ত্র আমাদের চাই। কোমল হৃদয়াবেগের স্বপ্নাবেশ বাংলাসাহিত্যকে বড় বেশী আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আজ

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অমরজীবনের অভয়বাণী কারা উচ্চারণ করবে? সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পকলায় সর্বত্র আজ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন-মন্ত্র উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের মানস-ইতিহাসে আর একবার এমন এক মহামুহূর্ত দেখা দিয়েছিল। একদিকে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবৃন্দ ও তাঁদের অসংখ্য সেনাবাহিনী, আর একদিকে সামান্যসংখ্যক সেনামাত্রসম্বল বনবাসী পঞ্চপাণ্ডব। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণের মতো মহারথী-পরিবৃত মহাদম্ভী দুর্যোধন, অন্যদিকে নিরস্ত্র অর্জুনসারথি শ্রীকৃষ্ণ। কর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনের উদ্দেশে সেই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেই উচ্চারিত হয়েছিল—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"
"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব"
"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়॥"

ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের এই বাণীই ভারতবাসীর জীবন-দর্শন। সংগ্রাম তার কর্তব্য, কারণ, সংগ্রামই জীবন। জীবনের লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসিত হয়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "যা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাই চেতন, তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্‌না একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার বিদ্রোহ করবে। যেখানে struggle, যেখানে rebellion, সেখানেই জীবনের চিহ্ন—সেইখানেই চৈতন্যের বিকাশ।"[১] [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ]

যুদ্ধ যেখানে সাম্রাজ্যক্ষুধার লুব্ধ বাহুবিস্তার, সেই মহাঅন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামই মহাপুণ্য। ভারতবাসীর জীবনযুদ্ধের চিরসারথি শ্রীকৃষ্ণচরিত্র স্মরণ করে বিবেকানন্দ বলেছেন—"এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা,

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ১২

ধনুর্ধারী রাম, মহাবীর, মা কালী এঁদের পূজা। তবে তো লোকে মহাউদ্যমে কর্মে লেগে শক্তিমান্ হয়ে উঠবে। আমি বেশ করে বুঝে দেখেছি, এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity (মজ্জাগত দুর্বলতাসম্পন্ন)—cracked brains (বিকৃত মস্তিষ্ক) অথবা fanatic (ধর্মোন্মাদ)। মহারজোগুণের উদ্দীপন ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমো-তে ছেয়ে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসত্ব, পরলোকে নরক।"[১] [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ]

জাতীয় চরিত্রে কোনো ভাবের সঞ্চার করতে হলে সেই জাতির জনমানসের ভাষায় সেটি করণীয়। তাই বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রেরণায় জাতীয় চিত্তকে সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় স্বামীজীর রচনাবলীর একটি প্রধান বক্তব্য—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—'ওঠো জাগো'।[২] কায়িক ও মানসিক সব দুর্বলতার নিঃশেষ ক্ষয়ের জন্য জাতির উদ্দেশে তিনি যে সব অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করে গেছেন, আজ আমাদের জীবনে মননে সেই মন্ত্রমালা অনুক্ষণ স্মরণীয়।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বীরত্বের অনন্য আদর্শ কঠোপনিষদের নচিকেতা। পরমসত্য উপলব্ধির জন্য এই ঋষিবালক যেভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে জীবনের গভীরতম বাণী আহরণ করে এনেছিল, তার সেই শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস ও নির্ভীকতার কথা বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় বারংবার উদাহৃত। সমগ্র উপনিষদ মন্থন করে জাতির পুনরুজ্জীবনের যে মন্ত্রটি বিবেকানন্দ সংগ্রহ করেছিলেন সেও এই "অভীঃ।" তিনি বলেছেন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে, একথা ধ্রুব সত্য। বীর হ—সর্বদা বল 'অভীঃ অভীঃ।' সকলকে শোনা 'মাভৈঃ মাভৈঃ'

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ১৬

২ কঠোপনিষদ ১।৩।১৪

—ভয়ই মৃত্যু। ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার।"[১]

'Kali the Mother' ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'—কবিতা দুটিতে এই অভয়সত্তার বজ্রমন্ত্র কাব্যরূপ লাভ করেছে—

Who dares misery love
And hugs the from of Death,
Dance in Destruction's dance
To him the Mother comes.

'সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

*

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের যদি কোনো একটি মাত্র বাণী তাঁর সমগ্র সত্তার পরিচয় হয়ে থাকে, তবে তা ওই কটি অক্ষরে বিধৃত—"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।"

জীবনের সর্বস্তরে এই সংগ্রাম—রণক্ষেত্রে, জীবনবিকাশে, অধ্যাত্মসাধনায়—সর্বত্র ভয় হতে অভয়ের উদ্দেশে আমাদের যাত্রা। ক্ষয়ক্ষতি দুঃখমৃত্যুর মূল্য না দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতি অস্তিত্বের সার্থকতা অনুভব করেছে, তা তো আমাদের জানা নেই। বরং বিবেকানন্দের ভাষায় বলতে গেলে—"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।" বেদনাবহনের দায়িত্ব যার জীবনে যত বেশী, মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে তার তত সার্থকতা। শতশতাব্দীর বেদনালাঞ্ছিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই মনুষ্যমহিমার উপলব্ধি এত গভীর। আবার এই ভারতবর্ষেই একদা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান ছিল স্বর্গলাভের পন্থা। কারণ, আসন্ন সংঘাতের সম্মুখীন হয়েও শান্তি-বচনের সৌখীনতা কাপুরুষতারই নামান্তর। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে—

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৬

"আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না।···এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে···তবে মানুষ।" [পত্রাবলী][১]

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী থেকে বিবেকানন্দশতবার্ষিকীর মধ্যপথে ভারত-ভাগ্যের বিবর্তন একথা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আমাদের জীবনে সাহিত্যে কোথায় একটা প্রাণশক্তির অভাব ঘটেছিল। সংস্কৃতি-আসরের বর্ণচ্ছটা ও বিলাসভূষার চাকচিক্য ছিল, পৌরুষের সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভাবালুতার দিক থেকে যতটা গ্রহণ করেছি, অকল্যাণের সঙ্গে তাঁর চিরসংগ্রামের বাণীকে তেমনভাবে স্মরণ করি নি। জাতীয় আদর্শের এই শূন্যতাপূরণের স্বাভাবিক প্রয়োজনেই বিবেকানন্দ-জীবন ও সাহিত্যের অনুধ্যান আজ একান্ত প্রয়োজন।

আজ তাই বিবেকানন্দের রচনা ও বাণীর অনুধ্যানে আমরা এই দীপ্তসূর্যের বহ্নিতেজ আমাদের অন্তরেও সঞ্চারিত করব। তাঁর জীবনে, রচনায়, কথোপকথনে, পত্রাবলীতে যে বিদ্যুৎস্পর্শ নিহিত আছে, প্রত্যেক ভারতবাসীর দেহে মনে তার তীব্র গতিসঞ্চার আমাদের জীবনযুদ্ধের উপযুক্ত করে তুলবে—এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে আমরা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী হব। স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের "আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive করতে পারবে।"[২] জীবনে তো বটেই, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্বামীজী এই প্রেরণাস্পন্দন এনে দিয়েছেন তাঁর চলতিভাষায় রচিত 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাব্বার কথা' ও 'পত্রাবলী'তে; আবার গভীর মননের সংহত ভঙ্গিমায় ইতিহাসের দর্শন রচনা করেছেন

১ বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ৮০

২ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৪

'বর্তমান ভারতে'। তাঁর শৌর্যদৃপ্ত বাগ্‌ভঙ্গীর অপূর্ব উদাহরণ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'। বাংলাভাষার কোমলকান্তরূপের অন্তরালে যে এমন দৃপ্ত কঠোর শাণিত ইস্পাতের প্রখরতা আছে, সেকথা বিবেকানন্দ-সাহিত্যই আমাদের কাছে ঘোষণা করেছে। স্বামীজীর বাংলা ও ইংরেজী কবিতায় জীবনের উপলবন্ধুর দুর্গম পথে অভিযাত্রী দুঃসাহসী মানবাত্মার জয়গান।

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে উপনিষদের সেই জাগরণের বাণী আবার ধ্বনিত হোক—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা উপনীত হব। কারণ, বিবেকানন্দ এ দেশে জন্মেছিলেন।

বিবেকানন্দ ঃ মনন ও সাহিত্য

এ পৃথিবীতে নামকরণ ব্যাপারটা সব সময় আকস্মিক নয়, আমাদের অগোচরে ওর মধ্যে অনেক সময় জীবনের গভীরতম তাৎপর্য থেকে যায়। নরেন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ—এ দুটি নামে যেমন স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা, 'ব্রহ্মবাদিন', 'প্রবুদ্ধভারত' ও 'উদ্বোধন'—পত্রিকা তিনটির নামকরণেও তেমনি ভারতের ইতিহাসে স্বামীজীর প্রেরণার মূলমন্ত্রটি উচ্চারিত। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের মুখপত্র এই ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকা তিনটির নামকরণ স্বামীজী নিজেই করেছিলেন। জাতীয় জীবনে এই জাগরণের চেতনা-সঞ্চারই তো তাঁর ব্রত।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে ভারতের নবজাগরণকে অনেকে এক মানদণ্ডে বিচার করতে যান। অথচ একথা সুবিদিত যে প্রত্যেক দেশ তার নিজস্ব ইতিহাস, পরিবেশ ও মননের স্বাতন্ত্র্যে আপন আপন সংস্কৃতি গড়ে তোলে। সেই স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে রেখে বিচার করলে, তবেই আমাদের ইতিহাসজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চা পূর্ণতা লাভ করে। বিবেকানন্দের রচনাবলী এ বিষয়ে আধুনিক মানসের অন্যতম দিক্‌নির্দেশক।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম সংখ্যার (মাঘ, ১৩০৫) প্রস্তাবনায় স্বামীজী ইউরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "......আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।......এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।" ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার একটি মূলসত্য স্বামীজী সঠিক অনুধাবন করেছিলেন, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি বাঙালী-মনীষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই দুই সভ্যতার অন্তরঙ্গ সমন্বয়ে।

আধুনিকতার উন্মাদনায় কতবার আমরা অতীত ঐতিহ্যের সব

যোগসূত্র ছিন্ন করে সমুদ্রপারে পাড়ি জমাতে চেয়েছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমন প্রচেষ্টা উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন পর্বে বারংবার দেখা দিয়েছে। জোয়ারের পর ভাঁটার টান যখন আসে, তখন আবার আমরা উপলব্ধি করি, সাহিত্যের জগতে নিছক আনকোরা নতুন বলে কিছু নেই, সব দেশের সব যুগের আধুনিকতাই ঐতিহ্যের নিগূঢ় সংযোগে সার্থক।

নবযুগের ভারতবর্ষ গঠনে স্বামীজী এই ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সংযোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর গ্রন্থচতুষ্টয়—'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত', 'ভাব্‌বার কথা'—এই প্রাচীপ্রতীচির সংঘাত ও সম্মেলনের পটভূমিতে রচিত। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলাসাহিত্যও বিশ্ব-পরিক্রমায় যাত্রা করেছে, ভারত-সংস্কৃতি পেয়েছে বিশ্বসংস্কৃতির আসরে মহৎ মর্যাদার অধিকার।

রামমোহন, মধুসূদন, প্যারীচাঁদ, ভূদেব, রাজনারায়ণ, বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের চিন্তাধারায় বিবেকানন্দের ঐতিহ্য-প্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্যগুণগ্রাহিতার সূত্রপাত।[১] কিন্তু প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা এবং জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে স্বামীজীর সাধনা, উপলব্ধি ও শাস্ত্রচর্চার ব্যাপকতা অনেক বেশী। তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীন ধর্মচেতনার উত্তরাধিকার লাভের ফলে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের এমন এক অন্তরঙ্গ ঐক্যসূত্র স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন, যার দ্বারা বেদান্ত ও বিজ্ঞান একই লক্ষের অভিমুখে মানবাত্মার পথ-নির্দেশ করেছে।

নবযুগের বেদান্ত-আন্দোলনের পথিকৃৎ রামমোহন। কিন্তু ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনের দ্বন্দ্ব তাঁর মনেও সম্পূর্ণ সমাধান লাভ করে নি। সংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠন পদ্ধতির সমালোচনা-প্রসঙ্গে বেদান্ত-অধ্যাপনা সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্যটি স্মরণীয়—"Nor will youths be fitted to be better members of

---

১ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য : প্রণবরঞ্জন ঘোষ দ্রঃ

Society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better…" (যে বেদান্তধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে দৃশ্যমান বস্তু-নিচয়ের কোনো পারমার্থিক সত্তা নেই, পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির যখন কোনো প্রকৃত সত্তাই নেই, তখন তাদের প্রতি মমত্ববোধও অপ্রয়োজনীয়, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি তাদের হাত এড়িয়ে আমরা জগৎ থেকে পালাতে পারি ততই ভাল, তার দ্বারা তরুণেরা যোগ্যতর সামাজিক হতে পারবে না।)[১]

বলা বাহুল্য, বেদান্তের মায়াবাদ এখানে দার্শনিক তাৎপর্য লাভ করে নি, স্বয়ং রামমোহনও যে এ ব্যাখ্যা বিশ্বাস করতেন না তার প্রমাণ আছে তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থের' ভূমিকায়। পূর্বপক্ষের 'ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না,' এই আপত্তির উত্তরে ঐ ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন, "তাঁহারা কি প্রমাণে এ বাক্য রচনা করেন তাহা জানিতে পারি নাই যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন যে নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ ইঁহারা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্যকর্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্যসকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন তবে কিরূপে বিশ্বাস করা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই আর কিরূপে এ কথার আদর লোকে করেন তাহা জানিতে পারি না।"[২]

পরবর্তীকালে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্রটিতে রামমোহন পূর্ব-পক্ষের যুক্তিকেই আপন যুক্তি হিসাবে পেশ করার কারণ ভারতবর্ষের

১ Life of Raja Rammohan Ray : Collet : p. 459 ('62 Edn)

২ রামমোহন গ্রন্থাবলী : বেদান্তগ্রন্থ (সাহিত্যপরিষৎ সং) : পৃঃ ৫

ঐহিক উন্নতিকল্পে তাঁর ব্যাকুল আগ্রহ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও বেদান্ত, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের মধ্যে এমন কোনো বিরোধ দেখতে পান নি। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছতর—"Art, science and religion are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Advaita." চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে বিভিন্ন পন্থায় প্রকাশের প্রচেষ্টামাত্র। কিন্তু একথা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য আমাদের প্রয়োজন অদ্বৈতবাদ। (স্বামী বিবেকানন্দর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ইংরেজী সংস্করণের সূচনায় ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা।)

অদ্বৈতবাদের এই পরম ঐক্যোপলব্ধির আলোকে স্বামীজী নতুন যুগের যে জীবনদর্শন উপস্থাপিত করলেন, তার ফলে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জীবনের দ্বন্দ্ব নিরসন হয়ে যে সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি মানবজাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তার সার্থক সূচনা ভগিনী নিবেদিতার রচনাবলীতে।

অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর রচনাবলীর ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন—"একথা অবিস্মরণীয় যে স্বামী বিবেকানন্দই সর্ববস্তুতে একাত্মবোধ সহ অদ্বৈতবাদের সর্বোচ্চ মহিমা ঘোষণা করে তার সঙ্গে এই তত্ত্বটিও যোগ করেন যে হিন্দুধর্মে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি পর্যায় বা স্তর মাত্র—অদ্বৈতই এর লক্ষ্যস্থল।...এই উপলব্ধিই আমাদের গুরুদেবের জীবনে পরম তাৎপর্য আরোপ করেছে। কারণ, এক্ষেত্রে তিনি শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলন-তীর্থে পরিণত। বহু ও এক যদি সত্যই এক সত্তা হয়ে থাকে, তবে শুধু সব ধরনের সাধনাই নয়, সব ধরনের কাজ, সব প্রচেষ্টা ও সৃষ্টিই উপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা।

"এর পর থেকে ব্যবহারিক ও পারমার্থিকে কোনো পার্থক্যই রইল না। পরিশ্রমই প্রার্থনা। জয়ই ত্যাগ। জীবনই ধর্ম। গ্রহণ ও আসক্তি, বর্জন ও ত্যাগের মতোই কঠোর দায়িত্ব।

"কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি-বর্জিত নয়, বরং জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশক—এই উপলব্ধিই বিবেকানন্দকে কর্মযোগের মহান প্রচারকে পরিণত করেছে। তাঁর কাছে সন্ন্যাসীর কুঠরী বা মন্দিরের মতো কারখানা, পাঠকক্ষ, খেতখামার প্রভৃতিও মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনক্ষেত্র-রূপে সমান সত্য ও সার্থক পরিবেশ। মানুষের সেবায় ও ভগবানের উপাসনায়, বিশ্বাসে ও পুরুষকারে, সততা ও আধ্যাত্মিকতায় তাঁর কাছে কোনো পার্থক্য নেই। এক হিসেবে তাঁর সব কথাই এই মূল প্রত্যয়ের ভাষ্যমাত্র।"[১]

বিবেকানন্দ-জীবনদর্শনের এই কেন্দ্রসত্যটি মনে রেখে নবযুগের বাঙালী তথা ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি যে মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তার কয়েকটি মূলসূত্র অনুধাবন করা যেতে পারে—সুস্থ সবল দেহ (muscles of iron and nerves of steel); সেই আশীষ্ঠ বলিষ্ঠ দৃঢ়িষ্ঠ দেহে একটি বজ্রের উপাদানে গঠিত মন; জীবন-সংগ্রামে সদাসমুদ্যত "খাপখোলা তলোয়ারে"র ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রত্যয়; স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি সর্বস্বত্যাগী ভালোবাসা এবং বিশ্বমানবের সঙ্গে ঐক্যবোধ; প্রগাঢ় মননশীলতার সঙ্গে অপার হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণ।

সাধারণত তাঁর আবেগদীপ্ত হৃদয়ধর্মী রচনাংশগুলিই আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করলেও স্বামীজীর অধিকাংশ রচনাই মননধর্মী। তাঁর সুবিখ্যাত যোগচতুষ্টয় সম্বন্ধে আলোচনামূলক প্রবন্ধ ও ভাষণাবলীতে (বিশেষত জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ গ্রন্থে) আমাদের শাস্ত্রানুসারী ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি আধুনিক জীবনবোধের যে নিপুণ সমন্বয়সাধন করেছেন, তার দ্বারা তাঁর মনীষার অসাধারণত্বই প্রমাণিত। চিকাগো মহাসভায় প্রদত্ত তাঁর প্রথম ভাষণটি[২] থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর বক্তৃতা,

১ অনুবাদ : লেখককৃত।

২ এর আগেও তিনি অন্যত্র ভাষণ দিয়েছেন, তবে সে সব বক্তৃতার পূর্ণরূপ আজ অবধি আমরা দেখতে পাই নি। চিকাগো মহাসভায় তাঁর প্রথম

রচনা ও কথোপকথনে তিনি ভারতবর্ষের যে অন্তরতম স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, সে কেবল স্বদেশপ্রেমের গৌরব-গাথার ভারত নয়, মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদের উত্তরাধিকারী 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত ভারতাত্মা। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে কেবলমাত্র ভৌগোলিক সত্তা নয়, নিখিলমানবের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার পরিপূর্ণ উত্তর।

কিন্তু বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতিভেদ, আত্মবিশ্বাস ও ঐক্যের একান্ত অভাব সম্বন্ধে স্বামীজী তীব্রভাবে সচেতন। তবু স্বদেশী বা বিদেশী যে সব সমালোচক কেবল এই অবনতির দিকগুলির প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করেই ক্ষান্ত থাকেন, কেবলমাত্র নিন্দাদ্বারাই সংস্কার সাধিত হয় বলে মনে করেন, তাদের তিনি কখনো ক্ষমা করেন নি। সমগ্র ভারতপরিক্রমা করে তিনি এই স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে ভারতের প্রাণসত্তা এখনো জাগ্রত। স্বামীজীর শিষ্য ও অনুরক্ত যে সব বিদেশী বা বিদেশিনী ভারতের সেবায় জীবনোৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের কাছে ভারতবর্ষের এই প্রাণসত্তাকে তুলে ধরাই ছিল স্বামীজীর প্রধান কাজ। ভগিনী ক্রিস্টিন স্বামীজীর এই ভারততন্ময় ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"Our love for India came to brith, I think, when we first heard him say the word, 'India', in that marvellous voice of his. It seems incredible that so much could have been put into one small word of five letters. There was love, passion, pride, longing, adoration, tragedy, chivalry, heimweh and again love. Whole volumes could not have produced such a feeling in others. It had the magic power of creating love in those who heard it. Ever after, India became the land of heart's desire. Everything

---

ভাষণটির পূর্ণ বিবরণ আমরা পেয়েছি। মনন ও সাহিত্যের সার্থক সমন্বয়ে এটি বিবেকানন্দ-রচনাবলীর যথার্থ সূচনা।

concerning her became of interst—became living—her people, her history, architecture, her manners and customs, her rivers, mountains, plains, her culture, her great spiritual concepts, her scriptures. And so began a new life, a life of study, of meditation." (Reminiscences of Vivekananda, pp : 157-58)[১]

ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন বলেই, বিবেকানন্দের হৃদয় সমগ্র পৃথিবীকে একদিন আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছিল। বিশেষ দেশ ও ধর্মের ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই সব দেশ ও সব ধর্মের অন্তরালে মানবতার অখণ্ড মহিমা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বিবেকানন্দের ভারতচিন্তাকে কেবলমাত্র দেশপ্রীতির নিদর্শন মনে করলে তার ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করা হবে। 'India's Message to the World' নামে তাঁর অসমাপ্ত গ্রন্থটিতে বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ—"এইখানে মানবহৃদয়—পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবতা থেকে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম থেকে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত

১ আমার মনে হয়, যেদিন তাঁর সেই অপূর্ব কণ্ঠে India (ভারতবর্ষ) শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম, সেদিন থেকেই আমাদের হৃদয়ে ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসা জেগে উঠেছিল। ভারতবর্ষ—মাত্র পাঁচটি অক্ষরের একটি শব্দে এত কথা ভরা থাকতে পারে, একথা অবিশ্বাস্য মনে হবে। ওই শব্দটির মধ্যে ছিল—ভালোবাসা, আবেগ, গর্ব, এষণা, পূজা, বিষাদ, শৌর্য, গৃহ-ব্যাকুলতা আর আবার ভালোবাসা। একটি সমগ্র গ্রন্থাবলীও কারো হৃদয়ে এতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারত না। যারা তাঁর কণ্ঠে ওই শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনেছে, তাদের হৃদয়ে ভালোবাসাসৃষ্টির জাদুমন্ত্র নিহিত ছিল এই শব্দটির মধ্যে। তারপর থেকে ভারতবর্ষই হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার ধন হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের মানুষ, ইতিহাস, স্থাপত্য, আচার-আচরণ, নদী, পর্বত, সমতল, সংস্কৃতি, শাস্ত্র, অধ্যাত্ম ধ্যানধারণা—প্রতিটি বিষয় তাদের কাছে সজীব আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। তখন থেকে ধ্যান ও মননের এক নতুন জীবন-চর্যার সূত্রপাত। (অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থ 'স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিকথা'র অন্তর্গত ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথা থেকে।)

সবকিছুকে ধারণ করে আরো বিশাল অনন্তপ্রসারিত হয়ে উঠেছে। এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করেছে, তার প্রতিটি স্পন্দনকে আপন নাড়ীর স্পন্দনরূপে অনুভব করেছে।"[১] স্বামীজীর বেশীর ভাগ বাংলা ও ইংরেজী রচনা ও ভাষণই এই ভারত ও বিশ্বহৃদয়ের সংযোগসাধন প্রচেষ্টা। তার মূল সুরটি আধ্যাত্মিক। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম, বেদান্ত ও বিজ্ঞান, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক—নানামুখী জীবনজিজ্ঞাসার মধ্যে অন্বয়সম্বন্ধ স্থাপন করাতেই বিবেকানন্দের মৌলিকতা।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটিতে এই ভিন্নমুখী জিজ্ঞাসার স্বরূপ-বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম' বলে ; এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

"পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা- বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষের চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল ; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে ; মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমনকি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে ; অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমার মধ্যে পৌঁছলেন, বল্লেন যে সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম' ; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া' অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান।...এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছেন,—এদের রকম দিয়ে, জড়-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে। তা সে এক কেমন করে বহু হল, একথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি

১ 'জগতের কাছে ভারতের বাণী' : বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৭৪-৩৭৫ : অনুবাদ : লেখককৃত।

ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও সেই করেছে। তবে সেই খোঁজার নাম বিজ্ঞান (Science)।"[১]

অন্বেষণের আপাত বিপরীত এ দুটি পন্থা যে শেষ অবধি 'বহু'-র অন্তরালে 'একে'র নিঃসংশয় উপলব্ধিতে বিলীন হবে, এ বিষয়ে স্বামীজী নিশ্চিত ছিলেন। তাই জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও তাঁর সিদ্ধান্ত —"অপরা ও পরাবিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত ; একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে ; এক উপায় অবলম্বনে সকল প্রকার জ্ঞানরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত না হইতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষণ (difference) কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনভেদ ; বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত।"

['জ্ঞানার্জন'—ভাব্‌বার কথা]

জ্ঞানের রাজ্যের এই ঐক্যবোধকে বিবেকানন্দ প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবনসত্যে পরিণত করেছিলেন বলেই তাঁর কবিতায় এই সত্যটি ধরা দিয়েছে—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

(সখার প্রতি)

বেদান্তের মননশীলতাকে মানবপ্রেমের কল্যাণবোধে রূপান্তরিত-করণের সাধনায় স্বামীজীর অপূর্বসিদ্ধির পরিচয় এই কবিতাটির মধ্যে সবচেয়ে সার্থকভাবে ফুটেছে। আমেরিকা পরিভ্রমণান্তে এদেশে ফিরে এসে স্বামীজী যখন তাঁর অনুরাগী গুরুভ্রাতাদের মধ্যে কর্মে পরিণত বেদান্তের আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন স্বভাবতই আমাদের প্রচলিত ধর্মধারণায় আঘাত লেগেছিল। বিবেকানন্দশিষ্য

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২০০
২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬০

স্বামী শুদ্ধানন্দজীর স্মৃতিকথায় এই চিন্তাসংঘাতের একটি বিবরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"একদিন মাষ্টার মহাশয়ের (কথামৃত-প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সঙ্গে কথা হইতেছে। মাষ্টার মহাশয় বলিতেছেন, 'দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে ত মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?' স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা ত নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির চেষ্টা কি?' "[১]

মুক্তিপ্রচেষ্টাকে পর্যন্ত মায়ার গণ্ডীতে ফেলার কারণ, স্বামীজী নিজে ছিলেন জীবন্মুক্ত। অপরপক্ষে নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়ে শুদ্ধচিত্ত মানুষ যে ওই মুক্তি আপন অন্তরে আপনিই লাভ করে এও তাঁর সিদ্ধান্ত। সত্ত্বগুণাশ্রিত দু'চারজন ব্যক্তি ছাড়া প্রায় সব মানুষকেই কর্মের দ্বারাই কর্মপাশমুক্ত হতে হবে, এই কথা জেনেই স্বামীজী লিখেছিলেন—"অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা'—সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে,—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নিচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে?"[২] ('বর্তমান সমস্যা'—ভাব্‌বার কথা)

এই মনোভাবের ফলে জাতীয় জীবনে রজোগুণের সংগ্রামীপ্রেরণা-সঞ্চারের অগ্নিবাণী তাঁর রচনাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ "বর্তমান ভারত" থেকে তাঁর সাধু গদ্যরীতি ও

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৩৩৬
২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩২-৩৩

"পত্রাবলী" থেকে চলতি গদ্যরীতির রচনাংশ যথাক্রমে উদ্ধৃতিযোগ্য—"হে বীর সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী…"[১]

"আমি আশীর্বাদ করছি, আজ এই মহামায়ীর দিনে—এই রাত্রে মা তোমাদের হৃদয়ে নাবুন, অনন্ত শক্তি তোমাদের বাহুতে আসুন! জয় কালী, জয় কালী! মা নাববেনই নাববেন—মহাবলে সর্বজয় বিশ্ববিজয়; মা নাবছেন। ভয় কি? কাদের ভয়।…জয় কালী, জয় কালী।"[২]

বিশেষভাবে চলতি গদ্যের প্রতি স্বামীজীর পক্ষপাতের কারণও তাঁর সংগ্রামী প্রেরণা। তাই তো ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—'ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে নেয়—দাঁত পড়ে না।'[৩] একদিকে সংগ্রাম অন্য দিকে গণসংযোগ—বিবেকানন্দের আদর্শ চলতি গদ্য এ দুয়েরই উপযুক্ত বাহন। সাহিত্য, স্বদেশচিন্তা, অধ্যাত্মসাধন—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিবেকানন্দ নিজেকে ভারতবর্ষের চিরপদদলিত স্বজাতিলাঞ্ছিত জনসাধারণেরই একজন বলে মনে করেছেন। তাই বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ অবধি যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা যে সাধারণের মুখের ভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেছেন সে কথা 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ব্রহ্মবিদ্ সাধকই আসন্ন শূদ্রযুগের নিশ্চিত ঘোষণা করেছেন তাঁর 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে।

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৯

২ তদেব : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ৮০-৮১

৩ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : বাঙ্গালা ভাষা : পৃঃ ৩৪

"তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য-জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল।"[১]

"পরিব্রাজক" গ্রন্থে জেলে, মালা, মুচি, মেথরের মধ্য থেকে "নূতন ভারতে"র আবির্ভাবের আহ্বান তো বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে পরিচিত শ্রমিক-বন্দনা। কিন্তু একথাও স্মরণীয়, ক্ষুধার সত্যকে স্বীকার করলেও বিবেকানন্দ ধর্মের সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সাধনায় আমাদের দিনযাপনের সংগ্রামের সঙ্গে চিরন্তনের ধ্যান এসে মিলেছে। সেদিক থেকে বিবেকানন্দ শুধু 'বর্তমান ভারতে'রই লেখক নন, ভবিষ্যৎ ভারতেরও স্রষ্টা।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : বর্তমান ভারত : পৃঃ ২৪১। প্রসঙ্গত ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিচারণে স্বামীজীর দু' একটি বক্তব্য স্মরণীয় (সময়—১৮৯৫)— "The next great upheaval which is to bring about a new epoch will come from Russia or China. I can't quite see which, but it will be either Russia or China." "Europe is on the edge of a volcano. Unless the fires are extinguished by a flood of spirituality, it will blow up." [Reminiscences of Swami Vivekananda : P. 203]

"পরবর্তী যে মহাবিপ্লব নবযুগ নিয়ে আসবে, তা হয় রাশিয়া নয় চীন থেকে দেখা দেবে। কোন দেশ থেকে এই নূতন যুগ দেখা দেবে, তা আমি সঠিক দেখতে পারছি না, তবে হয় রাশিয়া নয় চীন— এ দুই দেশের কোনোটি থেকেই আসবে।" "ইউরোপ এক আগ্নেয়গিরির শিখরে সমাসীন। আধ্যাত্মিক বন্যায় এর অগ্নি নির্বাপিত না হলে এ সভ্যতা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।"

বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্তা

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা সাধারণত একমত। স্বামীজীর শৌর্যদৃপ্ত আত্মসমাহিত ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনাবলীতে একটি বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গী বা শৈলীর সৃষ্টি করেছে, যার তুলনা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বা বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলা গদ্যে দুর্লভ। সংখ্যার বিচারে তাঁর বাংলা রচনা অত্যল্প; কিন্তু সেই স্বল্পসীমার সমুজ্জ্বল দীপ্তিতেই বাংলা গদ্য বা কবিতা-সংকলনে তাঁর উপস্থিতি অনিবার্য। স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনার অজস্র বাংলা অনুবাদে যেভাবে তাঁর ভাবগম্ভীর ওজস্বিতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস দেখা যায়, তার ফলে এই অনুবাদ-সম্ভারও বাংলাসাহিত্যের শ্রদ্ধার সামগ্রী। 'কর্মযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতি বইয়ের অনেক অংশ যেভাবে চিন্তামূলক রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকেরা বা সংবাদপত্র-সেবীরা ব্যবহার করে থাকেন, তাতে মনে হয় এসব বই যে মূলত অনুবাদ, সে কথা অনেকেই অবহিত নন। এ জন্য বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই তাঁর স্ব-নির্বাচিত প্রথম অনুবাদক স্বামী শুদ্ধানন্দজীর কাছে চিরঋণে আবদ্ধ।

কালানুক্রমিকভাবে বাংলাসাহিত্যে সুপরিচিত বিবেকানন্দের চারটি গদ্য-রচনা—'ভাব্‌বার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। এই সব কয়টিই 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ষের মধ্যে প্রকাশিত। 'ভাব্‌বার কথা'র 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটি বোধ হয় স্বামীজীর লেখা প্রথম বাংলা প্রবন্ধ। এর আগে তিনি 'সঙ্গীতকল্পতরু' নামে সংগীত-সংকলনগ্রন্থের একটি ভূমিকা[১]; হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থের অনুবাদ 'শিক্ষা' এবং 'গীতগোবিন্দে'র একটি অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রথম দুটি রচনা পাওয়া গেছে। তৃতীয়টি এখনও অনাবিষ্কৃত।

১ "শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত" 'সঙ্গীত-কল্পতরু'।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাংলা মুখপত্ররূপে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার আত্ম-প্রকাশ-উপলক্ষে[১] স্বামীজী একটি 'প্রস্তাবনা' লেখেন, পরবর্তীকালে 'ভাব্‌বার কথা' নামে প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশের সময় 'প্রস্তাবনার' নাম দেওয়া হয় 'বর্তমান সমস্যা'। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোধর্মের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবনায় স্বামীজীর সিদ্ধান্ত—"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজো-গুণপ্রবাহ প্রবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"

'উদ্বোধনে'র এই প্রস্তাবনা পত্রিকাটির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান; এই মহৎ আদর্শ সামনে রেখেই স্বামীজীর সচেতন সাহিত্যপ্রয়াস। বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষকে ও ভারতের কাছে বিশ্বকে উপস্থাপিত করার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি সেই পুণ্যব্রতই পালন করে গেছেন।

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষেই স্বামীজীর "বর্তমান ভারত" ও "বিলাতযাত্রীর পত্র" (পরবর্তীকালে 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত) বই দুটির অধিকাংশ প্রকাশিত। দ্বিতীয় বর্ষে (১৩০৬-৭) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সূত্রপাত। সুতরাং বাংলাসাহিত্যে স্বামীজীর আবির্ভাব সম্পূর্ণভাবেই এই মাসিক পত্রিকাটির উপলক্ষে। প্রথম চার বৎসর এই পত্রিকার প্রধান এবং একমাত্র আকর্ষণই ছিল স্বামীজীর রচনাবলী।

শুধু গদ্যরচনা নয়, এই সময়ের মধ্যে স্বামীজীর তিনটি শ্রেষ্ঠ কবিতাও উদ্বোধনে প্রকাশিত—১. সখার প্রতি—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। ২. নাচুক তাহাতে শ্যামা—২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ৩. গাই গীত শুনাতে

১ উদ্বোধন ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩০৫ পাক্ষিক পত্রিকারূপে সূচনা

তোমায়—৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। এর মধ্যে 'সখার প্রতি' কবিতাটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং স্বামীজীর বাংলা ও ইংরেজী কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

এ ছাড়া স্বামীজীর রচিত দুটি ধ্রুপদাঙ্গ ব্রহ্মসংগীত বাংলা কবিতার জগতে স্মরণীয় আসনের অধিকারী—"একরূপ-অরূপ-নাম বরণ" এবং "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ—"[১] গান দুটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ ব্যাধির সময় বিবেকানন্দের সমাধি-অবস্থা লাভের পর রচনা।

বিবেকানন্দের বাংলা ও ইংরেজী পত্রাবলী পত্রসাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। পত্রলেখকের ব্যক্তিত্ব যে পত্রকে কী জীবন্ত ব্যক্তিত্বে ভাস্বর করে তোলে, তার আশ্চর্য উদাহরণ স্বামীজীর পত্রাবলী। বিবেকানন্দ-মানসের পূর্ণপরিচয় লাভের জন্য এই পত্রগুলি অমূল্য উপকরণ। সেইসঙ্গে বিবেকানন্দের সাহিত্য-প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত রচনাবলীর মতো এগুলি সচেতনমনের সৃষ্টি নয়, অথচ শিল্পনৈপুণ্যের বিচারে সমান মর্যাদার অধিকারী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং বেশী বলেই মনে হয়।

যদিও রচনার প্রসার ও বৈচিত্র্য সাহিত্যিকের পক্ষে কম কথা নয়, তবু যে লেখক ভাবের জগতে কোনো মৌলিক চিন্তা বা উপলব্ধির সঞ্চার করেছেন, তাঁর মূল্য গতানুগতিক সাহিত্য-সাধনার অনেক ঊর্ধ্বে। স্বামীজীর সাহিত্যকৃতি সেই মৌলিকতার অধিকারী। সাহিত্যের সৃষ্টিমূলক কল্পনাজগৎ বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রধান বিষয় নয়। তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনাবলী প্রধানত মননধর্মী। চলমান জগৎ ও জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের ফলে এই মননধর্ম সজীব ও গতিময়। তাঁর গদ্যগ্রন্থাবলীর পটভূমিতে এক বিরাট অনুভূতিশীল কবিহৃদয় মানবসভ্যতার পতন-অভ্যুত্থানের ইতিহাস-পাঠে অভিনিবিষ্ট। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই কবিমনীষীর সীমাবদ্ধ

১ উল্লেখিত গানদুটির পটভূমি-প্রসঙ্গে 'বাণী ও রচনা' নবম খণ্ড: পৃঃ ৯৯ এবং এই গ্রন্থের 'বিবেকানন্দের কবিতা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য। স্বামীজীর লেখা স্বরলিপিসহ তাঁর 'গানের খাতা'য় এ দু'টি গান পাওয়া গেছে। খাতাটি ইংরেজীতে নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বাক্ষরিত, তারিখ ২২শে জানুয়ারি, '৮৬

আত্মপ্রকাশে তাঁর অন্তরের বিপুল ভাবসম্পদের আভাসটুকু মাত্র আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তবু সেই স্বল্প পরিচয়ই বাংলাসাহিত্যের অন্যতম বিস্ময়।

সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি বিবেকানন্দের আকৈশোর অনুরাগ। এ বিষয়ে তাঁর মধ্যমভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা উল্লেখযোগ্য—"বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। বি. এ. পরীক্ষার সময় তাঁহার পঠিত কোরিওলেনাস এবং মিল্টন, বাইরন, হ্যামিল্টন প্রভৃতির পুস্তকগুলি মঠের পুস্তকাগারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজী কাব্যের ভিতর মিল্টন নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহা হইতে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন। মিল্টন-আবৃত্তি-পদ্ধতি তাঁহার অতি সুন্দর ছিল। গম্ভীর ও তরঙ্গায়মান শব্দে তিনি মিল্টনের শ্লোকগুলি অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। শেক্স্পীয়ারের গ্রন্থগুলির সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন…। বাইরন তিনি খুবই পড়িতেন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহা ব্যতীত সাধারণ ইংরেজী কাব্য তিনি প্রধান অধ্যাপকের ন্যায় পড়াইতে পারিতেন।"

"বাঙ্গালা পুস্তকের ভিতর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' এত মন দিয়া পড়িয়াছিলেন যে মাঝে মাঝে সেই পুস্তক হইতে স্থান উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। হীরেমালিনীর কথা লইয়া মাঝে মাঝে কৌতুক করিতেন এবং মানসিংহের যশোর যাত্রা অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন।[১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ

---

১ ভারতচন্দ্রের কাব্যসম্বন্ধে স্বামীজীর পরবর্তীকালের মনোভাবপ্রসঙ্গে বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ডের পৃঃ ২১১ লক্ষণীয়। ঐ একই পৃষ্ঠায় মধুসূদন ও মেঘনাদবধকাব্য প্রসঙ্গে স্বামীজীর অমর মন্তব্য রয়েছে। এ গ্রন্থের 'মাইকেল মধুসূদন ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যখানি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "মাইকেলই বাঙ্গালা দেশে একটা বিশেষ কবি জন্মেছিল।" দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র কথা সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। একটু হাসি-তামাসার কথা হইলেই তিনি 'সধবার একাদশী'র কোন বোল্ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন। 'নীলদর্পণ' হইতেও তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন।... সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কবিতা 'সুদর্শন সবিতা' কাব্যখানি তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং ঐ ছন্দটি তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিত।... কালিদাসের গ্রন্থের ভিতর কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও মেঘদূত তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল...'ললিত-বিস্তর'খানি তাঁহার বিশেষ জানা ছিল।"[১]

উপরি উদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন উপকরণগুলির সাহায্যে স্বামীজীর সাহিত্য-রুচি কতখানি প্রসারিত ছিল তার অনেকটা পরিচয় মেলে। ছাত্রাবস্থা থেকেই নরেন্দ্রনাথ বহুবিচিত্র জ্ঞান-আহরণে সচেষ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে দর্শন ও শাস্ত্রচর্চাই তাঁর প্রধান আকর্ষণ হলেও নানামুখী জ্ঞানের প্রতি আজীবন ঝোঁক ছিল। জীবনের শেষ পর্যায় অবধি ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ বিশেষ লক্ষণীয়।

কিশোর বয়স থেকেই বিবেকানন্দের সাহিত্যানুরাগসম্বন্ধে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবনীকার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[২] তখন দত্তপরিবার রায়পুরে ছিলেন। সেই সময় "একদিন তাঁহার পিতৃবন্ধু জনৈক খ্যাতনামা লেখক বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন; নরেন্দ্রনাথও পিতার ইঙ্গিতে

---

১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী : ২য় খণ্ড : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত : পৃঃ ১৬২-৬৬ : প্রথম সংস্করণ।

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে তাঁর কতটা পরিচয় ছিল, তা সঠিক বলা কঠিন। তবে 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে রবীন্দ্রসংগীতের সংকলন, এবং 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে তাঁর ভক্তিমূলক রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া দেখে মনে হয়, প্রথম জীবন থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁর গদ্যভঙ্গী বা কবিতার গোত্র আলাদা।

২ বিবেকানন্দ চরিত : ৪র্থ সং : পৃঃ ২৭

আলোচনায় যোগদান করিলেন। সাহিত্যকপ্রবর কিছুক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, অধিকাংশ প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থই বালক অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি বিস্ময়ে ও আনন্দে নরেন্দ্রকে বলিলেন, "বৎস! আশা করি একদিন তোমার দ্বারা বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত হইবে।" এই 'খ্যাতনামা' লেখকটির পরিচয় আমরা জানি না; কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়েছে। বাংলাভাষার গঠনের ইতিহাসে বিবেকানন্দের দান চিরস্মরণীয়। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' নিবন্ধে বাংলা গদ্যের চলতিরূপের সপক্ষে যতখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্তি দেখানো হয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'সবুজপত্রের' আগে চলতি গদ্য সম্বন্ধে অতটা নিশ্চিত ছিলেন না। অথচ তাঁর 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' ও 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অথবা তাঁর প্রথম জীবনের পত্রাবলীতে চলতি গদ্যের যে ভাবসুন্দর নম্রমাধুর্য ফুটে উঠেছে তার দ্বারা বাংলা গদ্য অনেক আগেই চলতিপথের যাত্রী হতে পারত।

কালানুক্রমিকভাবে বিবেকানন্দের চলতি গদ্য পরবর্তীকালের। তবু, বাংলা গদ্যে বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম জীবনের সবরকমের অনুভূতিকেই চলতিভাষায় রূপান্তরিত করার বিদ্রোহী সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। এবিষয়ে তাঁর যুক্তি আরো সুদূরপ্রসারী—"যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।" "দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।" "চলতি ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে?" (বাঙ্গালা ভাষা—'ভাব্‌বার কথা') উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি সমকালীন বাংলা গদ্যের রূপান্তরসাধনে যতটা কার্যকরী হতে পারত, তা না হওয়ার কারণ বিবেকানন্দ কোনো সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মতবাদের সত্যতা স্বীকৃত হয়েছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ সাধুবাদ তার অন্যতম প্রমাণ।[১]

---

১ "দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের (কুমুদবন্ধু সেন)

কিন্তু স্বামীজী নিজেও সবসময় এই চলতিভাষায় লেখেন নি। নিরন্তর সংস্কৃতশাস্ত্রাদির সাহচর্য ভাষার আর একটি গুণের প্রতিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত, শবরস্বামীর মীমাংসা-ভাষ্য, পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতির প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা মনে থাকলে 'ভাব্‌বার কথা'র সাধুভাষায় লেখা প্রবন্ধাবলী অথবা 'বর্তমান ভারতে'র সাধুভাষা সম্বন্ধে বিস্ময়ের কারণ থাকে না।

বিবেকানন্দের সাধুগদ্য সম্বন্ধে সে-যুগেই কেউ কেউ অতিরিক্ত কঠোরতার (কটমটে) অভিযোগ এনেছিলেন। 'ভাব্‌বার কথা'র 'হিন্দুধর্ম কি?' প্রবন্ধটি যখন উদ্বোধনে প্রকাশিত হয় তখনও এ অভিযোগ উঠেছিল। 'বর্তমান ভারত' সম্বন্ধেও এধরনের সমালোচনা যে দেখা দিয়েছিল, স্বামী সারদানন্দজী-লিখিত উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তার নিদর্শন আছে। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর নিজস্ব অভিমত বাংলা-ভাষার দিক থেকে আজও চিন্তনযোগ্য—'এখনকার বাংলা লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs (ক্রিয়াপদ) use (ব্যবহার) করে; তাতে ভাষার জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb-এর ভাব প্রকাশ

নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন —তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল!' দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'আমি এই মাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার কাছে আসছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বল্লেন, 'আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্বপশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।' "
[উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৫৪ সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীকুমুদবন্ধু সেনের " 'উদ্বোধনে'র জয়যাত্রা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়—ভাষার ভিতর verbগুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস? ঐরূপে ভাবের pause বা বিরাম দেওয়া; সেজন্যে ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলার মত দুর্বলতার চিহ্নমাত্র।' [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ][১]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতানুযায়ী বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষার পরিবর্তন বিবেকানন্দও করেছেন—তবে তাঁর সাধু ও চলিত গদ্যের রূপের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। সাধুগদ্যে তিনি অতিমাত্রায় সংহত ও ঋজু। কিন্তু এই ঋজুতার ফলে ভাবপ্রকাশের এমন এক ঘনবদ্ধতা দেখা দিয়েছে যা বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য-অনুযায়ী। অথচ সেই সুগভীর বাক্‌সংযমও অনুভূতির আবেগে মাঝে মাঝে তরঙ্গায়িত হয়ে 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদের মতো অমর কাব্যরচনা করেছে।

তরুণ নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার আর একটি ঘটনার সাক্ষ্য আছে—তাঁর সহপাঠী শরৎচন্দ্রের (স্বামী সারদানন্দ) স্মৃতিকথায়—"ঠাকুরের শ্রীমুখে নরেন্দ্রনাথের গুণানুবাদ শুনিবার কয়েক মাস পূর্বে জনৈক বন্ধুর ভবনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের দর্শনলাভ একদিন আমাদিগের ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিন তাঁহাকে দর্শনমাত্রই করিয়াছিলাম, ভ্রমধারণাবশতঃ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হই নাই। কিন্তু তাঁহার সেইদিনকার কথাগুলি এমন গভীরভাবে আমাদিগের স্মৃতিতে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, এতকাল পরেও উহাদিগকে যেন কাল শুনিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া থাকে।"

শরৎচন্দ্রের এক সহপাঠী বন্ধু যৌবনের প্রথম ধাপে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গিয়েছেন বলে গুজব রটেছিল। বন্ধুটি এখন এক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং মাঝে মাঝে বাংলায় প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে নানা অসদুপায়ে অর্থোপার্জনও চলেছে বলে শোনা যেত। বন্ধু সম্বন্ধে এ সব গুজবের সত্যমিথ্যা নির্ণয়ের জন্য শরৎচন্দ্র সেদিন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। "ভৃত্যের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া আমরা বাহিরের ঘরে উপবিষ্ট

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৪

আছি, এমন সময়ে একজন যুবক সহসা সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গৃহস্বামীর পরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে নিকটস্থ একটি তাকিয়ায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একটি গীতের একাংশ গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিলেন। যতদূর মনে আছে, গীতটি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক, কারণ, 'কানাই' ও 'বাঁশরী' এই দুইটি শব্দ কর্ণে স্পষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল। সৌখীন না হইলেও যুবকের পরিষ্কার পরিচ্ছদ কেশের পারিপাট্য এবং উন্মনা দৃষ্টির সহিত 'কালার বাঁশরী'র গান ও আমাদিগের উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সহ ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ সুনয়নে দেখিতে পারিলাম না ![১]...কিছুক্ষণ পরে আমাদিগের বাল্যবন্ধু বাহিরে আসিলেন এবং বহুকাল পরে পরস্পরে সাক্ষাৎলাভ করিলেও আমাদিগকে দুই একটি কথামাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই পূর্বোক্ত যুবকের সহিত সানন্দে নানা বিষয়ের আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ঐরূপ উদাসীনতা ভাল লাগিল না। তথাপি সহসা বিদায় গ্রহণ করাটা ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া সাহিত্যসেবী বন্ধু যুবকের সহিত ইংরাজী ও বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে যে বাক্যালাপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যথাযথ ভাব প্রকাশক হইবে, এই বিষয়ে উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়া কথা আরম্ভ করিলেও মনুষ্যজীবনের যে কোনোপ্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য বলা উচিত কিনা, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। যতদূর মনে আছে, সকল প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত করিবার পক্ষ আমাদিগের বন্ধু অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যুবক (নরেন্দ্রনাথ) ঐ পক্ষ খণ্ডনপূর্বক তাঁহাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে সু বা কু যে কোনোপ্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি সুরুচিসম্পন্ন এবং কোনোপ্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে উহাকে কখনই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। আপনপক্ষ সমর্থনের জন্য যুবক তখন 'চসর'

১ সমকালীন ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের অনেকের দৃষ্টিতেই রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী নীতিজ্ঞানের অন্তরায় ছিল।—লেখক

হইতে আরম্ভ করিয়া যত খ্যাতনামা ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যিকের পুস্তকসকলের উল্লেখ করিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন তাঁহারা সকলেই ঐরূপ করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

উপসংহারে যুবক (নরেন্দ্রনাথ) বলিয়াছিলেন, "সু এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরের আদর্শ-বিশেষকে প্রকাশ করিতে সর্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছে। আদর্শ-বিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগ সকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—'They idealise what is apparently real.'[১] পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাতনিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত রহিয়াছে—'They want to realise the ideal.'[২] ঐরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে, তাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়। ঐরূপ আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি—সেইজন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।"[৩]

সাহিত্যের ভাবাদর্শ সম্বন্ধে এই চিন্তাধারার ক্রমবিকাশই বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রয়াসে পূর্ণতা লাভ করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, সাহিত্যিক হিসাবে স্বামীজী চরম আদর্শবাদী। বাস্তববাদী জীবন-জিজ্ঞাসা যেখানে মানুষের অন্নবস্ত্র ও বুদ্ধি-হৃদয়ের সামঞ্জস্য-সাধনে

১ আপাতবাস্তবকেই তাঁরা আদর্শায়িত করতে চান।

২ আদর্শকে তাঁরা বাস্তবে রূপায়িত করতে চান।

৩ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ: দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ: পৃঃ ১৩৪-৩৮ ১৩৪২ সংস্করণ।

ব্যস্ত, বিবেকানন্দ সেখানে আত্মার আলোকে জীবনের পরম সত্যটি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চান। তাই তাঁর কাছে ঊনবিংশ শতাব্দীর আর সব চিন্তানায়কের চেয়ে প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধির অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণই আদর্শ পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর অন্তর্লোকে তিনি কেবল ধর্মসাধনার সমন্বয় উপলব্ধি করেন নি, জীবন ও সাহিত্যের অন্তরঙ্গ যোগাযোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপেও লক্ষ্য করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্য—যে সরল উপমাচিত্রল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেছিলেন, সেই সহজ গভীর চলতিভাষার সৌন্দর্যানুরাগই বিবেকানন্দের সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন—"ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে! এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে।" [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ][১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত অধ্যাত্মসাধনার আন্দোলন কেবলমাত্র ধর্মজগতে সীমাবদ্ধ নয়, বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সে ভাবধারা ও বাণীভঙ্গীর চিরনবীনতা নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছে। ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন এসব বিষয়েই যে চলতিভাষায় সহজ ও সুন্দর প্রকাশ একান্ত স্বাভাবিক ও সম্ভব—সেকথা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং বিবেকানন্দের বাংলা রচনাবলীর দ্বারা সুপ্রমাণিত।

"ঈশ্বরলাভ মানবজীবনের উদ্দেশ্য" এবং "খালি পেটে ধর্ম হয় না" —দুটো কথাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দ শুনেছিলেন। উপনিষদের অনুসরণে তাই তিনি বলেছিলেন—'মূর্খ দেবো ভব, দরিদ্র দেবো ভব।' বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় মানবসেবামূলক সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান আজ ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৩। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য' [প্রথম খণ্ড] গ্রন্থের 'বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষা : রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মানুষে মানুষে অধিকারের যে পার্থক্য বিবেকানন্দহৃদয়কে ব্যথিত করত, যে নূতন ভারত জেলে মাল্লা মুচি মেথরের ঝুপড়ি থেকে বেরুবে বলে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন—সে ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক রূপান্তর আজও আমাদের প্রতীক্ষিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের মধ্যে এক স্বামী বিবেকানন্দই ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের অন্তরের পরিচয় লাভ করেছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ থেকে আরম্ভ করে বেশীর ভাগ মনীষীরাই নাগরিক সভ্যতার দৃষ্টিতে জনসাধারণকে পুথিপত্রের মধ্য দিয়ে দেখেছেন। বিবেকানন্দের মতো এমন প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আর কেউ আসেন নি। এদেশের দারিদ্র্য-জীর্ণ দশার আসল কারণ যে শিক্ষার অভাব এই কথাটি স্বামীজীর বারংবার মনে হয়েছে—বিশেষ করে পত্রাবলীতে তিনি গণশিক্ষার কথা একাধিক ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন। চলতিভাষার প্রতি তাঁর একান্ত পক্ষপাতের কারণ এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত গণ-শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী।

বিবেকানন্দের চলিতভাষাশ্রয়ী সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের মনে সহজেই আগ্রহ জাগে। কিন্তু তাঁর সাধুগদ্যে যথাসাধ্য ক্রিয়াপদ বিলোপের প্রস্তাবও আমাদের চিন্তনীয় আদর্শ। ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যেও সংস্কৃতের মতো এত বিশাল ও বিচিত্র শব্দসম্পদের তুলনা বিরল। স্বামীজীর চলতি ও সাধু দুই শ্রেণীর গদ্যই সংস্কৃত শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ। বিশেষত তাঁর সাধুগদ্য যথাসম্ভব ক্রিয়াপদবর্জনের ফলে আরো বক্তব্যনিষ্ঠ ও অর্থগূঢ় হয়ে উঠেছে।

গুরুভাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'কার স্বামী সারদানন্দজীর রচনাশৈলীকে প্রভাবিত করেছে স্বামীজীর সাধু গদ্যরীতির উত্তরাধিকার। তাঁর চলতিভাষার ঐশ্বর্য মনীষী বিনয়কুমার সরকারের রচনা ও আলোচনায় প্রাণবেগ এনে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র গদ্য রচনাবলীতে চলতিভাষাও সংস্কৃত শব্দের নিপুণ প্রয়োগের ফলে কতটা

সংহতগভীর হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন মেলে। বাংলা ভাষায় বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত সাধু-গদ্যের সংহত ভঙ্গিমা যে এখনো উপযুক্ত উত্তরসাধকদের রচনায় পূর্ণতা লাভ করতে পারে সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র গদ্যরীতি তার উদাহরণ। এঁরা কেউই বিবেকানন্দের অনুসরণ করেন নি। তবু মননসাহিত্যের ক্ষেত্রে এঁদের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাষাদর্শের মিল লক্ষণীয়। চলতিভাষাকেও গভীর মননের উপযোগী করতে হলে সংস্কৃত থেকে উপযুক্ত শব্দসন্ধান আমাদের করতেই হবে। তবে, অতিমাত্রায় শব্দকুহেলি-সৃষ্টির দিকে লেখকদের ঝোঁক না দেখা দেয় সে সম্বন্ধেও সতর্কতা প্রয়োজন।

বাংলাসাহিত্যে ও বাংলার জাতীয় জীবনে দৃঢ়চিত্ত পৌরুষের বলিষ্ঠতাসঞ্চারী বীররসের কবিরূপে মধুসূদনকে স্বামীজী বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। সমগ্র ভারতবর্ষেই সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরে নিরুদ্যম তমোগুণের জড়ত্ব তাঁর কাছে অসহ্য মনে হ'ত। বৈষ্ণব সাধনার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে "আধ্যাত্মিক তন্দ্রা" ভেঙে বাঙালীর জাতীয় জাগরণকে তিনি অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের অতিরিক্ত রসাবেশের প্রভাবে বাঙালীজীবনে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল, সেকথা স্মরণ করে তিনি মহাবীর, শ্রীরামচন্দ্র ও কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন—"কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাবি, দেখবি খোল-করতালই বাজছে! ঢাকঢোল কি দেশে তৈরী হয় না? তূরীভেরী কি ভারতে মেলে না? ঐসব গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছেলেদের শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্ত্তন শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল! এর চেয়ে আর কি অধঃপাতে যাবে?

"…ডমরু শিঙ্গা বাজাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মরুদ্রতালের দুন্দুভিনাদ তুলতে হবে। 'মহাবীর', 'মহাবীর', ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে দিগ্দেশ কম্পিত করতে হবে। যে সব music-এ (সংগীতে) মানুষের soft feelings (কোমল ভাবসমূহ) উদ্দীপিত করে সে-সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেয়াল টপ্পা বন্ধ করে ধ্রুপদ গান শুনতে লোকের অভ্যাস করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রাণতা আনতে হবে। এই ideal follow (আদর্শ অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ।"

[স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : উত্তরকাণ্ড][১]

মধুসূদনের মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত বীররসের উন্মাদনা কেন বিবেকানন্দকে এত আকর্ষণ করত, তার কারণ উপরি-উদ্ধৃত সংলাপ-বিবরণীতে সুপরিস্ফুট। বাংলাসাহিত্যে বীর ও রৌদ্ররসের সঞ্চারে স্বামীজীর দান এদিক থেকে অতুলনীয়। এই দুটি রসের পাশাপাশি ভয়ানকরসের প্রকাশ আছে তাঁর 'Kali the Mother' (মৃত্যুরূপা মাতা) ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতা দুটিতে। অবশ্য ইংরেজী ও বাংলা অন্যান্য কবিতায় তিনি ধর্মাশ্রয়ী কবিদের মতো মূলত শান্তরসের অনুগামী। কিন্তু সে শান্তরস কঠোর বীর্য ও অপার সংগ্রামে দৃপ্ত—তাঁর Song of the Sannyasin (সন্ন্যাসীর গীত) বা Song of the Free (জীবন্মুক্তের গীত) এই জাতীয় শান্তরসের উদাহরণ।

অদ্বৈতআশ্রম-প্রকাশিত বিবেকানন্দ-জীবনী (The Life of Swami Vivekananda) গ্রন্থে কবিতা সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার যেটুকু অংশ লিপিবদ্ধ তা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য—'Poetry, because it is the language of ideals, made a strong appeal to Naren. Wordsworth was to him

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ২১৯

the fixed star of poetic firmament. Naren lived in the world of ideals, where history and philosophy and poetry and all the sciences are recognised as phases of Reality. He possessed a prophetic vision of learning, wherein thought was seen as subservient to the real purpose of life, the intellect being the fuel on which the soul fed and which it burned in its supreme effort to go ultimately beyond the intellect, beyond all thought.'[১]

উদ্ধৃত অংশটুকুর ভাষাভঙ্গী নিবেদিতার। স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যশিষ্যাদের সম্মিলিত রচনা এই জীবনীটিতে উদ্ধৃত মতামত আমরা প্রামাণ্য হিসাবেই গ্রহণ করতে পারি। স্বামীজীর কবিতা সম্বন্ধে মতামতেও আমরা আদর্শবাদী চিন্তাধারার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখতে পাই। তাঁর নিজের কবিতায় তিনি বেদান্তের আত্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্মোপলব্ধির অনুভূতিকে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন। এই ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনপথেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—"আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন, তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" [স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—উত্তরকাণ্ড]

১ 'কবিতা যেহেতু ভাবলোকের ভাষা, তাই নরেন্দ্রনাথের কাছে তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ছিলেন তাঁর কাব্যপ্রেরণার ধ্রুবতারা। নরেন্দ্রনাথ সেই ভাবরাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, যেখানে ইতিহাস, দর্শন, কবিতা এবং বিজ্ঞান এক পরমসত্যের বিভিন্ন পর্যায়রূপে স্বীকৃত। জ্ঞানার্জন বিষয়ে তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্যসাধনের অনুবর্তী ছিল মননপ্রক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি আত্মার ইন্ধনস্বরূপ, বুদ্ধি ও চিন্তার অতীতরাজ্যে উত্তীর্ণ হওয়ার পরমপ্রয়াসে সে ইন্ধনাগ্নির সার্থকতা।' (অনুবাদ লেখককৃত)

The Life of Swami Vivekananda : Eastern and Western Disciples : P. 74, 1965 Edn.

বিশ্বপ্রেমের অদ্বয় উপলব্ধিই বেদান্তের ব্রহ্মরূপে বিবেকানন্দের কবিতায় বাণীরূপ লাভ করেছে।

আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা ১৭ই ফেব্রুআরি ১৮৯৬ তারিখের চিঠিতে বিবেকানন্দ তাঁর ইংরেজীভাষায় সাহিত্য-সাধনার মূল স্বরূপটি এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—"To put the Hindu ideas into English and then make out of dry philosophy and intricate mythology and queer, startling psychology, a religion which shall be easy, simple, popular, and at the same time meet the requirements of the highest minds, is a task which only those can under stand who have attempted it. The abstract Advaita must become living—poetic—in everyday life; out of hopelessly intricate Mythology must come concrete moral forms and out of bewildering yogism must come the most scientific and practical psychology—and all this must be put into such a form that a child may grasp it. That is my life's work." "হিন্দুভাবধারাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করা এবং শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও বিচিত্র মনোবিজ্ঞানের মধ্য থেকে এমন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা যা একদিকে সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অন্যদিকে উচ্চতম মনীষার উপযোগী হবে—এ এমন এক দুঃসাধ্য কাজ যে, যারা এ কাজে উদ্যোগী হয়েছে, তারাই তার মর্ম বুঝতে পারবে। বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে প্রতিদিনের জীবনে জীবন্ত ও কবিত্বমণ্ডিত করে তুলতে হবে; অসম্ভব জটিল পুরাণ-কাহিনীর মধ্য থেকে নৈতিক আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্তি চরিত্ররাশি আবিষ্কার করতে হবে; দুরূহ যোগশাস্ত্রের মধ্য থেকে সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারোপযোগী মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করতে হবে, আর এসবই এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটি শিশুও বুঝতে পারে।" (Letters of Swami Vivekananda ; p 302, 1948 Edn.)

স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী-সম্বন্ধেই উদ্ধৃত অংশটি প্রযোজ্য হলেও তাঁর বাংলা ও ইংরেজী কবিতা প্রসঙ্গেই এ কথাগুলি বেশী খাটে। বিশেষত ঐ কথাটি লক্ষণীয়—

"The abstract Advaita must become living—poetic···" (বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে জীবন্ত কবিত্বময় হয়ে উঠতে হবে) —স্বামীজীর কবিতায় বিমূর্ত অদ্বৈতবাদ কেবল "poetic" (কবিত্বময়) না হয়ে "poetry" (কবিতা) হয়ে উঠেছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যোগসূত্র-স্থাপনের উপলক্ষও একটি কবিতা। নরেন্দ্রনাথ জেনারেল এসেম্ব্লি বা স্কটিশ চার্চ কলেজে F. A. (পরবর্তী ইণ্টারমিডিয়েট) পড়বার সময় একদিন ইংরেজী ক্লাসের অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি তাঁদের ক্লাস নিতে আসেন। সেদিন আলোচনার বিষয় ছিল—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Excursion." আলোচনাপ্রসঙ্গে হেস্টি প্রকৃতিসৌন্দর্যধ্যানে ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের ধ্যানতন্ময়তা (trance) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভের সৌভাগ্য এর আগেই হেস্টির ঘটেছিল। সেকথা স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন, "Such an experience is the result of purity of mind and concentration on some particular object, and it is rare indeed, particularly in these days. I have seen only one person who has experienced that blessed state of mind, and he is Ramakrishna Paramahamsa of Dakhsineswar. You can understand if you go there and see for yourself,"[১] 'এ জাতীয় উপলব্ধি. অন্তরের পবিত্রতা এবং বিষয়বিশেষে একাগ্র মনঃসংযোগের ফল। অবশ্য একান্ত দুর্লভ, বিশেষত আজকালের দিনে। মাত্র একজনকেই আমি এমন মহত্তম মানসিক স্তরে উত্তীর্ণ হতে দেখছি, তিনি

১ The Life of Swami Vivekananda : Eastern & Western Disciples ; P. 24 : 1965 Edn.

দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস। সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখলে তোমরা ব্যাপারটি বুঝতে পারবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে নরেন্দ্রনাথ শুধু সমাধি দেখলেন না, স্বয়ং অনুভব করলেন। সেই অনুভবের জগৎ থেকে সর্বজীবে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে তিনি সেবার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—'দরিদ্রনারায়ণ'।

বাংলাসাহিত্যের ঊষাকালে বৌদ্ধ সাধকেরা প্রজ্ঞা ও করুণার মধ্য দিয়ে প্রথম বাংলাসাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন। নির্বাণ ও মানব-প্রেমের সেই সমন্বিত রূপ বাঙালী হৃদয়ের সহজাত ধর্ম। জ্ঞান ও ভক্তি, ধ্যান ও কর্ম, আত্মস্থ সমাধি ও বিগলিত মানবপ্রেমের যুক্তবেণী-রূপে বিবেকানন্দ-সাহিত্য বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী।

কিন্তু মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে ভক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাব ছিল সর্বগ্রাসী। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় রামমোহন সচেতনভাবে বাঙালীর মানস-গঠনের উপাদান আহরণের জন্য বেদান্তচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। হৃদয়াবেগমূলক ভক্তিতন্ময়তা থেকে যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানসাধনার দিকে বাঙালীমনকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথম সাধুবাদ রামমোহনেরই প্রাপ্য। রামমোহনের অনুবর্তী ব্রাহ্মসমাজে কিন্তু এই জ্ঞানযোগের আদর্শের চেয়ে সগুণ ব্রহ্মোপাসনার ভক্তিমূলক সাধনপন্থাই প্রাধান্য লাভ করে।

ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ও অদ্বৈতবাদের ক্রমিক উপলব্ধি একসূত্রে গ্রথিত হয়ে দেখা দিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার ইতিহাসে। বিবেকানন্দ এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরূপে তাঁর কবিতায় কালী থেকে ব্রহ্ম অবধি এক পরমসত্যের সাকার ও নিরাকার উভয়রূপে উপলব্ধি ফুটিয়ে তুলেছেন।

তন্ত্রোক্ত কালিকাধ্যান, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ কবিদের রচিত মাতৃসংগীত—সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আরাধ্যা ভবতারিণী স্বামীজীর কালী-কল্পনার পটভূমি হলেও এক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তাঁর কবিতায় মৃত্যুরূপা

মাতার ধ্যানে যে বীর রৌদ্র ও ভয়ানক রসের সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে তা অনন্য উদাহরণ।

যে মহা-অন্ধকারের পটভূমিতে বিবেকানন্দের কবিতায় মহাকালীর আবির্ভাব সেই অন্ধকারের অনুভূতি বিবেকানন্দের কবিকল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। 'ভারতে বিবেকানন্দ'-গ্রন্থের 'সর্বাবয়ব বেদান্ত' বক্তৃতাটিতে এই অন্ধকার-প্রসঙ্গে কবিতার ভাষা সম্বন্ধে স্বামীজী একটি মৌলিক প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন। সাধারণত কবিরা প্রকৃতির রূপরেখায় তাঁদের অন্তরের অসীমানুভূতি প্রত্যক্ষ করে তোলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তিনটি বিখ্যাত অন্ধকার-বর্ণনার উদাহরণ পাশাপাশি উদ্ধৃত করে স্বামীজী এ কথাটি প্রমাণ করেছেন—

(ক) ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"

(খ) কালিদাসের 'মেঘদূত' থেকে "সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ"

(গ) মিলটনের "No light but rather darkness visible"

আমরা এর পাশাপাশি তাঁর "Kali The Mother" ও "নাচুক তাহাতে শ্যামা" এবং "গাই গীত শুনাতে তোমায়" কবিতা তিনটি থেকে উদাহরণ দিতে পারি—

(১) The stars are blotted out
The clouds are covering clouds,
It is darkness, vibrant sonant.
('নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার,···)

(২) অন্ধকার উগরে আঁধার

(৩) মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে

এই অন্ধকার বর্ণনায় স্বামীজী বেদ ও উপনিষদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবেই প্রভাবিত। কিন্তু প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের এই ভাবপ্রকাশকে স্বামীজী অসম্পূর্ণ মনে করেছেন। তাঁর মতে বাইরের প্রকৃতির মধ্যে মানবহৃদয় কখনো আপন সম্পূর্ণ প্রকাশ খুঁজে পায় না। এই সত্যটি উপলব্ধি করেই উপনিষদের ঋষিরা বলেছিলেন—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি"[১]

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"[২]

কিন্তু বাক্যমনের অগোচর বলে ঋষিরা তাঁদের অনুভূতির প্রকাশচেষ্টা ছাড়লেন না। বরং আপন গভীরে ডুব দিয়ে পরমসত্যকে তাঁরা নতুন বাণীতে প্রকাশ করলেন। তখন—"জড়ের ভাষায় এই আত্মাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা আর রইল না। এমন কি, আত্মার বর্ণনায় তাঁরা নির্দিষ্ট গুণবাচক শব্দ পরিত্যাগ করলেন। অনন্তের ধারণার জন্য আর ইন্দ্রিয়ের সহায়তার প্রয়োজন রইল না।...আত্মতত্ত্ব এমন ভাষায় প্রকাশিত হতে লাগল যে উপনিষদের সেই শব্দগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মন এক সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ সেই অপূর্ব শ্লোকটি মনে করুন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।[৩]

জগতে আর কোন কবিতা এর চেয়ে গম্ভীর ভাবদ্যোতক?"

বিবেকানন্দের কবিতায়, এমনি ইন্দ্রিয়াতীত ভাষায় কাব্যসৃষ্টির উদাহরণ—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।—বিখ্যাত গানটি।

অথবা তাঁর Peace কবিতাটি—

Behold, it comes in might,
The power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.

১ কেনোপনিষৎ: ১।৩

২ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ: ব্রহ্মানন্দবল্লী: নবম অনুবাক

৩ কঠ ২।২।১৫

It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.

ওই দেখ—আসে মহাবেগে
মহাশক্তি, যাহা শক্তি নয়—
অন্ধকারে আলোকস্বরূপ
তীব্রালোকে ছায়ার আভাস।

আনন্দ যা হয়নি প্রকাশ,
অবেদিত দুঃখ সুগভীর,
অযাপিত অমৃত জীবন—
অশোচিত মৃত্যু সনাতন।

(অনুবাদ : স্বামী নিরাময়ানন্দ ,

উপলব্ধির এই অনন্ত আকাশে বিবেকানন্দের অনুভূতি প্রসারিত।

অথচ দুঃখদৈন্য বেদনায় পীড়িত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যন্ত্রণা-সম্বন্ধেও বিবেকানন্দ-সাহিত্য বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন। জগৎ ও ব্রহ্মের এই প্রান্তিক উপলব্ধিকে এক প্রেমের সূত্রে গ্রথিত করে বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীর উদ্দেশে যে নবযুগের অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণী প্রচার করেছিলেন, সেইটি স্মরণ করে আমরা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পরিপূর্ণ-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি—

"He who is in you and outside you,
Who works through all hands,
Who walks on all feet,
Whose body are all ye,
Him worship, and break all other idols."

(The Living God)

সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে
সব হাতে তাঁরি কাজ,
সব পায়ে তাঁরি চলা,
তারি দেহ তোমরা সবাই,
করো তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল প্রতিমা।

(জাগ্রত দেবতা : অনুবাদ : লেখককৃত)

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর !

(সখার প্রতি)[১]

১ আগ্রহী পাঠকের পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচার-প্রকাশিত 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' সংকলনগ্রন্থে বিধৃত বর্তমান লেখকের "বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্তা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

বাংলা গদ্যের চলতি রূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ

বৈদিক যুগ থেকে নব্যভারতীয় যুগ অবধি ভাষার কত রূপান্তরই না ঘটেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধারা দুটি চিরকাল পাশাপাশি প্রবাহিত, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও সাধু আর চলতি—এ দুটি ধারা সাহিত্য-বহনের কর্মে নিয়োজিত। সংস্কৃতের চলিত রূপ থেকেই পাণিনির 'সংস্কৃত' উদ্ভূত। 'পালি' আর 'প্রাকৃত' জনসাধারণের মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু মজা এই যে, একবার সাহিত্যের স্থায়ী মর্যাদা পেলেই চলতি ভাষার চালচলনও বনেদী হয়ে ওঠে। তখন সাহিত্যিক কথ্যভাষা আর সাধারণের মুখের ভাষার পার্থক্য বেড়েই চলে, যতদিন না নূতন কোন ব্যক্তি বা আন্দোলন ভাষায় আমূল পরিবর্তনের সঙ্কল্প নিয়ে আসে।

যা এককালের চলতি ভাষা তাই আর এককালের কেতাবী ভাষা। নূতনকালের মানুষের কাছে সে ভাষার স্থাণুত্ব অসহ্য লাগে। প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি দেখা দেন টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা।

বিদ্যাসাগর-পূর্ব পণ্ডিতী বাংলায় সংস্কৃত শব্দের জটিলতাকে ভাষার গুণ বলে মানা হ'ত। তাই সেকালের কোনো পণ্ডিত যখন কিছুটা বোধগম্য ভাষা লিখেছিলেন, তখন অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, "এ যে দেখছি বিদ্যাসাগরী বাংলা! এ যে বোঝা যায়!" পড়লেই যদি বুঝতে পারা যায়, তাহলে আর সাহিত্য হবে কেমন ক'রে। বাঙালী পণ্ডিতেরাই বিদ্রূপ করতে পারেন—"রঘুরপি কাব্যম্, তদপি চ পাঠ্যম্!" কিন্তু বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে যতই নমনীয় ও অভিজাত করবার চেষ্টা করুন না কেন, নব্য শিক্ষিতসমাজের কাছে সে ভাষাও অন্তরের দূরত্বে রইল। এ হেন সময়ে "আলালের ঘরের দুলালে"র

বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সংবর্ধনায় জাতীয় চিত্তের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হ'ল। বঙ্কিমের মতে : "বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ।" "যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।" অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, আলালী ভাষার দুটি দিক—বর্ণনার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ সাধু-গদ্যের কাঠামোই ব্যবহার করেছেন, আর কথোপকথনের বেলায় এনেছেন একেবারে মুখের ভাষা। এদিক থেকে আরো অগ্রসর হয়েছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য়। এই বইটিতে সর্বত্র নিরঙ্কুশভাবে উত্তর কলকাতার চলতি ভাষা ব্যবহৃত।

১৮৫৪ বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ রচনা 'শকুন্তলা'র প্রকাশকাল। ঐ সালেই হিন্দু-কলেজের দুটি প্রাক্তন ছাত্র, রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের মিলিত চেষ্টায় প্রকাশিত হ'ল 'মাসিক পত্রিকা'—যার উদ্দেশ্য সহজ ভাষার সাহিত্য-সৃষ্টি। একই কালে একদিকে সংস্কৃত কলেজের আভিজাত্যমন্থর ধীরগতি, আর একদিকে হিন্দু কলেজের বিদ্যুৎ-চঞ্চল প্রগতি। কিন্তু 'সবুজপত্র' প্রকাশের (১৯১৪) আগে অবধি 'মাসিক পত্রিকা' বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ব্যতিক্রমমাত্র। 'সবুজপত্র'-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ও উক্ত পত্রের প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা দু'জনে মিলে চলতি ভাষাকে পুরো সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তার ফলে, সাধু-ভাষার সীমা আজ সংকীর্ণ, চলতি ভাষাই বাংলাসাহিত্যের প্রশস্ততর রাজপথ। কিন্তু 'সবুজপত্রে'র আগে আরো একজনের নাম স্মরণীয়। যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি যদি রচনা-বাহুল্যের অপেক্ষা না রাখে তাহলে স্বামী বিবেকানন্দের হাতে চলতি গদ্যের যে বিশেষ রূপটি ফুটে উঠেছে 'উদ্বোধনে'র প্রথম প্রকাশকালেই (১৮৯৯), তা সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেরই চোখে পড়বে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাব্‌বার কথা' এবং 'পত্রাবলী'—এই চারটি বইয়ের মধ্য দিয়েই আমরা চলতি

গদ্যের শিল্পী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে পারি। কিন্তু তার আগে আর একটু পূর্বকথনের প্রয়োজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা সর্বপ্রথম এই চলতি ভাষার রাজপথ-নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উইলিয়ম কেরী এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও আছেন। কিন্তু এঁদের রচনায় চলতি ভাষার প্রয়োগ সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে নয়, অনেকটাই দৃষ্টান্তচ্ছলে। সচেতন সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং স্বামী বিবেকানন্দের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। টেকচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন বাংলাসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। এই দুটি ছদ্মনামই এঁদের চলতি ভাষায় সাহিত্যকীর্তির স্বরূপ অনেকটা বলে দেয়। সমকালীন জীবনধারার অসঙ্গতিকে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করার প্রয়োজনেই এঁদের এই অদ্ভুত নামের আশ্রয় গ্রহণ। দু'জনেরই শরাঘাতের প্রধান লক্ষ্য কলকাতার 'বাবু' সমাজ। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'বাবু' ইংরেজ-সমাগমে নূতন ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে হঠাৎ বড়লোক, কিন্তু দেশী বিদেশী কোনো শিক্ষাই তাদের নেই। এমন একটি বাবুর বর্ণনা: "বাবুরামবাবু চৌগোপ্পা—নাকে তিলক—কস্তাপেড়ে ধুতি-পরা—ফুল-পুকুরে জুতা পায়—উদরটি গণেশের মত—কোঁচান চাদরখানি কাঁধে—একগাল পান।" ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পর যে নতুন ধরনের 'বাবু' দেখা দিলেন, তাদের পরিচয় আছে হুতোমের নক্শায়: "আজকাল সহরের ইংরেজী কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন। প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্ট্'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গির জঘন্য প্রতিরূপ'।"

একদিকে এই জীবন-সমালোচনা, আর একদিকে জগতের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় সহাস্য দৃষ্টি—এ দুয়ের সম্মেলনে আলাল ও হুতোম ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতসমাজে অতি উচ্চ আসন অধিকার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসা উপন্যাসের পূর্ণতার সন্ধানী হ'ল। সেই সঙ্গে বঙ্কিমের সাহিত্যসাধনাকে অনুসরণ ক'রে আলালী ও বিদ্যাসাগরী ভাষার মধ্যপন্থাই বাংলাসাহিত্যে আদর্শরূপে

স্বীকৃতি পেল। তার ফলে কথ্যভাষায় সাহিত্য-রচনার রেওয়াজ দেখা দিল না। "আলাল" ও "হুতোম" উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হয়ে রইল।

চলতি ভাষাকে সবরকমের ভাবপ্রকাশের উপযোগী ক'রে তোলবার কাজে আলাল বা হুতোমের দান খুব কম। যে ভাষা কেবলমাত্র রসিকতার জন্যেই মন হরণ করে, গভীর ভাবের মহলে তার যাতায়াত কম। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—"বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।"[১] কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের রুচি হুতোমী ভাষাকে স্বীকার করতে চায় নি। বঙ্কিমের মতে. "···যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না।"[২] এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে, বিষয় অনুযায়ী ভাষার মাপকাঠিতে হুতোমই সার্থকতর। কারণ, হুতোমের বিষয়বস্তু সমগ্র জীবন নয়, জীবনের নক্‌শা। 'বিষবৃক্ষ' বা 'গোরা' নিশ্চয় এ ভাষায় লেখা যায় না। কিন্তু আলালী ভাষাতেও লেখা যায় না। সুতরাং চলতি ভাষাকে মুখের কথার কাছাকাছি নিয়ে এলেও তার সাহিত্য-রূপের সঙ্গে মুখের কথার পার্থক্য থাকবেই। বিষয় অনুসারে সে পার্থক্য কম বা বেশি হতে পারে—এইমাত্র।

এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য আবার স্মরণীয়—"···সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।"[৩] বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ ক'রে বাংলা গদ্যের এই

১, ২, ৩ বাঙ্গলা ভাষা (বিবিধ প্রবন্ধ)—বঙ্কিমচন্দ্র

ক্লাসিক রীতি 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাবের আগে অবধি অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করেছে।

বাংলা-ভাষার গতি-প্রকৃতি নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকে যখন এমনি পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে, সেই সময়ে কলকাতার উপকণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতায় বাংলার চলিত ভাষা এক নূতন মহিমা লাভ করেছে।[১] হুগলী জেলার গ্রাম্যটান মেশানো তাঁর সরল, অনতিমার্জিত, অথচ সত্যোপলব্ধিময় বাণী নব্যশিক্ষিতদের কানে অপূর্ব শোনালো। এভাষার সঙ্গে বাংলা গদ্যের দুই মহারথী বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর ভাষামাধুর্যের চেয়ে ভাবমাধুর্যের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন বেশী। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে দিলেই কথ্যভাষার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণত্ব বুঝতে পারা যাবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ সাগরে এসে মিল্‌লাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি ; এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান। (হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো ! নোনা জল কেন ? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নয়, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীর সমুদ্র ! (সকলের হাস্য)"

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপের সময় একজন প্রশ্ন করলেন, "যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা ক'ন না ?" এর উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ...যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুনগুন করে।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৩য়)

১ এ প্রসঙ্গে লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের 'বাঙালীর মনন, বাঙালীর ভাষা : রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো।

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)—আর মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য) সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন। শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ।"

ঈশ্বরলাভের উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে বলছেন—"বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশাহারা হয়, সন্দেশ মিঠাই হাতে দিয়ে ভোলাতে যাও, কিছুই চায় না, কিছুতেই ভোলে না, আর বলে, "না, আমি মা'র কাছে যাব", সেই রকম ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই।···এই ব্যাকুলতা। যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুলপথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই—যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভাল-পথে তুলে লন।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৫ম)

উদ্ধৃতির এই সংক্ষিপ্ত পরিসরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাগ্‌ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। প্রথমত উপমার আশ্চর্য সুপ্রয়োগ এবং সেই মৌলিক উপলব্ধির সজীবতা। দ্বিতীয়ত চলতি ভাষার মাধ্যমে শাস্ত্রের গূঢ়তম সত্যকে প্রকাশ করবার অসাধারণ ক্ষমতা। তৃতীয়ত সহজ রসজ্ঞানের সুপটুতা। জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ভাষার উপযোগিতা অসাধারণ। বিশেষ ক'রে যখন একথা ভাবি যে, "আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে।"[১] "তাই বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন,

---

১ বাঙ্গালা ভাষা (ভাব্‌বার কথা)—স্বামী বিবেকানন্দ : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৫-৩৭ ; মূলত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুআরি আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠির অংশ।

তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।"[১] এই মহাজনপন্থা অনুসরণ করেই স্বামী বিবেকানন্দের নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বিবেকানন্দ যে গতিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তার প্রভাবে স্থাণু, অচল কোনো কিছুকেই তিনি স্বীকার করতে পারতেন না। এই প্রচণ্ড গতিময় ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ দেখি তাঁর 'পত্রাবলী'তে, 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'ভাব্‌বার কথা' বই তিনটিতে। চলতি ভাষার পক্ষে স্বামীজীর যুক্তি একান্ত সহজবুদ্ধি-প্রসূত—"স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও তাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর: তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?"[২] অন্তত স্বামীজীর পক্ষে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, তিনি তো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা নিজের কানেই শুনেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর এই মাধুর্যভাণ্ডার থেকে আরো দু'চারটি কণিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে।[৩] আমাদের সত্যরূপ যে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সেকথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—"যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, যতক্ষণ মায়া-মেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞানসূর্য কাজ করে না···ঘরের ভিতরে আনলে আতস-কাঁচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি কাঁচে পড়ে, তখন কাগজ পুড়ে যায়। আবার মেঘ থাকলে কাঁচে

১, ২ বাঙ্গালা ভাষা: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩৫-৩৭।

৩ বাংলা ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব দান প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, একটি চিরস্মরণীয় গ্রন্থ। আগ্রহী পাঠক অবশ্যই এ গ্রন্থখানির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

কাগজ পুড়ে না। মেঘটা সরে গেলে তবে হয়।” (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৪র্থ ভাগ)

মনকে বশ করবার উপায়-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ—“অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে সেই দিকেই যাবে। মন ধোপাঘরের কাপড়। তাকে লাল ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।”

(কথামৃত—৪র্থ)

মায়া আর দয়ার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্ব-প্রেমের মূল কথাটি সুন্দরভাবে বলেছেন—“শুধু দেশের লোকগুলিকে ভালবাসা, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে হয়—ভক্তি থেকে হয়।”

(কথামৃত—৫ম)

সকল পথের সাধনার শেষে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব চেয়েছিলেন “অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ”-ভাবে থাকবেন। সেই অবস্থার অনুভূতি-বর্ণনা : “তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগ্‌লুম! পুজো উঠে গেল! এই বেলগাছ! বেলপাতা তুলতে আস্‌তুম! একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এলো। দেখলাম গাছ চৈতন্যময়! মনে কষ্ট হলো। দূর্বা তুলতে গিয়ে দেখি, আর সে রকম করে তুলতে পারি নি। একদিন ফুল তুলতে গিয়েছি, দেখিয়ে দিলে, গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট্—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া! আর ফুল তোলা হ'ল না!”

(কথামৃত—৩য়)

প্রসঙ্গত বলা চলে, কথামৃত-সঙ্কলয়িতা ‘শ্রীম’ যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাঁচটি খণ্ডে রেখে গেছেন তার যথার্থ সম্মান এখনও সাহিত্যরসিকদের কাছ থেকে আসে নি। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের “কবি শ্রীরামকৃষ্ণ”। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী-সংগ্রহে ‘শ্রীম’ যে শিল্পনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, তার একমাত্র তুলনা ইংরেজী সাহিত্যে

বস্‌ওয়েল-কৃত ডাঃ জনসনের বাণীসংগ্রহ। কিন্তু জগতের ইতিহাসে অধ্যাত্ম অনুভূতির এমন অপরূপ দিনলিপি ইতিপূর্বে আর রচিত হয় নি। বাংলা জীবনীসাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ এই "শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।" শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দিব্যানুভূতি-রূপায়ণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য "কথামৃতে"র মধ্য দিয়ে চিরন্তনতার অধিকার লাভ করেছে।

জীবন এবং সাহিত্য যত কাছাকাছি থাকে, ততই পূর্ণতা পায়। তাই চলতি ভাষা সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ: "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইস্পাত, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।"[১] অর্থাৎ জীবনের যোগেই সাহিত্য! সংস্কৃতপন্থী সাধুভাষা যদি জীবনের যোগ হারিয়ে ফেলে তাহলে চলিত ভাষাকে জায়গা ছেড়ে দিতেই হবে।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই স্বামীজীও প্রয়োজনবোধে অসঙ্কোচে সাধুভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর "বর্তমান ভারত" বইটি সাধুভাষায় লেখা হলেও আশ্চর্যরকম প্রাণবন্ত। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে"র সূচনায় তিনি ক্রিয়াপদের বাহুল্য বর্জন করে গদ্যের যে রূপ দিয়েছেন তা সংস্কৃতেরই নামান্তর। তবু তাঁর ভাষা সবচেয়ে জোর পেয়েছে চলতি ভাষার স্বাধীন ক্ষেত্রে। কারণ, এই স্বাধীনতাই তাঁর ধাতুপ্রকৃতি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আরো দু'একটি অভিমত প্রণিধানযোগ্য: ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি

---

১ বাঙ্গালা ভাষা (ভাব্‌বার কথা): বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩৫

আমার গুরুর ভাষাকে অনুসরণ করি। উহা যেমন চলিত ভাষা তেমনি ভাবের প্রকাশক। ভাষা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে।[১]

বাংলার নানা উপভাষার মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় এ প্রসঙ্গেও তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে যে ভাষা বড় হয়ে উঠেছে তাকেই গ্রহণ করতে বলেছেন "অর্থাৎ এক কল্‌কেতার ভাষা।" বছর কয়েক আগে "পূর্ববঙ্গের সমকালীন সেরা গল্প" নামে যে গল্প-সঙ্কলনটি পূর্ববঙ্গের তরুণ সাহিত্যিকেরা প্রকাশ করেছেন তাতেও দেখেছি মূলত কলকাতার ভাষাই বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশভাগের পর সামগ্রিকভাবে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধেই একথা বলা চলে।

সংস্কৃত ভাষাও একদিন মানুষের সহজ বুদ্ধির কাছাকাছি ছিল। কিন্তু কালে যত সহজাত প্রাণশক্তির অভাব ঘটেছে, ততই ভাষাও হয়েছে পল্লবধর্মী। "বাপ্‌রে, সে কি ধূম দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম্ ক'রে রাজা আসীৎ !!! ওসব মড়ার লক্ষণ"।[৩] জাতীয় জীবনে প্রাণশক্তির সঞ্চার হলে আপনাআপনিই এই অন্ধ অনুকরণপ্রিয় মন্থরগতি ভাষার রূপ বদলে যাবে। তখন "দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আস্‌বে, তা দু' হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।"[৪]

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

২, ৩ বাংলা ভাষা (ভাব্‌বার কথা) ২০শে ফেব্রুআরি ১৯০০। এর সঙ্গে তুলনীয় প্রমথ চৌধুরীর পরবর্তীকালের মন্তব্য—"শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।"—কথার কথা (১৩০৯)। যে প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলে থাকি, বঙ্গভাষার সেই ডায়ালেক্‌টই সাহিত্যের স্থান অধিকার করেছে।" বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু-ভাষা (১৩১৯)। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য খাস কৃষ্ণনগর এবং কলকাতার ভাষাকেও মার্জিত করার প্রয়োজন বোধ করতেন। তাঁর ও রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্য মূলত লেখার ভাষা। দ্রঃ প্রবন্ধ সংগ্রহ, (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৯৮, ২০৪-৫।

৪ বাঙ্গালা ভাষা : ভাব্‌বার কথা : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৬

"পরিব্রাজক" বইটি স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রাকালে জলপথে ভ্রমণের কাহিনী। এ বইটির প্রধান গুণ এই যে, এর চলমান বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সমুদ্রভ্রমণ হয়ে যায়। সমস্ত বর্ণনার মধ্যে এমন একটা চাক্ষুষ করানোর ক্ষমতা আছে, যা ভ্রমণ-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ। এই বইটি পড়তে পড়তে যে মানসভ্রমণ আমরা ক'রে থাকি, তাতে একই সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানুষের বৈচিত্র্য আর ইতিহাসের গতিধারা আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে।

"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশহাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর হর হর" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরিনির্ঝরের "হর হর" প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ?"[১] গঙ্গা ও হিমালয়ের সঙ্গে সুচিরবন্ধনে বিজড়িত ভারতের অধ্যাত্মসংস্কৃতি এই প্রকৃতি-সৌন্দর্যের অন্তরালে মন্ত্রিত হয়ে উঠেছে। এ অপূর্ব সাহিত্য-রস-সৃষ্টির পিছনে রয়েছে সন্ন্যাসী হৃদয়ের শান্ত উদার অচঞ্চল দৃষ্টি।

বাংলাদেশের নিজস্ব রূপটির বর্ণনায় বিবেকানন্দ-মানসের শিল্প-চেতনা অতুলনীয় সার্থকতায় বিকশিত :

"এই অনন্ত শস্পশ্যামলা সহস্র স্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবারে) আর কিছু আছে কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল নারিকেল খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ, এতে কি আর রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার, বিদেশ থেকে

১ পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬১

না এলে, ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ, তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি-ঢালা আম, লিচু, জাম, কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্ছে না, আশে-পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে দুলচে আর সকলের নীচে যার কাছে ইয়ারকান্দী, ইরানী, তুর্কিস্তানী গাল্‌চে দুল্‌চে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস কে যেন ছেঁটে ছুটে ঠিক কোরে রেখেচে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখে ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ? বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"

উপরের উদ্ধৃতির শেষ পঙ্‌ক্তি জুড়ে যে আবেগের অগ্নিস্পর্শ রয়েছে, সে স্পর্শের প্রজ্বলনে আমরা নিমেষে দীপ্ত হয়ে উঠি। আর ঐ "একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা" বিবেকানন্দ ছাড়া কেউ বাংলাসাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন কি?

স্বামীজীর চলতি ভাষা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। তাঁর চলতি ভাষায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত সমাসবদ্ধপদ বেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই শব্দ নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। হৃষীকেশের গঙ্গাবর্ণনায় "কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুল" অথবা ডায়মণ্ডহারবারের দিকের গঙ্গাতীরবর্ণনায় "অনন্তশস্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্য-

১ পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬৩-৬৪

ধারিণী” জাতীয় শব্দ তিনি বিনা দ্বিধায় প্রয়োগ করেছেন। অথচ, ভাষার ভারসাম্য হারান নি। বরং এই সমাসবদ্ধ শব্দগুলিকে ঘিরে চল্‌তি ভাষা কলমন্দ্রে মুখরিত।

টেকচাঁদ এবং হুতোমের রচনায় আমরা কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালী বাবু-সমাজের ছবি পাই। কিন্তু স্বামীজীর চলতি ভাষা সমগ্র বিশ্বপরিক্রমার বিষয়বস্তুকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে। চলতি ভাষার সার্থকতা এই বৃহত্তর ক্ষেত্রে আরো সুপ্রমাণিত। টেকচাঁদ ও হুতোমের সঙ্গে স্বামীজীর ভাষার কিছুটা সাধর্ম্য আছে হাস্যরস-প্রবণতায়। কিন্তু রুচির নির্মলতায় বিবেকানন্দের হাস্যরস আমাদের শ্রদ্ধা অনেক বেশী আকর্ষণ করে।

মার্কিনী বর্ণ-বিদ্বেষের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী যে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন, তার অন্তর্নিহিত বেদনাকে কীভাবে তিনি সরস ব্যঙ্গে পরিণত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : “যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিল মার্কিন-ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বল্‌লে, ‘ও চেহারা এখানে চল্‌বে না।’ মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়ামাত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হ’ল না ; তা একটা ইংরেজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস্ একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা, সে বুঝিয়ে দিলে যে, বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বল্‌বে না, কিন্তু ইউরোপি পোষাক পরলেই মুস্কিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু’একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। খিদেয় পেট জ্বলে যায়, আবার দোকানে গেলুম, “অমুক জিনিষটা দাও ;” বললে “নেই ;” “ঐ যে রয়েছে।” “ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।” “কেন হে বাপু ?” “তোমার সঙ্গে যে খাবে তার জাত যাবে।” তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগতে লাগলো।”[১]

১ পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৭৬

'পরিব্রাজক' বইটির হাঙ্গর-শিকারের বর্ণনায় চলতি ভাষার সাহায্যে সমগ্র ঘটনাটির গতিবেগ ও কৌতুক আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে। 'ভাব্‌বার কথা' থেকে স্বামীজীর হাস্যরস নিপুণতার আর একটি ছোট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। 'বলি রামচরণ! তুমি লেখা-পড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমাদ্বারা সম্ভব নয়, তার ওপর নেশা ভাঙ্‌ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি ?' রামচরণ—"সে সোজা কথা, মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।"[১]

আবার, ইতিহাসের ধারা-অনুসরণকারী বিবেকানন্দ-মানস আসন্ন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে এই চলতি ভাষাতেই বৈপ্লবিক গতি সঞ্চার করেছেন। প্রাচীনকালের বাণিজ্যসমৃদ্ধ ভারতের কথায় তাঁর মনে পড়েছে এ সমৃদ্ধির মূলে ছিল "বিজাতি-বিজিত স্বজাতি-নিন্দিত"[২] ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবী। "...তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেচেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেচেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে, আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্য জাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে ?"[৩] ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের এই শূদ্রশক্তির অভ্যুত্থান দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়ে বঞ্চনা-পরায়ণ তথাকথিত উচ্চবর্ণের উদ্দেশ্যে তাঁর নির্মম নির্দেশ : "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে ! বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোপ, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে।"[৪] বিপ্লবী চেতনার এই অগ্নিবাণী বাংলাসাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ।

এমনিভাবে জীবনের লঘু সৌন্দর্যের সীমা থেকে মনীষার উত্তুঙ্গ শিখর অবধি স্বামীজী এই চলতি ভাষার সাহায্যে অনায়াসে অতিক্রম

১ ভাব্‌বার কথা : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৩

২, ৩, ৪ পরিব্রাজক তদেব : পৃঃ ১০৬, পৃঃ ৮২

করেছেন। 'পরিব্রাজকে'র পাশাপাশি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়তে পড়তে সেই কথাই মনে হয়। দুটি ভিন্নমুখী সভ্যতার অন্তর্নিহিত ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বামীজী কত অনায়াসে সুসম্পূর্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা ফুটিয়ে তুলেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইউরোপীয় সংস্কৃতির অতিস্তুতি এবং দ্বিতীয় ভাগের ভারতীয়তার গোঁড়ামি —এই দুই প্রান্তিক চিন্তাধারার থেকে দূরে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নিখিলমানবের পটভূমিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার পারস্পরিক বিনিময়ের সত্য পন্থাটি নির্দেশ করেছেন। আজ অবধি আমাদের শিক্ষিতসমাজ সে আদর্শকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না, তাই আমাদের ভারতীয়তার আদর্শ আজও অসম্পূর্ণ।

"প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোনও গুণ নেই, যা কোনও জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোনও ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোনও জাতিতে কোনও গুণের আধিক্য, প্রাধান্য। আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্মে'র। আমরা চাই কি— "মুক্তি"। ওরা চায় কি—"ধর্ম"। "ধর্ম" কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম কি? যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম দিনরাত খোঁচাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি? যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোনার শিকল।...এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছো, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে ত ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে থাম্‌কা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হ'ল, না এদিক না ওদিক।"[১]

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫২-১৫৩

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যটি অনুপম প্রাঞ্জলতায় বুঝিয়ে দিয়ে স্বামীজী এই দুই সভ্যতার বহিরঙ্গ বিষয়-গুলিরও তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। শারীরিক গঠনভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, সমাজে নারীর মর্যাদা, ইউরোপীয় সভ্যতার মূলকেন্দ্র ফ্রান্স—এ সব কিছুর তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর ভাষাভঙ্গীর শাণিত অথচ সরল সৌন্দর্য আন্তরিক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনার সময়ও স্বামীজী একথা মনে রেখেছেন—"তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা আর এদের চোখে আমাদের দেখা এ দুই ভুল।"[১] সেই ব্যবহারিক পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন স্বামীজীর দৃষ্টিতে দুটি সভ্যতাই সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছে। এই প্রসারিত দৃষ্টির ফলেই এ দুই সভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে স্বামীজী নূতন আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে Evolution theory বা পরিণামবাদ (আধুনিক পরিভাষায় বিবর্তনবাদ) ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ দুই দেশেই আছে। একটি বহির্মুখী অন্যটি অন্তর্মুখী। বিষয়টি তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধে এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম' বলে ; এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

"পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল ; ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে ; মাটি, পাথর, গাছ, পালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমনকি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে, অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমার মধ্যে পৌঁছলেন, বল্লেন যে,

১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৯৬

সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম' ; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া' 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান।"[১]

"এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম দিয়ে, জড়-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে। তা সে এক কেমন ক'রে বহু হ'ল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত ক'রে দিয়েছি যে ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও সেই করেছে। তবে সেই এক কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এইটা খোঁজার নাম বিজ্ঞান (Science)।"[২]

"মাসিক পত্রিকা"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাধানাথ শিকদারের বক্তব্য ছিল, "যে ভাষা স্ত্রীলোকে বুঝবে না, তা আবার বাংলা কি ?" শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "সরল স্ত্রীপাঠ্য ভাষাতে বাঙ্গালা লেখা রাধানাথের একটা বাতিকের মত হইয়া উঠিয়াছিল। 'মাসিক পত্রিকা'তে কোন প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন কি না।"[৩] অশিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিতদের সঙ্গে উচ্চস্তরের জ্ঞানবিকাশের সংযোগ ঘটানো যে একান্ত প্রয়োজন একথা রাধানাথ শিক্‌দার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের ইংরেজী-বাহিনী উচ্চশিক্ষা আজ অবধি মাতৃভাষাকে বাহন করতে কুণ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের শিক্ষার চেয়ে গণশিক্ষার বিস্তারই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি সেই সাক্ষ্যই দেয়।

স্বামীজীর চলতি ভাষার প্রতি অনুরাগের মূলে ছিল জনগণের সঙ্গে তাঁর একাত্মভাব। এই গণদৃষ্টিই চলতি ভাষার মূল কথা।

১, ২ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২০০

৩ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ : পৃঃ ১৩৬ : নিউ এজ সংস্করণ।

অবশ্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পালি', 'প্রাকৃত' প্রভৃতি মূলত কথ্যভাষা কালে কালে পুরোপুরি লেখ্যভাষায় পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা বিষ্ণু দে-র অধিকাংশ গদ্য রচনা যতটা সংস্কৃতশব্দসমৃদ্ধ, তার তুলনা বিদ্যাসাগরী বাংলাতেই মেলে। অথচ এঁরাও চলতি ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন।

কিন্তু চলতি ভাষার প্রধান প্রয়োজন—মুখের ভাষার সঙ্গে যোগরক্ষা। সেদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং স্বামী বিবেকান্দের রচনাবলীই অনুধাবন-যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের "যুরোপপ্রবাসীর পত্র" এবং "পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী" বই দুটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তবে এই দুটি গ্রন্থের চলতি ভাষা প্রথম যুগের রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। তাছাড়া এদের বর্তমান সংস্করণের ভাষায় পরবর্তীকালের সংশোধন রয়েছে বলে মনে হয়।

বাংলা গদ্যের সাম্প্রতিক পরিণতি লক্ষ্য করলে, বিবেকানন্দ-সাহিত্যের গদ্যরীতি নিজস্ব পৌরুষ ও বীর্যের দৃপ্ত ব্যঞ্জনায় অনন্য উদাহরণ-রূপে দেখা দেয়। আত্মশক্তিতে অনন্ত বিশ্বাসই তাঁর জীবন ও সাহিত্য রচনার পটভূমি। তাই বিবেকানন্দের রচনায় বাংলা গদ্যরীতি কোমলকান্ত রূপের পরিবর্তে ঋজু ওজস্বিতায় দীপ্ত। "পত্রাবলী" থেকে এই রীতির উদাহরণ :

"প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে; ওরে হতভাগাগুলো, 'নেই নেই' বলে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই-নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। ······ছুঁচোগিরি কর্‌বি তো চিরকাল পড়ে থাকৃতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।···Avalanche-এর মত দুনিয়ার উপর পড়—দুনিয়া ফেটে যাক চড় চড় ক'রে। হর হর মহাদেব! উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্।"[১]

[১] ও রচনা (৬ষ্ঠ খণ্ড) : পৃঃ ৪৮৬, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪-এর পত্র

এমনি আরো অনেক সঞ্জীবনী উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু স্বামীজীর চলতি গদ্যের মোটামুটি পরিচয় দান এখানেই শেষ করা যাক। একথা মনে রাখতে হবে যে, লিখতে গেলেই কিছুটা কারুকর্মের প্রয়োজন। 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষার বনিয়াদ চলতি ভাষা, তবু লেখার জগতে এসে সে ভাষাকে কিছুটা পরিবর্তন মেনে নিতে হয়েছে। বিষয়ানুযায়ী সে পরিবর্তনে স্বামীজীর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু অনুরাগ ছিল সকলজনের উপযোগী চলতি ভাষার প্রতি। বাংলা গদ্য-সাহিত্য তাই তাঁর কাছে চিরঋণী।

আলাপচারী বিবেকানন্দ

এ জীবনে তিনি কত কথা বলেছেন, তার অতি সামান্যই লিখিত ইতিহাসে বিধৃত। তবু সেই স্বল্প সঞ্চয়ের মধ্যেই নবযুগের ভারতবর্ষ তার মর্মবাণী খুঁজে পেয়েছে, পৃথিবী পেয়েছে পরিবর্তনশীল মানব-সভ্যতার নিয়ত উত্থানপতনের অন্তরালে অমৃতপন্থার ধ্রুবনির্দেশ। স্বল্পকালের পরিসরে সীমাবদ্ধ তাঁর জীবন। কিন্তু আর সব মানুষের মতো তাৎক্ষণিক নয় তাঁর কথা। প্রতিদিনের সংলাপ, বন্ধুজনের সঙ্গে আলাপচারী, শিষ্য ও স্নেহভাজনদের উদ্দেশে উদ্বোধনী বাণী, স্বদেশ ও বিদেশে প্রদত্ত ভাষণাবলী সর্বত্র তাঁর অসামান্য বাক্‌প্রতিভার নিদর্শন।

বহুবিচিত্র ব্যক্তিত্ব তাঁর সংলাপকে নানা আবর্তনে কখনো গম্ভীর, কখনো উদাত্ত, কখনো বেদনার্দ্র, কখনো উজ্জ্বল চঞ্চল গতিবেগে ভরে দিয়েছে। তাঁর দিব্যকণ্ঠ-উচ্চারিত বাণীভঙ্গিমার বৈদ্যুৎশিহরণ নিমেষে সহস্র নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, একান্ত কথোপকথনের সান্নিধ্য-মুহূর্তে শ্রোতার হৃদয়মনে জাগ্রত করেছে সর্বসংশয়মুক্ত আত্মার অভয়-বাণী। মানবজাতির উদ্দেশে আত্মোপলব্ধির এই বাণীব্রত উদ্‌যাপন করতে করতে তাঁর মনে হয়েছে—"I am a voice without form". তাঁর সমগ্র সত্তাই এক দেহহীন বাণী।

জীবন ও বাণীর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ মনে রেখেও বলা চলে জীবনই বাণী নয়। সীমাবদ্ধ জীবন পিছনে পড়ে থাকে। বাণীই জীবন হয়ে নব নব সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করে। এক একটি মহৎ বাণীর ধ্যান, এক একটি দিব্যমন্ত্র কত যুগ যুগ ধরে মানবতার আলোক-দিশারী হয়ে আছে। বেদ-উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টাদের জীবনকাহিনী আমরা কতটুকু জানি? তবু তাঁদের ধ্যান ও সত্যোপলব্ধির ভিত্তিতেই ভারতীয় সভ্যতা আজও আপন শাশ্বতমূল্য খুঁজে পায়। তাই ভাবের জগৎ

যে বস্তুজগতের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত, সে কথা ভুলে গেলে মানব-ইতিহাসের মূল সত্যটিই উপেক্ষিত হয়।

অপরপক্ষে একথাও বলা চলে যে, মানবচেতনায় বাণীর প্রত্যক্ষ রূপ জীবনে। স্বামীজীর অনুসরণে বলা যায়, যীশুর উপদেশাবলী বাইবেলে যে পরিমাণে আছে, যদি সে তুলনায় তাঁর ব্যক্তিরূপের পরিচয় আর একটু বিশদভাবে আমরা পেতাম, তাহলে যীশুর স্বরূপ আমাদের দৃষ্টিতে কত প্রত্যক্ষ, কত আপন হয়ে উঠতো। তুলনা-মূলকভাবে বুদ্ধজীবন মনে করুন। অধ্যাত্মবিদ্যার নিগূঢ় রহস্যের জন্য নয়, ব্যক্তিজীবনের শতসহস্র সমুজ্জ্বল ঘটনার জন্যই বুদ্ধ আজ প্রাচ্য প্রতীচ্য, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সর্বজনের পরম শ্রদ্ধেয়, পরম আত্মীয়।

কথা ও কাজ, বাণী ও জীবন—এ দুয়ের সম্মিলিত রূপ এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানবকে বিবেকানন্দ অত্যন্ত কাছে থেকে দেখার ও তাঁর বাণী শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণব্যক্তিত্বে আদর্শ-রূপায়ণের অনন্যতা ও সেই আদর্শের বাণীরূপদানে সুদুর্লভ সৌন্দর্য নরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সন্ধিক্ষণে যে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল, পরবর্তী যুগে স্বামী বিবেকানন্দে সে প্রভাবের পূর্ণ পরিণতি।

'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশ হবার পর স্বভাবতই স্বামীজী সবচেয়ে খুশী হয়েছিলেন। যদিও নরেন্দ্রনাথ বা তাঁর অন্যান্য গুরু-ভাইরা, যাঁরা পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁদের উপস্থিতি 'কথামৃতে' অনেক কম, তবু 'কথামৃত' এই যুগমহামানবের দৈনন্দিন কথালাপের যে জীবন্ত চলচ্ছবি চিরকালের মতো বাণীবদ্ধ করে রেখেছে, অধ্যাত্ম-ইতিহাসে তার তুলনা নেই। বিবেকানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে কথায়, গানে, উপদেশে, পরিহাসে, উচ্ছল কীর্তনে, গভীর সমাধিতে, সর্বোপরি জীবন্মুক্তের অপরূপ লীলাভঙ্গিমায় বাস্তব প্রত্যক্ষরূপে বিশ্ববাসী এই কথামৃতের মাধ্যমেই নিত্যকালের মতো আপন করে পেয়েছে।

জীবন ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী। তবু প্রসারিত কারুকর্মের বিলাস-সজ্জায় অনেক সময়ই বাস্তবজীবন থেকে সাহিত্য সুদূরলোকের

অধিবাসী হয়ে দাঁড়ায়। তখন এমনি একজন মাটির বুকের মানুষের প্রয়োজন, যাঁর মুখের ভাষা সমগ্র জাতি ও জনতার মুখের ভাষা, অথচ যাঁর ভাষায় জাতির সমগ্র অন্তরেতিহাস আপনি প্রকাশিত। ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ, কবীর, নানক, চৈতন্য—এমনি জনমনের কাছাকাছি মানুষ, যারা জনতার ভাষাকেই অবলম্বন করে দুরূহগভীর দর্শনতত্ত্বের রহস্য প্রতিদিনের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলেছেন।

কিন্তু এঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর প্রকাশভঙ্গিমায় পার্থক্য আছে। প্রতিদিনের ব্যবহারের আটপৌরে গদ্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্যঞ্জনামণ্ডিত করেছেন, গভীরতম উপলব্ধির যে চিত্রময় প্রত্যক্ষতা এনে দিয়েছেন, আর তাঁর সমস্ত সংলাপে যে পরমরসিকমনের বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরশ্মি বিকীর্ণ হয়েছে—সেইখানেই তিনি আধুনিক মনের সবচেয়ে কাছাকাছি মানুষ।

স্বামীজীর কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সরল মাধুর্যটুকু দীপ্ত তেজের অগ্নিমন্ত্রে রূপান্তরিত। সাত্ত্বিক শুভ্রতা সংগ্রামী রজোগুণের স্পর্শে আগ্নেয় উত্তাপ লাভ করেছে তাঁর বাণীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ভাবপরিমণ্ডলটি পল্লীবাঙলার ; তেমনি স্নিগ্ধ, প্রসন্ন, গভীরতার শ্রীমাখানো ; আর বিবেকানন্দ-বাক্‌ধারার পেছনে রয়েছে কলকাতার নাগরিক পটভূমি, যে কলকাতার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক সূচনা হয়েছিল টেকচাঁদ ঠাকুর বা হুতোম প্যাঁচার ভাষায়। এ ভাষা নাগরিক, কিন্তু শব্দনির্মাণে বা ক্রিয়াবিন্যাসে কোনোরকম শুচিবাইকে প্রশ্রয় দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপচারীতে গ্রাম্যশব্দপ্রয়োগের বাহুল্য ব্রাহ্মসমাজের কোনো কোনো নেতাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। স্বামীজীর লিখিত চলতি বাংলা পড়েই বেশ অনুমান করা যায় যে, তাঁর মুখের ভাষাও শব্দব্যবহারে অনেক পরিমাণেই নিরঙ্কুশ ছিল। "পত্রাবলী", "পরিব্রাজক", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে"র রচনাভঙ্গী তো বিবেকানন্দের বাণীভঙ্গীরই লিখিতরূপ।

যেমন ধরুন, 'পরিব্রাজকে'র সূচনায়—"স্বামীজী! ওঁ নমো

নারায়ণায়—'মো'কারটা হৃষীকেশী ঢঙে উদাত্ত করে নিও ভায়া।" অথবা ঐ বইয়েই আর একটু এগিয়ে "আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন?—পা নিরীক্ষণ ক'রে চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌচাকলা, তায় চক্কর-ফক্কর বড় দেখা গেল না।"[১]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে—"তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি।"[২]

"এ সংসার—'দেখ্ তোর, না দেখ মোর', কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দু শ হাত দিয়ে দেখছে, আমরা—'গোঁসাইজী যা পুঁথিতে লেখেন নি—তা কখনই করব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা, খালি চীৎকার হচ্ছে; বস! কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখো না। আপনা আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।"[৩]

অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই মুখের ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি উদাহরণ মেলে "পত্রাবলীর" ভাষায়—"...দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম না হয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ঘোরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখেছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই ভাবের ঘরে চুরি।"

সাধু ও চলতির মিশ্রণে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠিতে তাঁর

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১১৯

২ তদেব পৃঃ ১৫১

৩ তদেব পৃঃ ১৬৯

বাক্‌ভঙ্গিমা কী অনিবার্যরূপে প্রকাশিত তার উদাহরণ দিই শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রথম সেবাব্রতী স্বামী অখণ্ডানন্দজীর উদ্দেশে লিখিত স্বামীজীর একটি চিঠি থেকে—"তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মতমতান্তরে আসে যায় কি? সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম কর্ম কর্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম—even unto death, দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্য ভয় নাই টাকা উড়ে আসবে। টাকা যাদের লইবে, তারা নিজের নামে দিক, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্।...ভ্যালো মোর ভাই-রে, অ্যায়সাই চলো। It is the heart, the heart that conquers, not the brain."[১]

শুধু যে সাধু আর চল্‌তি তা নয়, বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী, সংস্কৃত সব কিছুতে মিলেমিশে আলাপচারী স্বামীজীর ও লেখক স্বামীজীর অদ্বয় সত্তা এখানে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত। এই একান্ত ঘরোয়া সহজ ভঙ্গীটিতে প্রেরণা ও পৌরুষ, সহৃদয়তা ও অধ্যাত্ম অনুভব—এ সব কিছুরই মিলিত স্বাদ।

তবু বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে স্মরণীয়, যত চেষ্টাই করা যাক, মুখের ভাষা ও লেখার ভাষায় তফাত থাকবেই। সে ক্ষেত্রে স্বামীজীর মুখের ভাষার জন্য আমরা বাংলায় 'কথামৃত', 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', 'স্বামীজীর কথা'; ইংরেজীতে 'Inspired Talks', 'The Master as I Saw Him' এবং 'Reminiscences of Swami Vivekananda'—এই কয়টি গ্রন্থের শরণ নিতে পারি। তাছাড়া অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত 'স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী', 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ', এবং শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের 'Swami

১ বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৩৫৩-৫৪

Vivekananda in America: New Discoveries'—এ জাতীয় গ্রন্থেও তাঁর সংলাপের কিছু কিছু অংশ মেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথোপকথনের যে একনিষ্ঠ সংকলন মাস্টার-মশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশত স্বামীজীর ক্ষেত্রে ঠিক সে ধরনের তথ্যনিষ্ঠ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বাণীসংগ্রহ সম্ভবপর হয় নি। স্বামীজীর সমসাময়িকদের কেউ এ বিষয়ে সজাগ হলে ইতিহাস ও মানবতার অশেষ কল্যাণ সাধিত হ'ত। 'কথামৃতে' নরেন্দ্রনাথের যে সব উক্তি লিপিবদ্ধ, তাতে তাঁর প্রস্তুতিপর্বই বড়ো হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী ওয়াল্ডো-সংকলিত 'Inspired Talks'[১]-এ স্বামীজীর বাণী থেকে শাশ্বতকালের প্রেরণাসম্পদ আহরিত। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজীর ঘরোয়ারূপের চেয়ে বাণীরূপের প্রাধান্য। তবু বাণীসংগ্রহ ও অধ্যাত্মগ্রন্থ হিসাবে 'Inspired Talks' একটি উজ্জ্বলতম গ্রন্থ। 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদে' স্বামীজীর ঘরোয়া রূপটি ফুটেছে। কিন্তু শিষ্য স্বামীজীর মুখের ভাষাকে সাধুভাষার মিশ্রণে অনেক জায়গায় কৃত্রিম করে ফেলেছেন। এদিক থেকে 'কথামৃত'-কার মহেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অতুলনীয়। তবু স্বামীজীর পরিণত মানসের চিত্ররূপে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' বিবেকানন্দ-সাহিত্যে চিরস্থায়ী মর্যাদার অধিকারী। ভগিনী নিবেদিতার 'The Master As I Saw Him' গুরু বিবেকানন্দের দিব্যদৃষ্টি ও জীবনোপলব্ধিময় বাণীসম্পদে পরিপূর্ণ। বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের গভীরতম কবিত্বময় নাটকীয় ঘাতসংঘাতে সমুজ্জ্বল দিকটিরই এ গ্রন্থে প্রাধান্য। তাই এ গ্রন্থের কথোপকথনসংগ্রহ ভাবসৌন্দর্যে ও প্রকাশ-গৌরবে বিপুল ব্যঞ্জনাময়। 'Inspired Talks' বা 'দিব্যবাণী' এ বিশেষণটি স্বামীজীর প্রায় সব কথোপকথন সম্বন্ধেই খাটে। তবে

১ বাণী ও রচনা: ৪র্থ খণ্ড: পৃঃ ১৮৭-৩২৮ দ্রঃ। এই অসাধারণ অনুবাদ গ্রন্থের 'নিবেদন'-অংশে 'ইতি অনুবাদকস্য'-রূপে যিনি আত্মগোপন করেছেন, তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। এ অনুবাদ যে তাঁরই, সে কথা তিনি 'বাণী ও রচনা'র প্রধান সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দজীকে কথাপ্রসঙ্গে নিজেই বলেছিলেন।

বিশেষভাবে শ্রীমতী ওয়াল্ডোর স্মৃতিসঞ্চয়নে বিধৃত দিব্যবাণী সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে।

আলাপচারী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন পর্ব থেকে তাঁর কথোপকথনের কিছু উদাহরণ পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরি—

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ॥ ৩য় খণ্ড ॥ ১৮৮৫, ৯ই মে।

নরেন্দ্র। proof (প্রমাণ) না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।

গিরিশ। বিশ্বাসই sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ); এই জিনিষটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভক্ত।[১] External world (বহির্জগৎ) বাহিরে আছে, philosopher (দার্শনিক) কেউ proof করতে পেরেছে? তবে বলেছে irresistible belief (অপ্রতিরোধনীয় বিশ্বাস)।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না! হয়তো বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

[দেবতারা অমর এই কথা উঠিল]

নরেন্দ্র। তার প্রমাণ কই?

গিরিশ। তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না।

নরেন্দ্র। অমর, past ages-এ ছিল proof (প্রমাণ) চাই। মণি[২] পল্টুকে কি বলিতেছেন।

পল্টু। (নরেন্দ্রের প্রতি সহাস্যে) অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। —নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে। (যোগীন গিরিশাদি ভক্তের প্রতি সহাস্যে) নরেন্দ্রের কথা ইনি আর লন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল

১, ২ 'একজন ভক্ত' এখানে স্বয়ং মহেন্দ্রনাথ—এমন অনুমান করা চলে। মণি অবশ্যই তিনি নিজে

ছাড়া আর কিছু খায় না।' নরেন্দ্র বললে 'চাতক এ জলও খায়।' ভারী ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখি উড়ছিল দেখে বলে উঠল, 'ঐ! ঐ!' আমি বললাম, 'কি?' ও বললে, 'ঐ চাতক! ঐ চাতক।' দেখি কতকগুলো চামচিকে। সেই থেকে ওর কথা লই না।" (সকলের হাস্য)

*

কথামৃত ॥ ৩য় ভাগ ॥ পরিশিষ্ট—বরাহনগর মঠ।

নরেন্দ্র বলিলেন, আমি তো কিছুই মানতুম না।—জানেন।

তিনি যা যা বলতেন প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম না। একদিন তিনি বলেছিলেন, তবে আসিস কেন?

আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।

মাষ্টার—তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি খুব খুসী হলেন।

*

কথামৃত (৪র্থ) ১৮৮৬, ২১শে এপ্রিল।

নরেন্দ্র—বিত্তাসাগরের ইস্কুলের কর্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে যাব মনে করেছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্মের কথা একজন বলেছে! ঈশ্বর-টীশ্বর নাই।

মণি (সহাস্যে)—সে তুমি এখন বলছ; পরে বলবে না। Scepticism ঈশ্বর লাভের পথে একটা stage; এই সব stage পার হলে, আরও এগিয়ে পড়বে, তবে ভগবানকে পাওয়া যায়,—পরমহংসদেব বলেছেন।

নরেন্দ্র—যেমন গাছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?

মণি—হ্যাঁ, ঠাকুর দেখেছেন।

নরেন্দ্র—সে মনের ভুল হতে পারে।

মণি—যে যে অবস্থায় দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে (reality) সত্য। যতক্ষণ স্বপন দেখছো একটা বাগানে গিয়েছো, ততক্ষণ

বাগানটি তোমার পক্ষে reality ; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে—যেমন জাগরণ অবস্থা—তোমার ওটা ভুল বলে বোধ হতে পারে ! যে অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন করা যায়,—সে অবস্থা হলে তখন reality (সত্য) বোধ হবে।

নরেন্দ্র—আমি Truth চাই। সেদিন পরমহংস মহাশয়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

মণি (সহাস্যে)—কি হয়েছিল ?

নরেন্দ্র—উনি আমায় বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।' আমি বল্লাম, 'হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয় ততক্ষণ বলবো না।'

"তিনি বল্লেন—'অনেকে যা বলবে, তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম !'

"আমি বল্লাম, 'নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা বুঝব না।'

তরুণ বিদ্রোহীর যুক্তি-তর্ক, সংশয়-জিজ্ঞাসার উদাহরণ-স্বরূপ সংলাপ-কণিকাগুলি পাঠকচিত্তে যে ধারণা উপস্থিত করে, তারই কাছাকাছি আর একটি সংলাপবিবরণ বিবেকানন্দ-মানসের সুতীব্র অন্তর্দাহের পরিচয়রূপে উদ্ধৃত করি। শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক তাঁর 'New Discoveries' গ্রন্থে চিকাগো বক্তৃতার পূর্ববর্তী আগস্টমাসের শেষ দিকে এক ঘরোয়া আলোচনার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন বিখ্যাত অধ্যাপক রাইটের পত্নীর স্মৃতিসংগ্রহ থেকে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রতি জাতীয়তাবাদী যুবক-সন্ন্যাসীর এই অগ্ন্যুদগীরণ পরবর্তীযুগের বিপ্লববাদের পূর্বাভাস—"And God will have vengeance, you may not see it in religion, you may not see it in politics, but you must see it in history, as it just has been ; it will come to pass. If you grind down the people, you will suffer. We in India are suffering the vengeance of God. Look upon these things. They ground down those poor people for their own

wealth, they heard not the voice of distress, they ate from gold and silver when the people cried for bread, and the Mahommedans came upon them slaughtering and killing; slaughtering and killing they overran them. India has been conquered again and again for years, and last and worst of all came the Englishman. You look about India, what has the Hindoo left? Wonderful temples everywhere. What has the Mahommedan left? Beutiful palaces. What has the Englishman left? Nothing but mounds of broken brandy bottles! And God has had no mercy upon my people because they had no mercv. By their cruelty they degraded the populace, and when they needed them, the common people, the common people had no strength to give for their aid. If man cannot believe in the vengeance of God, he certainly cannot deny the vengeance of History. And it will come upon the English; they have their heels on our necks; they have sucked the last drop of our blood for their own pleasures, they have carried away with them millions of our money, while our people have starved by villages and provinces. And now the Chinaman is the vengeance that will fall upon them; if the Chinese rose today and swept the English into the sea, as they well deserve, it would be no more than justice".

"অন্যায়ের প্রতিশোধ ভগবান অবশ্যই নেবেন। আপনারা হয়তো ধর্ম বা রাজনীতির মধ্যে তা দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর সন্ধান করতে হবে। বারংবার এমনি ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। আপনারা যদি জনগণের উপর পীড়ন ও অত্যাচার করেন, তার জন্য আপনাদের দুঃখভোগ করতেই হবে। ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে দেখুন, কেমন ক'রে ঈশ্বর আমাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিচ্ছেন। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, অতীতে যারা ছিল ধনী মানী, তারা ধনদৌলত বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করেছে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। দুর্গতজনের কান্না তাদের কানে পৌঁছায় নি। সাধারণ মানুষ যখন অন্নের জন্য হাহাকার করে মরেছে, তখন ধনীরা তাদের সোনা-রূপোর থালায় অন্নগ্রহণ করেছে।

তারপরই ঈশ্বরের প্রতিশোধরূপে এল মুসলমানেরা, তাদের কেটে কুচিকুচি করলে। তলোয়ারের জোরে তারা তাদের উপর জয়ী হ'ল। তারপর বহুবার ভারত বিজিত হয়েছে এবং সর্বশেষে এসেছে ইংরেজ।

ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব সব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা ?—একরাশ ভাঙা মদের বোতল। আমাদের দেশবাসীরা তাদের নিষ্ঠুরতায় সমগ্র সমাজকে টেনে নিচে নামিয়ে এনেছে। তারপর যখন জনসাধারণকে প্রয়োজন হ'ল, তখন জনসাধারণের সাধ্য ছিল না দেশকে সাহায্য করার! ঈশ্বর প্রতিশোধ নেন—এ কথা যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তাহলেও ইতিহাসের প্রতিশোধ নেওয়ার কথা তারা নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবে না। ইংরেজের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে প্রদেশে প্রদেশে মানুষ যখন দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে। নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে, আর এ-দেশের কোটি কোটি টাকা নিজের দেশে চালান করেছে। আজ যদি চীনারা জেগে উঠে ইংরেজদের সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেয়—যা তাদের উচিত প্রাপ্য—তা হলে সুবিচারই হবে।"[১]

---

১ Swami Vivekananda in America : New Discoveries : 1st Edn : পৃঃ ২৩-২৪।

বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনায় অনেক সময় ভবিষ্যতের যথাযথ পূর্বাভাস আশ্চর্যভাবে দেখা দিয়েছে। উদ্ধৃত অংশটির ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণের অপেক্ষায়। কিন্তু অত্যাচারিত শোষিত পরাধীন জাতির চিন্তানায়কের কণ্ঠে এই ক্ষমাহীন আত্মবিশ্লেষণ ও অভিশাপবর্ষণ বিবেকানন্দচরিত্রকে এখানে আগ্নেয়গিরির প্রলয়ঙ্কররূপে উদ্ভাসিত করেছে।

কিন্তু এই একান্ত জাতীয়তাবাদী সত্তাই বিশ্বপরিক্রমার ফলে ধীরে ধীরে সর্বজাতির,—এমন কি অত্যাচারী ইংরেজের মধ্যেও মানবমহিমার প্রকাশ লক্ষ্য করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর উগ্র জাতীয়তাবাদ বিবেকানন্দের পরিণতমানসে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের উত্তরপর্বে মানবমৈত্রী ও আন্তর্জাতিকতার পথে আপন সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

তাই সংগ্রামী বিবেকানন্দের পূর্ণতর পরিচয় তাঁর ধ্যানীসত্তায়। আমেরিকার 'Thousand Island Park' (সহস্র দ্বীপোদ্যান)-এ বিশ্রামরত স্বামীজীর কাছে যে ক'জন তত্ত্বজিজ্ঞাসু এসে সমবেত হয়েছিলেন, শ্রীমতী ফাঙ্কি তাঁদের অন্যতম। শ্রীমতী ফাঙ্কি স্বামীজীর ঈশ্বরতন্ময় স্বরূপ প্রসঙ্গে লিখেছেন—In his talks he may go ever so far afield, but always he comes back to the one fundamental thing—"Find God! Nothing else matters."[১]—"কথাপ্রসঙ্গে তিনি যত দূরেই চলে যান না কেন, শেষ অবধি সেই মূল প্রসঙ্গেই ফিরে আসেন—ভগবান লাভ করো, আর কিছুই কিছু নয়।"

স্বামীজীর পূত সান্নিধ্যের শেষ দিনটির স্মৃতিতে শ্রীমতী ফাঙ্কি স্বামীজীর যে অপূর্ব চিত্রটি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন, সে চিত্রটি স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তার সুন্দরতম প্রতীক। শ্রীমতী ফাঙ্কি ও তাঁর সঙ্গিনী—দু'জনকে নিয়ে স্বামীজী সেদিন তাঁর শেষ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। 'আধমাইল আন্দাজ দূরে এক পাহাড়ে আমরা

১ Reminiscences of Swami Vivekananda : p. 261

উঠলুম। সমস্তটাই অরণ্য আর নির্জন। শেষপর্যন্ত তিনি একটি অবনতশাখা বৃক্ষতল নির্বাচন করলেন—আমরা তিনজনে সে গাছটির নেমে-আসা শাখার তলায় বসলুম। প্রত্যাশিত আলাপ-আলোচনার পরিবর্তে তিনি হঠাৎ বললেন, 'এখন আমরা ধ্যান করব। অশ্বত্থের তলে বুদ্ধের মত বসে থাকব।' মুহূর্তে তিনি যেন ব্রোঞ্জে গড়া মূর্তিটির মতো নিশ্চল হয়ে গেলেন। একটু পরেই বজ্র বিদ্যুৎ নিয়ে বিরাট ঝড় দেখা দিল। আর প্রচণ্ড বৃষ্টি। এসব তিনি টেরই পেলেন না। আমার ছাতাটি মেলে কোনো রকমে তাঁকে ঝড়বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। আপন ধ্যানে সম্পূর্ণ সমাহিত স্বামীজী বাইরের সব কিছু সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে রইলেন।"[১] দেশপ্রেমিক, গণনায়ক, মানবিকতাবাদী বিবেকানন্দের অন্তর্লোকে যে ব্রহ্মবিদসত্তা চিরজাগ্রত ছিল, এমনি কোনো দিব্যমুহূর্তে তার প্রকাশ ঘটতো, তখন :

'ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতি।'

'অবাঙ্মনসোগোচরম্' এই ধ্যানলোকের আভাস স্বামীজীর রচনায় সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত তাঁর 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি' গানটিতে। আর তাঁর সংলাপসংকলনগ্রন্থের মধ্যে 'Inspired Talks' গ্রন্থে।

স্বামীজীর রচনা ও কথোপকথনে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎচমকের মতো ঝলসে উঠেছে দিব্যবাণীর প্রেরণা। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে ঠিক এ ধরনের চমক নেই,—গোমুখী-উৎসারিত গঙ্গার মতো স্বচ্ছ শীতল সে অমৃতপ্রবাহ। স্বামীজীর বাণীতে শুধু যে তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তিই সঞ্চারিত, তা নয়, তাঁর অধ্যাত্ম-উপলব্ধিও অভীঃমন্ত্রের মূল প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাই স্বামীজীর আত্মতত্ত্বের আলোচনায় আমরাও সহস্র-দ্বীপোদ্যানের সেই অনুরাগীদের মতো উদ্বুদ্ধ হই, যখন পড়ি—

১ Reminiscences of Swami Vivekananda : p. 264-265

"No law can make you free. Nothing can give you freedom, if you have it not already. The Átman is self-illumined.

...Beyond what was, or is, or is to be, is Brahman. As an effect, freedom would have no value, it would be a compound, and as such would contain the seeds of bondage. It is the one real factor not to be attained, but the real nature of the soul...The greatest sin is to think yourself weak. No one is greater ; realise you are Brahman."

কোনো নিয়মকানুনই তোমায় মুক্ত করতে পারে না, তুমি মুক্তই রয়েছো। তুমি যদি আগে থেকেই মুক্ত হয়ে না থাকো, তবে আর কেউ তোমায় মুক্ত করতে পারে না। আত্মা স্বয়ম্প্রকাশ।...যা কিছু ছিল, আছে, বা হবে, ব্রহ্ম সে সব কিছুর পারে। মুক্তি যদি কোনো কর্মের ফল হতো, তবে তার কোনো মূল্যই থাকতো না, সেটা একটা যৌগিক বস্তু হতো, সুতরাং তার ভিতরে বন্ধনের বীজ থেকে যেত। এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যভাব। মুক্তি লাভ করতে হয় না, মুক্তিই আত্মার যথার্থ স্বরূপ।...নিজেকে দুর্বল ভাবাই সবচেয়ে বড়ো পাপ। তোমার চেয়ে বড়ো আর কেউ নেই, উপলব্ধি কর, তুমিই ব্রহ্মস্বরূপ। (Inspired Talks : ১৬ই জুলাই, ১৮৮৫ তারিখের দিনলিপি।)

"Christs and Buddhas are simply occassions upon which to objectify our own inner powers. We really answer our own prayers,

It is blasphemy to think that if Jesus has never been born, humanity would not have been saved. It is horrible to forget thus the divinity in human nature, a divinity that must come out. Never forget

the glory of human nature. We are the greatest God that ever was or ever be. Christ and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I am. Bow down to nothing but your own higher self. Until you know that you are that very God of gods, there will never be any freedom for you."

'খ্রীস্ট ও বুদ্ধের মতো মহামানবেরা কেবল আমাদের বহিরবলম্বন মাত্র; তাঁদের উপর আমরা আমাদেরই অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ আরোপ করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকি।

যীশু যদি না জন্মাতেন, তাহলে মানবজাতির কথনো উদ্ধার হতো না, এমন কথা ভাবা ঈশ্বরনিন্দারই সমান। মানবস্বভাবের অন্তর্নিহিত যে ঈশ্বরসত্তা তাকে ঐ ভাবে ভুলে যাওয়া অসঙ্গত। ঐ ঈশ্বরসত্তার প্রকাশ কোনো না কোনো ভাবে হবেই হবে। মানব-স্বভাবের মহত্ত্ব কথনো ভুলো না। অতীতে বা ভবিষ্যতে ঈশ্বরসত্তার যে প্রকাশ হয়েছে বা হবে, তার মধ্যে আমরাই সর্বোত্তম প্রকাশ। 'সোঽহম্'—'আমিই সেই অনন্ত মহাসমুদ্র', খ্রীস্ট ও বুদ্ধগণ সে মহাসমুদ্রের তরঙ্গমাত্র। আপন মহত্তর সত্তার কাছে ছাড়া, আর কারো কাছেই মাথা নোয়াবে না। যতক্ষণ না তুমি উপলব্ধি করতে পারছ যে, তুমিই সেই দেবাদিদেব, ততক্ষণ তোমার মুক্তি নেই।'

[Inspired Talks : ৩০শে জুলাই, ১৮৯৫ এর দিনলিপি]

কোন্ দিব্য মুহূর্তে এই মন্ত্রবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু এখনও যখন বিবেকানন্দ-রচনাবলী পাঠ করতে যাই, সেই মুহূর্তটি পরমতম সত্যের সঙ্গে আমাদের এই ক্ষণসত্যময় জগতের চিরন্তন ঐক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বামীজীর দিব্যবাণীময় সত্তার শ্রেষ্ঠ কথাসংগ্রহ এই 'Inspired Talks' নানা দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের সঙ্গে তুলনীয়। শুধু পার্থক্য এই যে, মানুষ বিবেকানন্দের চেয়ে তাঁর ভাবরূপই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ 'জ্ঞানী'র চেয়ে 'বিজ্ঞানী'কে বড়ো বলেছেন। বিবেকানন্দকে তিনি যখন সমাধির আনন্দে ডুবে থাকার চেয়ে উঁচু অবস্থার কথা বলেন, তখন ঐ বিজ্ঞানী-সত্তার কথাই অন্যভাবে দেখা দেয়। অদ্বৈতসত্তার এই স্তরে যে মুক্তমানস বিপ্লবীর পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব তার দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে সে সম্বন্ধে স্বামীজীর আর একটি বাণী—

'Learn to feel yourself in other bodies, to know that we are all one. Throw all other nonsense to the winds. Spit out your actions, good or bad, and never think of them again. What is done is done. Throw off superstition. Have no weakness even in the face of death. Do not repent, do not brood over past deeds and do not remember your good deeds ; be azad (free). The weak, the fearful, the ignorant will never reach the Atman. You cannot undo, the effect must come, face it, but be careful of all deeds to the Lord, give all, both good and bad. Do not keep the good and offer only the bad. God helps those who do not help themselves.'

'অনুভব করতে শেখো যে, আর সব দেহে তুমিই বর্তমান, জানতে চেষ্টা কর যে, আমরা সবাই এক। আর সব আজে বাজে জিনিস শূন্যে উড়িয়ে দাও। ভালো মন্দ যাই করেছ, সে সব থু থু করে উড়িয়ে দাও। যা করেছ, করেছ, সেগুলি নিয়ে আর একদম ভেবো না। কুসংস্কার দূর করে দাও। সামনে মৃত্যু এলেও কোনরকম দুর্বলতা মনে ঠাঁই দিয়ো না।

অনুতাপ করো না। আগে যে সব কাজ করেছ, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। এমন কি, যে সব ভালো কাজ করেছ, তাও মনে রেখো না। আজাদ (মুক্ত) হও। দুর্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনো

আত্মাকে লাভ করতে পারে না। কোনো কর্মের ফল তুমি বিনষ্ট করতে পারো না—ফল আসবেই আসবে। সুতরাং সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হও। কিন্তু সাবধান আবার যেন সে কাজ ক'রো না। সব কর্মের ভার ভগবানের উপর ফেলে দাও—ভালোমন্দ সব। নিজে ভালোটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ো না। যে নিজেকে নিজে সাহায্য করতে যায় না, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন।[১]

[Inspired Talks : ৩রা আগস্ট, ১৮৯৫ এর দিনলিপি]

এই বাসনামুক্ত বৈরাগ্যময় শুকদেবোপম সত্তাই বিবেকানন্দের সহজাত প্রকৃতি। তাই স্বামীজীর রচনাবলী অনুধাবনের সময় একথাটি মনে থাকা প্রয়োজন যে পাঠক যাঁর বাণী ও রচনার অনুশীলন করছেন, তিনি মূলত এক সর্ববন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসী, যিনি বিশ্বকল্যাণে আত্মনিবেদনের ব্রত গ্রহণ করেছেন।

শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের হৃদয়—স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত মনুষ্যত্বের আদর্শ। তবু 'মতামত দর্শন বিজ্ঞানে'র চেয়ে প্রেমই তাঁর উপলব্ধিতে জীবনের সারসত্য।

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ-বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম' এইমাত্র ধন।

(সখার প্রতি)

বুদ্ধ তাই তাঁর দৃষ্টিতে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব। কতবার কতভাবে তিনি বুদ্ধের প্রতি তাঁর চিরন্তন আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে একদিন বুদ্ধপ্রসঙ্গে বুদ্ধের সংসারত্যাগকাহিনী বর্ণনার সময় তাঁর মন্তব্যটি স্মরণীয় : Have you never thought

১ উক্তিটি প্রচলিত বাক্যের বিপরীত। সাধারণত আমরা বলি 'ভগবান তাকেই সাহায্য করেন, যে নিজেকে সাহায্য করে।' কিন্তু এখানে চরম বৈরাগ্যবান সাধকের কথা বলা হয়েছে। তুলনীয়—যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।—গীতা

of the heart of the heroes? How they were great, great, and soft as butter.' তুমি কি কখন মহাবীরদের হৃদয়ের কথা ভেবে দেখেছ? তাদের হৃদয় কত বড়, কত বিরাট, আর কেমন মাখনের মতো কোমল?[১]

বুদ্ধহৃদয়ের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী অজান্তে আপন হৃদয়সত্য উচ্চারণ করেছেন। তবু, স্বামীজীরই ভাষায় 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।' জগতের ইতিহাসে যাঁরা শ্রেষ্ঠ-বীর, তাঁরা সবচেয়ে বেশী দুঃখী। এই নিখিলযন্ত্রণাকে হৃদয়ে ধারণ করেই সেই রক্তাক্ত অনুভূতি আরো সত্য হয়ে ওঠে; প্রেমে ও যন্ত্রণায়, যন্ত্রণায় ও ঈশ্বরে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। কালী ঈশ্বরচেতনার সেই বেদনাঘন মূর্তি।

"She is the organ. She is the pain, And she is the giver of pain, Kali! Kali! Kali!" 'তিনিই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রণা, তিনিই যন্ত্রণাদাত্রী, কালী! কালী! কালী!'[২]

এই যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েই বিবেকানন্দ ধ্যাননেত্রে তাঁর আনন্দময় জীবনদেবতার মুখশ্রী দেখতে পেয়েছেন। তাঁর 'The Cup' কবিতায় বেদনার পানপাত্রটি বিনা প্রশ্নে পান করবার আদেশ এসেছে জীবনদেবতার কাছ থেকে, তারপর নিমীলিত দৃষ্টির নির্জন পটভূমিতে মুক্তির অন্বেষণের পরিসমাপ্তি।

তাই ভারতীয় সাধনার শেষ ও শুরু—'আনন্দাৎ আনন্দান্তরম্।' নিখিলবেদনাকে অকাতরে বরণ করতে পেরেছিলেন বলেই বিবেকানন্দের আনন্দময় রূপটি তাঁর কথোপকথনের নানাস্থানে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করেছে। উচ্চাঙ্গের হাস্যরস এমনি নিরাসক্ত হৃদয়ের অপেক্ষা রাখে।

১ The Master As I Saw Him: 'His attitude to Buddha': Complete works of Sister Nivedita: Vol I: p. 271

২ Ibid: 'Kshir Bhowani': p. 94.

একদা আমেরিকায় কোনো মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন, "Swamiji, are you a Buddhist?" (স্বামীজী আপনি কি বৌদ্ধ ?) মহিলার উচ্চারণে "Buddhist" (বৌদ্ধ) কথাটি দাঁড়িয়েছিল 'Budist', যার মানে দাঁড়ায় কুঁড়ি-বিশারদ। স্বামীজী সহাস্যে উত্তর দিলেন, "No, Madam, I am a florist" (না, আমি একজন পুষ্পবিশারদ।)

ব্যঙ্গচ্ছলে হলেও উত্তরটি ঠিক। স্বামীজীর কাজই তো কুঁড়িকে ফুটিয়ে তোলা !

বিখ্যাত দার্শনিক ইঙ্গারসোলের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ স্মরণীয়। ইঙ্গারসোল বলেছিলেন যে, জগৎটাকে তিনি কমলালেবুর মতো উপভোগ করতে চান। উত্তরে স্বামীজীর কথা, 'আমিও তাই চাই, তবে খোসাটুকু বাদ দিয়ে।' মায়ার খোসাটুকু বাদ দিয়ে ব্রহ্মফল আস্বাদের উপমা স্বামীজী 'পরিব্রাজক' গ্রন্থেও দিয়েছেন। ওই নির্মোহ দৃষ্টিই হাস্যরসের গোড়ার কথা।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদে গো-রক্ষাপ্রচারকের সঙ্গে স্বামীজীর সেই বিখ্যাত কথোপকথনটি এ জাতীয় ব্যঙ্গের চরম উদাহরণ।

স্বামীজী। ···আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আয়োজন করিয়াছে কি ?

প্রচারক। আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতৃগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত।

স্বামীজী। যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই মানুষ লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে গেছে, সামর্থ্যসত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেন নি ?

প্রচারক। না, লোকের কর্মফলে—পাপে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। যেমন কর্ম তেমনি ফল হয়েছে।

স্বামীজী। যে সভাসমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনাহারে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য একমুঠো ভাত না দিয়ে পশুপাখির জন্য রাশি রাশি খাবার বিলায়, তার প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।

তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উন্নতি হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কর্মফলে মানুষ মরছে—এ ধরণের কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোনো বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষা কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে —গোমাতারা আপন কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই।

প্রচারক (অপ্রতিভ)—হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন, তা সত্য বটে, তবে শাস্ত্রে বলে—গোরু আমাদের মাতা।

স্বামীজী (সহাস্যে)—হ্যাঁ, গোরু যে আমাদের মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন ?[১]

স্বামীজীর মানবিকতাবোধের অপূর্ব-দৃষ্টান্তও এই কথোপকথনে প্রকাশিত।

বেলুড় মঠ। ১৯০২

মঠের আঙিনায় স্বামীজী সেদিন সাঁওতাল মজুরদের নারায়ণ-জ্ঞানে খাওয়ালেন। তারপর শিষ্যকে বললেন, 'এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালোবাসা, এমন আর দেখি নি।'

তারপর মঠের সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, 'দেখ্, এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নয়তো গেরুয়া পরে আর কি হল? 'পরহিতায়'—সর্বস্ব অর্পণ এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস।...দেশের লোকে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই তোর শাঁখ-বাজানো, ঘণ্টানাড়া, ফেলে দিই তোর লেখাপড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা, সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়িপাতি

১ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ · বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯

যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণদের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দিই।...আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'।

সেদিনের কথাবার্তার শেষে স্বামীজী বলেছিলেন, 'আজ যা বলেছি, সে সব কথা মনে গেঁথে রাখবি। ভুলিস নি যেন।'[১]

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ভোলেন নি বলেই স্বামি-শিষ্য-সংবাদের দুটি খণ্ডে আমরা আলাপচারী বিবেকানন্দের একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ করেছি। স্বামীজীর মুখের ভাষায় যথাযথ লিপিবদ্ধ করা হয় নি বলে এ গ্রন্থের যে অপূর্ণতা, তা বক্তব্যের মহিমায় পূর্ণ হয়ে গেছে। সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে অন্ধতমিস্রাবিধ্বংসী চৈতন্যময় বিবেকানন্দের প্রবল দুর্বার ব্যক্তিত্ব।

চেতনের লক্ষণ কি, এ প্রশ্নের উত্তরে শিষ্যকে স্বামীজী বলেছিলেন, 'যা কিছু প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাই চেতন, তাতেই চৈতন্যের বিকাশ রয়েছে। দেখ্‌না একটা সামান্য পিঁপড়েকে মারতে যা, সেও জীবনরক্ষার জন্য একবার বিদ্রোহ করবে। যেখানে struggle (সংগ্রাম), যেখানে rebellion (বিদ্রোহ) সেখানেই জীবনের চিহ্ন।'[২]

আহারে, চলন-বলনে, ভাবে ভাষায় যে তেজস্বিতা তিনি জাতীয় হৃদয়ে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, তার জ্বলন্ত, জীবন্ত মূর্তি তিনি নিজে। এ যুগে তাঁর নিজস্ব মৌলিক বাণী কি, সে কথাও তিনি বলেছিলেন ভগ্নী নিবেদিতাকে—Yes! the older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. This is my new gospel.'[৩] 'হ্যাঁ, বয়স যত বাড়ছে, ততই একথা উপলব্ধি করছি যে, পৌরুষের উপরেই সবকিছু নির্ভর করে। এই আমার নূতন বাণী।'

---

১ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ২৩৫

২ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ১২

৩ Complete Works of Sister Nivedita : Vol I : p. 122.

ঋগ্বেদের ঋষি বলেছিলেন, বাক্ই সরস্বতী। নরঋষি বিবেকানন্দের বাক্ই মহাশক্তি। জাতির অন্তরে এই মহাশক্তি সঞ্চারই তাঁর জীবনবাণী। অমিত তেজ ও অনন্ত প্রেমে পরিপূর্ণ তাঁর বাক্মহিমা। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' শিষ্যের মাধ্যমে সমগ্র জাতির প্রতিই তাঁর 'অভীঃ'মন্ত্র উচ্চারণ—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—বীরই বসুন্ধরা ভোগ করে একথা ধ্রুবসত্য। বীর হ—সর্বদা বল্ 'অভীঃ'। সকলকে শোনা 'মাভৈঃ মাভৈঃ'—ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই ব্যভিচার। জগতে যতকিছু negative thoughts (নেতিবাচক ভাব) আছে, সে-সকলই ভয়রূপ শয়তান থেকে বেরিয়েছে। এই ভয়ই সূর্যের সূর্যত্ব, ভয়ই বায়ুর বায়ুত্ব, ভয়ই যমের যমত্ব যথাস্থানে রেখেছে—নিজের গণ্ডির বাইরে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তাই শ্রুতি বলছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

যেদিন ইন্দ্রচন্দ্রবায়ুবরুণ—ভয়শূন্য হবেন, সব ব্রহ্মে মিশে যাবেন; সৃষ্টিরূপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—'অভীঃ অভীঃ'।"[১]

বিবেকানন্দের আর এক শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজীর 'অস্ফুট স্মৃতি' থেকে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর আলোচনায় একটি কণিকায় বিধৃত নিখিল-মানবের প্রতি প্রেম-বিগলিত সত্তার অন্যতম উদাহরণ—

সেদিন আলোচনার বিষয়: অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষে পার্থক্য কি? এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর না দিয়ে স্বামীজী যা বলেছিলেন, তাই স্বামীজীর জীবনবেদরূপে গৃহীত হ'তে পারে—"বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ত, তবে সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হ'ল না বলে প্রায়োপবেশন ক'রে দেহত্যাগ করার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান, কত সাধন-ভজন করেছি, কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয়

১ বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ২৬

আগ্রহ নেই। এখন কেবল মনে হয় যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তি নেই।"[১]

আত্মমুক্তি থেকে এই বিশ্বমুক্তির জগতে উত্তরণের মূলে অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা। বিবেকানন্দের জীবনেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'জীব শিববাদে'র পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ। বহুমুখী বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিবেকানন্দ-বাণীর মূলসুরটি আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধির, সেই উপলব্ধির আলোকেই জগতের অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রের অনুধাবন। স্বভাবতই উপনিষদের মন্ত্রবাণী স্বামীজীর কথোপকথনে ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে। এ জাতীয় মন্ত্রোচ্চারণের এক অপূর্ব বাণীচিত্র আছে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর 'স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি'তে—"বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব স্বর, তাল ও তেজস্বিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যখন পরচর্চায় মগ্ন হইয়া আত্মচর্চা ভুলিয়া থাকি, তখনও শুনিতে পাই—তাঁহার সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা :

'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ। মুণ্ডক, ২।২।৫—সেই একমাত্র আত্মাকে জানো, অন্য সব বাক্য পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিদ্যুল্লতা চমকিতে থাকে, তখন যেন শুনিতে পাই—স্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বলিতেছেন :

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ॥
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ কঠ ২।২।১৫

সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না। চন্দ্র-তারকাও নহে, এইসব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি ? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে।

---

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড; স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি : পৃঃ ৩৩৯

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করিয়া হৃদয় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনিতে পাই— স্বামীজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করিতেছেন :

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

*

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

—শ্বেতাশ্বতর উপ. ২।৫ ; ৩।৮

—হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।"[১]

আবার এই উপনিষদমন্ত্রে অভিষিক্ত বিবেকানন্দেরই আর একটি কথাও স্বামী শুদ্ধানন্দজীর বাণী-সংগ্রহে বিধৃত : 'এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় ব'লে বুঝতে পারবে।'

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অনুধাবন-প্রসঙ্গে তাঁর ওই বাঙ্ময়স্বরূপের আলোচনা আমাদের কিছুক্ষণের জন্যও তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপনীত করে। মহৎ সান্নিধ্যে আপন মহিমাকে নিমেষের জন্যও যদি স্মরণ করায়—সেই তো পরম লাভ।

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৩৪১-৪২ উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর অনুবাদ স্বামী শুদ্ধানন্দকৃত।

২ স্বামী শুদ্ধানন্দ-সংকলিত 'স্বামীজীর কথা' : বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ [illegible]

সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলা গদ্যের সাধুরূপ আজ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় অন্তর্হিত। স্বামীজীর ভাষায় 'এক কলকেতার ভাষা'ই মার্জিতরূপে নিখিল বাঙালীর লেখনীর ভাষা। ব্যক্তিগতভাবে এই প্রবন্ধের লেখকও চলতি বাংলার অনুগামী। তবু এক এক সময় প্রশ্ন জাগে, সাধুভাষা কি সত্যি চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে আমাদের মননের জগৎ থেকে? সাম্প্রতিককালের বিশ্রুত দু'চারজন লেখকের কথা মনে হচ্ছে; যেমন ধরুন, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, নীরদচন্দ্র চৌধুরী,—এ যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকদের অন্যতম এই তিনজন নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রোত্তর যুগের সাধু-গদ্যের মহারথী। বিদ্যাসাগর থেকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী অবধি বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুধাবন করলে একথা স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে যে, সাধুগদ্যের নিজস্ব প্রাণশক্তি ও প্রকাশের ঐশ্বর্য আজও চলতি ভাষায় অপেক্ষিত।

সাধুগদ্য যে কৃত্রিম, একথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকার্য নয়; যেমন নয়, অভিনয়কে স্বাভাবিক করতে গিয়ে অভিনয়শিল্পের স্বাভাবিক অতিরেক অস্বীকার করার মনোবৃত্তি। আসলে তো কৃত্রিম বলেই তা অভিনয়! সংস্কৃতের মতো বিশাল সাহিত্যকীর্তি ওই আপাতকৃত্রিম ভাষাপদ্ধতিকে স্বীকার করেই আমাদের জীবনে ও মননে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। অথচ কালিদাস বা ভবভূতির ভাষা যে কৃত্রিম একথা বলার সাহস আমাদের হয় না। সংস্কার তো ভাষামাত্রেই অবশ্যকরণীয়—তাই না আমাদের ভাষা-মাতামহীর নাম 'সংস্কৃত'। রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয়, দেবেন্দ্রনাথ বা ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্র—এঁরা কেউ কৃত্রিম ভাষায় লিখেছেন মনে করাটা ভাষার নিজস্ব অলংকরণ ও সংগতিসাধন-চেষ্টাকেই অস্বীকার করা।

সাধুভাষা নিশ্চয়ই গড়ে-তোলা ভাষা। কিন্তু চলতিভাষাও কি মার্জনার অপেক্ষা রাখে না? বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের প্রতিভাস্পর্শে

সাধুভাষায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তাই বিদ্যাসাগরের শিল্পচেতনা থেকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল পর্যন্ত এ ভাষায় যে সৃজন ও মননশক্তি আমাদের মাতৃভাষার গদ্যসাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ যৌবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আজকের চলতিভাষার সমস্ত নৈপুণ্য স্বীকার করেও আমরা বাংলা গদ্যকে তার চেয়ে শক্তিশালী ভাবপ্রকাশের মাধ্যম করতে পেরেছি, একথা মনে করা কঠিন।

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ—তিনজনেই সর্বজনবোধ্য ভাষায় লেখবার পক্ষপাতী। বাংলারচনার দুর্বলতার বিরুদ্ধে এঁদের তিনজনেরই নানামুখী যুক্তির সঙ্গে আমরা মোটামুটি পরিচিত। তবু বিষয়বিশেষ অনুসারে এঁদের ভাষাও সবসময় জনসাধারণের মুখ চেয়ে থামে নি, বরং আপন আদর্শের উন্নতশিখরে পাঠকসমাজকে আহ্বান করেছে। কোনো দেশের কোনো যুগের সাহিত্যই পাঠককে অনুসরণ করে গড়ে ওঠে না, সাহিত্যের সার্থকতা পাঠক তৈরী করায়। একথা আর সব সৃজনধর্মী শিল্প সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ জীবনের উপাদানই শিল্পের উপকরণ, কিন্তু যা আছে তা নিয়ে যা অনন্য তাকে গড়ে তোলাতেই শিল্প বা সাহিত্যের মহিমা।

'পরিচয়'-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'সবুজপত্র'-প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যের চলতিরূপের সমর্থন মোহিতলালকে বিস্মিত করেছিল। সাধু গদ্যের সমর্থনে এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য—'ভাষার এক সাহিত্যিক ভঙ্গিকে কৃত্রিম বলিয়া অস্বস্তি বোধ করিবার কোনও কারণই থাকতে পারে না। কারণ, এক অর্থে সাহিত্যের ভাষামাত্রেই কৃত্রিম। কবি যে ভাষায় লেখেন, অরসিক অ-কবি তাহাকে কৃত্রিম মনে করিবেই, চিরদিনই করিয়া থাকে।' (আধুনিক সাহিত্যের ভাষা)[১]

সাধুগদ্যের সমর্থনে ঐ একই প্রবন্ধে মোহিতলালের আর একটি কথাও প্রণিধানযোগ্য—"এ ভাষা খাঁটি বাংলা না হইয়া যদি সংস্কৃতানুযায়ী হয়, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, জন্মহিসাবে বাঙ্গালী এক জাতি, কিন্তু ভাব-বিস্তার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপনয়ন-সংস্কারের দ্বারা

১ আধুনিক বাংলাসাহিত্য : মোহিতলাল : ৬ষ্ঠ সংস্করণ : পৃঃ ১৪৫

সে দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছে। খাঁটি বাংলাভাষা বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তাহাও প্রকৃত বাংলা নয়—বারো-আনা সংস্কৃত।”[১]

মোহিতলালের এই ভাষাপ্রীতির শ্রদ্ধাযোগ্য রক্ষণশীলতাসত্ত্বেও পরবর্তী বাংলা গদ্যে মনন ও রসসৃষ্টি—দুয়ের ক্ষেত্রেই চলতি ভাষাই মাধ্যম হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর চলিতভাষা-সমর্থন মোহিতলাল কখনো স্বীকার করেন নি, কিন্তু বিবেকানন্দের চলতি গদ্যপ্রসঙ্গে তিনি কি বলতেন জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক! এ পর্যন্ত তেমন কোনো উদাহরণ পাই নি। তবে একথা নিশ্চিত যে, বিবেকানন্দের অন্তরেও মনন বা দর্শনের ভাষা হিসাবে সংস্কৃতানুগামী সাধু-গদ্যরীতিই জয়ী হয়েছে। এদিক থেকে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদির সঙ্গে স্বামীজীর আকৈশোর সাহচর্য নিশ্চয়ই প্রধান প্রভাব হিসাবে গণ্য হতে পারে। উত্তরজীবনে স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষাপ্রীতি, সংস্কৃত স্তব ও পত্র রচনা, সংস্কৃতচর্চা ও সংস্কৃত-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের আগ্রহ প্রভৃতির কথা মনে থাকলে তাঁর বাংলা গদ্যে সংস্কৃতপ্রভাবের কারণ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবার উপরে বেদান্তবিদ বিবেকানন্দের ভাষার প্রাণশক্তি তো সংস্কৃতবাহন বেদান্তদর্শন থেকেই সঞ্চারিত!

India's Message to the World (জগতের প্রতি ভারতের বাণী) নামে স্বামীজীর যে অসমাপ্ত রচনাটি স্বামীজীর ভারতচেতনার বীজমন্ত্রগুলি ধারণ করে আছে তাতে ভাষা-সমস্যাসমাধানে স্বামীজীর নির্দেশ—“এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষাসমস্যার) একমাত্র সমাধান।”[২] সংস্কৃতকে ভারতের ভাষামাধ্যম করবার এই নীতি সাধারণভাবে আজও স্বীকৃত হয় নি বটে, তবু হিন্দী যতোই রাষ্ট্রভাষা হবার অধিকার চাইছে, ততই সংস্কৃতপন্থী হতে চলেছে—এও লক্ষণীয়। অন্ধ ভাষাবিদ্বেষের গণ্ডী মুছে গেলে সংস্কৃতের সার্বভৌম মহিমা আপনি প্রমাণিত হবে।

১ মোহিতলাল ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ : পৃঃ ২৪৫-২৪৬

২ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৭০

রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ অবধি বাংলা গদ্যের মননভূয়িষ্ঠ রচনাবলী যে সংস্কৃত থেকে বেদান্তচিন্তা ও ভাষাসৌষ্ঠব দুয়েরই উত্তরাধিকার পেয়েছে, সেকথা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বাভাবিকভাবেই সাধুভাষা এই বৈদগ্ধ্যের সবচেয়ে বেশী ফলভাগী। বিবেকানন্দ-মানসের গঠনে এই ভাষা ও শাস্ত্রের বিপুল প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তাঁর প্রিয় মননপ্রসঙ্গ থেকে উদাহরণ দেওয়া চলে।

প্রথমে বেদান্তের শাঙ্কর-ভাষ্যের ভাষাগত আদর্শ লক্ষ্য করা যাক।

ভাষ্যপ্রারম্ভঃ

যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয় গোচরয়োর্বিষয়-বিষয়িণোস্তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধ-স্বভাবয়োরিতরেতর ভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামি-তরেতর-ভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎ প্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপর্যয়েণ বিষয়িণ-স্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্। তথাপি অন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যাত্মকতামন্যোধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্য ইতরেতরাবিবেকেনাত্যন্ত বিবিক্তয়োঃ ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্ম্মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।[১]

অনুবাদ : 'এখানে যুষ্মৎ পদের অর্থ—অনাত্মা জড় পদার্থমাত্র, যাহাকে 'ইদং' (এই) বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারা যায়, আর অস্মৎ পদের অর্থ চিৎস্বভাব আত্মা (ব্রহ্ম)। তন্মধ্যে অস্মৎপদার্থ চিৎস্বভাব আত্মা হয় বিষয়ী—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয় আছে বলিয়াই তিনি বিষয়ী ; আর যুষ্মৎপদার্থ—জড়বস্তু হয় তাহার বিষয়, অর্থাৎ চিৎপ্রকাশ্য। উক্ত যুষ্মৎপ্রতীতিগম্য বিষয় ও অস্মৎপ্রতীতিগম্য বিষয়ী (চৈতন্য), উভয়ই আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব,—অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহংপ্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং প্রত্যয়গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা ইহারাও

১ বেদান্তদর্শন : দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত সং : পৃঃ ৩৪

তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যাহা আলোক তাহা অন্ধকার নহে, যাহা অন্ধকার, তাহাও আলোক নহে। এইরূপ, যাহা আত্মা তাহা অনাত্মা নহে, এবং যাহা অনাত্মা তাহাও আত্মা নহে, সুতরাং অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মার সহিত ইদং-জ্ঞান-জ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতরভাব অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্য বিভ্রম থাকা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না। যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মায় অনাত্মার তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভয়গত ধর্মসমূহেরও অর্থাৎ জাড্যচৈতন্যাদি গুণেরও পরস্পর তাদাত্ম্যভ্রম থাকা যুক্তিযুক্ত হইবে না। যদিও এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানের বিষয় আত্মাতে (আমাতে) ইদংজ্ঞান জ্ঞেয় অনাত্মার (দেহাদির) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যভ্রম মিথ্যা হইবার যোগ্য এবং তদ্বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় দেহাদিতে অহংজ্ঞানাস্পদ আত্মার (আমার) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম অসত্য হওয়াই উচিত, অর্থাৎ 'অহং মম—আমি আমার' ইত্যাদি জ্ঞানব্যবহার অধ্যাসমূলক নহে, সত্যমূলক, অথবা হইতেই পারে না, এই সিদ্ধান্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ, তথাপি অনাদিসিদ্ধ অবিবেক-প্রভাবে অত্যন্ত-বিলক্ষণ স্বভাব ও অত্যন্ত বিবিক্ত অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবিক্ততা বা পার্থক্য বোধগম্য হওয়ায় আপনাতে অন্যের ও অন্য ধর্মের এবং অন্যেতে (দেহাদিতে) আত্মার ও "ইহা আমার" ইত্যাদি উল্লেখ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্যমিথ্যা উভয়জড়িত, সুতরাং অধ্যাসমূলক, এবং উহা নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ও অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত, এবং কবে যে, উহার অবসান হইবে, তাহাও বলা যায় না।'

মূলানুগ এই বঙ্গানুবাদের পাশাপাশি আচার্য শংকরের ভাষা কত সংহত আকারে কী বিপুল সত্যকে ধারণ করে আছে। স্বামীজীর সাধু গদ্য যে অনেক পরিমাণে এ জাতীয় ভাষাভঙ্গিমার দ্বারাই প্রভাবিত তাতে সন্দেহ নেই।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী স্বামীজীর আর একটি প্রিয়গ্রন্থ। জয়পুরের ব্যাকরণবিদ্ পণ্ডিতের কাছে তাঁর পাণিনি-অধ্যয়নের প্রচেষ্টা ও

সাফল্যের কাহিনী 'বিবেকানন্দ-জীবনী' পাঠকদের সুবিদিত।'[১] ব্রাহ্মণের সংস্কৃত, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য প্রভৃতির সঙ্গে স্বামীজী পাণিনির মহাভাষ্যেরও নাম করেছেন তাঁর বিখ্যাত বাঙ্গালাভাষা রচনায়।[২]

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকেই পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্নের অনূদিত পাণিনির মহাভাষ্য প্রকাশিত হতে থাকে। মূল ও অনুবাদের[৩] একটু উদাহরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

"…'চত্বারি বাকপরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণো যে মনীষিণঃ। গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।' চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি। চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গ নিপাতাশ্চ তানি বিদুর্ব্রাহ্মণো যে মনীষিণঃ। মনসঈষিতো মনীষিণঃ। গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি ন চেষ্টান্তে ন নিমিষন্তীত্যর্থঃ। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি। তুরীয়ং বা এতদ্বা-চোযন্মনুষ্যেস্তু বর্ত্ততে। চতুর্থ মিত্যর্থঃ। চত্বারি।"

'…চারিপ্রকার পদ বাক্যপরিমিত; যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী তাঁহারাই সেই সকলকে অর্থাৎ বাক্যসকলকে জানেন। ইহাদিগের তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে, তাহা ইঙ্গিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থভাগ ব্যবহার করে।' চারিপ্রকার বাক্যপরিমিত পদ—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারিপ্রকার পদসমষ্টিই বাক্য। যে ব্রাহ্মণগণ মনীষী তাঁহারাই সেই সকল জানেন। যাঁহারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন তাঁহারাই মনীষী। তিনভাগ গুহায় নিহিত আছে তাহা ইঙ্গিত হয় না, গুহাতে অজ্ঞানেতে তিনভাগ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ইঙ্গিত হয় না, কার্যকরী হয় না অর্থাৎ প্রকাশিত হয় না। মনুষ্যেরা বাক্যের চতুর্থভাগ ব্যবহার করে;—"মনুষ্যলোকে যাহা

---

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ: স্বামী গম্ভীরানন্দ: (১ম সং) প্রথম খণ্ড: পৃঃ ৩১৮-৩১৯

২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৩৬

৩ উদ্বোধন: ১ম বর্ষ: ৯ম সংখ্যা: ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬: পৃঃ ২৮৫-৮৬

আছে ; ইহার বাক্যের তুরীয় অংশ আছে।" তুরীয় অর্থ চতুর্থ। "চত্বারি"। "চারি"। এই প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।'

ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের মহত্তম মনীষী পাণিনির ব্যাকরণের পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের মনন-ঋদ্ধ-ভাষা-নৈপুণ্য স্বামীজীর নিজস্ব ভাষাভঙ্গীতে আলোকসম্পাত করেছে সন্দেহ নেই।

সজীব ভাষায় উদাহরণরূপে স্বামীজী ব্রাহ্মণের সংস্কৃতের কথা বলতেন। আমরা শুক্লযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথ থেকে একটি কাহিনীর রূপরেখা গ্রহণ করতে পারি। উর্বশী-পুরুরবা, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা কাহিনীর বীজ এই 'ব্রাহ্মণে' আছে। অধ্যায় সংখ্যা একশত, তাই এর নাম 'শতপথ ব্রাহ্মণ'। বৃহদারণ্যক উপনিষদ এই গ্রন্থের 'মাধ্যন্দিনী'শাখার শেষ ছয়টি অধ্যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণম্—প্রথমং কাণ্ডম্—অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

মনবে হ বৈ প্রাতঃ। অবনেগ্যম্ উদকম্ আজহ্রুঃ। যথেদং পাণিভ্যাম্ অবনেজনায় আহরন্তি এবং তস্য অবনেনিজানস্য মৎস্যঃ পাণী আপেদে। স হ অস্মৈ বাচম্ উবাদ, বিভৃহি মা পারয়িষ্যামি ত্বেতি। কস্মাৎ মা পারয়িষ্যসীহি [মনুরুবাচ]। ঔধ ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়া ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি [মৎস্য আহ]। কথং তে ভৃতিরিতি [মনুরাহ]। স হোবাচ, যাবদ্ বৈ ক্ষুল্লকা ভবামো বহ্বী বৈ নঃ তাবন্ নাষ্ট্রা ভবত্যুত মৎস্য এব মৎস্যং গিলতি। কুম্ভ্যাং মা অগ্রে বিভরাসি, স যদা তাম্ অতিবর্ধাহ অথ মা সমুদ্রম্ অভ্যবহরাসি, তর্হি বা অতিনাষ্ট্রো ভবিতাস্মীতি ॥

মনুর জন্য প্রাতঃকাল। আচমনের জল গৃহীত হইল। যখন আচমনের জন্য দুই হাতে ইহা লইলেন এইরূপ (অবস্থায়) আচমন কারীর দুই হাতে (গণ্ডূষে) একটি মাছ উঠিল। সে তাঁহাকে বাক্য বলিল, আমাকে পালন কর, আমিও পরিত্রাণ করিব। [মনু বলিলেন] কোথা হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিবে। [মৎস্য বলিল] এই সমস্ত সৃষ্টি জলমগ্ন হইবে তখন তোমাকে পরিত্রাণ করিব। মনু বলিলেন, কিভাবে তোমার রক্ষণ (হইবে)। সে বলিল, যতদিন

ক্ষুদ্র থাকিব ততদিন অনেকেই আমার ধ্বংসের কারণ হইবে। মৎস্যই মৎস্যকে গিলিয়া খায়। প্রথমে আমাকে কলসে ভরিয়া রাখ। যখন সেই আমি অধিক বর্ধিত (হইব) তখন আমাকে সমুদ্রের অভিমুখে ছাড়িয়া দিবে। তখন আর ধ্বংস হইব না॥

[অনুবাদ : শ্রীহরিপদ আচার্য]

শতপথ ব্রাহ্মণের ঐ মৎস্যটি কি পরবর্তী মৎস্যাবতারের সূচনা ? সে যাই হোক, সংস্কৃত গদ্যরীতির নিদর্শন হিসাবে আখ্যায়িকাটি 'ব্রাহ্মণে'র সংস্কৃতের অন্যতম নিদর্শন। প্রাঞ্জলতা ও গতিবেগ—দুদিক থেকেই প্রাচীন সংস্কৃত গদ্যের এ গ্রন্থটির ভাষা বিস্ময়কর।

স্বামীজী জানতেন, 'যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্তকথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়।'[১] তাই তুলনামূলকভাবে প্রাচীন ও অর্বাচীন যুগের সংস্কৃত ভাষার তুলনা করতে গিয়ে লিখছেন 'ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান ; ভাষা পরে। হীরেমতির সাজপরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায় ? সংস্কৃতের দিকে দেখ দিকি। ব্রাহ্মণের সংস্কৃত দেখ, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য দেখ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ—আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ।……যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তা-শক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়। বাপ রে, সে কি ধূম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম করে,—'রাজা আসীৎ' !!! আহা হা ! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !! ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল তখন এই সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল।"[২]

'রাজা আসীৎ' অবশ্য বাণভট্টকে মনে পড়ায়। বাণভট্টের অনুরাগীরা এ মন্তব্যে ব্যথিত হলেও সাধারণভাবে উত্তরকালীন সংস্কৃত-সাহিত্যের অতি-পল্লবিত রূপের ত্রুটি অবশ্যই স্বীকার্য। বাস্তবিক অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য মননের ক্ষেত্রে চর্বিতচর্বণ

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'বাঙ্গালাভাষা' : পৃঃ ৩৬

এবং সৃজনের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ঐতিহ্যলালিত, মন্থরগতি। ভাবের বিপ্লবের সঙ্গে ভাষায় বিপ্লবও সাধিত হয়—সেকথা সংস্কৃত-সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে বিস্মৃতপ্রায়। সুতরাং প্রাচীন মনীষীদের সঙ্গেই বরং স্বামীজীর গুণগ্রাহী হৃদয়ের আত্মীয়তা। সেইসঙ্গে একথাও স্মরণীয়, সংস্কৃতই সর্বভারতীয় সুধীমণ্ডলীর ভাষা। ভারতের ইতিহাসে সব গণধর্মী ভক্তি-আন্দোলনই একসময় না একসময় সংস্কৃতের মাধ্যমে আপন স্থায়িত্বলাভ করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণাপুষ্ট নব অদ্বৈত-আন্দোলনেরও সেই পরিণতি স্বাভাবিক। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সংস্কৃত অনুবাদের মতো 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র সংস্কৃত অনুবাদও সাধিত হয়েছে। বিবেকানন্দের মৌলিক বাংলা রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' (একত্রে 'অনুবাদ-বিবেকানন্দম্') অনুবাদ করে ভারতের সর্বপ্রান্তের মনীষীদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন ডঃ সীতানাথ গোস্বামী।

সংস্কৃত শাস্ত্র ও ভাষ্যের অনুগামী বিবেকানন্দ কখনো কখনো সংস্কৃত গদ্যও লিখেছেন তাঁর কোনো কোনো চিঠিপত্রে। পূর্বাচার্যদের অনুসরণে স্বামীজীর শাস্ত্রব্যাখ্যার এক উদাহরণ এখানে দেওয়া চলে।

গীতার 'যাবানর্থ উদপানে' (২।৪৬) শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে স্বামীজী যে নতুন ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন সেইটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়—'সর্বতঃ সংপ্লুতোদকায়ামপি ভূমৌ যাবানুদপানে অর্থঃ তৃষ্ণাতুরাণাম্ (অল্পজলমলং ভবেদিত্যর্থঃ)। 'আস্তাং তাবদ্ জলরাশিঃ, মম প্রয়োজনং স্বল্পেঽপি জলে সিধ্যতি' এবং বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য সর্বেষু বেদেষু অর্থঃ প্রয়োজনম্।"[১]

'সমস্ত দেশ বন্যাপ্লাবিত হ'লে তৃষ্ণাতুরের নিকট ক্ষুদ্র জলাশয়ের যতটুকু প্রয়োজন (অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ পানীয় জলই তৃষ্ণার পক্ষে যথেষ্ট)—সে যেমন বলে, 'বিরাট জলরাশি থাকুক, সামান্য একটু পানীয় জলই আমার পক্ষে যথেষ্ট'—জ্ঞানী ব্রাহ্মণের পক্ষে সমগ্র

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩৫৬-৫৮

বেদগ্রন্থেও ততটুকুই প্রয়োজন। সর্বব্যাপী বন্যায় প্রয়োজন যেমন তৃষ্ণানিবারণমাত্র, তেমনি সমগ্র বেদের প্রয়োজন কেবল জ্ঞান।'[১]

অনুসন্ধান করলে স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী থেকে শাস্ত্রব্যাখ্যায় মৌলিকতার এমন আরো উদাহরণ পাওয়া যায়। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে বেদান্তের বিশদ ব্যাখ্যা-সংবলিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে সেটির সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হয় নি। তবু স্বামীজীর রচনাবলীতে অনুসন্ধান করলে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া খুব কঠিন নয়।

কিছুকাল আগে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত'-গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্বামী বিবেকানন্দকৃত 'ধর্মমীমাংসা ও রামকৃষ্ণদর্শন' নামে যে মূল্যবান উপকরণটি চোখে পড়েছিল, বর্তমান লেখকের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা : শ্রীরামকৃষ্ণ' অধ্যায়ে (পৃঃ ২৪১) তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে। দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ঐতিহ্যানুসরণে রচনাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের মূল সত্যটি যেমন বোঝা যায়, তেমনি পরবর্তী বিবেকানন্দ-চিন্তাধারার বাণীবীজরূপে এই রচনার মূল দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির ভাষারূপটিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করব। পরিব্রাজক বিবেকানন্দের এই রচনাটির আলোচনার আগে নরেন্দ্রনাথ দত্ত-রূপে রচিত স্বামীজীর প্রথম জীবনের আর একটি মূল্যবান গ্রন্থভূমিকা স্মরণীয়।

'সংগীতকল্পতরু' নামে যে সংকলনগ্রন্থটি স্বামীজী তাঁর বন্ধু বৈষ্ণবচরণ বসাকের সঙ্গে একত্রে সংকলন করেন, তার ভূমিকাস্বরূপ 'সঙ্গীত ও বাদ্য' রচনাটি যে স্বামীজীরই, এ বিষয়ে এখন অনেকেই একমত। 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' (প্রথম সংস্করণ-১৯৬৩)—রচনাকালে বেলুড়মঠের গ্রন্থাগারে রক্ষিত এ গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের দুটি বই দেখেছিলাম। এ বইয়ের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সে বই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।[২] অনতিকাল

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩৫৬-৫৮

২ এ সংস্করণের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

পরে শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু'-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে স্বামীজীর সঙ্গীতসাধনা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সূত্রপাত হয়। সম্প্রতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর 'বিবেকানন্দের সাধনায় মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত' গ্রন্থটি এ বিষয়ে আরো অগ্রসর।

মূলতঃ 'জ্ঞানের বাহন' হিসাবে এ ভূমিকার ভাষা বিচার্য হলেও স্বামীজীর প্রাক-সন্ন্যাস যুগের কল্পনামণ্ডিত ভাষাশৈলীরও বেশ কিছু উদাহরণ এখানে রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষা ও সংগীতপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মন্তব্য ভারত-সংস্কৃতির অনুরাগীদের কাছে বিশেষ মূল্যবান—

"আধুনিক মনুষ্যের মধ্যে শিক্ষালব্ধ এবং কৃত্রিম ভাবের প্রাবল্যই অধিক। পুরাকালে প্রাকৃতিকভাবে মানবহৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিত্ব নীরস অথবা কষ্টকল্পিত ভাবের আলয়, প্রাথমিক মনুষ্যের সরল হৃদয় প্রকৃতির মধুময় রঙ্গভূমি। অনন্ত সাগরের অনন্ত বিস্তৃতি, অনন্ত নীলাকাশের বুদ্ধি-প্রতিঘাতী প্রভা, নিবিড় অরণ্যের মহান স্তব্ধ ভাব, গিরি-নির্ঝরের গম্ভীর হৃদয়-মত্তকারী ঝর্ঝর ধ্বনি, অভ্রভেদী পর্বতের শান্তিপূর্ণ বিশাল বপু, নদীসকলের অর্ধস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি, বনবিহঙ্গের হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শকারী সঙ্গীত প্রাচীন মানবেরাই ভোগ করিত। আমরা শোভা দেখি, গান শুনিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হই; অরণ্য-আশ্রমী ফলমূলাহারী সরলপ্রাণ বৈদিক ঋষিদিগের বিশ্বব্যাপী হৃদয় কি তাহাতে শান্ত হয়? যে হৃদয় প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি হইতে বর্ষার ভেকের ঘর্ঘররবে নাচিয়া উঠিত, প্রকাণ্ড হিমালয়ের চিরশুভ্র শিখর হইতে ভ্রমরের গুঞ্জন এবং প্রাতঃকুন্দের বিকাশ পর্যন্ত যে প্রাণকে আত্মহারা করিত; তাহা কি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়? আমরা সৌন্দর্য দেখি, তাঁহারা সৌন্দর্য পান করিতেন,—আমরা মধুর ধ্বনি শ্রবণ করি, ঋষির প্রাণ বিষ্ণুপদ-নিঃসৃতা নির্মলসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় আর্দ্র হইয়া সঙ্গীততরঙ্গে মিশাইয়া যাইত।... যাঁহাদের প্রাণে কবিত্ব, যাঁহাদের জীবনে অলঙ্কার, যাঁহাদের কার্য ন্যায়, সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণই এই সঙ্গীতের স্রষ্টা—স্রষ্টা বলিলে হয়ত ভুল

হইবে, তাঁহারা আবিষ্কর্তা। এ দেবদুর্লভ ধন মানুষে সৃষ্টি করিতে পারে না, এ মন্দাকিনীধারা।

অনন্ত বিশ্ব যাঁহার কার্য, যাঁহার প্রতি ছন্দে গ্রহ নক্ষত্ররাজি ভ্রমণ করিতেছে, সেই দেবাদিদেব আদি কবি বিশ্বপতি কৃপা করিয়া কোন কোন পুণ্যবানের মস্তকে বর্ষণ করেন। ভারতের এই ভাস্কর মহাত্মশালী অতীতের স্মৃতিপূর্ণ পরিত্যক্ত এই বিশাল রঙ্গভূমির ত সেই সঙ্গীত একটি সর্বাঙ্গপূর্ণ সর্বাবয়বসম্পন্ন অবিনশ্বর চিহ্ন। হইতে পারে আজি পাশ্চাত্যভূমি বিজ্ঞানচর্চায়, দর্শনচর্চায়, ন্যায়চর্চায়, জ্যোতিষচর্চায়, গণিতচর্চায় ও ভৈষজ্যচর্চায়, প্রাচীনভারতকে দূরপরাহত করিয়াছে; কিন্তু ভারতের সঙ্গীত, তুমি শত সহস্র বিপ্লবের মধ্যে, লক্ষ পরিবর্তনের, ঘোর দুর্গতির মধ্যে আত্মজ্যোতি বিকাশ করিয়া ধীর স্থির অথচ নিশ্চিন্ত গতিতে শত লাঞ্ছনা সহিয়া শত বিঘ্ন বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছ।"[১]

বিবেকানন্দের কবিহৃদয়ের ও ভারতপ্রেমিক-সত্তার উন্মেষ নরেন্দ্রনাথের এই রচনাটিতে স্পষ্ট প্রতিভাত। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতির প্রভাবসত্ত্বেও বক্তব্যস্থাপনে আবেগ, আত্মবিশ্বাস ও দৃপ্ত গৌরববোধের যে সমন্বয় পরবর্তী বিবেকানন্দসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা সবই 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ভূমিকায় সার্থকভাবে উদাহৃত। বিশেষত পরবর্তী সাধুগদ্যশৈলীতে বিবেকানন্দের ভাষারীতির যে ক্রমবিকাশ তার ধারাটি অনুসরণে এই রচনাটি বিশেষ মূল্যবান।

'সঙ্গীতকল্পতরু'র পরে স্বামীজীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা মধ্যযুগের সাধক টমাস-আ-কেম্পিসের Imitation of Christ-এর স্বকৃত গদ্যানুবাদের 'সূচনা'। ১২৯৬ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকায় ১ম বর্ষের ১ম থেকে ৫ম সংখ্যায় স্বামীজীর অনুবাদের সূচনা এবং ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ অবধি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে টমাস-আ-কেম্পিসের নামে প্রকাশিত হলেও এ গ্রন্থের রচনাকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আধুনিক পণ্ডিতদের

১ সঙ্গীত কল্পতরু: 'সঙ্গীত ও বাদ্য'

মতে টমাস হ্যামারলীন বা হ্যামারকেন (১৩৮০-১৪৭২) এই ভক্তিবৈরাগ্যময় গ্রন্থের লেখক।[১] এ অনুবাদের ভূমিকায় স্বামীজীর দেশকাল ও ধর্মমত নিরপেক্ষ যথার্থ সাধকের প্রতি অনুরাগ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি আধুনিক খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকদের বহিরঙ্গ চাকচিক্যের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় আদর্শের দুস্তর পার্থক্যসম্বন্ধে কটাক্ষও স্মরণীয়।

বরাহনগর মঠে থাকার সময় স্বামীজী মাঝে মাঝে পরিব্রাজকরূপে নানা তীর্থে পরিক্রমা করেছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মঠবাস চলতো। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে একবার বরাহনগরে ফিরে এসে প্রায় একবছর (অল্পকিছুদিন শিমুলতলায় থাকা বাদ দিলে) তিনি মঠবাস করেন। এই সময়েই তিনি 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকায় তাঁর অনুবাদটি শুরু করেছিলেন, এমন অনুমান করা চলে। স্বামীজীর রচনার ভাষা তখন মূলত সাধু গদ্য। সেদিক থেকে 'ঈশা অনুসরণ'-এর 'সূচনা'র ভাষা লক্ষণীয়—

"'খ্রীষ্টের অনুসরণ' নামক এই পুস্তক সমগ্র খ্রীষ্টজগতের অতি আদরের ধন। এই মহাপুস্তক কোন 'রোমান কাথলিক' সন্ন্যাসীর লিখিত—লিখিত বলিলে ভুল হয়, ইহার প্রত্যেক অক্ষর উক্ত ঈশা-প্রেমে সর্বত্যাগী মহাত্মার হৃদয়ের শোণিতবিন্দুতে মুদ্রিত। যে মহা-পুরুষের জ্বলন্ত জীবন্ত বাণী, আজি চারি শত বৎসর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় অদ্ভুত মোহিনীশক্তিবলে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, রাখিতেছে এবং রাখিবে, যিনি আজি প্রতিভা ও সাধনবলে কত শত সম্রাটেরও নমস্য হইয়াছেন, যাঁহার অলৌকিক পবিত্রতার নিকটে পরস্পরে সততযুধ্যমান অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত, খ্রীষ্ট-সমাজ চিরপুষ্ট বৈষম্য পরিত্যাগ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে—তিনি এ পুস্তকে আপনার নাম দেন নাই। দিবেন বা কেন? যিনি সমস্ত পার্থিব ভোগ এবং বিলাসকে, ইহজগতের মান-সম্ভ্রমকে বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি কি সামান্য নামের ভিখারী হইতে পারেন?"[২]

১ বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা: ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র: 'বিবেকানন্দের একখানি প্রিয়গ্রন্থ অধ্যায়' দ্রঃ

২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: ঈশা-অনুসরণ: পৃঃ ১৬

" 'সব সেয়ান কী এক মত'—সকল যথার্থ জ্ঞানীরই একপ্রকার মত। পাঠক এই পুস্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবদুক্ত 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' উপদেশের শত শত প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইবেন। দীনতা, আর্তি এবং দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত এবং পাঠ করিতে করিতে জ্বলন্ত বৈরাগ্য, অত্যদ্ভুত আত্মসমর্পণ এবং নির্ভরের ভাবে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে।"[১]

'ভক্তসিংহ' ঈশানুসরণ-রচয়িতার অন্তরের সাধর্ম্য-অনুভবকারী বিবেকানন্দের অন্তর-পরিচয় উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে এ রচনার শান্ত, ওজস্বী, দৃঢ়নিষ্ঠ যুক্তি ও অন্তর্নিহিত আবেগধর্ম লক্ষণীয়। এর কিছুকাল পরে পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর হিমালয়ভ্রমণের কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে ভারতসাধকদের চিরতপস্যার স্থান হিমালয়-যাত্রার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের এই পরিক্রমা-কালে নৈনিতাল হয়ে আলমোড়ার পথে অগ্রসর হওয়ার সময় একদিন রাত্রিবাসের জন্য এক ঝরণার ধারে পানচাকির কাছে অখণ্ডানন্দ ও বিবেকানন্দ আশ্রয় নিলেন। স্নান সেরে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের তলায় স্বামীজী ধ্যানে মগ্ন হলেন। এক ঘণ্টা পর স্বামীজী ধ্যান থেকে উঠলেন। সেই ধ্যান তাঁর অনুভূতিজগতের বিরাট দরজা খুলে দিয়েছে। সঙ্গীকে ডেকে বললেন, "ত্যাখ্ গঙ্গাধর! এই বৃক্ষতলে একটা মহাশুভমুহূর্ত কেটে গেল; আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বুঝলাম সমষ্টি ও ব্যষ্টি (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণু-ব্রহ্মাণ্ড) একই নিয়মে পরিচালিত।" "স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট রক্ষিত এক-খানি নোটবুকে স্বামীজী সেদিনের অনুভূতির কথা লিখিয়া রাখেন। তিনি বাঙ্গালাতেই লিখিয়াছিলেন। ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত উহার ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ[২] এই, (উহার মূল হারাইয়া গিয়াছে): 'সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শব্দব্রহ্ম' ইত্যাদি।

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ঈশা-অনুসরণ : পৃঃ ১৭

২ ১৯১৩ সালে অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজী ভাষায় লেখা জীবনী দি লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয় ভাগে মূল বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদের ঠিক আগে লেখা—[Kakrighat, under the shade of a Banyan, by the bank of a stream.] পৃঃ ১১১

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মে সংগঠিত। ব্যষ্টি জীবাত্মা যেমন একটি চেতন দেহের দ্বারা আবৃত, বিশ্বাত্মাও তেমনি চেতনাময়ী প্রকৃতির মধ্যে বা দৃশ্য জগতের মধ্যে অবস্থিত। শিবা শিবকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইহা কল্পনা নয়। এই একের দ্বারা অপরের আলিঙ্গন যেন শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের সদৃশ—তাহারা উভয়ে অভিন্ন এবং শুধু মানসিক বিশ্লেষণ সাহায্যেই উহাদিগকে পৃথক করা চলে। শব্দ ভিন্ন চিন্তা অসম্ভব। অতএব 'সৃষ্টির আদিতে ছিলেন শব্দব্রহ্ম' ইত্যাদি।

"বিশ্বাত্মার এই বিবিধ প্রকাশ অনাদি। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি সবই সাকার ও নিরাকারের মিলনে সংগঠিত।"[১]

---

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ : প্রথম খণ্ড : স্বামী গম্ভীরানন্দ : পৃঃ ২৮৩ (১ম সংস্করণ)। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত। অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত 'Life of Swami Vivekananda' গ্রন্থ থেকে এই অংশটির প্রসঙ্গে বক্তব্য এবং মূল বাংলারচনার ইংরেজী রূপসম্বন্ধে স্মরণীয়—"What Swamiji entered in a fragmentary way in his note-book on that day, is given here, in translation, as it was found, verbatim'. From this one may "get a glimpse of his trend of thought and realisation.······In the beginning was the word etc.

"The microcosm and the macrocosm are built on the same plan. Just as the individual soul is encased in the living body, so is the Universal Soul in the living Prakriti (Nature)—the objective universe. Shivā (Kali) is embracing Shiva; this is not a fancy. This covering of the one (Soul) by the other (Nature) is analogous to the relation between an idea and the word expressing it: they are one and the same, and it is only by a mental abstraction that one can distinguish them. Thought is impossible without words. Therefore in the beginning was the word, etc.

The dual aspect of the universal soul is eternal. So what we percieve or feel is this combination of the Eternally Formed and the Eternally Formless. Vide: The Life of Swami Vivekananda: Vol II: 1913 Edn. P III and also (p. 197 ; 1955 Edn.)

স্বামী অন্নদানন্দকৃত স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনীতেও এই রচনাটির উল্লেখ আছে। মূল রচনাটি হারিয়ে গেছে এই ধারণাই এতকাল প্রচলিত ছিল।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী-পরিকর শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত"-গ্রন্থের পরিশিষ্টে সান্ন্যালমশাই এই রচনাটি সংযুক্ত করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকমাত্রকেই চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন। 'লীলামৃত' থেকে এই রচনাটির ভূমিকা-স্বরূপে সান্ন্যালমশাই যা লিখেছেন এবং রচনার যে প্রথমাংশ ইংরেজী-অনুবাদের মাধ্যমে স্বামীজীর ইংরেজী ও বাংলা জীবনীতে উল্লেখিত, তার মূল বাংলা নিচে উদ্ধৃত করছি—

ধর্ম মীমাংসা ও রামকৃষ্ণ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত

[প্রভুর লীলাবসানের কিছুদিন পরে হিমালয়ে তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়ায় গমনকালে এক পান্থশালায় বসিয়া নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) খাতায় তাঁহার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করেন। আলমোড়ায় শরচ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) ও আমাকে দেখাইলে আমি উহা লিখিয়া লই; এবং কবচের মত যত্ন করিয়া রাখি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার কালে শরচ্চন্দ্রকে দিই এবং তাঁহারও ইচ্ছা ছিল যে, দিব্য-ভাব লেখা সমাপ্তকালে ভক্তসমাজে প্রচার করিবেন। বিধিনির্বন্ধে পুনরায় আমার নিকট আসায়, আমি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিতেছি।

...আচার্যপাদ নরঋষি নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) যিনি আমাদের শিরোমণি এবং যাঁহারই প্রসঙ্গে আমরা অচিন্ত্যচরিত প্রভুর মহিমা যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার ধর্মমীমাংসা এবং রামকৃষ্ণ-দর্শন ব্যাখ্যার প্রারম্ভে সেই মহাশক্তিরই উপাসনা করিতেছেন।][1]

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত (অনুশীলন) : শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল : ২য় সং : পৃঃ ২৫৯ ; বন্ধনীচিহ্ন বর্তমান লেখক প্রদত্ত

In the beginning was the word and the word was with God, and the word was God.[১] ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ এক রকমের গঠন। যেমন ক্ষুদ্র আত্মা চেতন শরীরে আবৃত, সেইরূপ বৃহৎ বিশ্বাত্মা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি, বাহ্যজগতে আবৃত; শবোপরি শিবা —কল্পনা নহে; যেমন—মনের ভাব এবং অক্ষর বা কথা ভেদ করা যায় না, একের অন্য আবরণ—সেইরূপ। কল্পনাদ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া বলা যায় মাত্র। কেহ কথা বিনা চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব In the beginning was the word and the word was God.

বিশ্বাত্মার এই প্রকাশভাব অনাদি অনন্ত। অতএব নিত্য সাকার ও নিত্য নিরাকার মিলিয়া আমরা জানি দেখি ইত্যাদি।"[২]

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল-প্রদত্ত মূল রচনাটির অবশ্য এইখানে শুরু। এরপরই স্বামীজীর ধর্মমীমাংসা এবং রামকৃষ্ণদর্শনের মূলসূত্রাবলীর উপস্থাপনা।[৩] প্রারম্ভিক অংশটুকুর মূল ভাষা আমরা পেলাম। পরবর্তী দার্শনিকসূত্রাবলী থেকেও স্বামীজীর তদানীন্তন ভাষাভঙ্গীর দু'একটি উদাহরণ দিই—

"দ্ব্যণুক এসরেণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহা আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন মনুষ্যের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মুহূর্তে যেথায় আছে, পরমুহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে।

এই নিরন্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই হইতেছে। [ধর্মমীমাংসার ১, ২ সূত্র]।

১ বাইবেলের সেণ্ট জন লিখিত সুসমাচারের গোড়ায় এই বাক্যটি রয়েছে। বলা বাহুল্য ভারতীয় শব্দব্রহ্মবাদের সঙ্গে এই বাক্যটির বিশেষ মিলই স্বামীজীকে আকৃষ্ট করেছে।

২, ৩ লীলামৃত: পৃঃ ২৫৯ এবং বর্তমান লেখকের 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য': 'নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা: শ্রীরামকৃষ্ণ'—অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

জীবন কি ? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু।

যে মহাশক্তি ব্যাঘ্রের হননেচ্ছার স্রষ্টা, তাহাই হরিণের পলায়নেচ্ছার স্রষ্টা নতুবা বহু ঈশ্বরপ্রসঙ্গ দোষ হয়।

[রামকৃষ্ণ-দর্শনের ১৬, ১৭ সূত্র]

স্বামীজীর দার্শনিক আলোচনার ভাষা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শাস্ত্রীয় ভাষাকে অনুসরণ করেছে। এদিক থেকে রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয়ের মননচর্চার ভাষার সঙ্গে স্বামীজীর ভাষার গোত্রগত মিল রয়েছে। তবে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তি তাঁর এ জাতীয় রচনার ভাষাতেও এক অন্তঃশীল গতিবেগ সঞ্চার করেছে।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দের এই গদ্যরচনাটির পরে দীর্ঘকালের ইতিহাসে (প্রায় সাত বছর) আর কোনো মৌলিক গদ্য রচনা থাকলেও আমাদের এখনও চোখে পড়ে নি। চিঠিপত্রের কথা অবশ্য আলাদা। আমেরিকা থেকে প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পর ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্ঠিতম উৎসবে 'হিন্দুধর্ম কি ?' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'ভাব্‌বার কথা' প্রবন্ধগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'হিন্দুধর্ম কি ?' নামে পুস্তিকা-আকারে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির মধ্যেই পরবর্তীকালে 'বর্তমান ভারত'-গ্রন্থে ব্যবহৃত স্বামীজীর পরিণত সাধুগদ্যের পূর্বাভাস দেখি। সংস্কৃত শাস্ত্রাদির প্রভাবে সূত্র-জাতীয় বাক্যরচনা-পদ্ধতির উদাহরণ (রামকৃষ্ণ-দর্শনে এর্ আগে যা আমরা পেয়েছি)—"শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত বেদ বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য ; তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত।

'সত্য' দুই প্রকার। এক—যাহা মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। দুই—যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।"[১]

বিভিন্ন বক্তব্যের সমাবেশে দীর্ঘজটিল বাক্যপদ্ধতি—

"কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র লোকাচার-নিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষার জন্য আপাতপ্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ হইয়া, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহুধাখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া, তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন—

তখন আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত বিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান বহুধা-বিভক্ত, সযথা-প্রতিযোগী, আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগ যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ড-সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"[২]

দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই দীর্ঘতম বাক্যটির অসমাপিকা ক্রিয়াবহুল রূপায়ণে স্বামীজী কোথাও ছন্দোভঙ্গ করেন নি বা পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় নি, এও যেমন লক্ষণীয়, তেমনি জটিল ও দুরূহ দার্শনিক বক্তব্য-রূপায়ণে স্বামীজীর এই ভাষার উপযোগিতাও চিন্তনীয়। সাধারণ বিচারে এ ভাষার অমিতবিস্তার দোষাবহ সন্দেহ নেই, কিন্তু অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় সংযোজন এতে কিছুই নেই,

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩

২ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪-৫

বরং একটি সমগ্র যুগের পতন ও উত্থান-কাহিনী যেন এই দীর্ঘবাক্যটির দ্বারা কালসীমায় বিধৃত।

হয়তো এই শব্দারণ্য অতিক্রম করেই অনুভূতির উদ্বেল তরঙ্গে বিবেকানন্দ-হৃদয় আন্দোলিত হতে থাকে। আর সেই মুহূর্তে একের পর এক ঢেউয়ের মতন তাঁর তরঙ্গায়িত বাক্যরাশি পাঠকের হৃদয়তটে আঘাত করে ফেরে—

"প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়; পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে—ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।"...

"মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি।"[১]

১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণায় বিধৃত স্বামীজীর আলাপচারীটি এ প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"এই সেদিন "হিন্দুধর্ম কি?" ব'লে একটা বাঙলায় লিখলুম—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙলা হয়েছে। আমার মনে হয়, সকল জিনিসের মতো ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়।"[২]

আধুনিককালে কেউ কেউ যখন সাহিত্যিক হিসাবে স্বামীজীকে রচনাশিল্প সম্বন্ধে অনবহিত মনে করেন, তখন স্বামীজীর জবানবন্দীতে একথাগুলি বিশেষভাবেই স্মরণীয়—"দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু change (পরিবর্তন) করে নিতে হয়। এর পর বাঙালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে

---

১. বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৫-৬

২. ঐ : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৩

নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা ক'রব।"[১] এই নূতন ছাঁচের মূলসূত্র বিশেষণের দ্বারা ক্রিয়াপদের বিলোপ। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত গদ্যের আদর্শই এখানে বাংলার প্রচলিত গদ্যরীতিতে নবজীবন সঞ্চারের জন্য ব্যবহৃত।

শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে স্বামীজী এই আদর্শে 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন। ১৮৯৯-এ যখন 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয়, তখন তার প্রস্তাবনায় স্বামীজী এই গদ্যরীতির ব্যবহারে আরো নৈপুণ্য সঞ্চার করলেন। স্বামীজী যে সচেতন গদ্যশিল্পী, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই 'প্রস্তাবনা'টির ভাষায়—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"[২]

ভারত-চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত বিবেকানন্দ-সাহিত্যের শুভসূচনাও 'উদ্বোধনে'র এই 'প্রস্তাবনা'য়, নামান্তরে যা 'বর্তমান সমস্যা।' এই 'উদ্বোধনে'র লেখকরূপেই স্বামীজীর মৌলিক বাংলা-রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ আবির্ভাব। সে আবির্ভাবে চলতি গদ্যের ধারা যেমন সজীব ও প্রাণবন্ত, সাধুগদ্যের ধারাও তেমনি স্থিতধী প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত ধ্রুপদী গদ্যরীতির অনন্য উদাহরণ।

'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র রচনাকাল প্রায় সমসাময়িক। তবে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশকালের দিক থেকে 'বর্তমান ভারত'ই প্রথম অধিকার দাবি করতে পারে।

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৪

২ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৩

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথমবর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকেই 'বর্তমান ভারত' প্রকাশিত, সেক্ষেত্রে 'পরিব্রাজক' নামান্তরে 'বিলাতযাত্রীর পত্র'রূপে 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত। কালের হিসাবে সাধুগদ্যের লেখক বিবেকানন্দই ধীরে ধীরে তাঁর 'পত্রাবলী', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'ভাব্‌বার কথা'র রসরচনাগুচ্ছ প্রভৃতির মাধ্যমে চল্‌তি গদ্যের লেখক হয়ে উঠেছেন। তাঁর সাধুগদ্যের সংহত বিন্যাস 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সূচনায় পর্যন্ত স্বাক্ষর রেখেছে। 'পত্রাবলী' বাদ দিলে সাধুগদ্যের রচনা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের স্বল্পসীমায় বেশ কিছুটা স্থান অধিকার করে রয়েছে।

'পরিব্রাজকে' স্বামীজী তাঁর বিশ্বভ্রমণের সঙ্গী করেছেন বাঙালী পাঠককে ; 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' মূলত এই বিশ্ববীক্ষার আলোকেই— ভারত ও য়ুরোপের জীবন, আদর্শ ও সাধনার তুলনামূলক মূল্যায়ন। 'বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দ সন্ধান করেছেন ভারত-ইতিহাসের চিন্তন-প্রণালী বা ইতিহাসের দর্শন। সুতরাং তথ্য নয়, তত্ত্বগত ইতিহাস-অভিজ্ঞানরূপে 'বর্তমান ভারতে' যে ভারতাত্মার সংক্ষেপিত ইতিহাস বর্ণিত, তার ভাষা মৌখিক রীতির চলতি গদ্য না হয়ে মনন-ঋদ্ধ সুসংহত সাধুভাষা হওয়াই স্বাভাবিক।

'বর্তমান ভারতে'র গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজীর মন্তব্য—"বঙ্গভাষা যে অত অল্পায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। পদলালিত্যও অনেকস্থানে বিশেষ বিকশিত। অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোধ হয় যেন লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্যকমত প্রয়োগ করিয়াছেন।"[১] বাস্তবিক পাশাপাশি এই তিনটি গ্রন্থে স্বামীজীর ভাষা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার অনায়াস কৌশল দেখলে দক্ষ ভাষাশিল্পী হিসাবে স্বামীজীর প্রতিভা-বৈচিত্র্য আমাদের মধুসূদনের 'সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কথা মনে পড়ায়।

১ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১২০

মধুসূদনের সঙ্গে আরো একক্ষেত্রে স্বামীজীর মিল—সাহিত্যে আত্মনিয়োগের স্বল্পকালীনতায়।

মানুষ হিসেবে আমরা সকলেই সমকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ। বিবেকানন্দের মতো ক্রান্তদর্শী পুরুষই অতীত ও ভবিষ্যতে প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে অখণ্ডকালচেতনায় ইতিহাসকে বিধৃত করতে পারেন। বৈদিক যুগের ভারতীয় জীবনধারা থেকে ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর কর্তব্য-নির্ণয় অবধি বিশাল বিষয়বস্তুকে একটিমাত্র নিবন্ধের পরিসরে আবদ্ধ করতে গিয়ে যে বৈদান্তিক-সুলভ সংযম স্বামীজী অবলম্বন করেছেন তার দ্বারা বাংলা গদ্যের অর্থগূঢ় প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে 'বর্তমান ভারত' বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কিন্তু এই গদ্যরীতিই প্রজ্ঞাদীপ্ত অনুভূতির আলোকে ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়কে নূতন তাৎপর্যে পাঠকমানসে উদ্ভাসিত করেছে। সবার উপরে স্বদেশপ্রাণ সন্ন্যাসীর অন্তরে ভারতের মাটি, মানুষ, জাতি, ইতিহাস, আদর্শ ও সাধনা এক বিপুল আবেগে আলোড়িত হয়ে নবভারতের স্বদেশমন্ত্ররচনা করেছে। একে একে এ জাতীয় গদ্য-রচনার উদাহরণ—

'বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পান-ভোজন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ। রাজা সোম পুরোহিতের উপাস্য, বরদ ও মন্ত্রপুষ্ট; আহুতিগ্রহণেপ্সু দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয়; দৈববলের উপর মানব-বল কি করিতে পারে?"[১]—বৈদিক যুগের পুরোহিত-কেন্দ্রিক ভারত-সভ্যতা।

ইংরেজ-শাসনের স্বরূপ-বিশ্লেষণ—"যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাবলের ন্যায়—তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ যাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্য দেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাটকুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২২২

ফেনারাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।"[১] এ বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত বিশালদৃষ্টি ও সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে বাস্তবজীবনবোধের সমন্বয় কী অনায়াসে সাধিত।

পাশ্চাত্যের ময়ূরপুচ্ছধারী সমকালীন ভারতবাসীর উদ্দেশে স্বামীজীর ধিক্কারবাণী ও পন্থানির্দেশ—"বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে —দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দ্দশশতবর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ-জাতি, উহারা অনার্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!"[২] পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমায় সমগ্র ভারতের সঙ্গে তাঁর যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল, সে আত্মীয়তাবোধ আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে আজও দেখা দেয় নি বলেই তাঁর এই গণচেতনাময় ঈষৎ ব্যঙ্গে চকিত কণ্ঠের বেদনা ও ভর্ৎসনা-মিশ্রিত আহ্বান আজো 'বর্তমান ভারতে'র পাঠককে স্তব্ধ ও আত্মানুসন্ধানী করে।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি বিবেকানন্দের সাধুগদ্য আপন পৌরুষস্বাতন্ত্র্যের ঋজুতায়, বিশ্বব্যাপ্ত ইতিহাসদৃষ্টির উন্মীলনে এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবনমন্ত্রের দুন্দুভি-ধ্বনিতে আজও বাংলাসাহিত্যের পাঠককে যে পরিমাণ প্রেরণা, পথনির্দেশ ও সর্বোপরি মননশীল গদ্যরচনার সংকেত দিতে পারে, সে কথা মনে রেখে বাংলা সাধুগদ্যের কাছে আমাদের জাতীয় ঋণস্বীকারে শ্রদ্ধাবনত হওয়া একান্ত সঙ্গত ও প্রার্থনীয়।

১, ২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৩০-২৩১; ২৪৮-২৪৯

স্বামী বিবেকানন্দের "পত্রাবলী"[১]

মানবমনের দুটি আয়না—চোখ আর চিঠি। আমাদের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেমন সব চেয়ে বেশি ধরা দেয় চোখের আলোয়, লেখকের অন্তরের কথা তেমনি সব চেয়ে বেশি ধরা পড়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে। 'The style is the man' কথাটি পত্র-সাহিত্য প্রসঙ্গে বোধ করি সবচেয়ে প্রযোজ্য। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিটির মুখচ্ছবি আমরা চিঠিতে প্রকাশিত দেখি। বলা চলে—'Letter is the man'. বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের বিশালতাই আমাদের সবচেয়ে আচ্ছন্ন করে, সন্দেহ নেই। তাঁর চিঠি যতটা ব্যক্তিসত্তার পরিচায়ক তার চেয়ে ভাবসত্তার বাণীবহ। বিশেষভাবে প্রথম যুগের রবীন্দ্র-পত্রমালা পরবর্তীকালে যেভাবে তথ্যে, তত্ত্বে, বক্তব্য-উপস্থাপনায় প্রায় প্রবন্ধপর্যায়ী হয়ে উঠেছে, তাতে করে অনায়াসেই পত্র ক্রমে গ্রন্থাকারে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রসাহিত্যের অমূল্য উপকরণ হলেও মনে রাখতে হবে, পত্রের প্রত্যক্ষস্পর্শ ও সীমায়িত প্রকাশ তাঁর শেষযুগের অধিকাংশ পত্রেই অনুপস্থিত।

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যশৈলী ওজোগুণসম্পন্ন এবং একেবারে মুখের ভাষার মতোই দ্রুতচলনে তার কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত গতিশীলতাই, তাঁর গদ্যেও গতিবেগ সঞ্চার করেছে। চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে এই গতিসম্পন্ন ভাষা ইস্পাতের শাণিত উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে। চিন্তার দিক থেকে বেদান্তের মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং জীবনের দিক থেকে কোলকাতার কথ্যভাষার সঙ্গ—এ দুয়ে মিলে তাঁর চিঠিপত্রের ভাষাকে গড়ে তুলেছে। জগৎ ও জীবনের নানাদিকে তাঁর দৃষ্টি, তবু মূলত তিনি সন্ন্যাসী—এ কথাটি তাঁর চিঠিতে পরিস্ফুট; অথচ এ সন্ন্যাসের একটি মূল আদর্শ 'জগদ্ধিতায়'

১ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম খণ্ড

—আধুনিককালে যার নাম "বিশ্বপ্রেম"। স্বদেশ, স্বজাতি, সেইসঙ্গে সর্বমানবের প্রতি অপরিমেয় প্রেমের গভীর মন্ত্রধ্বনি তাঁর চিঠিপত্রের মানস-পরিমণ্ডলে অনাহত সুরে বেজে চলেছে—একটু কান পাতলেই শোনা যায়। এ প্রবন্ধে অবশ্য আমি কেবল বাংলায় লেখা চিঠিগুলির আলোচনা করব—বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ওদেরই। ইংরেজি থেকে অনুবাদ-করা চিঠিগুলির সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের পরোক্ষ যোগ। যদিও এই চিঠিগুলির অনুবাদে স্বামীজীর রচনাভঙ্গী যেভাবে অনুকৃত হয়েছে তা বিস্ময়কর।

পৃথিবীর অনেক মহামানবের মতোই স্বামীজীর পত্রাবলী তাঁর জীবনের ও অনুভূতিলোকের অনেক গূঢ় সংবাদ বহন করে এনেছে! এই পত্রাবলী তাঁর জীবনীরচনার অপরিহার্য উপাদান।

একদিকে অগাধ আত্মবিশ্বাস আর একদিকে সুগভীর মানবপ্রীতি —এই দুই সম্পদে তাঁর চিঠিপত্রের ভাষা সমুজ্জ্বল। চলতি ভাষায় সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে "পরিব্রাজক" এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বই দুটিতে স্বামীজী যে অনায়াসকৃতিত্ব লাভ করেছেন, পত্রাবলীতে সেই কৃতিত্বের সূচনা ও পরিণতি। তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা মুহূর্তের রঙে রাঙানো এই চিঠিগুলি আমাদের সুখদুঃখময় অন্তর-চেতনার সঙ্গে অনায়াসে যোগস্থাপন করে। যাঁদের উদ্দেশ্য করে এসব চিঠি তিনি লিখেছিলেন, আজ তাঁদের অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা মনে হলে বিস্ময় জাগে। তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও আলাপের চেয়ে এই পত্রালাপগুলির মূল্যও যে কিছুমাত্র কম ছিল না—একথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই পত্রাবলীতে তাঁর বৈদ্যুতী-ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাই। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ বিবেকানন্দকে পাওয়া যায় তাঁর "পত্রাবলীর"র পৃষ্ঠাতেই।

১৮৮৯এর ৪ঠা জুলাই তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা একটি চিঠিতে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়—"আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস পড়িতেছে, আর একটি ছোট। কখন কখন কলিকাতায়

নিকট থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্যকরী বাসনার উদয় হয়। সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে। তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর।...কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মতো বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্বাদ করুন।—'আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ &c.

আশীর্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূরাপহত হয়—For 'we have taken up the cross, Thou hast laid upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen.'—Imitation of Christ."[১]

"তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব।"[২]

স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা এই পত্রাংশটুকু সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতার প্রতি কী অমেয় ভালবাসার বাণী বহন করে এনেছে, অথচ এ বন্ধনও সন্ন্যাসীকে মোচন করতে হবে! ভগবান বুদ্ধের জীবনেও দেখি ত্যাগ তো প্রেমেরই নামান্তর। ঐ চিঠিরই আরেক অংশে বুদ্ধপ্রসঙ্গে আছে—"যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect এবং heart, যাহা জগতে আর হইল না।...বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৮৮
২ তদেব: পৃঃ ৩১৩-৩১৫

তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতি করিবার শক্তি কাহারও নাই।"[১]

ঠিক তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তাঁর অনুভূতি—"...রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense Sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধজীবের জন্য এ জগতে আর নাই।...তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই।"[২] ব্যক্তিগত অনুভূতির মানদণ্ডে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে,—"Love is the gate to all the secrets of the universe." দেবর্ষি নারদের ভক্তিসূত্রে আছে—তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ; মহাকবি দান্তে অনুভব করেছিলেন—'Love that moves suns and stars'। জীবনশতদলের মধুস্থলী এই অনির্বচনীয় প্রেমসত্তারই শুভ্র ও সুন্দরতম বিকাশ বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণের মতো মহামানবদের জীবনে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তাই এঁরাই মানবজাতির আদর্শ—তাঁর মানস-আকাশের ধ্রুবজ্যোতি।

মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মানদণ্ড হিসাবে তিনি ঐ অতুলনীয় সহানুভূতিকেই বুঝ্‌তেন বলে 'জীবে দয়া'র স্থলে 'জীবে প্রেম' তাঁর জীবনে নূতন পন্থা নির্দেশ করেছিল। আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন—

"মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন কাম করে? তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ের নানা কথা, map, camera, globe ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না।"[৩]

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩১৩-৩১৫
২ তদেব : পৃঃ ৩২০-৩২১
৩ তদেব : পৃঃ ৪১২

কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি এই সহানুভূতি কেবল চিন্তনীয় তত্ত্ব নয়। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা অনুভূতিকে কর্মে রূপান্তরিত করবার যে প্রবল প্রাণশক্তি দেখি তা উনবিংশ ও বিংশ উভয় শতাব্দীর বাঙালীর পক্ষেই অনন্য আদর্শ। সেই প্রবল কর্মশক্তির উদ্দীপনা তাঁর পত্রাবলীতে বারংবার প্রকাশিত—"Life is ever expanding, contraction is death (চিরসম্প্রসারণই জীবন, সঙ্কোচনই মৃত্যু।) যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নেই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)।"[১]

কাজ করতে গেলেই বাধা আসে। বিশেষ করে বাঙালী শিক্ষিতমন্যের কাছে অন্যের নেতৃত্ব অসহনীয়। "ঐ jealousy (ঈর্ষা), ঐ absence of conjoined action (সম্মিলিতভাবে কাজ করার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব); কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত।"[২] এই ঈর্ষ্যার অনলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সবাইকে দগ্ধ হতে হয়েছে—আজ অবধি এই স্বভাবটি ছাড়তে না পেরেই আমরা নেতৃহীন হয়ে আছি।

কিন্তু বিবেকানন্দের সমালোচনা তো ভাঙনমুখী নয়, গড়নমুখী। তাই নবযুগের কর্মপন্থা নির্দেশ করে লিখেছেন—"পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব পিতৃদেবো ভব' আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব' 'মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।"[৩]

সত্যিকার অধ্যাত্মধর্মচেতনা ভারতবর্ষের কয়জনের আছে তা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু ধর্মের নাম করে সামাজিক নিপীড়নের বেলায়

---

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৮৯৪ (গ্রীষ্মকাল)-এর চিঠি; বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৫৭

২ তদেব : তারিখ ১৮৯৪. বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ২৭

৩ স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা ১৮৯৪ এর চিঠি : বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০

আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেওয়াটা এদেশের রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। দেখে শুনে স্বামীজীর মন্তব্য—"ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন কেবল আছে ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না! দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে।"[১]

এই ছুঁৎমার্গী সামাজিক আচার যে ধর্ম নয়, উপনিষদ-প্রতিপাদিত সত্যই যে হিন্দুধর্মের আসল রূপ এ কথাটি রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ অবধি বেদান্তচর্চার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সেবামূলক কর্মশক্তিকে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করেছে। এই পটভূমিতে বিবেকানন্দের আর একটি পত্রাংশ স্মরণীয়—

"আমি একমাত্র কর্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই।...ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম, বাকি অধর্ম।"[২]

আর এই পরোপকারের জন্য যে বিপুল প্রাণশক্তি চাই, তার জন্য প্রয়োজন অনন্ত আত্মবিশ্বাস। বিবেকানন্দ তো সেই আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধারই জ্বলন্ত বিগ্রহ। "যে বলে আমি মুক্ত সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীন হীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা।...যে সদা আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে কোনোকালে বলবান হইবে না, যে আপনাকে সিংহ জানে সে "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।"[৩] এই পাশমুক্ত কেশরীর নির্ভয় বিচরণের মহিমা বিবেকানন্দের ব্যক্তিসত্তার প্রতীক। আমাদের জাতীয় চরিত্রের

---

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ১৮৯৪ সালের চিঠি: বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৫১-৫২

২, ৩ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৮৯৫ সালের চিঠি: বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ১২১-১২২

নিবীর্যতাকে তিনি এই অভয়মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে চেয়েছিলেন—তাঁর ইংরেজী, বাংলা সব জাতীয় রচনার মধ্যেই বারংবার এই নির্ভীকতার উপর জোর দেওয়ার ভাব দেখতে পাই। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"...আসল কথা ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি?—একঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে...তবে মানুষ।...কাপুরুষ দয়ার আধার!"[১]

স্বামী বিবেকানন্দের মানস-পরিমণ্ডলে দুটি দেবতার—বস্তুত একই দেবতার দুটি রূপ আমরা দেখতে পাই। একজন "উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর", আর একজন "মাতৃরূপা কালী"। শ্মশানচারী এই দুই দেবতার মধ্যে তাঁর বৈরাগ্যপূত শাক্তচেতনার ঘনীভূত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় আমরা ত্যাগ ও ভোগের, সৃষ্টি ও প্রলয়ের সম্মিলিত প্রকাশ দেখি 'নটরাজ'-প্রতীকের মাধ্যমে। তাঁর 'নৃত্যের তালে তালে' 'তপোভঙ্গ' প্রভৃতি গান ও কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' 'Kali the Mother' প্রভৃতি কবিতায় আমরা শক্তিরূপিণী জগন্মাতার প্রকাশ দেখি। পত্রাবলীতেও জগন্মাতার নামোচ্চারণ করে আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ করার প্রয়াস দেখি—"আমি মায়ের দাস, তোমরা মায়ের দাস—আমাদের কি নাশ আছে, ভয় আছে? অহঙ্কার যেন মনে না আসে, ভালবাসা যেন না যায় মন থেকে। তোমাদের কি নাশ আছে! মাভৈঃ! জয় কালী! জয় কালী!"[২]

মহাশক্তির উপাসক বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন জাতির প্রাণে আবার শক্তিসঞ্চার করবার জন্য প্রয়োজন নূতন ধরনের শিক্ষাদর্শ—"কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখস্বচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের

১, ২. স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ২০শে নভেম্বর ১৮৯৯ তারিখের চিঠি: বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃঃ ৮০-৮১

মনে রাখিয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম, কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউয়র্কে দেখিতাম Irish colonist (আইরিশ উপনিবেশবাসী) আসিতেছে ইংরেজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছমাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে। তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নাই, কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে ঐ Irishmanকে তার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলছিল "প্যাট্ তোর আশা নাই, তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাকবি গোলাম।" আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট-এর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে প্যাট হিপনটাইজ করলে যে, সে অতি নীচ; তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—"প্যাট তুইও মানুষ, আর আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করছে, তোর আমার মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ!" প্যাট ঘাড় তুল্লে, দেখলে ঠিক কথাই ত; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" ইত্যাদি।"[১]

আইরিশ লোকটির এই উদাহরণের মধ্য দিয়ে বেদান্তের শিক্ষাকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করায় কী আশ্চর্য উদাহরণ তিনি জীবন্তভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। পাশ্চাত্যের এই রজোগুণাত্মক শক্তিকেই তিনি নিদ্রিত ভারতবাসীর সুপ্ত চেতনায় সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁর কাছে রজোগুণের অর্থ তৃপ্তিহীন সম্ভোগ নয়, 'পরহিতায়' সর্বস্ব সমর্পণের আনন্দ। সমগ্র স্বদেশী যুগ জুড়ে বাঙালী যুবকদের আত্ম-দানের আদর্শে এই রজোগুণের আহ্বানকেই আমরা

১ 'ভারতী'-সম্পাদিকাকে লেখা ২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৭ তারিখের চিঠি : বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩২৬-৩২৭

সফল হতে দেখেছি। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের কর্মীদের মধ্যে আজও দেখছি।

তাঁর বহুবিস্তৃত জীবনানুভূতি এমনি করে প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। প্রথমেই কেউ সর্বস্বত্যাগ করে নিষ্কাম সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে না। প্রথমে ব্যক্তিগত ভালবাসা, তারপর দেশগত প্রেম, বিশ্বানুভূতি তারও পরের কথা।

"একটিকে নিঃস্বার্থ ভালবাসতে শিখতে পারলে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট ব্রহ্মে প্রীতি হইতে পারে।

"অতএব একজনের জন্যে আত্মত্যাগ করতে পারলে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়, সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাকলে কি কখন কাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাকলে কি কখন আলোকের মানে হয়?

"সকাম, সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তারপর আপনা আপনি বড় আসবে।"[১]

ব্যক্তিপ্রেম থেকে বিশ্বপ্রেমের এই প্রতিটি ধাপ উত্তীর্ণ হবার মূল্য মানুষকে দিতে হয় কঠোর বেদনা, কঠিনতর সাধনার মধ্য দিয়ে। দুঃখের ভয়ে যে পিছিয়ে আসে তার "অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।" "ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছিল? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় ব্রহ্মদর্শন হয়।"[২]

স্বামীজীর বিখ্যাত "বাঙলা ভাষা" প্রবন্ধটিতে চলতি গদ্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত—"স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ

১, ২ শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লেখা ২৩শে ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখের চিঠি : বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ১৭০

করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না ; সেই ভাব সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না।"[১]—ভাষার এ আদর্শ সবচেয়ে বেশী প্রমাণিত হয়েছে তাঁর পত্রাবলীতে। পত্রাবলীর রচনাভঙ্গীই স্বামীজীর মানসভঙ্গীর পরিচায়ক ;—সে মানস ত্যাগে, প্রেমে, বীর্যে, ব্রহ্মদৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল,—মানবাত্মার অনন্ত যাত্রাপথে শাশ্বতসত্যের চিরন্তন দিশারী।

প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর পত্রমালায় এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব পাঠককে আচ্ছন্ন করে থাকলেও আনন্দে বেদনায় পরিহাসে অশ্রুজলে একান্ত অন্তরঙ্গরূপেও তিনি আমাদের কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়ান। মাঝে মাঝে তাঁকে অশান্ত, অধীর মনে হওয়া স্বাভাবিক। হয়তো বিপুল কর্মভার ও সে অনুপাতে সীমাবদ্ধ জীবনকালের সচেতনতাই তাঁকে এতো অস্থির করে তুলেছে। সেইসঙ্গে পরপদানত স্বদেশবাসীর বেদনা, এমন কি জগতের যত নির্যাতিত মানুষের হাহাকার সবই তাঁর অন্তরাত্মাকে বিদ্রোহী চঞ্চল করে তুলেছে। কিন্তু সব বিদ্রোহ অবশেষে জগৎরহস্যের অন্তরালে ইচ্ছাময়ীর অপার ইচ্ছাসমুদ্রের সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কর্মে ও ধ্যানে, সংগ্রামে ও সাধনায়, আপাত রূঢ়তায় ও পরমকল্যাণকামনায়, স্বদেশ-স্বজাতি-প্রীতিতে ও বিশ্বমানবিকতায়—যে অসঙ্গতির সম্ভাবনা সে সবই বিবেকানন্দের তীব্র ব্যক্তিত্বে বিগলিত হয়ে দিব্যবাণীর রূপলাভ করেছে। বিবেকানন্দ-বাণীর মণিভাণ্ডার তাঁর পত্রাবলী। এই বাণীর অন্তরে রয়েছে তাঁর মতো নরেন্দ্র-ব্যক্তিত্বশালী যুগনায়ক।

গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজীর নিজস্ব ব্যক্তিত্বেরই প্রতিচ্ছবি—"জগৎ উচ্চ উচ্চ নীতির (principles) জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়। তারা যাকে পছন্দ করে তার কথা ধৈর্যের সঙ্গে

১ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ তারিখে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে লেখা পত্রাংশ

শুনবে, তা যত অসারই হোক না কেন—কিন্তু যাকে তারা পছন্দ করে না, তার কথা শুনবেই না।...যদি শাসন করতে চাও, সকলের গোলাম হয়ে যাও। এই হল আসল রহস্য। কথাগুলি রুক্ষ হলেও ভালবাসায় ফল হবেই। যে-কোন ভাষার আবরণেই থাকুক না কেন, ভালবাসা মানুষ আপনা হতেই বুঝতে পারে।"[১]

শিষ্য ও গুরুভাইদের কাছে লেখা অনেক চিঠিতেই স্বামীজী যে তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার অন্তর্নিহিত সর্বজয়ী ভালবাসার সুরটি তাঁরা অনায়াসেই ধরতে পারতেন বলেই এই সব পত্র তাঁদের আদর্শগত প্রেরণার অমূল্য পাথেয় হয়ে উঠেছিল। এ জাতীয় পত্রের দু'একটি উদাহরণ—"যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পুজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম ; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট ব'সব কি আধ ঘণ্টা ব'সব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন ; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশময়।"[২]

স্বামীজীর আমেরিকাবাসকালে এদেশী গোঁড়া পণ্ডিতের দল যখন তাঁর সমুদ্রযাত্রা, আচারবিচারের প্রতি উপেক্ষা প্রভৃতি নিয়ে সমালোচনা শুরু করেন, সেই সময়কার একটি চিঠিতে তার নির্মম প্রতিক্রিয়া—"রাখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুক গে। 'লোক না

১ পত্রের এই অংশটি অনুবাদ। বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৪৪

২ মঠের গুরুভাইদের উদ্দেশে ১৮৯৪ সালের পত্র : তদেব : পৃঃ ৪৮

পোক'। ভাবের ঘরে তোমাদের চুরি না থাকে এবং Jesuitism-এর দিক মাড়াবে না। Orthodox (গোঁড়া) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন কালে; বা আচারী হিন্দু কোন কালে? I do not pose as one. (আমি তেমন কোনো ভান করি না।) বাঙালীরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে পরিপোষণ করছে—অহ্ হ!!! তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে—না? বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বারো বছরের মেয়ের ছেলে হয়। যাঁর জন্মে ওদেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা! বাঙালা দেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ? ওরা ভারতবর্ষের নাম খারাপ করেছে।"[১] অথচ এই 'বাঙালী'র বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর কত উচ্চধারণা।[২] আসলে বাঙালীর তথা ভারতবাসীর মজ্জাগত তমোগুণের বিরুদ্ধেই স্বামীজীর রজোগুণাদর্শের সংগ্রাম। সঙ্ঘ-স্থাপনে নিয়মানুবর্তিতা ও আজ্ঞাবহতার গুরুত্বসম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে স্বামীজী লিখেছেন—

"প্রভু তোমাদের সৎবুদ্ধি দিন! দু-জন জগন্নাথ দেখতে গেল—একজন দেখলে ঠাকুর, আর একজন দেখলে পুঁই গাছ!!! বাপু হে তোমরা সকলেই তাঁর সেবায় ছিলে বটে, কিন্তু যখনই মন ফুলে আমড়া গাছ হবে, তখনই মনে ক'রো যে, থাকলে দিনে প্রকাশ হ'ত। তিনি নিজেই বলতেন, নাচিয়ে গাহিয়ে তারা নরকে যাইবে—ঐ নরকের মূল 'অহঙ্কার'। 'আমিও যে, ও-ও সে—বটে রে মধো?' 'আমাকে তিনি ভালবাসতেন'—হায় মথুরাম, তা হলে কি তোমার এত দুর্গতি হয়?…এখনও উপায় আছে সাবধান।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৮৯৫ সালের পত্র : ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ১৬৮—১৬৯

২ দ্রঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৬ সালে 'কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর' বক্তৃতা : বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ২১৫

৩ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৬-এর চিঠি। বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ২৪৪।

মধ্যেও কোনো অহংভাব পাছে এসে পড়ে, নেতৃত্বের বাসনা পাছে তাঁদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে, এ বিষয়ে স্বামীজী তাঁর পত্রাবলীতে বার বার করে সাবধান করে দিয়েছেন।

স্বদেশ ও বিশ্বের কল্যাণব্রতে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণের সঙ্কল্পে কী দুরন্ত প্রাণশক্তির আধারে পরিণত, তার উদাহরণ—"সমাজকে জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিক প্রেরণাপূর্ণ) করতে হবে। বসে বসে গপ্পিবাজি আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া গৃহস্থের কর্ম।···তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought crurents. (চিন্তাপ্রবাহ প্রচার ও সঞ্চার করা।) তাই যদি পারো, তবে ঠিক, নইলে বেকার। রোজকার ক'রে খাওগে···"

"Life is ever expanding, contraction it death. (জীবন চির প্রসারণশীল, সংকোচনই মৃত্যু।) যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করবে, সেই আমার ভাই সেই তাঁর ছেলে, বাকি যে তা না পারো—তফাত হয়ে যাও এই বেলা ভালোয় ভালোয়।"

"···এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তার ভিতর আমার spirit আসবে, বিশ্বাস কর।"[১]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অধিকাংশ এমনি প্রেরণামণ্ডিত হ'লেও 'পত্রাবলী'র মতো এতো প্রত্যক্ষ প্রাণশক্তির উদাহরণ তাঁর রচনায়ও অন্যত্র দুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেরণায় তাঁর শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ কেমন করে বিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে, পত্রাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাসে তারই স্বাক্ষর।

---

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৮৯৪ গ্রীষ্মকালের চিঠি : বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৬৬-৪৬৭

"যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও,—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর; বলি প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। 'Have faith in yourself, all power is in you. Be conscious and bring it out.' (নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, সব শক্তিই তোমার অন্তরে। সচেতন হয়ে সেই শক্তিকে প্রকাশ কর।) বল্ আমি সব করতে পারি। 'নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়'। খবরদার No 'নেই নেই'; বল্—হ্যাঁ হ্যাঁ, 'সোঽহং সোঽহং'।"[১]

এই চিঠিরই কিছুটা আগে স্বামীজী আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত বীরের আদর্শরূপে 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী'—জগৎপাশমুক্ত নির্ভয় কেশরীকে স্থাপন করেছেন। 'পত্রাবলী' আমাদের মানস-অনুধ্যানে বিবেকানন্দের সেই দৃপ্ত ব্যক্তিত্বকে সবচেয়ে উজ্জ্বল করে তোলে। এ ব্যক্তিত্বের মূলে রয়েছে বেদান্তশাস্ত্রমন্থনের ফলে লব্ধ মন্ত্র 'অভীঃ'। তত্ত্বতঃ এই 'অভীঃ' ও 'সোঽহম্' একই সত্যের এপিঠ ওপিঠ। সেই সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষই নিখিলমানবকে এই অমৃতসত্যের বাণী শোনাবার ভারপ্রাপ্ত। আজকের ভারতের দৈন্য-দুর্দশা স্বীকার করে নিয়েই তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের প্রাণমন্ত্র সঞ্চার করতে হবে। এ দেশের মহত্তম ভাবসত্যের জয়গান করেও স্বামীজী জানতেন, "কৃতকর্মতা (Practicality) আদৌ নাই।"

"উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্যে মহাভেদবুদ্ধি, মহা নিঃস্বার্থ কর্ম ভারতে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

"তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্যে অগ্রসর হইতে

---

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ তারিখের চিঠি : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৮৯

পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল-মন্দ-বিচারের শক্তি সকলের আছে, কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্যহীন অগ্নিবর্ষণ-কারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম, সে দেশের বালিকাদের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙে না।...আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেহ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্তবুদ্ধি পরপদদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে।"[১]

কিন্তু ভারতে গণজাগরণের আন্দোলন গড়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ। কারণ—"যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি, তাহা এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এই জন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্তব্য সাধন, এ দেশে এখনও ফলদায়ক হয় না; এইজন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই।"[২]

'দরিদ্র নারায়ণে'র সেবার পরবর্তী অধ্যায় তাই 'মূর্খদেবে'র উপাসনা। শিক্ষা অর্থে তত্ত্বমূলক বা ভাবমূলক শিক্ষা শুধু নয়, ব্যবহারিক, অর্থকরী ও জীবনসংগ্রামের উপযোগী শিক্ষার কথাই স্বামীজীর মনে জেগেছে। ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে সে কথা তিনি লিখেছিলেন—"দাদা এই সব দেখে —বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না, একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা

১ 'ভারতী'-সম্পাদিকাকে লিখিত: ৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭ তারিখের পত্র। বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ ৩২২-৩২৪

২ তদেব: তারিখ ২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৬; পৃঃ ৩২৫

কুমারীর মন্দিরে ব'সে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর ব'সে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না ? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা ; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু'পা দিয়ে দলেছে।"[১]

একদিকে এই বাস্তব শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে আত্মপ্রত্যয় ও মৌলিকতার উদ্বোধন সে সম্বন্ধে স্বামীজীর সচেতনতা—"বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি ? বই পড়া ?—না নানাবিধ জ্ঞানার্জন ? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয় তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইতেছে, যাহার শাসনে নতুন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, তাহা কি শিক্ষা ? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন চিন্তা—চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর।"[২]

এখানেও সেই রজোগুণের সংগ্রামে সদসৎ মিশ্রিত কর্মপন্থার প্রশ্ন। কাজ করতে গেলেই কিছু ভুলভ্রান্তি বা পাপ এসে পড়ে। নিষ্কর্মার জড়ত্বে আর সাধকের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে আকাশপাতাল পার্থক্য। ভারতের তথাকথিত সাধু, ফকির, গুরুর দল বহুযুগ ধরে সাধারণ-মানুষের অন্নে ভাগ বসিয়ে এসেছেন, কিন্তু প্রতিদানে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অংশ নিতে চান নি। আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের ক্ষমতা খুব কম সাধকেরই থাকে। কিন্তু রোগে-শোকে-দারিদ্র্যে-অত্যাচারে

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪ তারিখের চিঠি : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪১২

২ মৃণালিনী বসুকে লেখা ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০ তারিখের পত্র : বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ১৬৯

জর্জরিত মানুষকে নরনারায়ণ জ্ঞানে সেবার অধিকার সকলেরই আছে। সেজন্য যে বিরাট অনুভূতিশীল হৃদয় প্রয়োজন, বিবেকানন্দ সেই হৃদয়ের প্রকাশ।

গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবা করতে গিয়ে একটি অনাথ-আশ্রম গড়ে তুলছেন, তখন সবচেয়ে মনোমত আদর্শের রূপায়ণে 'আনন্দিত-হৃদয় বিবেকানন্দ লিখছেন—"বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ—উপরে চাকচিক্যমাত্র; সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়। 'জ্ঞানবলক্রিয়াশালী আত্মার অধিবাস' হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। 'শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ' ইত্যাদি। হৃদয়ের নিকট 'সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন' নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা। হৃদয় যত দেখাতে পারবে, ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলে বোঝে। তবে আমাদের দেশে, মড়াকে চেতানো—দেরী হবে; কিন্তু অপার অধ্যবসায় ও ধৈর্যবল যদি থাকে তো নিশ্চিত সিদ্ধি, তার আর কি?"[১]

স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর এই অতি আদরের বয়ঃকনিষ্ঠ গুরুভ্রাতার হৃদয়ের মিলটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হয়তো তাই স্বামীজীর বেশ কয়েকটি শ্রেষ্ঠপত্র এই গুরুভ্রাতার উদ্দেশে লেখা। স্বামীজীর পত্র সম্বন্ধে অখণ্ডানন্দজীর একটি মূল্যবান প্রবন্ধের অংশবিশেষ এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়—"বোধ হয় ইহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা। সেই সময়ে আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ আমেরিকা মহাদেশে বেদান্তের বিজয়নির্ঘোষে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভারতের অতুল বৈভবে জগতকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন! সভ্য জগতের সকলেই তাঁহার মুখে ভারতের অতুল মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।...স্বদেশের ও স্বজাতির পূর্বগৌরবকাহিনী বিবৃত করিয়া তিনি যেন পাশ্চাত্যজাতিসমূহকে মুগ্ধ করিয়া স্বয়ং বিমুগ্ধ

---

১ স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ তারিখের পত্র: বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃঃ ১০১

হইতেন, তাহার বর্তমান দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াও আবার তেমনি ব্যাকুল হইতেন এবং না জানি বিরলে বসিয়া কত অশ্রুই বিসর্জন করিতেন!… যে মহান দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সুদূর পাশ্চাত্য দেশে গিয়া তাহার কল্যাণ সাধনে রত হইয়াছিলেন, আমিও যথাশক্তি পর্যালোচনা করিয়া চতুর্দিকে সেই একই দুঃখেরই জীবন্ত বিরাট মূর্তি দেখিতে পাইলাম। সেই দিন হইতেই আমার কর্তব্যজ্ঞান ও জীবনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্নভাব ধারণ করিল এবং আমার হৃদয়ে যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল পূজ্যপাদ স্বামীজীকে আমি তাহা অতি বিশদভাবে পত্রদ্বারা জ্ঞাত করিলাম। এরূপ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমি যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না, তাহা নিশ্চয় জানিয়া তাঁহাকে অতি সরলভাবে আমার অভিপ্রায় লিখিয়া জানাইলাম। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের দ্বারা এই বিপন্ন জনসমাজের কিছুমাত্র সেবা হইতে পারে কিনা এবং সন্ন্যাসী হইয়া আমার পক্ষে এরূপ কার্য সঙ্গত হইবে কিনা, জানিবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে আমি তাঁহার পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এক একবার ইহাও মনে হইত, বুঝিবা তিনি আমাকে এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়া কেবল অধ্যাত্মচিন্তায়ই রত থাকিতে উপদেশ করিবেন! কিন্তু কি আশ্চর্য যে, তিনি আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া যে অমিয় আশ্বাস ও অভয়-বাণীতে আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এবং যে সকল অমোঘ বাক্যে তিনি আমাকে দুঃস্থ ও জনসমাজের সেবায় জীবন গঠন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল যেন আমার প্রত্যেক কথাটি পৃথিবীর অপরদিক হইতে বজ্রনিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া আমার হৃদয়ে মহাশক্তির সঞ্চার করিয়া দিল। দুর্বল সুপ্ত হৃদয় যেন বহুকালের পর মহাবল ধারণ করিয়া জাগরিত হইল। তাঁহার পত্রের যে কয়েকটি কথার মহাশক্তিতে আমার জীবনের স্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ধাবিত হইল, তাহারই কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার অভয়বাণী শ্রুত না হইলে আমার সংকল্পমাত্রই সার হইত এবং তাহা কখন কার্যে পরিণত হইত কিনা সন্দেহ। স্বদেশের দুঃখে পূজ্যপাদ

স্বামীজীর হৃদয় যে কতদূর কাতর ছিল এবং তাহার দুঃখ মোচনের জন্য তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইতেন, তাঁহার মহান জীবনের প্রত্যেক কার্যেই আমরা তার বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি।...তাঁহার পত্রের যে কয়েক পঙ্‌ক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতেই যে মহাশক্তি নিহিত আছে তাহা আর কাহারও বাক্যে সম্ভবে না। "বহুজন-হিতায়" ও "বহুজনসুখায়" জীবন পণ করিয়া কার্য করিতে তিনি যে কেবল আমাকেই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি সকলকেই সেই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্য করিতে এবং আত্ম-ত্যাগই যে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা ও চরম লক্ষ্য তাহাই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।...

আমাদের মধ্যে কেহ একটু সৎকার্য করিলে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। সেজন্য তিনি যে কিরূপ আশাপ্রদ, মধুর বাক্যে উৎসাহিত করিতেন এবং প্রাণে প্রাণে তিনি যে কি মহাশক্তির সঞ্চার করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার পত্র পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।"[১]

উদাহরণস্বরূপ যে পত্রগুলির কথা অখণ্ডানন্দজী উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলির কোনো কোনোটি আগেই আলোচিত। তবু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের যে পত্রটির কথা অখণ্ডানন্দজী উল্লেখ করেছেন, তার অংশবিশেষ এ আলোচনায় একান্ত প্রাসঙ্গিক—"...রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। কার্য করিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া কার্য হয় না।...

খেতড়ি শহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায় আর "হে প্রভু রামকৃষ্ণ" বলায় কোন ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পারো।...

---

১ স্বামী বিবেকানন্দের পত্র (ভূমিকা): স্বামী অখণ্ডানন্দ: উদ্বোধন ১৩১৩ সাল, ৮ম বর্ষ, ১৫ই আষাঢ় ১১শ সংখ্যা এবং সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের দ্বারা প্রকাশিত 'অঞ্জলি' (১৩৭৬) পৃঃ ১০-১১

…ধর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম কর, তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। গুণনিধি আসিলে দুইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে, পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান—কায়মনোবাক্য 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে।"[১]

সন্দেহ কি, এমন একটি পত্রের প্রেরণাই অখণ্ডানন্দজীর সমগ্র জীবনের পাথেয় হয়ে উঠতে পারে। তাঁরই সাক্ষ্য অনুযায়ী স্বামীজী নিজে এসব পত্রের গুরুত্ব ততটা দিতে চাইতেন না। সেকথা মনে রেখে অখণ্ডানন্দজী লিখেছেন—"বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁহার সমুদয় পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই। তাঁহার অমূল্য উপদেশ সম্বলিত পত্রগুলি আমি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি দেখিয়া একদিন তিনি আমাকে কতই বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পত্র রাখায় যে কোনও লাভ নাই তাহাই আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার নিরভিমানিতার কথা আর কি লিখিব, আমরা যে তাঁহার পত্রের গৌরব করিতাম, তাহাও তিনি দেখিতে পারিতেন না।"[২]

সমগ্র 'পত্রাবলী' অনুধাবন করলে গুরুভাইদের কাছে লেখা পত্রগুলিতে সঙ্ঘনেতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শের আদি প্রচারক বিবেকানন্দের মানবপ্রেমিক সত্তাটি সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রকাশিত দেখি। নেতৃত্বের সবচেয়ে বড়ো আদর্শ বোধ করি নিজেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করায়। নিজের পত্রের গৌরব না করা বিবেকানন্দের অনাসক্ত অন্তরের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ; আবার এই পত্রসাহিত্যের শেষপ্রান্তে এসে দেখি সঙ্ঘের নেতৃপদ থেকেও তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, এমন কি যে প্রচণ্ড কর্মমুখরতায় তাঁর জীবনের শেষ দশকটি অতিবাহিত সে কর্মস্রোত থেকেও মুক্ত হয়ে অধ্যাত্মজীবনের আদি

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০

২ স্বামী বিবেকানন্দের পত্র (ভূমিকা) : স্বামী অখণ্ডানন্দ : উদ্বোধন, ১৩১৩

উৎসে মহাপ্রয়াণের ব্যাকুলতা ধ্বনিত। একদিকে বাস্তব-সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত আর একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই নিশ্চিত আশ্বাস—'সমাধির ঘরে চাবি দেওয়া থাকল, সময় হলে খুলে দেওয়া হবে।' ক্ষীরভবানীর মন্দিরে দৈববাণী শ্রবণের পর থেকেই বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের এ রূপান্তরের কথা তাঁর জীবনী-পাঠকদের অজানা নয়। কিন্তু 'পত্রাবলী'তে তাঁর শেষযুগের লেখনী এমন এক বেদনাধূসর পটভূমিতে অস্তগোধূলির অভিযাত্রী-হৃদয়ের রঙ ফুটিয়ে তুলেছে, যার তুলনা তাঁর রচনায় আর কোথাও নেই। বিবেকানন্দের কবিসত্তার প্রকাশরূপে এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ পত্রের অংশবিশেষ—"যতই যাই হোক, জো, আমি এখন সেই আগেকার বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত, আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে, তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের জন্য আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সংকার মৃতেরা করুক। তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়!' যাই প্রভু যাই।...আমি যে জন্মেছিলুম, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্ছি না; অথবা এমন বন্ধন আমি কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমার মুক্তি হোক, অথবা দেহ থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরোনো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে—আর ফিরছে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!··· তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণ গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা ভাসান দিয়েছি। উপরে সূর্য তাঁর নির্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিনের উত্তাপে সব প্রাণী ও পদার্থ কত নিস্তব্ধ, কত স্থির শান্ত! আর আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর-স্থির ভাবে, নিজের ইচ্ছা আর বিন্দুমাত্র না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি! এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙতে আমার প্রবৃত্তি বা সাহস হচ্ছে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে যায়! প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। এর আগে আমার কর্মের ভিতর ব্যক্তিবিচার আসত, আমার পবিত্রতার পিছনে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা আসত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে; আর আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই, মা যাই! তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই।"[১]

এ চিঠির মাস তিনেক পরে গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী (স্বামীজীর 'হরি-ভাই')-কে প্যারিস থেকে স্বামীজী লিখছেন—"···লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে দিনরাত মনকষ্ট। কাজেই

১ বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃঃ ১৩১-১৩৩; ১৮ই এপ্রিল, ১৯০০ তারিখে শ্রীমতী জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লেখা পত্র। স্বামীজীর মূল ভাব বজায় রেখে এই বিস্ময়কর অনুবাদটি যে অপূর্ব বাংলারূপ নিয়েছে, সেজন্য অনুবাদক আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

…সব লিখে-পড়ে আলাদা হয়ে গেছি।…আমার কাজ আমি করে দিয়েছি, বস্। গুরু মহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি।…আমি এখন আমার কাজ করতে চললুম।"[১]

জীবনের শেষ পর্বে বিবেকানন্দের সংগ্রামীচেতনা পরমাশান্তির নির্বৃতিতে সমাহিত হতে চলেছে। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দরুন একটু ব্যথা একটু আহত অভিমান হয় তো কোথাও ফুটে ওঠে, কিন্তু শেষ অবধি সেই প্রার্থনা 'অব শিব পার কর মেরে নেইয়া।'

শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রটির মাত্র কিছুদিন আগে স্বামীজী তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ পত্র লিখেছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহের বিদেশিনী ভগিনী শ্রীমতী মেরী হেলকে। বিবেকানন্দের অন্তরতম সত্তার পরিচয়-উদ্ঘাটনে মেরী হেলকে লেখা পত্রগুলি বিশেষ সহায়ক। তবে আলোচ্য পত্রটি (সানফ্রান্সিস্কো থেকে ২৮শে মার্চ, ১৯০০ তারিখে লেখা) আসন্ন বিদায়ের পটভূমিকায় বিবেকানন্দের আত্মদর্শনের পরিচায়ক আর একটি অসীম গুরুত্বপূর্ণ রচনারূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

"আমার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। শীঘ্রই তা গর্জন শুরু করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অচঞ্চল থাকবো। সকল বোধের অতীত এক শান্তি আমি লাভ করেছি, তা আনন্দ বা দুঃখের কোনটাই নয়, অথচ দুয়েরই ঊর্ধ্বে।…গত দুবছর ধরে মৃত্যু-উপত্যকার উপর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্রা আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা করেছে। এখন আমি সেই—শান্তির—সেই চিরন্তন নীরবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সকল বস্তুকে তার নিজের স্বরূপে আমি দেখছি, সব কিছুই সেই শান্তিতে বিধৃত, নিজের ভাবে পরিপূর্ণ। 'যিনি আত্মতুষ্ট, যিনি আত্মরতি, তাঁরই যথার্থ শিক্ষালাভ হয়েছে'—এ জগতে এই বড় শিক্ষাটি আমাদের জানতে হয় অসংখ্য জন্ম এবং

১ বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ১৫০–১৫১

স্বর্গ ও নরকের মধ্য দিয়ে—আত্মা ছাড়া আর কিছুই কামনা বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু নেই।...'চির একাকী, কারণ আমি মুক্ত ছিলাম, এখনও মুক্ত এবং চিরকাল মুক্ত থাকব'—এই হ'ল বেদান্তবাদ। এতকাল আমি এ তত্ত্বটি প্রচার করছি। তবে আঃ, কী আনন্দ!... এখন প্রতিটি দিন তা উপলব্ধি করছি। হ্যাঁ, তাই—'আমি মুক্ত'। আমি একা—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

সচ্চিদানন্দে মগ্ন তোমার চিরকালের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—এখন আমি সত্যিকারের বিবেকানন্দ হতে চলেছি। তুমি কখন মন্দকে উপভোগ করেছ...ভাল-মন্দ দুইই আমার কাছে উপভোগ্য। আমিই ছিলাম যীশু এবং আমিই ছিলাম জুডাস ইস্ক্যারিয়ট্; দুই-ই আমার খেলা, আমারই কৌতুক। "যতদিন দুই আছে ততদিন ভয় তোমাকে ছাড়বে না...সাহসী হও, সব কিছুরই সম্মুখীন হও, ভাল আসুক, মন্দ আসুক, দুটিকেই বরণ করে নাও, দুইই আমার খেলা। আমার লভ্য ভাল বস্তু কিছুই নেই, ধরে থাকবার মতো কোন আদর্শ নেই, পূর্ণ করার মতো কোন উচ্চাভিলাষও নেই; আমি হীরের খনি, ভাল-মন্দের নুড়ি নিয়ে খেলা করছি।... আমার সামনে দুনিয়াটা উল্টেপাল্টে গেলেই বা আমার কি আসে যায়? আমি বুদ্ধির অতীত শান্তি; বুদ্ধি আমাদের কেবল ভাল-মন্দই দিতে পারে। আমি তার বাইরে, আমি শান্তি।[১]

বি——"

(মূল ইংরেজীর বঙ্গানুবাদ)

সুখে দুঃখে অচঞ্চল এই ব্রহ্মতন্ময়তার আদর্শই জীবন্মুক্তের সাধনা এবং সাধ্য। মাত্র চল্লিশ পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবেকানন্দের জীবনবৃত্তের সেই কেন্দ্রসত্যটি তাঁর নিজের কাছে উজ্জ্বলতমরূপে উদ্ভাসিত। পত্রসাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ব্যক্তিসত্তার জীবনদর্শন। একের সঙ্গে আর একজনের অন্তরঙ্গ আলাপচারীতে

১ বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ২২৪-২২৫

ব্যক্তিমানসের যে বিভিন্ন মুহূর্তগুলি মুকুরিত হতে থাকে, তার সামগ্রিক সার্থকতা একটি অখণ্ড জীবনদর্শনের পটভূমিকায়। বিবেকানন্দ-পত্রাবলীর প্রথম থেকে শেষ অবধি মানবপ্রেমিক, সংগ্রামী সৈনিক, বিশ্বসভ্যতার তুলনামূলক বিচারে নিপুণ ঐতিহাসিক, একাধারে চলতিভাষার জীবন্তরূপ ও সাধুভাষার মননঋদ্ধচেতনাসম্পন্ন যে ব্যক্তিসত্তার পরিচয় পাই, তিনি মূলত অদ্বৈতসাধক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের স্ব-নির্বাচিত বাণীবহ বিবেকানন্দের মানস-উত্তরণের বহু বিচিত্র স্তর-পরম্পরার সামগ্রিক প্রকাশে তাই 'পত্রাবলী'ই প্রধান চাবিকাঠি।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিত্বসমুজ্জ্বল পত্রসাহিত্যে মধুসূদন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কথা পাশাপাশি মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। মধুসূদনের পত্রাবলী ইংরেজী ভাষায় তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, সেই সঙ্গে তাঁর বিদ্রোহী সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বেরও শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। বিবেকানন্দের বাংলা পত্রাবলীই আমরা প্রধানত আলোচনা করলেও কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁর ইংরেজী পত্রাবলীর ঐশ্বর্য ও মহত্ত্ব আরো ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের পত্রসাহিত্য তাঁর কবিসত্তার পরিচয়কেই প্রাধান্য দিলেও মানুষ রবীন্দ্রনাথের বিপুল মানসবিস্তারের তা শিল্পসমৃদ্ধ সাক্ষী।

তবু বাংলা ও ভারতের নবজাগরণে বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাদানের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, বাংলাসাহিত্যে তা নিঃসংশয়ে অনন্য উদাহরণ।

বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি

শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শন করে মহাবিস্ময়ে অর্জুন বলেছিলেন—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

"আমি দেখছি তোমার আদি-মধ্য-অন্তহীন রূপ, অনন্তবীর্য তুমি, অনন্ত তোমার বাহু, চন্দ্রসূর্য তোমার দুই নেত্র, মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতিঃ, আপন তেজে তুমি নিখিল জগৎ সন্তপ্ত করে তুলেছ। হে বিষ্ণু, নভস্পর্শী অনেকবর্ণ তেজোময় তোমার ব্যায়ত মুখমণ্ডল আর দীপ্ত বিশাল নেত্র দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত, দূরে গেছে আমার ধৈর্য ও শান্তি। মরণের আহ্বানে যেমন করে পতঙ্গেরা মহাবেগে ছুটে চলে প্রদীপ্ত অগ্নির অভিমুখে, তেমনি এই সকল প্রাণী মৃত্যুর জন্যই তোমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করতে চলেছে।" (গীতা ১১।১৯, ২৪, ২৯)

জগৎ-কারণের এই মহাকালমূর্তির ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য অর্জুনের মনকে অভিভূত করে প্রশ্ন তুলেছিল—"আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো"—উগ্রমূর্তি কে আপনি আমায় বলুন। উত্তর এল—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ—আমি লোকক্ষয়কারী কাল! তুমি যদি যুদ্ধ নাও কর, তবু বিপক্ষদলে যে বীরেরা আছেন তাঁরা কেউ বেঁচে থাকবেন না।" "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।"—অতএব, তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও, যশোলাভ কর এবং শত্রুবর্গকে পরাজিত করে নিষ্কণ্টক হয়ে রাজ্যভোগ কর।

বৃন্দাবন ও কুরুক্ষেত্র—এ দু'য়ের পটভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবন পূর্ণাঙ্গ। মনে হয়, চিরায়ত-সাহিত্যেরও এই লক্ষণ; জীবন ও মৃত্যু, প্রেম ও বৈরাগ্য, কুসুম ও বজ্র সেখানে পাশাপাশি দেখা দেয়। তা না হলে জীবনের পরিপূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না। অবশ্য—"রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা

এলোকেশী।” কিন্তু রুদ্রের তো বামমুখও আছে। মঙ্গল ও অমঙ্গল—এ দু'য়ের মধ্য দিয়েই ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। তাই দুঃখ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, দুঃখের মুখোমুখি হয়েই তার অন্তরালে দুঃখমূর্তি ভগবানকে চিনে নিতে হবে।[১] তাই জীবনের বেদনা, ব্যর্থতা, সংগ্রামের উপরে মানবাত্মার জয়-ঘোষণাই স্বামীজীর কবিতার ব্যঞ্জনা। “তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ”—“জাগো বীর”—এই তাঁর কবিতার মূল সুর, এর ছন্দ “প্রাণ” এবং দেবতা “মহাকালী।”

বাংলার ঐতিহ্যে অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের মতো ব্যাপ্ত সমগ্রানুভূতি দেখা দিয়েছিল তন্ত্রের ধ্যানে। বাংলাসাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বৃন্দাবনলীলার বাইরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই সমগ্র শ্রীকৃষ্ণজীবনকে আমাদের মানসলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সুপ্রাচীনকাল থেকে তন্ত্র-সাধনার দিব্যালোকে বাঙালী পরমাশক্তির ধ্যান করে এসেছে।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ-বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকাং॥

দুর্গা, চণ্ডী ও কালিকামূর্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি ও সংহাররূপা জগজ্জননীর পালনীশক্তির উদ্দেশে বাঙালী-হৃদয় যুগ যুগ ধরে প্রণাম জানিয়েছে। একদিকে বৈষ্ণব সাধনা, অন্যদিকে শাক্ত সাধনার যুগ্ম ধারায় বাঙালী-হৃদয় অভিসিঞ্চিত।

১...God manifasts through evil as well as through good... the true attitude of mind and will, that are not baffled by the personal self, was in fact that determination, in the stern words of the Swami Vivekananda, to seek death, not life, to hurl oneself upon the sword's point, to become one with the Terrible for evermore. (The Master as I saw Him : Complete Works of Sister Nivedita. Vol 1. p 117)

অধ্যাত্ম-সাধনার অন্তরালে যাঁরা মানবকল্পনার ইতিহাস লক্ষ্য করে থাকেন, তাঁরাও বাঙালীর এই কালিকাপূজার ধ্যানস্তোত্রে একটি নূতন সত্যের ইঙ্গিত পাবেন। মাধুর্যমণ্ডনের দিকে বাঙালী মনের সহজাত প্রবণতা রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখদহনের তপস্যায় জীবনের পূর্ণতর সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টাও তার জাতীয় ঐতিহ্য। দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠের মূলকারণটিও এইখানে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যেও আমরা জীবনানুভূতির সকল বিকাশে পরম সত্যের প্রকাশকেই অনুভব করতে চেয়েছি। আমাদের কালিকামূর্তি একদিকে খড়্গ-মুণ্ডধরা বিভীষণা, আর একদিকে বরাভয়করা অপরূপা।

ভগবানের এই মাতৃরূপ-বন্দনার পিছনে আমাদের অতীত ইতিহাসের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অথবা পারিবারিক জীবনে মায়েদের প্রাধান্য নিশ্চয় কাজ করেছে। তাই আমাদের কবি দেখতে পেয়েছেন—'ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি!' এই মাতৃসাধনার অগ্রদূত কবি রামপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবকে সূচিত করে গিয়েছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি যেমন 'চৈতন্য'-ভাবনার পরিমণ্ডল রচনা করে গিয়েছিলেন, রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতির গানে তেমনি 'রামকৃষ্ণ'-ভাবনার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সংগীতের ব্যাকুলতা সাধনার মন্ত্রবলে মূর্ত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। তারপর একে একে সকল মতের পরিক্রমাশেষে অদ্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে দ্বৈতজ্ঞানের রাখীবন্ধন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব! ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের একটি মাত্র দিক—নিরাকার-সাধনার দিক—শিক্ষিত-সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অদ্বৈতজ্ঞানের আলোকে সাকার থেকে নিরাকারে, আবার নিরাকার থেকে সাকারে—'ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'-র পরিপূর্ণতা এনে দিলেন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজারী। ভগবানের অনন্ত বৈচিত্র্যকে যাঁরা বুদ্ধির নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাঁরাও অনন্তলীলাময়ের মাতৃ-সত্তাকে প্রণাম জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসবার পর থেকে।

এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতিপ্রিয় সংগীতগুলি স্মরণীয়: যেমন—'আমায় দে মা পাগল করে', 'চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে', 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি', 'অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী'। সাকার নিরাকার বোঝাতে গিয়ে অপূর্ব সুন্দর উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়ে দিলেন—"আমি শুনেছি কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মত হ'ল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মত হ'ল!"

(আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী)

সাহিত্যের অনুরাগীমাত্রেই জানেন গভীর অনুভূতি বাক্যমনের অগোচর—'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্।' আমরা তার আভাস পাবার চেষ্টা করি মাত্র। সুতরাং অনুভূতির কোন মৌল সত্যই সাহিত্যানুরাগীর কাছে উপেক্ষণীয় হ'তে পারে না; অধ্যাত্ম অনুভূতি তেমনি একটি সাহিত্যিক উপাদান—শ্রেষ্ঠ এবং দুষ্প্রাপ্য উপাদান। কেবল যে প্রাচীন কালের সাহিত্যেই এই উপাদান পাওয়া যায় তা নয়, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায়ও এর কম বেশি অনুরণন কান পাতলেই শোনা যায়। অধ্যাত্মচেতনাময় কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথই অগ্রগণ্য। তাঁর পরেও রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ, কালিদাস রায়, করুণানিধান, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নজরুল ইস্‌লাম, দিলীপকুমার রায়, নিশিকান্ত এবং অমিয় চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কল্পনালব্ধ সত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুভূতির পার্থক্য থাকবেই।

এই অধ্যাত্ম অনুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরে কতখানি প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে ধরা দিয়েছিল, তার সাক্ষ্য রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাঁচটি খণ্ডে।[১] তা ছাড়া আরো বহুজনের স্মৃতিতে তাঁর বাণী

---

১ বর্তমান লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থটি এ বিষয়ে সাহিত্যের দিক থেকে আলোচনার প্রচেষ্টা।

চিরমুদ্রিত। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিতে পাই—"একবার এই প্রসঙ্গ হইয়াছিল, 'মানুষ অনন্ত ঈশ্বরকে জানিতে পারে কি না।' তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাতাস যেমন গায়ে ঠেকে, ঈশ্বরও তেমনি আমার গায়ে ঠেকেন'।" এই অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়ে তিনি সমাধিমগ্ন হতেন, সমাধি থেকে অভ্যুত্থানের সময় নানা উপমা ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে অসীমরাজ্যের সংবাদ পৌঁছে দিতে চাইতেন সসীমরাজ্যের কানে।

নরেন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ জীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবদুপলব্ধির নিশ্চিত অভিজ্ঞান তুলে ধরতে পেরেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথের অন্তরের দ্বার চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু পদে পদে সংশয়, সঙ্কট ও জিজ্ঞাসার ক্ষুরধার পথে নরেন্দ্রনাথকে বিচরণ করতে হয়েছে। অবশেষে একদিন যখন তিনি মহাজীবনের মোহানায় এসে ভূমা-সমুদ্রে মিশে যেতে চাইলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন—"কোথায় কালে বটগাছের মত শত শত লোককে শান্তির ছায়া দিবি, তা না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্; এত ছোট আদর্শ তোর!" কিন্তু তবু অনুভূতির স্পর্শ চাই —তা না হলে কল্যাণকর্মের পরিপূর্ণ প্রেরণা জাগে না। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের ব্যাকুল অনুরোধে শেষ অবধি সম্মতি দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ —"আচ্ছা যা, নির্বিকল্প সমাধি হবে।"

"একদিন সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আপেক্ষিক জড়পুঞ্জ যেন মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল; দেশ কাল-নিমিত্তের পরপারে অবস্থিত নিজবোধস্বরূপ আত্মা স্ব-মহিমায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।...বহুক্ষণ পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি অনুভব করিলেন, তাঁহার মন ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণ-রূপে কামশূন্য হইলেও একটা অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্যজগতে নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। অনুভব করিলেন, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কর্ম করিব,

অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ সত্য প্রচার করিব' এই মহতী কামনার সূত্র ধরিয়া তাঁহার মন নির্বিকল্প অবস্থা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল।"[১]

ব্রহ্মকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে তিনি সর্বজীবে দর্শন করলেন। উচ্চারিত হ'ল নবযুগের নূতন মন্ত্র—"দরিদ্রনারায়ণ"।

অপরোক্ষানুভূতির গভীরতম গুহা থেকে মন্দ্রিত হ'ল 'প্রলয়' বা 'গভীর সমাধি'র সুর :

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥
সে ধারাও বদ্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত না থেকে সে ধারা নেমে এল বিশ্বজনের সেবামন্ত্র নিয়ে—

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

(সখার প্রতি)

বেদান্তের এই কর্মপরিণত রূপদানই মানবাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। সমাধিলোক থেকে নেমে এসে যাঁরা মানবকল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করবেন তাঁরা সংখ্যার দিক থেকে মুষ্টিমেয়। সাধারণ মানুষ সেই উচ্চতম অধ্যাত্মসত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যই নিষ্কাম সেবাব্রত গ্রহণ করতে পারে। এই সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে পার্থিব সত্যের সঙ্গে অপার্থিব সত্যের যোগসূত্র স্থাপন করা চলে। সুতরাং নবযুগের বেদান্ত-সাধনা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার গুহা

১ বিবেকানন্দ চরিত : দ্বাদশ মুদ্রণ : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : 'সাধক বিবেকানন্দ' অধ্যায় : পৃঃ ৫৭

ছেড়ে সর্বমানবের কল্যাণব্রত গ্রহণ করলো। এই সাধনার ইতিহাসই স্বামীজীর জীবনের পটভূমি।

*

স্বামীজীর কবিতা আলোচনার আগে তাঁর মননধারার উৎস সম্বন্ধে আলোচনায় এতক্ষণ নিবিষ্ট ছিলাম। এবারে তাঁর সমকালীন বাংলাকাব্যধারার প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন। মধুসূদনের আবির্ভাব যে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কত বড় যুগান্তর সেকথা সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনীষী-মাত্রেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'মেঘনাদবধ-কাব্য'কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেকালের সেরা মনীষিবৃন্দ। রাজনারায়ণ বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মহারথীদের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু একদিকে এই অভিনন্দনের সমারোহ থাকলেও গতানুগতিকতা-পরায়ণ পণ্ডিত-সমাজে এ কাব্যের নিন্দারও অবধি ছিল না। "ছুছুন্দরী-বধ" —রচনা করে জগদ্বন্ধু ভদ্র যে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিলেন সেটি আসলে বাঙালী জাতির আত্মব্যঙ্গ। সবচেয়ে আশ্চর্য এই, কিশোর রবীন্দ্রনাথও 'মেঘনাদবধকাব্যে'র চেয়ে 'বৃত্রসংহারকাব্য'কে বড় স্থান দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যে মত বদলেছিলেন তাতে এই প্রমাণিত হয় যে, মেঘনাদকাব্যের রস উপলব্ধি করতে হলে পরিণত মনের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালি-গালাজ।" (জীবনস্মৃতি)

পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মেঘনাদবধকাব্যের অভিনবত্ব ধরা পড়েছিল এইভাবে—"মেঘনাদবধকাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই।...তিনি (মধুসূদন) স্বতঃস্ফূর্ত প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন।...এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা

অস্ত্রের কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে।...যে অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্র-তীরের শ্মশানে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্য-লক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

এখন মেঘনাদবধকাব্য সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত স্মরণ করা যাক। মধুসূদন-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—"ঐ একটা অদ্ভুত genius (মনস্বী ব্যক্তি) তোদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে ত নাই-ই; সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।"..."তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই, তোরা তাকে তাড়া করিস। আগে ভাল করে দেখ্, লোকটা কি বলছে, তা না—যাই কিছু আগেকার মত না হ'ল. অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগল। এই মেঘনাদবধকাব্য—যা তোদের বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি—তাকে অপদস্থ করতে কি না ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হ'ল! তা যত পারিস লেখ্ না, তাতে কি? কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, সে সব criticদের (সমালোচকদিগের) মত ও লেখা কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল নূতন ছন্দে ওজস্বিনী ভাষায়, যে কাব্য লিখে গেছেন—তা সাধারণে কি বুঝবে?"[১]

'মেঘনাদবধকাব্যে'র কোন্ অংশটি স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাও এক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য—"যেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, মন্দোদরী শোকে মুহ্যমান হয়ে রাবণকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে মহাবীরের ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প—প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-

১ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : উত্তরকাণ্ড : শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ২১১

পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য বহির্গমনোন্মুখ—সেই স্থান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ কল্পনা। 'যা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভুলবো না, এতে দুনিয়া থাক, আর যাক'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যের ওই অংশ লিখেছিলেন।"

মেঘনাদবধকাব্যের সপ্তম সর্গের ওই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-যোগ্য—

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষকুলপতি ;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল ! বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য ; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেনকালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ, "বাম এবে, রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি ! তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার ! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব !
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণী মন্দোদরী ?

বাঙালীর জাতীয় আদর্শে এমন একটি বলিষ্ঠ প্রতিজ্ঞার সেদিন

প্রয়োজন ছিল। আত্মবিশ্বাস—বিবেকানন্দ-জীবনের ভিত্তিভূমি। সমগ্র জাতির জীবনে তিনি এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন।

বেদান্তের আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর মনে যে বলিষ্ঠ আশাবাদ সঞ্চার করেছিল, তার সঙ্গে এসে মিশেছিল দেশপ্রেমের দীপ্তি। বস্তুত যা কিছু চলন্ত ও জীবন্ত তার মধ্য দিয়েই তিনি ব্রহ্মের প্রকাশ দেখতে পেতেন। 'পত্রাবলী'তে তাই তিনি লিখেছেন "—যদি জন্মেছ ত' একটা দাগ রেখে যাও।" "Avalanche[১]-এর মত দুনিয়ার উপর পড়—দুনিয়া ফেটে যাক চড়চড় করে···।" তাই মেঘনাদবধকাব্য স্বামীজীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার পরিচয় আছে তাঁর কবিতার ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে।

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে বিবেকানন্দের তরুণ বয়সে মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিদের কাব্যে বীর-রসের প্রেরণাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখনকার নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ কবিদের কাছে উৎসাহ ও প্রেরণার দাবি করত। বঙ্কিম-চন্দ্রের শেষ উপন্যাসত্রয়ী (আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম) এবং নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যত্রয়ী (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) জাতীয় আদর্শের পুনরুজ্জীবনেরই সাহিত্যিক প্রকাশ। জোড়া-সাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে হিন্দুমেলার জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতী', 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটক লিখে চলেছেন। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে—বাংলা-সাহিত্যের পরিমণ্ডলে সর্বত্র তখন পরাধীনজাতির নব-উৎসাহ-সঞ্জাত বীরত্ববোধই স্থায়ী ভাব! বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে এই স্থায়ী ভাবের সঙ্গে এসে মিলেছে তাঁর দৃপ্ত-পৌরুষে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনাবোধ এবং জাতিগত দিক থেকে অপরিমেয় দৈন্যদুর্দশার উপলব্ধি তাঁর অনু-ভূতিকে স্পন্দিত করেছে। আবার আত্মস্বরূপে অচল প্রতিষ্ঠার ফলে সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মার জয়ঘোষণা তাঁকে দেশকালের ঊর্ধ্বে সর্ব-

১ হিমবাহ

মানবের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করে তুলেছে। জীবনরহস্যের আলোছায়া-সম্পাতে বিবেকানন্দের মানসতরঙ্গ তাই এত সুন্দর, এত মহনীয়।

তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা বলতে জীবনের লাভ ক্ষতির সূক্ষ্ম অংশ-ভাগের কথা বলছি না ; সেই বেদনার কথাই বলছি যে বেদনায় সকল যুগের সব মহামানবই আলোড়িত হয়েছেন, যে বেদনার বশে স্বামীজী বলেছিলেন—"যতদিন এ দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততদিন আমার মুক্তি চাই না।" সেদিন অলক্ষ্যে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় হাসি বিবেকানন্দের হৃদয়-আকাশকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের আগে রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করে ভবিষ্যৎ ভারতকে এই দুই সভ্যতার মিলনকেন্দ্ররূপে গঠন করবার কল্পনা বোধ করি স্বামীজীরই প্রথম। এই বিশ্বপরিক্রমার ফলে বিবেকানন্দের কবিতাও সর্ব দেশের সর্ব মানবের বাণী বহন করে এনেছে ; সমগ্র মানবজাতি তাঁর কবিতার উদ্দিষ্ট পাঠক।

ভাব, ভাষা ও ছন্দ—এ তিনটিই ভালো কবিতার ক্ষেত্রে "অপৃথগ্-যত্ন-সম্পাদ্য" অর্থাৎ আলাদা আলাদাভাবে চেষ্টা করে এদের যুক্ত করতে হয় না। কবিমানস থেকে সৃষ্টির ঘূর্ণাচক্রে এরা এক সঙ্গেই আকার লাভ করে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার মধ্যেও ব্যক্তির নিজস্ব মানসভঙ্গী কাজ করে বৈ কি! তাছাড়া পূর্বপুরুষাগত ঐতিহ্যও অনেকখানি প্রেরণা যোগায়।

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা কবিতার ভাষা ও ছন্দে তাঁর গভীর আবেগের সঙ্গে সঙ্গে অটল সংযমের পরিচয় রয়েছে। বিলম্বিত পয়ার ছন্দে তিনি "সখার প্রতি" ও "নাচুক তাহাতে শ্যামা" কবিতা দুটি লিখেছেন। এ দুটি কবিতার ভাষায় তিনি সংস্কৃত শব্দের সুচারু প্রয়োগ করেছেন। ঐ শব্দসম্ভারের দ্বারা বক্তব্যের গভীর গাম্ভীর্যই ধ্বনিত হয়েছে।

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীত সুধার ধায়।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার॥
(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন,—
মৃত্যু মাঙ্গে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন।
(সখার প্রতি)

উপরের এই দুটি উদাহরণেই তাঁর ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য বুঝা যাবে। সংস্কৃত শব্দের সুগম্ভীর ব্যঞ্জনা ও সংস্কৃত ভাষাসুলভ সংযমেই তাঁর বক্তব্য আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। আর এই ছন্দের মধ্যে যে তরঙ্গিত গতি দেখতে পাই,—তা' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। চরণের শেষে নির্দিষ্ট যতি থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য চলমানতা রয়েছে এই ছন্দে। পয়ারের চরণান্তিক যতি অক্ষুণ্ণ রেখে এমন গতিবেগ সঞ্চারের উদাহরণ সেকালে খুব বেশি ছিল না। ভাষার ক্ষেত্রেও স্বামীজী মধুসূদনের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। যে পৌরুষদৃপ্ত জীবনাদর্শ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল মধুসূদনের কাব্যভাষায় সেই আদর্শের প্রথম প্রকাশ—সে প্রকাশের ফলে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত হয়েছিল। মধুসূদনের মহাকাব্যের কল্লোলধ্বনি স্বামীজীর কবিতায় আরও সুগম্ভীর মহিমায় সঞ্চারিত হয়েছে। মিলের প্রতি স্বামীজী যে বেশী মনোযোগী হন নি—তার কারণও ওই অমিত্রাক্ষর।

গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে নিয়ে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে যে নূতন রূপ দিয়েছিলেন, সেই গৈরিশ ছন্দ 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে প্রযুক্ত। এ কবিতায় যে গীতি-কাব্যের স্পর্শ পাই—ছন্দ ও ভাষা তারই অনুযায়ী। 'সখার প্রতি' ও 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'-র মন্দ্রধ্বনি চিরায়ত সাহিত্যেরই উপযুক্ত। 'সৃষ্টি' এবং 'প্রলয়' মূলতঃ গান—কিন্তু এ দুটি গানের কাব্যসৌন্দর্যের তুলনা একমাত্র উপনিষদেই মেলে। স্বামীজীর ইংরেজী কবিতা "Peace" (শান্তি) ঐ গান দুটিরই সমগোত্র।

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্বামীজীর ব্যক্তি-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষ্যে রচিত "চৌঠা জুলাইয়ের প্রতি" (To the Fourth of July) কবিতায় তার প্রকাশ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশসাধন তাঁর আন্তরিক আগ্রহের বস্তু ছিল। 'পত্রাবলী'তে তাই তিনি লিখেছেন—"স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি।"[১]

'To the Awakened India' (প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি), 'The Song of the Free' (জীবন্মুক্তের গীতি) প্রভৃতি কবিতায় ভারতবর্ষের ও নিখিল মানবাত্মার চিরস্বাধীন সত্তার জয়গান ধ্বনিত। কিন্তু মুক্তিপথের যাত্রীর হাতে স্বামীজী তুলে দিয়েছেন জীবনমথিত বেদনাবিষের "পেয়ালা" (The Cup)। এ কবিতার ঘননিবদ্ধ আঙ্গিক কাব্যোৎকর্ষের দিক থেকেও লক্ষণীয়। "My play Is Done" (খেলা মোর হলো শেষ) কবিতায় সৃষ্টির উৎসমূলে প্রত্যাবর্তনরত জীবনতরঙ্গের বিলীয়মান ধ্বনিটুকু ফুটে উঠেছে। সমগ্র ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্যে তুলনারহিত তাঁর "Kali the Mother" (জননী কালিকা—"মৃত্যুরূপা মাতা") কবিতায়—নবযুগের ঋষিকবির ধ্যাননেত্রে জগজ্জননীর যে চিত্রচেতনাময় রূপ ফুটে উঠেছে তার অপার বিস্ময়রস সাধক ও সাহিত্যিকমাত্রের কাছেই অমূল্য সম্পদ বলে মনে হবে। এর আগে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছি, বিবেকানন্দের কবিতার দেবতা —"মহাকালী"।

"হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।"

(সখার প্রতি)

Kali the Mother কবিতায় বিবেকানন্দের জীবনোপলব্ধির কেন্দ্রচেতনা রূপ পেয়েছে এ কয়টি চরণে—

১ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : আলসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা ২রা নভেম্বর, ১৮৯৩ সালের চিঠি : পৃঃ ৩৮৪

Who dares misery love,
and hug the form of death.
Dance in Destruction's dance
To him the Mother comes.

সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।
(মৃত্যুরূপা মাতা—অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এই সুখদুঃখে সম-অধিষ্ঠাত্রী, জীবনমৃত্যুর লীলাবিভঙ্গে শাশ্বত-রূপিণী, মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমিতে সংস্থিতা।[১] তাই বিবেকানন্দের কাব্যসৃষ্টি, বাংলা কবিতার জগতে এক অভিনব সত্য ও সৌন্দর্যের আদর্শ তুলে ধরেছে,—এ আদর্শ সাহিত্যরসিক পাঠকমাত্রেরই সশ্রদ্ধ অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে।

*

যদি কেউ বলেন, বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের কবিতা সম্বন্ধে সর্বাগ্রে আলোচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাহলে একটু আশ্চর্য হলেও একেবারে অসত্য কিছু বলা হবে না। এ বিষয়ে প্রথম অবহিত হয়েছিলাম 'সাহিত্যপত্রে' পুনর্মুদ্রিত শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'কবিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা' প্রবন্ধটি পাঠ করে। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র ৭ম বর্ষ, ১৩১৪ সাল, জ্যৈষ্ঠসংখ্যায়[২] এই অসাধারণ প্রবন্ধটি বাংলাসাহিত্যে কবিতাচর্চার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'-গ্রন্থে কবি বিষ্ণু দে এই প্রবন্ধ পাঠের প্রতিক্রিয়াতে রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখ' প্রবন্ধটির আবির্ভাব বলে ইঙ্গিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের

১ 'উদ্বোধন': বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, ১৩৭০ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের 'স্বামীজীর ধ্যাননেত্রে মহাকালী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ পৃঃ ৭১—৮০

ভাবজগতে দুঃখচেতনার সাধর্ম্য ও বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনায় এ প্রবন্ধ নিশ্চয়ই অন্যতম দিক-নির্দেশক।[১]

'বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি'-আলোচনাকালে এই প্রবন্ধটি অবশ্যস্মরণীয়। একটু দীর্ঘ হলেও প্রবন্ধকারের ভাষাতেই এ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি। প্রবন্ধের সূচনাতেই লেখকের মন্তব্য—'যথার্থ কাব্যরসসম্ভোগ···কেবলমাত্র উদার নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।'

কবিতার আঙ্গিক নয়, ভাবসত্যই এ প্রবন্ধে লেখকের মূল বক্তব্য। "কবিতার প্রাণস্বরূপ যে অন্তরতম ভাব—যাহা সর্বদেশের সর্বকালের যথার্থ কবিদিগের রচনায় মানবভাষার দারিদ্র্যবন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার শুভ্রজ্যোতিতে আপনি বিভাসিত হইয়া উঠে, যাহা বিশ্বের পুরাতন সত্যগুলিকে প্রত্যহ নবীন নবীন মূর্তিতে মানবনয়নের সম্মুখে ধারণ করিয়া প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়—সেই অন্তরতম ভাব"—সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক তুলনামূলকভাবে যে দু'জনের কবিতার কথা বলেছেন, তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ।

লেখক শ্রী চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে অবহিত যে, "কবিতার দেহের বিশ্লেষণ হইতে পারে। তাহার প্রাণরূপী অন্তরতম ভাবের বিশ্লেষণ হইতে পারে না। সমধর্মী বা বিপরীতধর্মী অপর মহাভাবের সহিত তাহার তুলনা চলিতে পারে মাত্র।" সেই মহাভাব এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের। স্বভাবতই রবীন্দ্রমানসের ঠিক বিপরীত না হলেও স্বতন্ত্র বিবেকানন্দ-মানসের কথা তাঁর মনে পড়েছে।

১৩১০ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতচন্দ্র সেনের লেখা থেকে কবিতার একটি মানদণ্ড শ্রী চট্টোপাধ্যায় আহরণ করেছেন—"যে কবিতা অনির্বচনীয়তায় সঙ্গীতের

১ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ : বিষ্ণু দে : 'বীরবল থেকে পরশুরাম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : প্রথম আবৃত্তি সংস্করণ : পৃঃ ৫৯

যত সদৃশ, এবং যে কবিতায় পাঠক মানবজীবনের প্রসার যত অধিক অনুভব করেন, তাহা তত শ্রেষ্ঠ।"

" 'জীবনের-প্রসার' শব্দে চৈতন্যের বহুব্যাপিত্ব এবং সেই হেতু কর্মক্ষেত্রের বিস্তার সূচিত হইয়াছে, মনে করি। এইজন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহাসত্যগুলিকে যিনি যত অধিক দিক হইতে উপলব্ধি করিয়া মানবনয়নের সম্মুখে ধরিয়াছেন তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এই সূত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে বোধ হয় আমরা দেখিতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথ সুখের দিক হইতে, সৌন্দর্যসম্ভোগজনিত সুখের অনুভূতি দ্বারা বিশ্বের সনাতন সত্যের পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতি মোহিনীও বটেন, ভীষণাও বটেন। রবীন্দ্রনাথ এই মোহিনী প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন, ভীষণাকে বড় একটা দেখেন নাই।"

"বসুন্ধরা" কবিতার নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত সংস্করণে বর্জিত—

"হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ডবলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল
বজ্রের মতন রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে অসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে, অপরূপ সে মহিমা
হিংসাতীব্র সে আনন্দ সে দৃপ্ত গরিমা—
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ।"

এই অংশটি বর্জনের কারণ কি, "সাধারণ মানবের হৃদয়ে জীবত্ব-হেতু যে স্বাভাবিক শোণিতপিপাসা বর্তমান দেখা যায়, কবিহৃদয়ে তাহারই অলক্ষ্য প্রতিবিম্ব দেখিয়া" সম্পাদকের কুণ্ঠা? শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য—"যতদিন পৃথিবীর এই নিদারুণ positive pain" বা সদ্বস্ত বেদনার সম্মুখীন হইবার বীর্যের উপলব্ধি না হয়, ততদিন মানবহৃদয়ে এই হিংসাতীব্র আনন্দের পিপাসার অস্তিত্ব

ভালই মনে করি। হিংসার সহিত এই ভীষণ যন্ত্রণার বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেইজন্য এই হিংসাই অনেকস্থলে সত্যবেদনার সহিত পরিচয় করাইয়া মানুষকে বীর্যবান করে। মাত্র শোণিত দর্শনভয়ে যে মানব হিংসার আনন্দ দান করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার,
দেখে তোর হিয়া কাঁপে,
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার!
মর্মকথা বলি কাকে।"

কেহ কেহ বলিবেন, "কেন, রবীন্দ্রনাথ কি তাঁহার তুলিকায় বেদনার ছবি অঙ্কিত করেন নাই?" উত্তরে আমি বলিব, "হাঁ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলেই সদ্বস্তু বেদনা নহে,—সুখাতিশয্যের বেদনামাত্র।"...

"প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই 'সদ্বস্তু বেদনা' আমি কাহাকে বলিতেছি।...এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আক্রান্ত মৃগের নয়নে যে মর্মান্তিক নীরব বেদনা ফুটিয়া উঠে,—ঘোর দুর্ভিক্ষে অনশন-পীড়িত কঙ্কালাবশিষ্ট আসন্নমরণ শিশু কোটরপ্রবিষ্ট বুভুক্ষিত কাতরনয়নে তাহার ইহলোকের ভগবান্ শীর্ণকায়া উদাসনয়না হতভাগিনী জননীর মর্মান্তিক নৈরাশ্যব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া আছে—হতভাগ্য শিশু অপর কোন ভগবান্ অপর কোন নির্ভরের দেবতা দেখিতে শিখে নাই,—তখন পরস্পরের দিকে চাহিয়া উভয়ের চক্ষে যে জমাট-বাঁধা নিঃসহায় রিক্ত বেদনার ছায়া দেখা দেয়—যেখানে বেদনাই বেদনার সহচর...ইহা সেই বেদনা।

জীবনক্ষয়কারী তপস্যার পরে ভগবান্ বুদ্ধদেবের চক্ষের সম্মুখে বিশ্বের অনন্ত যন্ত্রণা বুঝি জমাটবদ্ধ হইয়া রিক্তমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাই এই দুঃখের ঋষির মুখ হইতে প্রথম মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল—'কষ্ট আছে, কষ্ট আছে'। দারুণ শোকের ভিতর শেলির হৃদয়ে...অনন্ত বেদনার ছায়াপাত...

"It is a woe 'too deep for tears'; when all
Is reft atonce, when some surpassing spirit
Whose light adorned the world around it, leaves
Those who remain behind, not sobs and groans
The passionate tumult of a clinging hope;
But pale despair, and cold tranquility,
Nature's vast frame, the web of human things,
Birth and the grave. they are not as they were."

এই যন্ত্রণা "too deep for tears'-ই বটে। কেন কাঁদিবে? কাহার কাছে কাঁদিবে? নির্ভরের দেবতা, অভিমানের দেবতা কেহ থাকিলে তবে ত তাহার কাছে কাঁদিবে।

বিশ্বের পুঞ্জীভূত রিক্ত যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর,—অনন্ত হাহাকারের উপর প্রতিষ্ঠিত শবরচিত সিংহাসনে উপবিষ্টা করালিনীর নিরাভরণা-নিরাবরণা নগ্নমূর্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার বিরাটহৃদয়নিঃসৃত যে বীর্যের গান আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, তাহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। সন্ন্যাসী প্রথমে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃ-প্রকৃতি সুন্দর ও ভীষণ দুইরূপেরই অতি বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতেছেন—

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্ত বিহঙ্গম, সঙ্গীতসুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুঃখের পার॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্ন তপনজ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো॥
সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর, দুঃখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায় কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির-উদগার, ভীম তরবার, খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী, তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী, বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুঃখ চাও সুখ হবে বলে, ভক্তিপূজাছলে, স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা॥···
ভাঙ্গ বীণা, প্রেম সুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজল পান, প্রাণপণ, যাক কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার এ ভব-ঈশ্বর! মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

এই কবিতার ছত্রে ছত্রে তীব্র বেদনার অনুভূতির সহিত যে ভাস্বরবীর্যের শুভ্রদীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আজ কয়জন ভারতবাসীর আছে?···

ক্ষুদ্র মানবের এই দশা দেখিয়া বীর সন্ন্যাসী ভৈরবস্বরে আহ্বান করিতেছেন—"কে মুক্তিকাম নির্ভীক বীর আছে—মোহময় সুখস্বপ্ন ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হও, জাগ্রত হও। দেখ, শ্মশান বিলাসিনী যন্ত্রণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার অর্চনা লইবার জন্য তোমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তুমি কি এই দেবীর অর্চনা করিতে ভীত হইবে? যুদ্ধই ইঁহার অর্চনা। তোমার সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ, সমস্ত চিত্তদৈন্য, সর্বক্ষুদ্র কামনা, ঐ শোণিত রঞ্জিত চরণে জলাঞ্জলি দিয়া নিষ্কলঙ্ক ললাটে রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া জীবনান্তকর মহাযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া দেবীর সম্মুখে উদ্ধতশিরে দণ্ডায়মান হও। নতশিরে স্তবের দ্বারা করালিনীর তুষ্টিসাধনে চেষ্টা করিও না। আহবেই এই দেবীর পরম পরিতোষ!···

এই যুদ্ধের ফল কি, তাহাও সন্ন্যাসী বলিয়াছেন। হায়··· সদা পরাজয়ই এই যুদ্ধের ফল। বিশ্বের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণার সম্মুখে

মহাবীরেরও শক্তি ব্যর্থ হয়। অনন্ত যুদ্ধেও এই অনন্ত বেদনার পরিমাণ অটুট থাকে। ইহাই pessimist বা দুঃখবাদীদিগের শেষ কথা। কিন্তু সাধারণে pessimist কথাটি যেভাবে ব্যবহার করেন সেই অর্থে এই মহাবীর্য সন্ন্যাসীকে pessimist নামে অভিহিত করিলে কথাটির অপব্যবহার করা হয়। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—'সে কি, যদি সদা পরাজয়ই যুদ্ধের ফল হয়, তবে যুদ্ধ কিরূপে চলিতে পারে? সদা পরাজিতের আবার যুদ্ধ কিরূপ?' তখন অপর একটি প্রশ্নের দ্বারা এই শ্রেণীর দুঃখবাদীরা ইহার উত্তর দেন। তাহা এই 'যদি মরিবেই, তবে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টাই যেমন জীবিতের পক্ষে স্বাভাবিক, সেইরূপ জীবনব্যাপী মহাসমরই মহাকালীর ভৈরব আহ্বানে প্রবুদ্ধচৈতন্য বীরের পক্ষে স্বাভাবিক। ফল কি হইবে, দেখিবার অবসর বা ইচ্ছা নাই।'···

বহুদিন ধরিয়া আমরা বহু কবির ললিত বেণুরবে মুখরিত, মলয় মারুত নিষেবিত আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে সুখশয্যায় শয়ান করিয়া সুখের মিথ্যাস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই নিদ্রা কালনিদ্রায় পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছিল। আজ বুঝি আমাদের মোহতন্দ্রা ছুটিতেছে তাই এই মহাবীর্য সন্ন্যাসীর তূর্যনিনাদ সাগরগর্জনবৎ আমাদের কর্ণে আসিয়া পশিতেছে।"

বিবেকানন্দের এই জীবনদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালীমূর্তির যে ব্যাখ্যা 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতির উক্তিতে পাওয়া যায়, সেকথা লেখকের মনে জেগেছে। জয়সিংহের মৃত্যুতে রঘুপতির এত দিনের সযত্ন লালিত দেবী-সংস্কার যখন নষ্ট হয়ে গেল, অমনি কালীপ্রতিমা তাঁর কাছে 'জড় পাষাণের স্তূপে', পরিণত। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য—"ইহাতে আমাদিগকে বিবেকানন্দ স্বামীর সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

'মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্নদিক্‌বাস, বলে মা দানবজয়ী॥'

যতদিন রঘুপতির আশার স্বপ্ন অটুট ছিল, ততদিন সাধারণ মানবের

ন্যায় রঘুপতিও মুণ্ডমালিনীকে ভক্তবৎসলা এবং কেবলমাত্র শত্রুরূপি-দানবদলনী বলিয়াই পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাই তাঁহার উগ্র স্নেহের একমাত্র পাত্র জয়সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রিক্ত কঠোর জীবনে যাহা কিছু আশার, সুখের বা শোভার আস্পদ ছিল, সমস্তই মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হইল—তখনি এই ব্রাহ্মণ আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জানিস্ কি করেছিস ? কার রক্ত করেছিস প্যান ?"···

"রঘুপতি বলিতেছেন, 'সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস।' ইহা ত সরলভক্তি নহে,—'সরল' কোথায় ? এবং ভক্তিই বা কোথায় ? সরল নহে, স্বার্থবক্র—ভক্তি নহে, ভয়। তাই দেবীও ভক্তির দেবী নহেন।···

সন্ন্যাসী দেখিয়াছেন, এই দেবী "দানবের ক্রূর পরিহাস" মাত্র নহেন। ইনি সত্যরূপিণী—তাই বলিয়াছেন, "সত্য তুমি মৃত্যুরূপা

ইনি যদি উপহাসমাত্র হইবেন, তাহা হইলে ইঁহার ভীম অসির আঘাতে যে সুখবনমালীর সুখের মুরলী মুহূর্তে মুহূর্তে ধূলিচুম্বন করে তিনি কি ?···

রবীন্দ্রনাথের শেষ উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া আসিয়া উপাসকের হৃদয়ে ভক্তিরূপে ফুটিয়া উঠে।

বিবেকানন্দের উপলব্ধি—যাঁহার আনন্দধারা বিশ্বের অনন্ত শোণিতরাঙা সত্যবেদনার ভিতর দিয়া আসিয়া যুধ্যমান বীরের আপনাতে আপনি পূর্ণ বিরাট হৃদয়ে যন্ত্রণাপীড়িত জীবের প্রতি প্রেমরূপে ফুটিয়া উঠে।"

প্রবন্ধপ্রান্তে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যে 'শেষ উপলব্ধি'র কথা বলেছেন, তা বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে সত্য হলেও, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারা এরপর বহু বিচিত্রপন্থায় আবর্তিত হয়ে উপনিষদের অদ্বৈতচেতনার সাগর-সঙ্গমে উপনীত। সেদিক থেকে এ আলোচনার স্বাভাবিক অপূর্ণতা স্বীকার করেও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের

পার্থক্যটি এ প্রবন্ধে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষিত। কবিরূপে এঁদের কোনো তুলনা লেখক করেন নি। মূল ভাবসত্যই তাঁর বিচার্য এবং এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পক্ষাপাত যে বিবেকানন্দ-জীবনবেদের অভিমুখী তাও সুস্পষ্ট।

বিবেকানন্দের স্বল্পসংখ্যক বাংলা কবিতার মধ্যে উদ্বোধন (১৩০৬-৭), দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটিই শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচনার মূল বিষয় করেছেন। তবে স্বামীজীর 'Kali The Mother', 'Who knows How The Mother Plays,' 'সখার প্রতি,' বা 'The Cup' জাতীয় কবিতার কথা উল্লেখিত থাকলে তাঁর কবিসত্তার পরিচয়টি আরো বিকশিত হত।[১] হয়তো, এ সব কবিতা ('সখার প্রতি' ছাড়া) তখনো ব্যাপক প্রচারলাভ করে নি বলেই এই অনুল্লেখ। প্রবন্ধের প্রান্তে এসে লেখকের মন্তব্য—"কেহ মনে না করেন, আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবেকানন্দ স্বামীর কবি হিসাবে কোন তুলনা করিয়াছি। "কবি" শব্দটি সাধারণ যে অর্থে ব্যবহার হয়, সেই অর্থে স্বামী বিবেকানন্দকে কবি বলা যায় কিনা সন্দেহ করি। প্রবন্ধের ভিতর একস্থানে ভগবান বুদ্ধের নামোল্লেখ করিয়াছি। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সহিত বিবেকানন্দের তুলনা করিয়াছি বলিলে ইহাও বলিতে হয়, বুদ্ধদেবের সহিতও রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিয়াছি—কারণ, যে প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের নামোল্লেখ করিয়াছি—ঠিক সেই প্রসঙ্গেই বলিতে বলিতে বিবেকানন্দ স্বামীর কথা আসিয়া পড়িয়াছে।"

১ স্বামীজীর এই ভাবধারা সাম্প্রতিককালের এক বিদেশী লেখকের গবেষণা গ্রন্থকে অনুপ্রাণিত করেছে। বইটির নাম "The Sword and the Flute" : Kali and Krishna Dark visions of the Terrible and The Sublime in Hindu Mythology (অসি ও বাঁশী : কালী ও কৃষ্ণ, হিন্দু পুরাণে ভীষণ ও মধুরের অন্ধকার রূপ) : লেখক David R. Kinsley (ডেভিড আর কিন্‌স্‌লি) : Chapter IV দ্র. : বিকাশ পাব্লিশিং হাউস : প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫

এ বিষয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সতর্কতা সত্ত্বেও মনে হয় বিবেকানন্দের ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতাবলীর সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ তাঁর ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় কিনা সে প্রশ্ন না তুলেও সংখ্যা ও গুণবিচারে বিবেকানন্দ-রচনাবলীতে তাঁর কবিতা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। বিশেষত বিবেকানন্দ-মানসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়লাভে তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতাই অপরিহার্য। তাই প্রধানত ইংরেজীতেই তাঁর অধিকাংশ কবিতা লিখিত হলেও সেগুলির অনুবাদ এবং তাঁর বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা অবলম্বনে বিবেকানন্দসাহিত্যের সৃজনধর্মী কবিসত্তার পরিচয়লাভের প্রচেষ্টা বর্তমানে গ্রন্থে প্রত্যাশিত। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান আলোচনাটির সারাংশ বিবেকানন্দমানসের পটভূমি-উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক বিবেচনায় এ অধ্যায়ে সংযোজিত। সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলে তাঁর কবিতা ও কবিসত্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা যে কোনো সাহিত্য-পাঠকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—এই আমাদের নিশ্চিত ধারণা।[১]

১ এ ধারণার অন্যতম সার্থক উদাহরণ—'বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র-সংখ্যা, ১৩৭১-এ প্রকাশিত সুনীলচন্দ্র সরকারের 'বিবেকানন্দ: কবিতা ও জীবন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর দুটি মন্তব্য আমরা বিশেষভাবে মনে রাখতে পারি। একদা তাঁর অনুগামী শিষ্যকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, "Do you not see, that I am first and foremost a poet?" (তুমি কি বুঝতে পারছো না যে সব কিছুর উপরে আমি কবি?)—'এ লাইফ অফ বিবেকানন্দ: রমাঁ রলাঁ: পৃঃ ২৭১ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

উপনিষদের বাণী স্মরণে স্বামীজী আর এক জায়গায় লিখেছেন—"I never read of any more beautiful conception of God than the following: He is the Great Poet, the Ancient Poet, the whole Universe is His poem, coming in verses and rhymes and rhythms, written in infinite bliss." (ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলির মতো সুন্দর কথা আর কোথাও পাই নি—"তিনি মহাকবি, আদিকবি, সমগ্র জগৎ তাঁর পরম আনন্দ-সঞ্জাত ছন্দে মিলে শ্লোকরাশিতে প্রকাশিত একটি কবিতা।" (বাণী ও রচনা: ২য় খণ্ড: 'সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন': পৃঃ ১৭২)

মাইকেল মধুসূদন ও স্বামী বিবেকানন্দ

আঠারো শো একষট্টিতে মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হলো। আঠারো শো তেষট্টিতে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। বাল্য বা কৈশোরে তিনি হয়তো এই দত্তকুলোদ্ভব মহামতিকে দেখে থাকবেন। নরেন্দ্রনাথ নিজেও আর এক দত্তবংশের মহারথী। দুজনের সম্বন্ধেই সেই একান্ত পুরাতন প্রবচনটি আশ্চর্যভাবে সার্থক—'দত্ত কারো ভৃত্য নয়।' স্বভাবের ক্ষেত্রে সম্রাট, জীবনের ক্ষেত্রে অপরাজেয় সৈনিক, দুজনের একজন বিজাতীয় রীতিনীতিতে দীক্ষিত মাইকেল হলেও আসলে শ্রীমধুসূদন, আর একজন ভারতীয় ধ্যান ধারণা ও জীবনাদর্শের মূর্ত বিগ্রহ সন্ন্যাসী হলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার আন্তরিক গুণগ্রাহী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলিত সার্থকতার দুই বিচিত্র উদাহরণ মাইকেল মধুসূদন ও স্বামী বিবেকানন্দ।

মধুসূদনের পূর্ববর্তী বাংলা কাব্যধারায় যে জীবনবেগ স্তিমিত হয়ে এসেছিল, অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে মানবতাবোধের জোয়ার এসে সেই জীবনীশক্তির অমিত সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিল। মধুসূদনের মহাকাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীমানস সেই নবজীবনের শঙ্খধ্বনি শুনতে পেয়েছিল বলেই মেঘনাদবধকাব্য আমাদের কাব্যজগতে চিরস্থায়ী আসনের অধিকারী। প্রাচীন মহাকাব্য যেমন সমগ্র জাতির অন্তর থেকে উদ্ভূত, মধুসূদনের এই আধুনিক মহাকাব্যটি তেমনি নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার পরিণত ফল এবং সে জাতীয়তার সঙ্গে চিরন্তন মানবতার কোনো বিরোধ নেই। এদিক থেকে বিচার করলে মেঘনাদবধকাব্যই বাংলাসাহিত্যে একমাত্র মহাকাব্য।

মেঘনাদবধকাব্যকে অবলম্বন করে যে সমালোচনাসাহিত্য গড়ে উঠেছে তার মধ্যে একটি নেতিবাচক মনোভাব, লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে শঙ্কিত হতে হয়। এ যুগের সমালোচকগোষ্ঠী মধুসূদনের এই

কাব্যটিকে করুণরসের উদাহরণরূপে প্রতিপন্ন করতেই সমধিক উৎসাহী। আশঙ্কা সেখানে নয়। এই করুণরসের কারণস্বরূপ কেউ কেউ যখন সমকালীন পরাধীনতা, বাঙালী মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অথবা মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা প্রভৃতি সমাজনীতি ও অর্থনীতির যুক্তি উপস্থিত করেন, তখন সবিনয়ে বলতে হয় এসব ঘটনার সঙ্গে মেঘনাদ বা রাবণের ভাগ্যকে যুক্ত না করাই ভালো। রাবণ ও মেঘনাদের ভাগ্য 'বাল্মীকি রামায়ণে'ই নির্ধারিত হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে মধুসূদনের নূতন কিছু করণীয় ছিল না। বরং প্রশ্ন করা যেতে পারে মেঘনাদবধকাব্যকে কেবলমাত্র করুণরসের কাব্য বলা কতদূর সঙ্গত?

একথা সত্য যে পুত্রশোকাতুর রাবণের নিঃশব্দ অশ্রুপাতে এ কাব্যের সূচনা, চিতাশয্যায় শায়িত মেঘনাদের উদ্দেশে রাবণের বিলাপে এ কাব্যের অবসান। কিন্তু এই শোক কি ভগ্ন ভাগ্যের কাছে পরাজিত আত্মার আত্মসমর্পণ? বরং নিয়তির অভিঘাতে, দেবতা ও মানবের মিলিত চক্রান্তে, সংসার-সমাজ-প্রিয়জনের মর্ম-যন্ত্রণায়—সর্বত্র রাবণের অটল অচল সমুন্নত বীরত্বই কি বড়ো হয়ে ওঠে নি? মধুসূদনের কবিমানস রাবণের দম্ভকে বড়ো করে দেখে নি, রাবণের আত্মবিশ্বাসকেই বড়ো করে দেখেছিল। তাই সে প্রাণের গভীরে দুরন্ত শোকের জ্বালা অনুভব করেও অবিচলিত কর্তব্যপরায়ণতায় জীবনযুদ্ধে অগ্রসর। কেবল শত্রুহননের দুর্জয়-সঙ্কল্পে নয়, মৃতপুত্রের শোকযাত্রায় পর্যন্ত রাবণের ধীরগম্ভীর সংযত ব্যক্তিত্ব স্মরণীয়। বিশদবস্ত্র বিশদ উত্তরী-শোভিত রাবণের কল্পনায় মধুসূদন উপমা আহরণ করেছেন—'ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে'। কৃতকর্মের বিষপানে মধুসূদনের রাবণ তো সত্যই নীলকণ্ঠ ধূর্জটি।

মেঘনাদবধকাব্য পাঠকালে স্বভাবতই এ প্রশ্ন বারংবার মনে উঁকি দেয়, বীরত্বের সংজ্ঞা কি? যুদ্ধবরণ বীরত্বের বহিরঙ্গ লক্ষণ, দুঃখবহন তার অন্তরঙ্গ মহিমা। অন্তর বাহিরের এই সংগ্রামস্বীকৃতি-তেই বীরত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। বিবেকানন্দের 'নাচুক তাহাতে

রাবণের পতনকে ট্রাজেডির মর্যাদা দিই, এবং ট্রাজেডির নায়ক বলেই রাবণের মহিমাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু সব ব্যর্থতার উর্ধ্বে রাবণের ওই দৃপ্ত পৌরুষ মানবসত্তার মহত্তর সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে। মানবতার প্রতি এই বিশ্বাস, এই প্রীতিই যথার্থ মানবপ্রেম। উনবিংশ শতাব্দীর এ দুই ভিন্নধর্মী মানবপ্রেমিকের এইখানে সুরসঙ্গতি।

মেঘনাদবধকাব্যে কোন অংশটি শ্রেষ্ঠ—এই প্রশ্ন করে বিবেকানন্দ নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং মেঘনাদবধকাব্যের সেই অংশটি দৃপ্ত কণ্ঠে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।[১]

রাবণের পক্ষে মন্দোদরীর নীরব নিষেধের চেয়ে বড়ো বাধা আর কিছু কল্পনা করা যায় না। এই অন্তহীন শোক রাবণচিত্তে যেভাবে সঙ্কল্পের জ্বলন্ত অগ্নিতে পরিণত হয়েছে এবং তারপর সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের যে শরবৎ লক্ষ্য-তন্ময়তা দেখা দিয়েছে, সে কল্পনায় এ কাব্যের তীব্রতম গতিবেগ পরিস্ফুট। উনবিংশ শতাব্দীর সমালোচক-বৃন্দ এই কারণেই মেঘনাদবধকাব্যের সপ্তম সর্গের প্রশংসা করেছেন সবচেয়ে বেশী। সে প্রশংসার মূল্য আজকের দিনেও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।[২]

মেঘনাদবধকাব্যের করুণ রস বীররসের স্পর্শে দীপ্ত গভীর; এ কাব্যে বজ্র কুসুমের বিপরীত মিলন অনায়াসে সাধিত। নবম সর্গে রাবণের বিলাপে যে সুসংহত ঋজু প্রকাশ দেখি, সে ঋজুতার কারণ এই যে, ওই বিলাপ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত হতাশার ক্রন্দন নয়; ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপার দুঃখরাশিবরণের নির্ভীকতাও

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ২১১

২ উদাহরণস্বরূপ রমেশচন্দ্র দত্তের 'Literature of Bengal' থেকে "—the seventh book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps the sublimest in the entire range of Bengali Literature". পৃঃ ১৮৩

ওই বিলাপের অন্তরালে ধ্বনিত। বিমুখ ভাগ্যের উদ্দেশ্যে রাবণের প্রশ্ন আছে, নতিস্বীকার নেই।

নীতিশাস্ত্রের পাপপুণ্যের হিসাব শেষ করেও মহাকালের প্রাঙ্গণে মানুষের আরো কোনো পরিচয় থাকে। সৃষ্টি—রাবণ এবং স্রষ্টা—মধুসূদন—দুজনেই তার সাক্ষী।

২

মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থ সর্গটি যেন নির্জন দ্বীপের মতো চার পাশের রণকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বপ্নস্বর্গ। এ সর্গে প্রবেশের আগে সশ্রদ্ধ বন্দনায় আমরা অবনতশির। দূর থেকে ভেসে-আসা পুষ্পধূপদীপের মৃদু সুগন্ধে যেন পূজার আয়োজন; জীবন-চেতনার অন্য এক উপলব্ধির জগৎ।

এ কাব্যের রাবণ যদি প্রতীচ্যসভ্যতার দুর্দম প্রাণশক্তির উদাহরণ হয়ে থাকে, সীতা তবে প্রাচ্য তথা ভারতীয় সভ্যতার অন্তরতম স্বরূপ। যে মধুসূদন অনায়াসে লিখেছেন, "I despise Ram and his rable; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow"[১]—সেই মধুসূদনই সীতাচরিত্র বর্ণনায় অন্তরের সমস্ত ভক্তি সরমার প্রণামের মধ্য দিয়ে উজাড় করে দিয়েছেন।

সীতার ললাটে সরমার এঁকে দেওয়া সিন্দূরবিন্দুটি—

…'শোভিত ললাটে
গোধূলি-ললাটে আহা তারা-রত্ন যথা।'

এই একটি উপমায় সীতার সমগ্র জীবনের বিষাদ-নীহারাচ্ছন্ন জ্যোতিষ্ক মূর্তিটি উদ্ভাসিত। গোধূলি আকাশের বিদায়ব্যথাতুর রক্তিম আকাশ যেন সীতার সারাজীবনের বেদনার পটভূমি।

১ 'রামচন্দ্র আর তাঁর দলবলকে আমি ঘৃণা করি; কিন্তু রাবণ আমার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করে। রাবণ এক অপূর্ব ব্যক্তিত্ব।'

সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে সীতার চরণতলে প্রণামরত সরমা—

স্থবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিক !

বাঙালী কবির মনে সান্ধ্যপূজার শান্ত আত্মনিবেদনের স্মৃতি ঐ দীপশিখাটিতে বিধৃত।

আজীবন দুঃখতপস্যায় মধুসূদনের সীতা নিখিলবিশ্বের সহমর্মিতা লাভ করে 'ভবতলে মূর্তিমতী দয়া' হয়ে উঠেছেন। মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদেও এ সীতার মনে হয়—

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলরূপী
আমি।"

রক্ষকুলশোকে সে অশোক-বনে
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা দুঃখী পরদুঃখে।

রাবণের বিপুল ঐশ্বর্য, বিরাট ব্যক্তিত্বের কল্পনায় মধুসূদন মুগ্ধ, চকিত, উচ্ছ্বসিত, কিন্তু সীতার নিরলঙ্কার তপস্যাপূত সৌন্দর্যের উদ্দেশে মধুসূদনের প্রণাম-নিবেদনে ধ্যানের স্তব্ধতা, ভক্তির আত্ম-সমর্পণ। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'রামায়ণ' কবিতাটিতে মধুসূদন আর একবার তাঁর প্রণামমন্ত্রটি উচ্চারণ করেছেন—

কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে !

মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্থসর্গে এই দুঃখের দেবতাকে মধুসূদন আর একটি অপূর্ব উপমায় পূজা করেছেন—

রহিলা দেবী সে বিজন বনে
একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি।

পবিত্র সৌন্দর্যের এই সকরুণ নিঃসঙ্গ প্রকাশেই সীতাচরিত্রের অনন্যতা।

এ মহাকাব্যের নর, বানর, রাক্ষস—সকলেই মানুষ, একমাত্র সীতাই দেবী। কিন্তু মানবহৃদয়ের বেদনার শতদলে এ দেবতার পাদপীঠ। এই অনন্তকরুণাবিগ্রহ যে মহাকবির ধ্যানে উদ্ভাসিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে চিরন্তন ভারতবর্ষ অতন্দ্র প্রতীক্ষায় জেগেছিল। দেবতার আবির্ভাবকে সেই নির্নিমেষ প্রতীক্ষমাণ অন্তর নিষ্ফল হ'তে দেয় নি—পরিপূর্ণ পূজার অর্ঘ্য দিয়ে মহাকাব্যের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় পাশ্চাত্যজাতির কাছে ভারতের নারী-জাতির আদর্শের কথা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দের মানসপটে সর্বাগ্রে স্মরণীয়া হয়ে উঠেছেন সীতা।

"সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে সীতা সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শ-স্বরূপ।" "পরমশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা সর্বংসহা সীতার মত হওয়াই ভারতীয় নারীর সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা।" "প্রতীচ্য বলে, কাজ কর, কর্মের দ্বারা তোমরা শক্তি প্রতিপন্ন কর! ভারতবর্ষ বলে, 'সব দুঃখবেদনা সহ্য কর—এই সহনশীলতার মধ্য দিয়ে তোমার শক্তি দেখাও। মানুষ কত বেশী বিষয়ের অধিকারী হতে পারে পাশ্চাত্য সে সমস্যা পূরণ করেছে; আর মানুষ কত অল্প নিয়ে থাকতে পারে ভারতবর্ষ এই সমস্যা পূরণ করেছে। এ দুটি আদর্শই এক এক ভাবের চরমসীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধি, যেন মূর্তিমতী ভারতবর্ষ।...সীতা নামটি ভারতে যা কিছু শুভ, যা কিছু শুদ্ধ, যা কিছু পুণ্য তারই পরিচায়ক।

"কে জানে এই দুই আদর্শের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ—পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা অনুযায়ী ওই আপাত প্রতীয়মান শক্তি ও তেজ অথবা প্রাচ্যদেশীয় তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, ধৃতি?"[১]

---

১ ৩১শে জানুয়ারি, ১৯০০ সনে ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা শহরের শেক্সপীয়র ক্লাবে প্রদত্ত "রামায়ণ" বক্তৃতা।

"সীতাচরিত্র যদি কাল্পনিকও হয়, তবু যে জাতি ঐ চরিত্র সৃষ্টি করেছে, নারীজাতির প্রতি সে জাতির যতটা শ্রদ্ধা, জগতে তার তুলনা নেই।"[১]

নবযুগের ভারতবর্ষকে স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন, "ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।"[২] এই পুণ্যনামমালার আদ্য নামটি সীতা।

৩

মেঘনাদবধকাব্যে যে বিদ্রোহী প্রাণের অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে, তার অমিত শক্তির প্রচণ্ড লীলায় আমরা কিছুক্ষণের মতো চিরন্তন ভারতবর্ষকে ভুলে থাকি। সাময়িকভাবে আমরা যে ভাবধারায়ই প্রভাবিত হই না কেন, আমাদের অন্তরের অন্তরালে ভারতবর্ষের ধ্যান ও স্বপ্ন নিঃশব্দ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত চেতনার দুটি রূপ মধুসূদনের মহাকাব্যে রাবণ ও সীতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। রাবণচরিত্রের উত্তুঙ্গ বিস্ময় সীতার বিনম্র-শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি—একথাটি মধুসূদনের কাব্যপাঠ-কালে স্মরণীয়।

শক্তির অপরিমেয় প্রতাপসত্ত্বেও যা ত্যাগের দ্বারা পবিত্র, ক্ষমার দ্বারা মহনীয়, কল্যাণের দ্বারা আলোকিত—তাকেই মানবপ্রাণ যুগে যুগে বন্দনা করে এসেছে। 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ'—এ কেবল সাহিত্যতত্ত্বের কথা নয়, মানবজাতির অভিজ্ঞতার ফল। মধুসূদনের কাব্যে রাবণের পাশে রামচন্দ্রকে নিষ্প্রভ মনে হ'তে পারে, কিন্তু সীতার মধ্য দিয়ে রামায়ণের মূল রসটি অব্যাহত থেকেছে। রামচন্দ্রকেও কি মধুসূদন আদর্শচ্যুত করেছেন?

১ প্রবুদ্ধভারত, ১৮৯৮ ডিসেম্বর-সংখ্যায় স্বামীজীর "ভারতীয় নারী" সম্বন্ধে আলোচনা।

২ বর্তমান ভারত: শেষ অনুচ্ছেদ।

বিশেষতঃ নবম সর্গে রামচন্দ্রের বীরোচিত উদারতায় অভিভূত রাবণমন্ত্রী সারণ রামচন্দ্রের যে স্তুতি করে গেলেন, তা নিশ্চয় চাঁদ-সদাগরের মনসাবন্দনা নয়। তবু দেবপ্রতিম রামচন্দ্র মধুসূদনের লক্ষ্য নন, মানবমূর্তি রাবণই মেঘনাদবধ কাব্যের কেন্দ্রবিন্দু। তাই সব অপূর্ণতা সত্ত্বেও মানুষ রাবণই মধুসূদনের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত সঞ্জীবিত করে।

মহাদম্ভের পরাভবের মধ্যেও প্রচণ্ড জীবনীশক্তির উপাদান নিহিত। স্বামী বিবেকানন্দ সেই শক্তিকেই নবযুগের মনুষ্যত্ব-সাধনায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন; তাই রাবণচরিত্রে তাঁর মুগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। পাশ্চাত্য-পরিক্রমান্তে ভারতবর্ষের সঙ্গে ওদেশের তুলনায় তাঁর মনে হয়েছিল—…'এ দেশের মত এত বেশী তামসপ্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে ইটপাটকেলের মত জড়ত্ব—এদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে?…তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ। তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না—সর্বাঙ্গে Paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে। আমি তাই এদের ভিতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। আমি নেড়েচেড়ে এদের ভিতর সাড় আনতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম।"[১]

দেয়ালে চুরি করে না, গোরুতে মিথ্যা কথা কয় না, এজন্য দেয়াল বা গোরুকে মানুষের চেয়ে বড় স্থান দেওয়া হয় না। অন্যায় করার স্বাধীনতা সত্ত্বেও ন্যায়ের পথে অবিচলিত থাকার মধ্যেই মনুষ্যত্ব। মানুষেই ভুল করে এবং মানুষই সব ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে পরমসত্যে

১ বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ১৬৪

প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথা স্বামীজী তাঁর বাণী ও রচনায় বারংবার উচ্চারণ করেছেন। রজোগুণের মধ্য দিয়ে সত্ত্বগুণে উপনীত হবার সাধনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা তাঁর জীবনব্রত ছিল। মধুসূদনের মহাকাব্যে আমরা এই রজোগুণদীপ্ত পৌরুষের দুর্বার গতিবেগ প্রথম অনুভব করেছিলাম। কিন্তু সে গতিবেগের সামনে কোনো ধ্রুব লক্ষ্য নেই, প্রশান্ত পরিণামে সে গতি পূর্ণতা লাভ করে না। এই গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব এসে রূপায়িত হ'ল বিবেকানন্দের জীবনে। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, যোগে জীবনের এক পরিপূর্ণ ছন্দ নিয়ে উদ্ভাসিত হ'ল আর এক মহাজীবন—যে জীবন প্রাচীন মহাকাব্যের নায়কোচিত উপাদানে গড়া। পাশ্চাত্যসভ্যতার আত্মবিধ্বংসী আগ্নেয়গিরির সামনে দাঁড়িয়ে এই যুগনায়ক ভারতবর্ষের ধ্যানের সত্যকে তুলে ধরলেন—লক্ষ্যের দ্বারা গতির সার্থকতা সাধিত হ'ল; ভারতীয় সভ্যতার মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট জড়তাকে জাগিয়ে তুললেন প্রতীচ্যের কর্মপ্রেরণায়—গতির স্পর্শে আদর্শ প্রাণময় হয়ে উঠল।

মাইকেল মধুসূদন থেকে স্বামী বিবেকানন্দে এসে বাংলার নবজাগরণের একটি অধ্যায় সুসম্পূর্ণ।

বিবেকানন্দের কবিতা

পৃথিবীর সব মহৎপ্রাণ ক্ষণজন্মাদের সঙ্গেই কবিতার নিবিড় আত্মীয়তা। একটি মহৎ হৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে নিখিলমানব আপন পূর্ণতা উপলব্ধি করে। সেই পূর্ণতা কবিতায়, গানে, সাহিত্যে, শিল্পে নূতন স্পন্দন, নূতন ধ্বনি জাগিয়ে তোলে। এক মহাজীবনের ছন্দে সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের ভাবনালোক আবর্তিত হতে থাকে। পরবর্তীকালের ইতিহাস সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে এমন এক একটি আবর্তনকে স্মরণ করে ধন্য হয়।

প্রাচ্যভূখণ্ডে বুদ্ধ ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে খ্রীষ্ট—এঁদের জীবন ও সাধনা-অবলম্বনে যে ভাবলোক গড়ে উঠেছে, এশিয়া-ইয়োরোপের সংস্কৃতি আজও তার প্রসাদধন্য। মানবহৃদয়ের এই বিপুল ভাব-স্পন্দনের স্পর্শে কবিচিত্তের উন্মীলন ঘটে সবচেয়ে আগে। কারণ, অনুভূতির অতলে যাঁরা বাণীসন্ধানী, তাঁদের হৃদয়-পথে এই মহামানবদের সহজ আনাগোনা। এঁদের অন্তরের প্রজ্বলিত অগ্নি আমাদের আলো দেয়, এদের বিপুল করুণা আমাদের উদ্বেলিত করে। এঁদের বাণীতে নিহিত থাকে সেই প্রেরণা, যার আশীর্বাদে কবিতার জন্ম।

এঁদের কেউ কেউ সত্যি কবিতা লিখেছেন।—আচার্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, রামকৃষ্ণ—এঁরা তিনজনেই আক্ষরিক অর্থে কবি না হ'লেও এঁদের বাণী কবিতার সৌন্দর্যবিভায় সমুজ্জ্বল; সব মহৎসৃষ্টির মূল প্রেরণা এঁদের বাণীতে বীজাকারে নিহিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "আকাশের মত উদার ও সমুদ্রের মত গভীর হওয়াই আদর্শ।" সে আদর্শ মহৎ জীবন ও মহৎ কাব্য—দুয়েরই। প্রাচীন ভারত বেদ ও উপনিষদে এ দুয়ের সার্থক সমন্বয় অনুভব করেছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত অথবা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের

ঋষির "অমৃতস্য পুত্রাঃ"র প্রতি আহ্বান—ভারতবর্ষের ব্রহ্মৈক্যানুভূতির প্রাচীনতম নিদর্শন। উপনিষদের এই আত্মোপলব্ধির মন্ত্রমালায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার অসংখ্য উদাহরণ মেলে। আর এই উপনিষদকে অবলম্বন ক'রেই ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত—এই ত্রিধারার দার্শনিক ও সাধকবৃন্দ উপনিষদের আলোকে পথের সন্ধান করেছেন। বহুযুগের এই অনুসন্ধানে পথ ও মতের যত বিতর্কই থাক, সবার উপরে ব্রহ্মোপলব্ধির পরমসত্য ভারতবর্ষকে চিরকাল ধারণ করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সেই সত্যের সাম্প্রতিক প্রকাশ।

শঙ্করের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধের হৃদয়—এ দুয়ের সমন্বয় ছিল বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের সঙ্গে এসে মিলেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-কণ্ঠে উচ্চারিত যুগচিত্তের বাণী, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' সমাধি-তন্ময়তার জন্য ব্যাকুল বিবেকানন্দচিত্তে এই বাণী জগৎ ও ব্রহ্মের অমৃতসেতু রচনা করে পরবর্তীযুগে অমর শ্লোকে রূপান্তরিত—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥

(সখার প্রতি)

'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু'—এক পরম সত্যের বিচিত্র বিকাশের উপলব্ধি বিবেকানন্দের কবিতার অন্যতম মূল প্রেরণা। এই উপলব্ধির সূচনা হয়েছিল কিশোর নরেন্দ্রনাথের কল্পনালোকে, উপলক্ষ্য ছিল—প্রকৃতি। চৌদ্দবছর বয়সে একবার মা-ভাই-বোনদের নিয়ে রায়পুরে বাবার কাছে যাচ্ছিলেন নরেন্দ্রনাথ—পথের বেশীর ভাগ অরণ্যময়, যাতায়াতের উপায় গোরুর গাড়ি। পরবর্তীকালে বন্ধুদের কাছে এই ভ্রমণের স্মৃতিকথা বলতেন স্বামীজী—"বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ঐ সময়ে যা দেখেছি ও অনুভব করেছি, চিরকালের জন্য তা স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে গেছে। বিশেষতঃ একদিনের কথা। বিন্ধ্যাচলের তলা দিয়ে সেদিন চলেছি। পথের দুপাশে পাহাড়ের চূড়াগুলি আকাশ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে আছে, নানা জাতের গাছ লতা

ফল ফুলে পাহাড়ের গায়ে অপূর্ব শোভা হয়ে রয়েছে ; মধুর কাকলিতে চারিদিক পরিপূর্ণ করে নানা রঙের পাখিরা এক কুঞ্জ থেকে আর এক কুঞ্জে উড়ে বেড়াচ্ছে, কখনো বা মাটিতে নেমে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই সব দেখতে দেখতে মনে এক অপূর্ব শান্তি অনুভব করেছিলাম। ধীরমন্থর গতিতে চলতে চলতে আমাদের গোরুর গাড়িগুলি এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালো যেখানে ছুটি পাহাড়ের চূড়ো যেন ভালোবাসায় এগিয়ে এসে বনের পথটিকে একসঙ্গে ছুঁয়ে আছে। সেই চূড়াছুটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখি এক পাশের পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে তলা অবধি এক বিরাট ফাটলের ফাঁক পূর্ণ করে যুগযুগান্তরের পরিশ্রমের চিহ্নস্বরূপ এক প্রকাণ্ড মৌচাক। অবাকবিস্ময়ে সেই মৌমাছিরাজ্যের আদি অন্তের কথা ভাবতে ভাবতে মন ত্রিজগৎ-নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির উপলব্ধিতে এমনভাবে তলিয়ে গেল যে, সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হয়ে গেলুম। কতক্ষণ অমনভাবে পড়েছিলুম মনে নেই। একলা একটি গাড়িতে ছিলুম, তাই আমার এ অবস্থা আর কেউ টের পায় নি।"[১]

প্রকৃতি-সৌন্দর্যের ধ্যানে বিবেকানন্দের এই তন্ময়তার প্রসঙ্গে স্মরণীয় তাঁর একান্ত প্রিয় অনন্য প্রকৃতিপ্রেমিক কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কথা। এই ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রসঙ্গেই কলেজের ক্লাসে তিনি হেস্টিসাহেবের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-তন্ময়তার কথা শোনেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে নির্বিকল্প সমাধির আস্বাদলাভের আগে রায়পুরের পথে ওই ভাব-তন্ময়তাই তাঁর জীবনে প্রথম অনন্তানুভব।

কলেজ-জীবনে নরেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে সত্যানুসন্ধান যত তীব্রতর হয়েছে, ততই নানা দার্শনিকের ভাবনালোকে তিনি পথ খুঁজে ফিরেছেন। সমসাময়িক যুগের বহুপঠিত পাশ্চাত্যদার্শনিকদের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সার, হেগেল, হিউম, কান্ট, শোপেনহাওয়ারের রচনাবলী তিনি যে কত গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পড়েছিলেন তার পরিচয় মেলে তাঁর অসংখ্য বক্তৃতামালায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ [দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ]—অবলম্বনে।

মননধারায় সবচেয়ে জনপ্রিয় জন স্টুয়ার্ট মিল ও কোম্‌ত্‌—এঁদের রচনাবলী অন্যান্য চিন্তানায়কদের মতো নরেন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছিল। একদিকে এই পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সংশয়িত জীবনজিজ্ঞাসা, অন্যদিকে ভক্তিবাদী ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপ্রচেষ্টা—এ দুয়ের সমন্বয়ে নরেন্দ্রনাথ সমকালীন তরুণমানসের অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক এই সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থার একটি সুন্দর সাক্ষ্য রয়েছে সতীর্থ বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথের স্মৃতি-কথায়। উত্তরকালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল "প্রবুদ্ধ ভারত" (১৯০৭) পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তার কিছু কিছু অংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"Undeniably a gifted youth, sociable, free and unconventional in manners, a sweet singer, the soul of social circles. a brilliant conversationalist, somewhat bitter and caustic, piercing with the shafts of a keen wit the shows and mummeries of the world, sitting in the scorner's chair but hiding the tenderest of hearts under the garb of cynicism : altogether an inspired Bohemain but possessing what Bohemains lack, an iron will ; somewhat peremptory and absolute, speaking with accents of authority and withal possessing a strange power of the eye which could hold his listeners in thrall."[১]

১ 'নিঃসন্দেহে এক প্রতিভাদীপ্ত যুবক, মুক্তস্বভাব, বেপরোয়া, মিশুক, সামাজিক সম্মেলনে প্রাণস্বরূপ মধুকণ্ঠ গায়ক, বাকনৈপুণ্যে সমুজ্জল, যদিচ অম্ল ও তিক্ত সেই সব বাক্য যা দুনিয়ার সব ভণ্ডামি ও জুয়াচুরিকে তীব্রতম শরবিদ্ধ করে, অবজ্ঞাকারীর আসনে উপবিষ্ট মনে হলেও আসলে তা হৃদয়ের কোমলতম বৃত্তিকে সংশয় ও অবিশ্বাসে আবৃত করে রাখার ছলমাত্র ; সব মিলিয়ে এক প্রেরণাযুক্ত 'বোহেমিয়ান' (উদ্‌ভ্রান্ত যথেচ্ছাবিচরণকারী), কিন্তু বোহেমিয়ানদের

আঠারো বছর বয়সের উদ্দাম নরেন্দ্রনাথের আচার-আচরণে যে বাধাবন্ধহীন পৌরুষের প্রকাশ ছিল, তার ফলে তাঁকে সাধারণ দিক থেকে "বোহেমিয়ান" মনে হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়! বিশেষত যখন তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দজীও প্রথম পরিচয়ে তাঁকে বন্ধুবিশেষের উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গী বলে মনে করেছিলেন। অনেক দিন পরে বিবেকানন্দের এই বন্ধনমুক্ত ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করে এক পাশ্চাত্য রমণী বলেছিলেন—"Vivekananda is nothing if not a breaker of bondage"[১]

কিন্তু, ব্রজেন্দ্রনাথের লেখনীতে তরুণ নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব-রূপায়ণের সাহিত্যিক সার্থকতা অবিস্মরণীয়। তাঁর সাক্ষ্যেই আমরা জানতে পেরেছি, অবিরত বুদ্ধিচর্চার ফলে সুলভ ভক্তির আবেগ কমে এলেও সঙ্গীত নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে সবচেয়ে গভীর আবেগ জাগিয়ে তুলতো—"...music...starred him as nothing else could, and gave him a weird unearthly sense of unseen realities which brought tears to his eyes."[২]

পরমসত্যের অনুসন্ধানপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁকে শেলীর কবিতার দিকে আকৃষ্ট করেন। শেলীর Hymn to Intellectual Beauty কবিতার নৈর্ব্যক্তিক প্রেম ও his vision of a glorified millenial humanity 'মহিমোজ্জ্বল মানবতার দিব্যদর্শন' তাঁকে শুষ্ক দার্শনিক-বিচারের থেকে অনেক বেশী প্রভাবিত করেছিল। এমন কি, ব্রজেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য অনুযায়ী, শেলীর কবিতালোকে প্রবেশের পর

যা নেই, সেই লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, কিছুটা স্বেচ্ছাতন্ত্রী ও স্থিরনিশ্চয়, নিশ্চিত্ কর্তৃত্বের সুর তাঁর উচ্চারণে আর অদ্ভুতশক্তি-ভরা দুই চোখ যা শ্রোতাদের সম্মোহিত করে রাখে।

১ বিবেকানন্দ বন্ধনমোচনকারী ছাড়া আর কিছুই নন। 'Notes of Some Wanderings': নিবেদিতা।

২ সঙ্গীত, যার মতো আর কিছুই তাঁকে আলোড়িত করত না, যা তাঁকে অপার্থিব চেতনায় দৃষ্টির অতীত সত্যের অনুভূতিতে অশ্রু-আর্দ্র করে তুলতো।

তাঁর কাছে "জগৎ আর প্রেমহীন প্রাণহীন যন্ত্রমাত্র রইল না—এক অধ্যাত্ম-ঐক্যের সূত্রে বিধৃত হলো !"

বিবেকানন্দের ভাবলোকে শেলীর এই সুগভীর প্রভাববিস্তারের সামান্য কিছুদিন আগে বাংলাসাহিত্যে বিহারীলালের "সারদামঙ্গল" দেখা দিয়েছে। "সারদামঙ্গল" বিবেকানন্দের তরুণ বয়সে বিশেষ পরিচিত।[১] শেলী, বিহারীলাল ও বিবেকানন্দ—তিনজনেই রোমান্টিক থেকে মিস্টিক চেতনায় উত্তরণের কবি—সে হিসেবে এঁদের সগোত্র বলা চলে।

কবিচেতনার রোমান্টিক কল্পনাধর্মকে বিবেকানন্দ জীবনে মাত্র একটিবার প্রত্যক্ষ বন্দনা করেছেন, সেই দুর্লভ উদাহরণটি সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করি—

THOU BLESSED DREAM

If things go ill or well,
If joy redounding shows her face,
Or seas of sorrow swell,
'Tis but where each has part,
Each one to weep or laugh as may ;
Each one his robe to don ;
Its scenes, alternative shine and rain.

Thou dream, O blessed dream !
Spread near and far thy veil of haze,

১ স্বামীজীর গানের সংকলনগ্রন্থ 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে বিহারীলালের গান সংকলিত। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যটি যে স্বামীজীর বিশেষ পছন্দ ছিল, সেকথা জানিয়েছেন তাঁর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ। সেকালের তরুণদের মধ্যে বিহারীলালের সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

Tone down the lines so sharp,
Make smooth what roughness seems.

No magic but in thee !
Thy touch makes deserts bloom to life,
Harsh thunder blessed song,
Fell death the sweet release.

(১৭ই আগস্ট, ১৯০০)[১]

দেহাবসানের মাত্র দু'বছর আগে প্যারিস থেকে ব্রহ্মচারিণী ক্রিস্টিনকে লেখা একটি চিঠির অংশে এই কবিতাটিতে একবার মাত্র এই বৈদান্তিক কবি জীবনে স্বপ্নের সার্থকতা স্বীকার করে বিনম্র সৌন্দর্যের স্তবগানে মুখর হয়েছেন। কিন্তু ওই স্বীকৃতি যে আকস্মিক উদ্ঘাটন নয় সে কথা তাঁর 'পরিব্রাজক' ভ্রমণ-কাহিনীতে গঙ্গাতীরের সবুজবর্ণনায় অথবা হৃষীকেশের গঙ্গাবর্ণনায় অথবা জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রশোভা দেখে, 'সামনে কবিতার সার সৌন্দর্য থাকতে কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন কি ?' বলায় প্রমাণিত। রূপ-তন্ময়তার চরমতম পরিচয় 'পরিব্রাজকে'র এক পঙ্‌ক্তিতে—"বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে !" এসব উদাহরণসত্ত্বেও জীবনের কোমলকান্ত লাবণ্যবিলাস তাঁর রচনার স্বধর্ম নয়, ব্যতিক্রম মাত্র—একথা অবশ্য স্বীকার্য।

তাই "Thou Blessed Dream" কবিতাটিতে রোমান্টিক স্বপ্নচারণের যে গভীর মূল্য বিবেকানন্দ দিয়েছেন, তার প্রাণময় প্রকাশভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিবেকানন্দের কবিসত্তার একটি অপরিচিত অথচ সহজাত সত্য এ কবিতার সুধন্যসুন্দর স্বপ্ন-বন্দনায় উচ্চারিত। এই স্বপ্নই কবিদের 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা

১ উদ্বোধন-প্রকাশিত "স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" (৭ম খণ্ড) গ্রন্থে লেখকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

প্রজ্ঞা'—মধুসূদনের 'মধুকরী কল্পনা', কোলরিজের 'imagination' (কল্পনা)। স্বপ্ন-বিলাসের সঙ্গে Blessed Dream-এর সম্বন্ধ নেই, জীবন ও জগতের সামগ্রিক রসরূপান্তরে এই স্বপ্নের সার্থকতা। কবিতাটির শেষ তিনটি চরণে এই রূপান্তরের অপূর্ব কাব্যময় অভিব্যক্তি—

তোমারি পরশে—প্রাণপুষ্পে হিল্লোলিত জাগে মরুভূমি,
মধুর সঙ্গীতে ভরে ঘনঘোর অশনি-গর্জন,
মৃত্যু আনে মধুময় মুক্তির আস্বাদ।

বিবেকানন্দের কল্পনাজগতে ভীষণের এই মধুময় পরিণতির সাক্ষ্য আর কোনো কবিতায় নেই। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে বাস্তবের নিষ্ঠুর সংঘাতে স্বদেশ ও বিদেশে তিনি জীবনের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, তার ফলেই হয়তো বেদনা ও মৃত্যুর প্রতি তাঁর যতটা আত্মীয়তাবোধ ছিল, জীবনের সুখস্বপ্নের প্রতি সে তুলনায় মমতাবোধ অনুপস্থিত।

কিন্তু বাইরের ঘটনা দিয়ে কবির অন্তরজীবনকে বিচার করতে গেলে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল বোঝার সম্ভাবনা। বিবেকানন্দের একটি পত্রে তাঁর যে আত্মবিশ্লেষণ পাই, এক্ষেত্রে সে কথাই বেশী মূল্যবান—

"জগতে দু'জাতের লোক আছে। এক ধরনের হলো—বলিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয়, প্রকৃতির কাছে নতিস্বীকারে রাজী, বেশী কল্পনার ধার ধারে না, কিন্তু সৎ সহৃদয় মধুরস্বভাব ইত্যাদি। তাদের জন্যই এই দুনিয়া, তারাই সুখী হতে জন্মেছে। আবার অন্য ধরনের লোকও আছে, যাদের স্নায়ু উত্তেজনাপ্রবণ, যারা ভয়ানকরকম কল্পনাপ্রিয়, তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন এবং এই মুহূর্তে উচ্চগ্রামে উঠছে, পরমুহূর্তে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। তাদের বরাতে সুখ নেই। প্রথম দলের লোকেরা মাঝামাঝি এক সুখের জগতে বাস করে। শেষোক্ত দলের মানুষ অপার আনন্দের ও গভীর বেদনার স্তরে পর্যায়ক্রমে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এদের দ্বারাই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের দল তৈরী হয়।

'প্রতিভা এক রকমের পাগলামি'—এই আধুনিক মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত।

"এখন এই শ্রেণীর লোকেরা যদি বড়ো হতে চায়, তবে তাদের তা চরিতার্থ করবার জন্য সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে ফেলে লড়াই করতে হবে। তাদের কোনো দায় থাকবে না—বিবাহ নয়, সন্তান নয়, সেই এক চিন্তা ছাড়া আর কোনো অনাবশ্যক আসক্তি নয়। সেই এক আদর্শের জন্য জীবনধারণ এবং মৃত্যুবরণ। আমি এই শ্রেণীর মানুষ। আমার একমাত্র আদর্শ 'বেদান্ত', আর আমি 'লড়াইয়ের জন্য তৈয়ার।"[১]

জীবনের মহত্তম আদর্শকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন বলেই সবচেয়ে গভীর দুঃখের ভার তাঁকে বহন করতে হয়েছিল—"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।" পরমসত্যকে কেবল আপন অনুভূতির সীমায় আবদ্ধ করে রাখা চলবে না—ঘরে ঘরে এই অমৃতমন্ত্র ঘোষণা করতে হবে—তাই তো নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস। এই সীমাবদ্ধ দেহমনের জগতে সেই অসীমের উপলব্ধি সম্ভব করে তুলতে হবে—তাই তাঁর পক্ষে কোনো আসক্তি, কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। অথচ ওই অনাসক্তি বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত চিরন্তন প্রেমপ্রবাহের উপলব্ধিতেই সত্য হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বুদ্ধের জীবনেও এই দুঃখচেতনাই প্রেমের আলোকে পরিণত! এমনি এক মহৎপ্রেমের আহ্বানেই বিবেকানন্দ মানব-জীবনের দুঃখ বেদনা মৃত্যু অন্ধকার—এ সব কিছুর মধ্য দিয়ে চিরন্তন সংগ্রামের পথে চলেছেন—নবযুগের নচিকেতা ধর্মরাজের শেষ উত্তর না শুনে তো ফিরে আসতে পারেন না।

তাই বুদ্ধিগত দার্শনিকচর্চায় তরুণ নরেন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতে পারেন নি। চাই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির নিশ্চিত অভিজ্ঞান। বর্তমান ভারতের এই সংশয়িত জিজ্ঞাসার উত্তরে চিরন্তন ভারতবর্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে জানালো, "তিনি আছেন। আমি তাঁকে দেখেছি।"

১ ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ তারিখে শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা চিঠি। বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ২৮২

উপনিষদের আত্মোপলব্ধির অপূর্ব আলোক বিবেকানন্দ আপন অন্তরে অনুভব করলেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

ব্রহ্মসঙ্গীতানুরাগী নরেন্দ্রনাথের দুটি অমর-গীতি-রচনায় এই পরম-উপলব্ধির বাণীরূপ বিধৃত। 'সৃষ্টি' ও 'প্রলয়' নামে এই গান দুটি বিবেকানন্দের কবিতা-সঙ্কলনে দ্রষ্টব্য।[১]

প্রথমটিতে অনাদি অনন্ত নামবর্ণহীন দেশকালহীন ব্রহ্ম বা আত্মায় কারণরূপে বাসনার উদ্ভব—"বহু স্যাং প্রজায়েয়।" এই বাসনা থেকে অহংজ্ঞানের উদ্ভব। স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ নেতিবিচারের উর্ধ্বে। অহং-জ্ঞানের অবস্থা থেকেই সূক্ষ্ম ও জড়জগতের, 'সুখ দুঃখ জরা জনম মরণে'র সৃষ্টি।

সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি,
কত গতি স্থিতি, কে করে গণন॥

এই একই ব্রহ্ম থেকে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে জগৎ-সৃষ্টি চলেছে, তাই এ সৃষ্টিও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—"সেই সূর্য, তারি কিরণ; যেই সূর্য সেই কিরণ।"

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৬৬-৬৭ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, কিছুকাল আগে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ (প্রয়াণ, জানুয়ারী, ১৯৭৮) স্বামীজীর একটি 'গানের খাতা' আবিষ্কার করেন। খাতাটিতে স্বামীজীর নিজের লেখা এবং অন্যদের লেখা তাঁর প্রিয় গান (অনেক সময় স্বরলিপিসহ) রয়েছে। খাতাটির সামনের পৃষ্ঠায় তারিখ রয়েছে ২২শে জানুয়ারী, ১৮৮৬, ইংরেজিতে 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' নাম লেখা। ওই খাতায় এ গান দুটি রয়েছে।

দ্বিতীয় গানটিতে বিপরীতক্রমে এই সৃষ্টি থেকে আত্মা আপনাকে সংহরণ করে স্ব-স্বরূপে মগ্ন হতে চলেছে—সেই অর্থেই প্রলয়। স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয় উপনিষদশ্লোক 'ন তত্র সূর্যো ভাতি'র ছায়ানুসরণে এ গানের প্রথম চরণের সূত্রপাত—

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥
অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ॥[১]
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥

ধ্যানতন্ময় চিত্তে বিশ্বজগতের অনুভূতি ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে বিলীন হবার পর কেবলমাত্র অহং চেতনার ধারা বইতে থাকে। এই অহং চৈতন্যের পরপারেই 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' অবস্থা। মানবভাষা কেবল 'এ নয়,' 'এ নয়', 'নেতি' 'নেতি' বলে তার আভাসমাত্র দিতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—কেমন ঘি? না—যেমন ঘি।

১ গানের এই অংশটির সঙ্গে আচার্য শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি'র ১৩৫ সংখ্যক শ্লোকটি তুলনীয়—

প্রকৃতি বিকৃতিবিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন্ নির্বিশেষঃ।
বিহরতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষ্ববস্থা—
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ॥

কারণ ও কার্য থেকে ভিন্ন, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ নির্বিশেষ পরমাত্মা অখিল স্থূল ও সূক্ষ্মজগৎকে প্রকাশ করে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই 'আমি' 'আমি' রূপে প্রকাশ করে যেন লীলারত। [স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত ও 'উদ্বোধন'-কার্যালয় প্রকাশিত 'বিবেকচূড়ামণি' : পৃঃ ৯১]

বিবেকানন্দের গানে—'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'। অপরোক্ষানুভূতির কাব্যরূপায়ণে এ গান দুটি উপনিষদের সৌন্দর্য-মহিমার অধিকারী।

এই সমাধিস্তর থেকে লোককল্যাণের প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথের উত্তরণ অধ্যাত্মজগতের ইতিহাস। সাধারণ মানুষের চোখে বিবেকানন্দহৃদয়ের অতুলন মানবপ্রেমই সবচেয়ে বেশী সমাদরের বস্তু। সাহিত্যের জগতে তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও মানবপ্রেম—দুইই সমান আগ্রহের বিষয়।

অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্য-দুইই লক্ষণীয়। বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আত্মসত্যের যোগে যে একাত্ম-অনুভূতি, সেক্ষেত্রে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারার উত্তর-সাধক; ব্যষ্টিগত মুক্তিসাধনাকে সমষ্টির মুক্তিসাধনায় পরিণত করার সঙ্কল্পে তিনি বুদ্ধের মহাকরুণার অধিকারী—কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশী প্রেম ও অনুরাগ দরিদ্র, মূর্খ, পাপী, লাঞ্ছিতের প্রতি। মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসায় তাঁর ব্যথিত দৃষ্টি অপমানিত মানুষকেই সবচেয়ে আগে বরণ করেছে। তাই তো তাঁর আকাঙ্ক্ষা "—May I be born again and again and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in—the sumtotal of all souls; and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species is the special object of my worship."[১]

১ আমি যেন বারে বারে ফিরে ফিরে জন্মগ্রহণ করে সহস্র দুঃখ ও বেদনা ভোগ করি, যাতে করে আমি আমার সেই একমাত্র ঈশ্বর, যাঁকে আমি বিশ্বাস করি, যিনি সমস্ত আত্মার সমষ্টিস্বরূপ, তাঁরই পূজা করতে পারি। সবার উপরে খলরূপী ভগবান, দুঃখীরূপী ভগবান, আমার ভগবান যিনি সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর দরিদ্রমানবসাধারণ—এঁরাই বিশেষভাবে আমার পূজনীয়।

সব জাতির সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যারা দুঃখী, দরিদ্র, এমনকি দুরাত্মা—তাঁরাই বিবেকানন্দের ভগবৎ-উপাসনার বিশেষ লক্ষ্যস্থল। সর্বজীবের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তায় যাঁর বিশ্বাস, 'পাপী' বলে কাউকে চিহ্নিত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বরং বিবেকানন্দের মতে—"Ye divinities on earth—sinner ? It is a sin to call a man so ; it is a standing libel on human nature."[১] [চিকাগো ধর্মমহাসভায় ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ তারিখে প্রদত্ত 'হিন্দুধর্ম' নামে লিখিত ভাষণ।]

স্বামীজীর দৃষ্টিতে মানুষের এই স্খলন পতন ত্রুটি তার আত্ম-স্বরূপের আবরণমাত্র। এক হিসাবে এই অধঃপতনের মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্দৃষ্টিবিকাশের সহায়তাই হয় ; পঙ্ক আছে বলেই পঙ্কজের মূল্য আমরা বুঝি। 'Angels Unawares"[২] কবিতাটিতে স্বামীজী তিনটি চরিত্রের রূপরেখায় মানবজীবনে এই দুঃখ ও কলঙ্কের গভীরতর সার্থকতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো মানুষ জীবনের বেদনার দিকটিকে বেশী করে উপলব্ধি করেন। নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ একদা এই বেদনাবোধকে মহত্ত্বের একটি আবশ্যিক লক্ষণরূপে নির্দেশ করেছিলেন। ইন্দ্রিয়গত সব সুখেরই সহজ অবসানের বাস্তবসত্য তাঁদের মনে করিয়ে দেয়—"The whole life is only a swan song."[৩] এই বেদনার মূল্যে জীবনের সত্যকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে দুঃখবাদী মনোভাবের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, দুঃখবাদ জীবনের

১ হে অমৃতের পুত্রগণ! পাপী ?—মানুষকে পাপী বলাই তো পাপ। মানবস্বভাবের বিরুদ্ধে—এ তো চিরন্তন মিথ্যা নিন্দা!

২ Poems : অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত কাব্যসঙ্কলন। বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ডে কবিতাটির লেখককৃত অনুবাদ 'অজানা দেবতা' দ্রষ্টব্য।

৩ The Master As I Saw Him : Comp. Works of S. Nivedita Vol I. P 124 'সমস্ত জীবন শুধু মরণেরই অন্তিমসংগীত'।

নেতিবাচক দিকটির কাছে পরাজয় স্বীকারেরই অভিব্যক্তি। বিবেকানন্দের কাছে এই 'দুঃখ'-চেতনা সাময়িক বা সাংসারিক ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে বিচার্য নয়, জীবনের সুখদুঃখ-কলরোলের অন্তরালে যে চিরন্তন অতৃপ্তি বিশ্বমানবের হৃদয়ধর্ম, বিবেকানন্দের বেদনাবোধ সেই অনন্ত দীর্ঘশ্বাসের সৃষ্টি।

মৃত্যু, অন্ধকার, কালী—বিবেকানন্দের কবিতায় পরস্পর অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ তিনটি প্রতীক। রোগশোকদুঃখমৃত্যুর জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হওয়াই বিবেকানন্দের মাতৃবন্দনা। তাই মহানিশার অন্ধকারে করালিনী কালীমূর্তিতে এই সংগ্রামী জীবনচেতনা আপন সার্থক রূপকল্পটি খুঁজে পেয়েছে। তন্ত্রের কালিকামূর্তি বিবেকানন্দের ধ্যানস্পর্শে প্রকৃতি ও মানব-চেতনার অন্তরে-বাহিরে পরিব্যাপ্ত যে অমোঘ জীবনসত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে, বাংলাসাহিত্যে তার অভিনবত্ব ও পরিপূর্ণতা এক আশ্চর্য সার্থকতার উদাহরণ!

বিবেকানন্দের কালী-কল্পনায় বাংলার শাক্তসাহিত্যের রুদ্রমধুরা বিশ্বজননীর রুদ্রাণীরূপটিই প্রাধান্যলাভ করেছে। মূলতঃ অদ্বৈত-সাধক হ'লেও রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণের ধারাবাহী বিবেকানন্দ জানতেন, "তারা আমার নিরাকারা।" এই দ্বৈত থেকে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে অদ্বৈতে প্রয়াণের মধ্য দিয়ে 'সত্যে'র ক্রমবিকশিত পরমসত্তাটি আবিষ্কার করাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার বিশিষ্ট দান। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য অনুভূতিলব্ধ কালিকামূর্তি বিবেকানন্দের অদ্বৈতচিন্তার পটভূমিতে তাই স্বাভাবিক প্রেরণাতেই প্রকাশিত।

"সখার প্রতি"[১] কবিতায় সমগ্র জীবনসত্যের প্রতীকরূপে—

> হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
> মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।

মায়ের মৃত্যুরূপ ও মাতৃরূপের মধ্যে এই বীরসন্তানের দৃষ্টিতে ওই মৃত্যুরূপই মানবচৈতন্যের সমস্ত দুঃখবেদনায় পুঞ্জীভূত অন্ধকারের পটভূমিতে মহাকালী-মূর্তিতে আবির্ভূত—

---

১ বীরবাণী।

সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিকবাস, বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময় কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী, বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে॥

(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

কাশ্মীরে ক্ষীরভবানীদর্শনের দিন কয় আগে মাতৃধ্যানে তন্ময় বিবেকানন্দের লেখনী থেকে "Kali the Mother" কবিতার আবির্ভাব। কবিতার জগতে এই শ্রেণীর সৃষ্টিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে হয় বলেই 'আবির্ভাব' কথাটি ব্যবহার করছি। কোনো কোনো কবিতা কবিরা লেখেন, কোনো কোনো কবিতা কবিদের অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়, কবিরা সেক্ষেত্রে উপলক্ষ্যমাত্র। এই অর্থেই উপনিষদের কবিরা মন্ত্রদ্রষ্টা।

এই কবিতাটির রচনাকালীন অন্যতম সাক্ষী নিবেদিতার কথায়—His brain was teeming with thoughts, he said one day and his fingers would not rest till they were written down. It was that same evening that we came back to our houseboat from some expedition and found waiting for us, where he had called and left them, his manuscript lines on "Kali the Mother." Writing in a fever of inspiration, he had fallen on the floor, when he had finished—as we learnt afterwards—exhausted with his own intensity."[১] [The Master As I Saw Him : Complete Works of Sister Nivedita : Vol I. P 94]

১ একদিন তিনি বললেন, যে ভাবকল্পনায় তাঁর মনোজগৎ পূর্ণ হয়ে আছে, যতক্ষণ না সেগুলি লিখে ফেলতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর আঙুলগুলি স্বস্তি

ক্ষীরভবানীদর্শনের পর যখন এই চিরবিদ্রোহী সন্তান উপলব্ধি করলেন, মায়ের ইচ্ছাই তাঁকে—তাঁর ভারতবর্ষকে, বিশ্বজগৎকে পরিচালিত করছে, তিনি উপলক্ষ্য মাত্র—সেই সময়ে একদিন আলাপচারী বিবেকানন্দ Kali the Mother থেকে চরণ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—এর সবটাই সত্য সত্য এসেছিল, এর প্রতিটি শব্দ—

Who dares misery love,
And hug the form of death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.—তার কাছে মা সত্যি সত্যিই আসেন। আমি তা প্রমাণ করেছি। মৃত্যুকে আমি আলিঙ্গন করেছি।"[১] Kali the Mother-এর অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য বায়ু বেগ!
লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দিশালা হ'তে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!
সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'
নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,
প্রকাশিছে দিকে দিকে তা'র মৃত্যুর কালিমামাখা গায়
লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!

পাচ্ছে না। সেইদিনই বিকেলবেলা আমরা ছোটখাট এক অভিযান সেরে ফিরে এসে দেখলাম 'কালী দি মাদার' (মা কালী) কবিতার পাণ্ডুলিপিতে সেই চিন্তারাশি তিনি লিপিবদ্ধ রেখে চলে গেছেন। পরে জেনেছিলাম—এক দিব্যপ্রেরণায় এ রচনা শেষ হওয়ার পরে তীব্র আবেগে অবসন্ন স্বামীজী লেখা শেষ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

১ The Master As I Saw Him : Complete Works of Sister Nivedita : Vol I : p 99

করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে !
কালি, তুই প্রলয়-রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।[১]

অনুবাদের নিজস্ব কাব্য-সার্থকতার এমন উদাহরণ বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ।

Kali the Mother-এর পাশাপাশি সার্থকতার বিচারে সমতুল্য The Cup (পানপাত্র) কবিতাটি। কবির ব্যক্তিগত জীবনাদর্শের এমন বেদনাঘন রূপায়ণ কবিতার জগতে খুব বেশী চোখে পড়ে না।

The Cup-এর চিত্রকল্পটি যীশুখ্রীষ্টের জীবনকাহিনী থেকে গৃহীত—যীশুর সেই Cup of blood—যে পানপাত্রের স্মরণে টমাস-আ-কেম্পিস ঈশানুসরণ (The Imitation of Christ)-গ্রন্থে লিখেছেন—"Many follow Jesus unto the breaking of bread, but few unto the drinking of the cup of His Passion."—সেই বিরল সাধকদের অন্যতম বিবেকানন্দ—যাঁর হাতে তাঁর জীবন-দেবতা তুলে ধরেছেন যুগযুগান্তরের বেদনামথিত বিষপাত্র—

This is your cup—the cup assigned to you
From the beginning.

এই তব পানপাত্র, তোমারি উদ্দেশে
সৃষ্টির উন্মেষ হতে এ পাত্র রচনা।

এ জীবনে সুখ, তৃপ্তি, আনন্দের ছায়াশীতল রাজপথ আছে, তবু কবির জীবনদেবতা জানেন সে পথ তাঁর ভক্তের জন্য নয়—

দুর্গম দুঃসহ পন্থা—এই তব পথ,
প্রতিপদে অবিশ্রান্ত উপল-সঙ্ঘাত,
সে আমারি দান। দিয়েছি বন্ধুরে তব
স্নিগ্ধ স্বচ্ছ পথখানি সানন্দ যাত্রার।

---

১ কাব্যসঞ্চয়ন : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

তোমারি মতন সেও পাবে মোর বক্ষে
পরম আশ্রয়। তোমারে চলিতে হবে
এই পথ ধরে ;—এ নির্মম নিরানন্দ
নিঃসঙ্গ সাধন—এতো আর কারো নয়,
এ শুধু তোমার। মোর বিশ্বরচনায়
আছে এরো স্থান। লও এই পানপাত্র,
বুঝিতে বলিনি আমি কি অর্থ ইহার,
শুধু ধ্যাননেত্রে দেখ স্বরূপ আমার।[১]

বীরভক্তের জন্যই এই দুর্গম পথযাত্রার সাধনা। এ জীবনে দুঃখমৃত্যু ক্ষয়ক্ষতিরও যে নিজস্ব মূল্য রয়েছে, বেদনাবিষের পেয়ালাও যে তাঁরই হাতের দান! এ দান গ্রহণের যোগ্যতা তো সকলের নেই—

But it is not meant for any other hand—

যার সে যোগ্যতা আছে, তারও কোনো প্রশ্নের অধিকার নেই, দুঃখবরণের মধ্যেই সব প্রশ্নের উত্তর, সব জিজ্ঞাসার সমাধান—

I do not bid you understand.

I bid you close your eyes to see My face.

জীবনে দুঃখের এই পরমমূল্যকে বিবেকানন্দ চিরদিন স্বীকৃতি জানিয়েছেন, কারণ ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় ও মানবজীবনের ইতিহাসচর্চায় তিনি অনুভব করেছিলেন—"বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায় আঘাত লাগলে তবে সে ফণা ধরে। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, চারিদিকে দুঃখের ঝড় উঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখতে পাব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্তি পায়। ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন?" [পত্রাবলী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০]

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : লেখককৃত অনুবাদ

Let eyes grow dim and heart grow faint,
And friendship fail and love betray,
Let Fate its hundred horrors send,
And clotted darkness block the way.

স্তিমিত হউক নেত্র, অন্তর মূর্ছিত,
বিফল বন্ধুত্ব—প্রেম প্রতারণা হোক,
নিয়তি পাঠাক তার ভীতি অগণিত
পুঞ্জীকৃত অন্ধকারে পথ রুদ্ধ রোক।
রোষদীপ্ত মূর্তি ধরি' আসুক জগৎ
চূর্ণিতে তোমায়—তবু জানিও নিশ্চয়,
হে আত্মা, তুমিই দেব, তুমি সে মহৎ,
মুক্তিই গন্তব্য তব—অন্য গতি নয়।[১]

জীবনের ললিত ও কঠোর ভাবসত্যের পাশাপাশি ছবি স্বামীজী এঁকেছেন 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটিতে। মানবপ্রাণের স্বাভাবিক সুখলালসার উদ্দেশে কঠোর কশাঘাত হেনে বলেছেন—

সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুখে যার ভালবাসা।
সুখে দুঃখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥

ভারতীয় সাহিত্যে ললিত সৌন্দর্যের চিরশ্যামল প্রতীক বৃন্দাবনের কৃষ্ণকাহিনী স্বামীজীর গভীর শ্রদ্ধার বিষয় ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন ইন্দ্রিয়াধীন সাধারণ মানুষের জন্য গোপীপ্রেমের আদর্শ সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত। জীবনসংগ্রামে উদ্যত নবীন ভারতের জন্য প্রয়োজন উমা-মহেশ্বরের তপস্যাকঠোর বৈরাগ্যমণ্ডিত জীবন-সাধনা। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের চেয়ে কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথি, গীতার সিংহনাদকারী কৃষ্ণই তাঁর কাছে বরণীয়, "সুখবনমালী"র চেয়ে "মৃত্যুরূপা কালী"ই আরাধ্যা।

---

১ শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা পত্রকাব্যমালার প্রথম চিঠি। "বীরবাণী"-গ্রন্থে The Song of the Free নামে এ চিঠির অংশবিশেষ এবং কিরণচন্দ্র দত্তের অনুবাদ "জীবন্মুক্তের গীতি" দ্রষ্টব্য। সমগ্র পত্রকাব্য-মালার শংকরীপ্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ: বাণী ও রচনা: দশম খণ্ড: পৃঃ ২২৭-২৩৪

সাহিত্যিক বা ভাবুক ভক্তের মুখে দুঃখবন্দনা খুব নতুন কিছু নয়। দুঃখবিলাস বা ভবিষ্যৎ সুখের আকাঙ্ক্ষায় দেবতার বন্দনা—এ দুইই মানবমনের 'ভাবের ঘরে চুরি'। সামান্য রক্তপাত দেখেই যার মূর্ছা হয়, নিজেকে সে পরম দয়ালু ভেবে প্রতারণা করে। এই আত্মপ্রতারণা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে বিবেকানন্দের সুতীব্র শ্লেষ উচ্চারিত—

রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও সুখ হবে বলে, ভক্তিপূজাছলে স্বার্থ-সিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্মকথা বলি কাকে?

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে এই কাপুরুষতাই পাপ; আত্মবিশ্বাসের অভাবই অন্তরাত্মার সুপ্তির কারণ। সব ভীরুতা ও দুর্বলতার অবসানে আমাদের প্রসুপ্ত আত্মরূপী সিংহ জেগে উঠুক, জীবন-সংগ্রামে নির্ভীক সৈন্যদলের মৃত্যুউপেক্ষাকারী দৃঢ়তা আমাদের দেহে মনে সঞ্চারিত হোক, বীর সন্ন্যাসীর এই ছিল প্রার্থনা—

জাগো বীর ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

আজকের ভারতবর্ষের কাছে এই মহাবাণীর তাৎপর্য যত বেশী এতখানি বোধ হয় কোনোদিনই ছিল না। তবু এ শুধু অতীত বা বর্তমানের নয়, চিরকালের মানবাত্মার সংগ্রাম-মন্ত্র।

সংগ্রামী সন্ন্যাসী ঘোষণা করেছিলেন: 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার';—জীবনভোর জড়তা ও অজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমাহীন সংগ্রামে সে পূজার মন্ত্র বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। দেশের জন্য যাঁরা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁর রচনাবলী পড়ে তাঁরা স্বদেশপ্রেমের অর্থ বুঝেছেন। পরম সত্যের জন্য যাঁরা চরম ত্যাগের পথে

গিয়েছেন, তাঁরা তাঁর জীবন ও বাণীতে ব্রহ্মাস্বাদের সন্ধান পেয়েছেন। স্বয়ং তিনি সংসারপাশ-মুক্ত দৃপ্ত বেদান্তকেশরী—জাতির জীবনে ওই পৌরুষের আদর্শ সঞ্চারই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান।

জগৎ ও জীবনের দুটি আপাত বিভিন্ন দিক তাঁর কল্পনানেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল—

ফুল্ল ফুল সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল
গুঞ্জরিছে আশে আশে।
শুভ্র শশী যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী
বিতরিছে ধরাবাসে॥

*

মেঘমন্দ্র কুলিশ-নিঃস্বন, মহারণ,
ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার,
হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয় বায়ু॥
(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

পুরাণ ও তন্ত্র থেকে ভারতীয় সাহিত্যের দুটি প্রতীক, জীবনের এই কোমল-কঠোর দ্বৈতসত্তার রূপায়ণ—স্বামীজীর ভাষায়, 'সুখবনমালী' ও 'মৃত্যুরূপা কালী'। জীবনের এই দ্বৈতরূপের মধ্যে বিবেকানন্দের সংগ্রামী-সত্তা ভীষণকে বরণ করেছে, ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে মহাপ্রলয়ের মধ্যে জীবনের সার সত্যকে উপলব্ধি করেছে। রোগ শোক জরা মৃত্যুর প্রতিকারচিন্তা নয়, ঐ অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ও ধ্বংসের অন্তরালে ভগবৎশক্তির গভীরতম প্রকাশ উপলব্ধি করা—এই ছিল তাঁর সাধনা।

আধ্যাত্মিক সাধনায় অথবা সাহিত্যিক কল্পনায় দুঃখবাদ একটি সুপ্রচলিত চিন্তাধারা। এই দুঃখ-কামনার আসল স্বরূপটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলতঃ একটি সুখময় পরিণতির আকাঙ্ক্ষা থেকে আপাত দুঃখবরণের মোহ মানুষকে পেয়ে বসে। বস্তুত কোনো স্থায়ী মঙ্গলবোধের আদর্শ মনে না থাকলে মানুষ জীবনের পথে

অগ্রসর হতে উৎসাহ পায় না। সেই মঙ্গলবোধের আদর্শ বিভিন্ন দেশে ও কালে মানুষকে সংগ্রামের পথে আহ্বান করে নিয়ে গেছে। কিন্তু এই মঙ্গলবোধ শেষ অবধি সাফল্য ও সচ্ছলতার ঊর্ধ্বে কোনো নিশ্চিততর প্রত্যয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না বলেই নিজের হাতেগড়া প্রাসাদ নিজের হাতে ভাঙার ইতিহাসে সভ্যতার রাজপথ পরিকীর্ণ।

স্বামীজীর দুঃখচেতনা এ জাতীয় সুখাকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত নয়। দুঃখকে দুঃখের মূল্যেই উপলব্ধি করার পৌরুষ তাঁর জীবনাদর্শ।

"Worship the terrible! Worship Death! All else is vain. All struggle is vain. Yet this is not coward's love of death, not the love of the weak, or the suicide. It is the welcome of the strong man, who has sounded everything to his depths, and knows that there is no alternative……"[১]

ভয়ঙ্করের আরাধনা কর! মৃত্যুর বন্দনা কর! আর সবই বৃথা, সব প্রচেষ্টাই বৃথা। কিন্তু এ ভীরুর মৃত্যুকামনা নয়; দুর্বলের মৃত্যু-প্রেম নয়, আত্মহত্যাও নয়। যে বীর জীবনের প্রতিটি জিনিসকে তলিয়ে দেখেছে এবং বুঝেছে যে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, এ সেই বীরের আহ্বান……"

"How few have dared to worship Death, or Kali! Let us worship Death! Let us embrace the Terrible, because it is terrible, not asking that it be toned down. Let us take misery, for misery's own sake."[২]

'কালী বা মৃত্যুকে ক'জন পূজা করতে সাহস করেছে। এসো আমরা ভয়ঙ্কর বলেই ভয়ঙ্করকে আলিঙ্গন করি, যেন সে ভয়ঙ্করকে নম্র হতে না বলি। এসো দুঃখের জন্যই আমরা দুঃখকে গ্রহণ করি।'

১ The Master as I Saw Him: Comp. Works of Sister Nivedita: Vol I: p 128

২ Ibid: p 123

"...আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের চেয়ে পাপ নেই; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—এ নিশ্চিত। আর সব সয়, ঐটি সয় না। ওটি যে ছাড়বে না, তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক চলে কি?...এক ঘা খেয়ে দশ ঘা তেড়ে মারতে হবে...তবে মানুষ!...কাপুরুষ দয়ার আধার!"[১]

সাহিত্যে, শাস্ত্রে, জীবনে এই সংগ্রামের আদর্শ যাঁদের মধ্যে পেয়েছেন, বিবেকানন্দ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে সদা সচেতন। গীতার সিংহনাদকারী কৃষ্ণ, রামায়ণের রামচন্দ্র ও মহাবীর হনুমান, প্যারাডাইস লস্টের শয়তান, মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ, রানা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দসিংহ, নেপোলিয়ন, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ—সংগ্রামী-চেতনার এই বিভিন্ন আদর্শগুলি স্বামীজীর কথোপকথনে বারংবার উল্লিখিত। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদনের সংগ্রাম তাঁর সশ্রদ্ধ স্মৃতিতর্পণে সর্বাগ্রে স্থান পেত।[২] তাঁর নিজের জীবনও তো প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ত সংগ্রামরত এক অনন্য সেনাপতির যুদ্ধকাহিনী।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে বিদেশী ভাবধারায় আমাদের ভারতীয় জীবনাদর্শ প্রায় সমাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল, তার বিরুদ্ধে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠতার প্রত্যয় নিয়ে বিবেকানন্দের প্রতীচ্য-অভিযান ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নবযুগের সৃষ্টি করেছিল। সে গৌরব-কাহিনীর অন্তরালে রয়েছে হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে আসমুদ্রহিমাচল-পরিভ্রমণকারী পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ইতিহাস; অনাহারে অপমানে লাঞ্ছনায় অবিচলিত থেকে আমেরিকার নগরে নগরে ভ্রাম্যমাণ বিবেকানন্দের ইতিহাস। প্রিয়শিষ্য আলাসিঙ্গা

১ ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখা পত্রাংশ। বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃঃ ৮০

২ ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' এবং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 'স্বামি শিষ্যসংবাদ' দ্রষ্টব্য।

পেরুমলকে চিকাগো মহাসভার অধিবেশনের তিনসপ্তাহমাত্র আগে তিনি লিখছেন—"আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি। কিন্তু মাদ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের হাতে এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ সমর্পণ করছি।...প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হয়ে মরতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করবে। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়হীন মস্তিষ্কসার ব্যক্তিদের এবং তাদের নির্বীর্য সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলিকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পিছনে চেয়ো না। কে পড়ে গেল দেখতে যেয়ো না। এগিয়ে চলো, সামনে এগিয়ে চলো। এমনি করেই আমরা অগ্রগামী হব,—একজন পড়বে, আর একজন তার স্থান অধিকার করবে।" (২০শে আগস্ট, ১৮৯৩)

চিকাগো মহাসভায় আমেরিকাবাসী এই জীবন-যোদ্ধার ললাটে বিজয়তিলক পরিয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু এই সাময়িক সাফল্যকেই স্বামীজী জীবনের চরম জয় মনে করেন নি। আমেরিকা, ইংলণ্ড, য়ুরোপ ঘুরে এসে তাঁর সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে স্বদেশবাসীর সঙ্গে। এই আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্যমহীন আত্মবিশ্বাসহীন দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করে তোলার জন্য অনুক্ষণ চিন্তা ও চেষ্টার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বল্পাবশিষ্ট জীবন তিনি আহুতি দিয়েছেন। অন্তরে অন্তরে এই সদাজাগ্রত সংগ্রামচেতনা বহন করতেন বলেই বোধ হয় "নাচুক তাহাতে শ্যামা"-র নিম্নোদ্ধৃত স্তবকটিতে স্বামীজী যুদ্ধের একটি বাস্তব আদর্শদীপ্ত ছবি এত প্রত্যক্ষ করে তুলতে পেরেছেন—

ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র্‌ ঝর্‌র্‌ দামামা নক্কাড়, বীর দাপে
কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ, বব-বব বম্‌, বব-বব বম্‌ বন্দুকের কড়কড়া॥

ধূমে ধূমে ভীম রণস্থল, গরজি অনল, বমে শত জ্বালামুখী।
কাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার
ঘোড়া হাতী॥

পৃথ্বীতল কাঁপে থরথর, লক্ষ অশ্ববর—পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম, গোলাবরিষণ, গুলি শন শন, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥
আগে যায় বীর্য-পরিচয়, পতাকা-নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্ত ধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিকদল, বন্দুক প্রবল বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায়, মৃত বীরকায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

পদাতিকযুদ্ধের এই বর্ণনাটিতে যুদ্ধের বাস্তব বর্ণনাকে ছাপিয়ে উঠেছে যোদ্ধাদের অন্তর্নিহিত বীরধর্মের প্রেরণা। পতাকাধারী বীরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বীর তার ধ্বজা নিয়ে সহযোদ্ধাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে—এই চিত্রটি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিকাস্পর্শে রূপায়ণযোগ্য।

এই জীবনযুদ্ধের দুটি দিক—বীর্যপরিচয় পতাকাধারীর অগ্রগতি যতটা সত্য, ঠিক ততখানি সত্য সহস্র সহযোদ্ধার স্তূপাকার মৃতদেহ। এমনি করে সহস্র মরণের মধ্য দিয়ে জীবনের জয়পতাকা এগিয়ে চলে। অথবা, শুধু জয় নয়; পরাজয়, অপমান, লাঞ্ছনা—রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু,—এ সবই জীবনযুদ্ধের অঙ্গ। এই নির্মম বাস্তবের সম্মুখীন যে হ'তে পেরেছে, সেই তো মায়ের যথার্থ সন্তান, যথার্থ সৈনিক।

কিন্তু সত্যের সম্পূর্ণ স্বরূপ আমরা ধারণা করতে পারি না। আমাদের মধ্যে দুঃখবিলাস যে পরিমাণে রয়েছে, দুঃখস্বীকৃতি সে পরিমাণে নেই। তাই ভক্তমহলে এমন উদাহরণ প্রচুর মেলে যারা ভগবানকে সুন্দর ও মঙ্গলের দিক থেকেই দেখতে অভ্যস্ত। অসুন্দর ও অমঙ্গলের অস্তিত্বকে তাঁরা পরিণামে সুখকর বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে থাকেন; বলাই বাহুল্য, জীবনের চরম বিপর্যয়ের সামনে

এ ধরনের মনগড়া স্তোকবাক্য মুহূর্তে মিথ্যায় পরিণত হয়। স্বামীজীর ভাষায়—

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়,
নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস,
বলে মা দানবজয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়,
কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি
বিতরিছ জনে জনে॥
(নাচুক তাহাতে শ্যামা)

বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে এই মৃত্যুরূপা মাতার পূর্ণ প্রকাশ Kali the Mother কবিতাটিতে।

বিবেকানন্দের জীবনদর্শনের কাব্যমূর্তিরূপে Kali the Mother কবিতাটির প্রতিটি চরণ গভীর অভিনিবেশ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ভবিষ্যতের কোনো দ্রষ্টাপুরুষের ধ্যানদৃষ্টিতে এ কবিতার সম্পূর্ণ অর্থ হয়তো ধরা দেবে। তবু আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণা নিয়ে এ কবিতার কয়েকটি বিশিষ্ট দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

প্রথমে একটি নিবিড় অন্ধকারের বর্ণনা—যে অন্ধকারে "The clouds are covering clouds"—"মেঘ এসে আবরিছে মেঘ।" ঋগ্বেদের নাসদীয়সূক্তে যে অন্ধকার-বর্ণনাটি স্বামীজীর সবচেয়ে প্রিয়—"তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"—তার সঙ্গে তন্ত্রোক্ত কালিকা-ধ্যান "মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং"—সেই মহামেঘান্ধকার মিশে গিয়ে এ যেন প্রাক-সৃষ্টির অনুরূপ প্রলয়পূর্ব অন্ধকার।

বিপুল ক্রন্দন, বিরাট ধ্বংসের আলোড়নে—

"স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য বায়ুবেগ।"

এই প্রলয় ঝড়ের উন্মুক্ত তাণ্ডবের মাঝখানে কবিচৈতন্য মহাশক্তির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে আহ্বান করেছেন "Come, Mother, Come."[১] এমন মহাপ্রলয়ের প্রেক্ষাপটে ভূলোক-দ্যুলোকব্যাপী যে চরম-সংগ্রাম চলেছে তারই মধ্যে তো রণরঙ্গিণী মায়ের প্রত্যক্ষ প্রকাশ—যে মা দুঃখ-দৈন্য-বেদনা-সংগ্রামের সম্মিলিত রূপমূর্তি। একদিকে ওই নিবিড় অন্ধকার, আর একদিকে এই উন্মত্ত ঝড়—বিবেকানন্দের ভাবলোকে দুঃখ, ধ্বংস ও সংগ্রামের মিলিত স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। এই বিপুল ভাবপ্রেরণার আপন স্বধর্ম থেকেই মৃত্যুরূপা মহাকালীর এই অতুলনীয় চিত্রকল্পটি জেগে উঠেছে।

তন্ত্রোক্ত কালিকা-ধ্যানে এই মহাকালী-কল্পনা বীজরূপে নিহিত। কিন্তু স্বামীজীর দিব্যকল্পনা এই ছোট্ট কবিতাটির স্বল্পসীমায় জলে স্থলে আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত মহাপ্রলয় ও রোগ শোক ধ্বংস মহামারীর বিপুল তাণ্ডবের সমন্বয়ে যে জীবনসত্যের উপলব্ধি রূপায়িত করেছে, তার ব্যাপকতা ও গভীরতা অচিন্তিতপূর্ব।

সবচেয়ে লক্ষণীয়, কবিতাটির শেষ দুই চরণে এসে এই ধ্বংসরূপিণীর মহাপূজার যে তিনটি উপকরণের কথা স্বামীজী বলেছেন—দুঃখ দৈন্যকে ভালোবাসার সাহস, মৃত্যুকে আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা, ধ্বংস-নৃত্যে যোগদানের উন্মাদনা—এ যার আছে তারই হৃদয়ে মায়ের আবির্ভাব—"To him the Mother comes." বিবেকানন্দের এই মা অভয়াবরদারূপিণী ন'ন, তিনি স্বয়ং মৃত্যুরূপা, তাঁর হাতে 'বিষকুম্ভ'-ভরা রোগ-মহামারী। সাধারণ মানবদৃষ্টিতে তিনি চরম অমঙ্গলরূপিণী। এই অমঙ্গলের আরাধনাই বীরের সাধনা। দুঃখের জন্যই দুঃখবরণের সাহস—স্বামীজীর বীরত্বের আদর্শ।

জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-সুখস্বপ্নের সমাধিভূমিতে ভারতবর্ষের কবিকল্পনা শিব ও শক্তির বিহারস্থান নির্দেশ করেছে। মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃত উপলব্ধির সাধনায় রুদ্র ও রুদ্রাণীর যে ধ্যান যুগে যুগে সাধকচিত্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, বিবেকানন্দের জীবনে ও

১ 'আয় মা আয়'।

কাব্যে সেই ধ্যানই সংগ্রামের তরবারিতে পরিণত। ওই সংগ্রামে পরাজয়ের হতাশা প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী। আসল সংগ্রাম তো এই হতাশার সঙ্গে।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে জীবনের পরাজয় ও ব্যর্থতার অসীম মূল্য—"Never mind failures; they are quite natural, they are the beauty of life—these failures. What would be life without them? It would not be worth having if it was not for struggles. Where would be the poetry of life?" "ব্যর্থতার জন্য দমে যেয়ো না; এই ব্যর্থতা একান্ত স্বাভাবিক—এরাই তো জীবনের সৌন্দর্য। এদের ছাড়া জীবন কি হয়ে দাঁড়াবে? সংগ্রাম না থাকলে জীবনধারণের কোনো সার্থকতাই থাকত না। কোথায় থাকত জীবনের কাব্য?"

জীবনের কাব্য-সৌন্দর্যকে যিনি ব্যর্থতা ও সংগ্রামের মাঝখানেই উপলব্ধি করেছেন সেই নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ এক কথায় বলেছিলেন—'খাপখোলা তলোয়ার।'

অথচ ওই সংগ্রামচেতনা তাঁর 'Kali the Mother' কবিতায় যখন সবচেয়ে ঘনীভূত আকারে দেখা দিয়েছে, তখনই তাঁর হৃদয়ে বিশ্বজগতের জন্য অপার করুণা, অনন্ত প্রেম উৎসারিত। নিবেদিতার স্মৃতিকথায় এই সময়কার বিবেকানন্দমানসের প্রতিফলন—"একমাত্র প্রেম ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেই। লোকে যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় আচরণও করে তবু তাকে আমরা ভালবেসে যাব, শেষ পর্যন্ত এ প্রেমকে তারা স্বীকার না করে পারবে না।"[১]

দুঃখ, সংগ্রাম ও প্রেমের এই যোগসূত্রটি স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মর্মস্থল থেকে আবিষ্কার করতে পারলেই তাঁর কবিসত্তার

১ The Complete Works of Sister Nivedita: Vol. 1: The Master as I Saw Him: Kahir Bhowani: p 99

সবচেয়ে বড়ো রহস্যটি ধরা পড়ে, যে রহস্যের প্রেরণায় তিনি বলেছিলেন—"Through the terrors of evil, say—my God, my love! Through the pangs of death, say—my God, my love! Through all the evils under the sun, say—my God, my love! Thou art here, I see Thee. Thou art with me, I feel thee."[১] যে বিপুল বিশ্বচেতনার উদ্বোধনে সব দুঃখ সব যন্ত্রণা এমন পরমপ্রেমে পরিণতি লাভ করে—কবিতার জগতে তার চেয়ে বড়ো সত্যের প্রেরণা আর কি থাকতে পারে? উদ্ধৃত গদ্যাংশটুকু কী গভীর প্রেরণার আবেগমণ্ডিত! বক্তৃতা ও রচনায় এমন আবেগস্পন্দিত উদাহরণ বিবেকানন্দ-সাহিত্যে অজস্র। অন্তরের অন্তরে এক মননশীল কবিব্যক্তিত্বের সহজাত সংস্কার নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই বিবেকানন্দের রচনাবলীতে একাধারে সাহিত্য-সৌরভ ও প্রজ্ঞাবাণীর এমন সার্থক সম্মেলন।[২]

'সখার প্রতি' বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা, সংগ্রাম, বেদনা ও অভিজ্ঞতার অন্তরতম পরিচয় এ কবিতার প্রতিটি চরণে নিবিড় সংহতি নিয়ে ফুটে উঠেছে। মানবজীবনের সব ছদ্মবেশ, সব শোভনতার আড়ালে যে অপার দৈন্য, অতল অশ্রু নিহিত, বিবেকানন্দের মতো এমন নির্মম বাস্তবদৃষ্টিতে

১ "অমঙ্গলের ভয়াবহতার মধ্যে বলো, 'প্রিয় আমার, আমার ঈশ্বর।' মরণ-যন্ত্রণার মধ্যে বলো, 'প্রিয় আমার, আমার ঈশ্বর'। জগতের যত অকল্যাণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলো, "'প্রিয় আমার, আমার ঈশ্বর! তুমি এইখানে রয়েছ, আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমার সাথে সাথে রয়েছ, আমি তোমায় অনুভব করছি।'

২ 'মৃত্যুরূপা মাতা' (Kali the Mother) কবিতাটির প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলির মন্তব্য স্মরণীয়—"শক্তিকে নানা দেশের কবি এবং সাধকগণ নানারূপ কল্পনা করেছেন। কাব্যে বিবেকানন্দের কবিতাই শ্রেষ্ঠতম।" সৈয়দ মুজতবা আলি-রচনাবলী : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৩২৩-২৪ : 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' প্রবন্ধ : মিত্র ঘোষ : (প্রথম প্রকাশ)।

তার আবরণ-উন্মোচন তো আর কারু সাধ্য ছিল না। আবার এই দৈন্য ও বেদনার অন্তরালে প্রেমের যে অনির্বাণ আলো মানবহৃদয়ে চিরজাগ্রত—সেই মহাসত্যকে উপলব্ধি করাও মানব-মহিমার আর এক বিস্ময়কর উদ্ঘাটন।

বিবেকানন্দের কথা অনুসারে—খেলার আনন্দ খেলোয়াড়ের চেয়ে দর্শকেরই বেশী। সংসার-চক্রের আবর্তনে থেকে যারা এই সংসারকেই একমাত্র সত্য বলে জেনেছে, তাদের পক্ষে মানব-চরিত্রের এমন নির্মম বিশ্লেষণ বা এমন নিঃস্বার্থ প্রেম—কোনোটাই পুরোপুরি সম্ভব নয়। একান্ত কাছের জিনিসকে কে সম্পূর্ণ জেনেছে!

বনের বেদান্তকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার মহাব্রত নিয়ে বিবেকানন্দ আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমা করেছিলেন, পৃথিবী-পর্যটনে সেই পরিক্রমার পূর্ণতা। সমসাময়িক পৃথিবীর নানা স্তরের মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, তীক্ষ্ণতম দৃষ্টিতে এ মানব-সংসারকে বিশ্লেষণ করেছেন—সেই বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার ফলে জগৎ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—

> আঁধারে আলোক-অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান;
> প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান?
> দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান;
> স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার?

এ জগৎ-রঙ্গশালায় মানুষের এই চির-অভিনয় প্রতিদিনের কাহিনী—সে যা নয় নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত। অথচ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্নতার মধ্যে শান্তির বুলি আওড়ানো আমাদের সমান তালেই চলেছে। আদর্শবাদী মানুষের কাছে মানবমনের এই আত্মপ্রতারণা একান্ত অসহ বলে মনে হয়। এ পৃথিবীতে কেউ কি আদর্শের পরিপূর্ণ রূপটি দেখতে পেয়েছে? রোমান্টিক হৃদয়ধর্ম তাই চির-অতৃপ্ত।

১৮৯৬-এর সেপ্টেম্বরের পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটিতে শ্রীমতী হেলকে স্বামীজী লিখেছেন—"I will tell you a great lesson I have learnt in this life. It is this: 'The higher your ideal is, the more miserable you are,' For such a thing as an ideal cannot be attained in this world—or in this life, even. He who wants perfection in the world is a mad man—for it cannot be. How can you find the infinite in the finite?"[১]

তবু আর সব রোমান্টিকের মতোই বিবেকানন্দও একদা এই জগতেই পূর্ণতার সন্ধান করেছেন—

যোগ-ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত, ত্যাগ, তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার ;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন ;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।

... ...

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়।
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর, শ্মশান আলয়,
নদীতীর, পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে কি ধন করিনু উপার্জন ?

---

১ জীবনের কাছে আমি যে এক মহৎ শিক্ষা পেয়েছি, সে কথা তোমায় বলছি। তা এই : 'তোমার আদর্শ যত উঁচু, তোমার দুঃখ তত বেশী।' কারণ এ দুনিয়ায় বা এ জীবনে যা আদর্শ, তাকে কখনো সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। এ জগতে যে পরিপূর্ণ সার্থকতা চায়, সে উন্মাদ, কারণ সে পূর্ণতা কখনোই পাবার নয়। অসীমকে তুমি কেমন করে সীমার মধ্যে পাবে ?' বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃ ২৮২ দ্রঃ

শোন বলি[১] মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর,[২] এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম', প্রেম' এই মাত্র ধন।

'প্রেম'—বিবেকানন্দের সব তপস্যার পরম উত্তররূপে দেখা দিয়েছে। তাই বুদ্ধি ও হৃদয়ের সংঘাতে বিবেকানন্দ হৃদয়ের চির-পক্ষপাতী। বিচারবিতর্কে নয়, আত্মোৎসর্গের মধ্যেই মানব-জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিহিত। 'রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম' থেকে সর্বস্বত্যাগী ঈশ্বর-প্রেমিক অবধি সকল সত্তার মধ্যে বিবেকানন্দ এই প্রেমের বিকাশ উপলব্ধি করেছেন—

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসারজলধি,[৩] দুঃখ সুখ করে আবর্তন।

---

১ স্বামীজীর এই সম্বোধন-প্রসঙ্গে 'বিবেকচূড়ামণির' ১৩৮ শ্লোকের শেষ শব্দ দুটি লক্ষণীয়—

অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ প্রভবিত বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্ বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।
ততোঽনর্থব্রাতো নিপতিত সমাদাতুরধিক—
স্ততো যোঽসদ্‌গ্রাহঃ স হি ভবতি শৃণু সখে॥

স্বামীজী এই 'শৃণু সখে' সম্বোধনটি মনে রেখেই—'শোন বলি' সম্বোধন করেছেন, একথা ভাবা যায়। আচার্য শঙ্করের মতোই মোক্ষসাধকদের উদ্দেশে স্বামীজীর এ সম্বোধন। শঙ্করের পরমজ্ঞান এ কবিতায় পরম প্রেমে পরিণত। মূল শ্লোকের অর্থ এই—'অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষ যে জিনিষ যা নয় তাই ভেবে ভুল করে। বিবেকের অভাবে সর্পকে রজ্জু বলে মনে হয়। এই ভুলের বশে যদি কেউ রজ্জুকে ধরতে যায়, তাহলে তার বহু বিপদ ঘটে। শোনো সখা, মিথ্যা গ্রহণই বন্ধন।' 'শৃণু সখে' থেকেই 'সখার প্রতি' নামকরণ।

২, ৩ সংসারজলধির উপমার সঙ্গে তুলনীয় বিবেকচূড়ামণি'র ১৩৬ সংখ্যক শ্লোকের পঙ্‌ক্তি—'জনিমরণতরঙ্গাপারি-সংসারসিন্ধুম্'— জন্মমরণ-তরঙ্গসঙ্কুল সংসারসমুদ্র। স্বামীজীর ভাষায়—'তরঙ্গ আকুল ভবঘোর।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি পত্রে লিখেছেন—"প্রীতিঃ পরমসাধনম্"—আবার সাধন কি?—সকলে প্রেম। স্বামীজী বলেছেন—"এক তরী করে পারাপার।" ("স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র" ১১।৮।১৭ তারিখের চিঠি।)

পক্ষহীন[1] শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার,
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম।
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।

হৃদয়ধর্মের এই অনন্তবিস্তারে বিবেকানন্দের কবিসত্তার সর্বোত্তম পরিচয়—কঠোরতম সন্ন্যাসীর গভীরতম মানবপ্রেমে এ মহাজীবনের অনন্য মহিমা। এই প্রেমই তাঁর সন্ন্যাসেরও মূল প্রেরণা। ভালোবাসার বণিকবৃত্তি নয়, ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসা—বিন্দুমাত্র প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষাহীন নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্জন—তাই বিবেকানন্দের প্রেমের আদর্শ—

ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও"—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।

দেবার প্রেরণা এলে দেখতে পাই, অনন্ত সম্পদ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। ফিরে চাইতে গেলেই সে অনন্ত স্বার্থসীমায় সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষায় আমরা আমাদের অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপকে আচ্ছন্ন করি মাত্র। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, "মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্বস্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী তা ভুলে যায়।" (কথামৃত : ৫ম : ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ সালের দিনলিপি।)

বিবেকানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে সমুদ্ভাসিত জগৎসত্য—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।

---

১ 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতায় 'পক্ষহীন' পাঠ-স্থলে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে রক্ষিত ঐ সংখ্যা উদ্বোধনে এবং উদ্বোধন-কার্যালয়ে রক্ষিত 'অজিৎকুমার রায়' এই নামাঙ্কিত প্রথম বর্ষের খণ্ডে উক্ত সংখ্যায় 'লক্ষ্যহীন' পাঠ রয়েছে। 'পক্ষহীন' পাঠই পরে স্বীকৃত।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?[১]
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সাহিত্যজগতে রোমান্টিক অন্বেষণের চরম পরিণতি হিসাবে মিস্টিক প্রত্যয়ে উত্তরণের উদাহরণ হিসাবে শেলীর কবিতাকে বলা হয় Love Mysticism-এর উদাহরণ। অর্থাৎ প্রেমের অন্তরে শেলী জীবন ও জগতের সব অসঙ্গতির উর্ধ্বে এক নিশ্চিত প্রত্যয় খুঁজে পেয়েছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থকে সে হিসাবে প্রকৃতি-চেতনার ও কীট্‌স্‌কে সৌন্দর্য-চেতনার মিস্টিক কবি বলা চলে। কিন্তু সত্যের পরম প্রকাশে এই অনুভূতিগত পার্থক্যও স্বীকার্য নয়। সে হিসাবে কঠোপনিষদের কবি যখন বলেন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

অথবা গীতার কবি যখন ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ হৃদয়ের উপমায় ছবি আঁকেন—

আপূর্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥—

তখনই আমরা সৃষ্টিরহস্যের মর্মমূলে উপনীত। বিবেকানন্দের সর্বত্যাগী প্রেম 'সখার প্রতি' কবিতার শেষ চরণে সেই গভীরতম সত্যের স্পর্শে মানবহৃদয়ের চিরন্তন আলো হয়ে উঠেছে। ভাব-সৌন্দর্যের কথা ছাড়াও প্রকাশের বলিষ্ঠরীতি এবং ভাষার অপূর্ব ওজোগুণে 'সখার প্রতি' অসামান্য সৃষ্টি। সেই সঙ্গে দুটি সার্থক চিত্রকল্পও স্মরণীয়—

'তরঙ্গ আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার'—
'যতদূর যতদূর যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহণ ;
এই সেই সংসারজলধি দুঃখসুখ করে আবর্তন।'

১ শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি'র ৩৯৪ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তি—"বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং'—'জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে আর কি বলার আছে ? জীব স্বয়ং ব্রহ্মই।'
এক্ষেত্রে 'বহুধা' শব্দটি এবং স্বামীজীর 'বহুরূপে' শব্দটির মিল লক্ষণীয়।

সুখ ও দুঃখের সমস্যাকে বিবেকানন্দ জীবনের চরম সমস্যা বলে মনে করেন নি। পরম সত্য এই সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের সাংসারিক অভিজ্ঞতার বহু উর্ধ্বে। সুখ ও দুঃখ দুয়েরই নিজস্ব মূল্য আছে। কিন্তু যাঁরা মনে করেন, পৃথিবীতে 'এমন এক সময় আসবে যখন জগতের সব দুঃখ চলে গিয়ে কেবল এর সুখগুলিই অবশিষ্ট থাকবে তখন পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।'—তাঁদের ভ্রান্তবিশ্বাসকে তিনি কখনো স্বীকার করেন নি। মানুষের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপবিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন—"তোমরা যাকে উন্নতি বল, সে ত বাসনার ক্রমাগত বৃদ্ধি মাত্র। যদি আমি কোন কিছু স্পষ্ট বুঝে থাকি, তা এই যে, বাসনা কেবল দুঃখই সৃষ্টি করে—এ ত কেবল যাচকের অবস্থা।···যদি বাসনাপূরণের শক্তি যোগখড়ি (Arithmetical) নিয়মানুসারে বেড়ে যায়, তবে বাসনার শক্তি গুণখড়ির (Geometrical) নিয়মানুসারে বাড়তে থাকবে। অনন্ত জগতের সমুদয় সুখদুঃখের সমষ্টি সর্বদাই সমান। সমুদ্রে যদি কোথাও একটি তরঙ্গ ওঠে, তবে আর কোথাও গর্তের সৃষ্টি হবেই···যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব।"[১]

[জ্ঞানযোগ—অপরোক্ষানুভূতি]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইন্দ্রিয়সুখত্যাগী 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সন্ন্যাসব্রতধারীদের বহুমুখী দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বামীজী বলতেন—'ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নেই। কেবল তমো—ঘোর তমোগুণে ইতর সাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে। কেবল সন্ন্যাসীদের ভিতরেই দেখেছি রজঃ ও সত্ত্বগুণ রয়েছে, এরাই ভারতের মেরুদণ্ড।···তারাই হচ্ছে কর্মের fountain-head (উৎস)—উচ্চ আদর্শগুলি তাদের জীবনে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ideas (ভাবধারা) নিয়েই গৃহীরা কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে।' (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ)[২]

১ বাণী ও রচনা : ২য় খণ্ড : পৃঃ ১৯৮-৯৯

২ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৫২

বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের দেশের ইতিহাসে সন্ন্যাসীর দানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি আমাদের দিতেই হবে। আবার বর্তমান ভারতের নবজাগরণের দ্রষ্টা ঋষি যখন সন্ন্যাসের নবীন আদর্শ ঘোষণা করে বলেন—"বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাসগ্রহণ করে যারা এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায়—'বৃথৈব তস্য জীবনং'। পরের জন্য প্রাণ দিতে—জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম।"[১] (স্বামি-শিষ্য-সংবাদ)—তখন আমাদেরও উপলব্ধি করতে হবে সন্ন্যাসীর সর্বত্যাগের আদর্শ কেবল অতীতের কথা নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পক্ষেও সমান সত্য।

ভারতীয় চিন্তাধারায় সন্ন্যাস-আদর্শের সেই অমর মহিমাগাথা স্বামীজীর "The Song of The Sannyasin" (সন্ন্যাসীর গীতি) কবিতায় সুগম্ভীর ভাষা ও ছন্দে রূপায়িত। চিকাগো ধর্মমহাসভার সময় থেকে অনবরত বক্তৃতা ও আলোচনায় শ্রান্ত বিবেকানন্দ কিছুদিনের জন্য সেণ্ট লরেন্স নদীবক্ষে সহস্রদ্বীপোদ্যানে বিশ্রাম নিতে এসেছিলেন। এখানে তিনি অল্প কয়জন শিষ্য-শিষ্যাদের সঙ্গে ধর্ম প্রসঙ্গে সাতটি সপ্তাহ (১৮৯৬এর ১৫ই জুন থেকে ৭ই আগস্ট) কাটিয়েছিলেন—এই ক'দিনের বাণীসঙ্কলনই স্বামীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'Inspired Talks' (বাংলায় "দেববাণী")। এই সময়ে একদিন বিকেলবেলায় ত্যাগের মহিমা ও গৈরিকের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার কথা বলতে বলতে স্বামীজী আলোচনার আসর থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন। যখন ফিরে এলেন তখন 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা পরিসমাপ্ত।

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ [illegible]

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জীবন্মুক্তির আদর্শের কাব্যরূপায়ণ হিসাবে এ কবিতা ভর্তৃহরির "বৈরাগ্যশতক" বা শঙ্করাচার্যের "বিবেক-চূড়ামণি"-র সঙ্গে একাসনে স্থান পেতে পারে। সর্ববন্ধনমুক্ত এই বৈরাগ্যেরই অন্য নাম স্বাধীনতা। সমগ্র কবিতাটি জুড়ে মানুষের এই স্বাধীন সত্তার জয়গান—

Wake up the note ! the song that had its birth
Far off, where worldly taint could never reach ;
In mountain caves, and glades of forest deep···

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রিশিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যেথা নাহি পশে···

Have thou no home. What home can hold thee, friend ?

কোনো গৃহ তুমি ক'রো না নির্মাণ
কোন গৃহ তোমা ধরে হে মহান ?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস।

··· ···

সত্য সব, কিন্তু নামরূপ পারে
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।
জানো 'তত্ত্বমসি', করো না ভাবনা,
হে বীর সন্ন্যাসি, করহ ঘোষণা—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।[১]

Know thou art That, Sannyasin bold ! Say—
"Om Tat Sat, Om !

[১] স্বামী অভয়ানন্দ-কৃত অনুবাদ 'সন্ন্যাসীর গীতি'-অবলম্বনে

আচার্য শঙ্করের 'নির্বাণষটকে'র প্রত্যেকটি শ্লোকের শেষে 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্'—এই মন্ত্রধ্বনি বারংবার ফিরে এসে পাঠকচিত্তে যে ধ্যানোপলব্ধির সৃষ্টি করে, 'সন্ন্যাসীর গীতি'র প্রতিটি শ্লোকের শেষে 'ওঁ তৎ সৎ ওঁ' উচ্চারণে তেমনি পরম সত্যের ব্যঞ্জনা ধ্বনিত। যতিরাজ শঙ্করের কাব্যসিদ্ধিও অসাধারণ। অনুগামী বিবেকানন্দের আত্মোপলব্ধিমূলক রচনায় তাঁর গভীর প্রভাব স্বাভাবিক-ভাবেই সঞ্চারিত। স্বামীজী 'নির্বাণষটকে'র একটি সুন্দর ইংরেজি অনুবাদও করেছিলেন। আগ্রহশীল পাঠকের জন্য এই অতুলনীয় কবিতার প্রথম ও শেষ দুটি শ্লোক উদ্ধৃতি করছি—

ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোমভূমির্ণ তেজো ন বায়ু—
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

... ...

অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবো ঽহম্॥[১]

১ স্বামীজী-রচিত দুটি শিবসঙ্গীতে যে ভাবতন্ময় নৃত্যরত ভোলানাথের চিত্র আঁকা হয়েছে, তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভারতের পৌরাণিক চেতনায় নটরাজ শিব সন্ন্যাসীদের আদিগুরু। শিল্পময় বিবেকানন্দের 'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা', এবং 'হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি', গান দুটিতে শিবের সেই আনন্দময় রূপটি সার্থকভাবে রূপায়িত। কালীচেতনার মতোই শিব-চেতনার ক্ষেত্রেও শাক্তদের মত শৈবেরা শেষ অবধি অদ্বৈতবাদী। তাই 'শিবোঽহং' আসলে 'সোঽহম্' মন্ত্রেরই আর এক প্রকাশ। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈতের যাত্রাপথে বিবেকানন্দের কবিতাও সব স্তরকেই ছুঁয়ে গেছে। প্রসঙ্গত স্বামীজীর 'শিবস্তোত্রম্' ও 'অম্বাস্তোত্রম্' নামে দুটি সংস্কৃত স্তবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আত্মস্বরূপের এই স্বাধীনতার পটভূমিকায় স্বামীজী দেশ ও জাতির জাগরণকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের হোমহুতাশনে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন—বিশ শতকের প্রথম যুগের সেই স্বদেশী বিপ্লবীর দল বিবেকানন্দকে তাঁদের চিন্তানায়ক গুরুর আসন দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে স্বামীজী বুঝেছিলেন, 'জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধ্বক্ ধ্বক্ করছে, ওপরে ছাইচাপা পড়েছে মাত্র।' সেই সঙ্গে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন যে, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কালে যেমন গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতা সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে মিলিত হয়েছিল, তেমনি "আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" প্রতীচ্য সভ্যতার রজোগুণাত্মক প্রাণশক্তি ও ভারতীয় জীবনধারার সাত্ত্বিক আদর্শের সমন্বয়ে যে নবীন ভারত গড়ে উঠবে তার উদ্দেশে স্বামীজীর আহ্বান—

Once more awake !
For sleep it was, not death, to bring thee life
Anew, and rest to lotus-eyes, for visions
Daring yet. The world in need awaits,
O Truth !
No death for thee.[1]

জাগো আরো একবার !
মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুনঃ সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরো উচ্চ
লক্ষ্য ধ্যান তরে, প্রদানিতে
বিরাম পঙ্কজ-আঁখি-যুগে।

১ ১৮৯৮-এর আগস্টে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জন্য লেখা।

হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন।

(অনুবাদক: স্বামী প্রজ্ঞানন্দ[১])

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল ভারত-পরিক্রমার সময় রাজার কুটির থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটির অবধি সর্বত্র পরিভ্রমণের ফলে ভারতবাসীর প্রাণস্পন্দনের যে পরিচয় পেয়েছিলেন, পাশ্চাত্য পরিক্রমার পর সেই পরিচয়ে তাঁর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। এর ফলে বিবেকানন্দ-মানসে যে ধ্যানের ভারত গড়ে উঠেছিল, তার অপূর্ব কাব্যমণ্ডিত প্রকাশ রয়েছে স্বামীজীর 'India's Message to the World' ('জগতের কাছে ভারতের বাণী') নামক অসমাপ্ত গ্রন্থের ভূমিকায়—"দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তাকে রক্ষা করিবার নিরন্তর প্রয়াসে বাধা সৃষ্টি করে, যে-সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মারূপে প্রকাশিত হইতে সহায়তা করে—এই দেশ সেই সব কিছুরই পুণ্যভূমি। এই দেশ—যেখানে আনন্দের পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনায় পাত্রটি পূর্ণতর হইলে অবশেষে এইখানেই মানুষ উপলব্ধি করিল—এ সবই অসার; এখানেই যৌবনের প্রথম সূচনায়, বিলাসের ক্রোড়ে, গৌরবের সমুচ্চ শিখরে, ক্ষমতার অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ মায়ার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে। এইখানে এই মানবতাসমুদ্রে সুখদুঃখ, সবলতা ও দুর্বলতা, ধন-দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, জন্ম-মৃত্যুর তীব্র স্রোত-সংঘাতে, অনন্ত শান্তি ও স্তব্ধতার বিগলিত ছন্দের আবর্তনে উত্থিত হয় বৈরাগ্যের সিংহাসন! এই দেশেই জন্মমৃত্যুর মহাসমস্যাসকল—জীবন-তৃষ্ণা, এ-জীবনের জন্য ব্যর্থ উন্মাদ প্রচেষ্টার ফলে সঞ্চিত দুঃখরাশি—সর্বপ্রথম আয়ত্তে আনিয়া সমাধান

১. পূর্বজীবনে প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীদেবব্রত বসু।

া হয় ;—এমন সমাধান অতীতে কখনও হয় নাই বা ভবিষ্যতে
নও হইবে না ; এইখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় যে, এই
বনটাই অনিত্য—যাহা পরমসত্য, তাহারই ছায়ামাত্র !

"এই একটি দেশ, ধর্ম যেখানে বাস্তব সত্য ;—এইখানেই নরনারী
হসের সঙ্গে অধ্যাত্ম-লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঝাঁপ দেয়, ঠিক
মন অন্যান্য দেশে দরিদ্র ভ্রাতাদের বঞ্চিত করিয়া নর-নারী জীবনের
সামগ্রীর জন্য উন্মাদের মতো ঝাঁপ দেয়। এইখানেই মানবহৃদয়
শুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবগণ হইতে তুচ্ছ ধূলিকণা অবধি,
চতম সত্তা হইতে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত সবকিছুকে ধারণ করিয়া
রও বিশাল—অনন্তপ্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই
নবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করিয়াছে,
হার প্রতিটি স্পন্দন আপন নাড়ীর স্পন্দন বলিয়া মনে করিয়াছে।"[১]

স্বামীজীর এই ধ্যানের ভারতবর্ষ সহস্র পতন-অভ্যুত্থানের মধ্য
য়ে চিরকাল অগ্রসর হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে তার গতিবেগ
মিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু—"হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো
খনো অধঃপতন হয় নাই ! সত্যই এক মহিমময় ভবিষ্যৎ ! প্রাচীন
পনিষদের যুগ হইতে পৃথিবীর সমক্ষে আমরা সগৌরবে প্রচার
রিয়াছি—ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" বিভিন্ন
নবজাতির অস্তিত্বের সংগ্রামে ভারতবর্ষের নিজস্ব সমাধান তার
পার্থিবতা, তার সর্বস্বত্যাগের আদর্শ। এই ত্যাগের আদর্শই
থিবীর কাছে প্রবুদ্ধ ভারতের বাণী—

And tell the world :

Awake, arise, and dream no more !

....

Be bold and face

The Truth ! Be one with it ! Let visions cease.

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : পঞ্চম খণ্ড : পৃঃ ৩৭৩-৭৪ : অনুবাদ :
ধককৃত

Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.

(To The Awakened India)[১]

একদিকে অনন্ত প্রেম ও নিঃস্বার্থ সেবার সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি, অন্যদিকে সর্বজীবে ব্রহ্মোপলব্ধি থেকে সেবা ও প্রেমের করুণাধারায় বিশ্বকল্যাণে আত্মোৎসর্গ—বিবেকানন্দ-জীবন এই দুইধারার সঙ্গমতীর্থ। ব্রহ্ম ও জগৎ—মানবমনের বিকাশের স্তরভেদে দুইই সত্য। একেবারে একধাপে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—জাতীয় উপলব্ধির জগতে পৌঁছানো দুর্লভ অধিকারীদের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই জগৎসত্য থেকেই ক্রমে নিখিলবিশ্বের প্রতি ভালোবাসায় নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে সত্যের পরম ঐক্যে পৌঁছানোর সাধনাই শ্রেয়। তাই মানবপ্রেম এবং সেবাধর্মও একহিসাবে স্বপ্ন—স্বামীজীর ভাষায় 'truer dreams' (মহত্তর স্বপ্ন)। যে মানুষ 'সোঽহম্' উপলব্ধি করে নি, তার পক্ষে ওই মহত্তর স্বপ্নই শ্রেয়-সাধনা।

তাই আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণী-প্রচারের মতো জাতীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও বিবেকানন্দের স্বধর্ম। ফরাসীবিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলন, ভারতবর্ষের সিপাহীবিদ্রোহ—এ সবই স্বামীজীর গর্ব ও গৌরবের বস্তু ছিল। পৃথিবীতে যেখানেই মানুষ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় সংগ্রামরত সেখানেই এই পরমস্বাধীন সংগ্রামী সন্ন্যাসীর অভিনন্দন—"The history of the world is the history of few men who had faith in themselves. That faith calls out the Divinity within. As soon as a man or a nation loses faith in himself, death comes. Believe first in yourself, then in God"[২]

---

১ In Search of God and other Poems : Vivekananda : p. 23
বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : অনুবাদ দ্র

২ 'জগতের ইতিহাস হলো মুষ্টিমেয় আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মকে জাগিয়ে তোলে। যে মুহূর্তে কোনো ব্যক্তি বা

স্বামীজীর জীবনে বিশেষভাবে বিধিনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ছিল আমেরিকা। আমেরিকার মানুষের মনুষ্যত্বের সম্মান ও অধিকারবোধ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস স্বামীজী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন।

প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে কাশ্মীর-ভ্রমণের সময় ভ্রমণসঙ্গী আমেরিকাবাসীদের স্বাধীনতা-উৎসব উপলক্ষ্যে ১৮৯৮-এর ৪ঠা জুলাই (কবিতাটি বোধ হয় আগের দিন লেখা) স্বামীজী তাঁর নৌকায় একটি ছোট্ট উৎসবের আয়োজন করেন। সঙ্গীদের বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রবণে "To The Fourth of July" (চৌঠা জুলাইয়ের উদ্দেশে) কবিতাটি যে অপার আনন্দ সঞ্চার করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

পরাধীনতার তমিস্রা ভেদ করে চৌঠা জুলাইয়ের স্বাধীনতাসূর্য দেখা দিল—এই সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় যুগ যুগ ধরে অপেক্ষারত সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি সমস্বরে অভিনন্দন জানালো—

All hail to thee, thou Lord of Light!
O Sun! To-day thou sheddest Liberty!

স্বাধীনতার এই পরম সম্পদ লাভের জন্য মানুষের কত না আত্মদানের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ। সেই সব চিরস্মরণীয় মহামানব—যাঁদের সাধনা, সংগ্রাম ও দেশপ্রেমের তপস্যার পরিপূর্ণ ফলস্বরূপ স্বাধীনতার আলোকে আজ মানবজাতি অভিষিক্ত। এ স্বাধীনতা কোনো বিশেষ জাতি বা দেশের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। স্বামীজীর প্রার্থনা—৪ঠা জুলাইয়ের এই স্বাধীনতাসূর্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারীর পরাধীনতাশৃঙ্খল মোচন করে উন্নতশির নবজীবনের অধিকার এনে দেবে—

Move on, O Lord, in thy resistless path!
Till thy high noon o'erspreads the world,

জাতি নিজের প্রতি বিশ্বাস হারায়, অমনি তার বিনাশ ঘটে। আগে নিজেকে বিশ্বাস করো। তারপর ভগবানে বিশ্বাস।' কর্মযোগ: বাণী ও রচনা: ৩য় খণ্ড: পৃঃ ১৭২ দ্র

Till every land reflects thy light,
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed.[১]

অরুণোদয় থেকে সূর্যপরিক্রমার গতিময় চিত্রকল্পে স্বাধীনতার ভাবসত্যটি এ কবিতায় যে সার্থক কাব্যরূপ লাভ করেছে, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের সাহিত্যজগতে তা স্মরণীয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

*

মানুষ মাত্রেরই একাধিক সত্তা। বিবেকানন্দের মতো মহা-মানবের মধ্যে মানবসত্তার বহু-বৈচিত্র্যের একত্র রূপায়ণ। কখনও তিনি দৃপ্ত সংগ্রামশীল কর্মযোগী, কখনও ধ্যানসমাহিত দ্রষ্টা ঋষি, কখনও ভক্তিতন্ময় ভাবুক কবি। আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে একদা তিনি বলেছিলেন—"শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইরে থেকে কেবল ভক্তিময় মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জ্ঞানী; কিন্তু বাইরে থেকে (বিবেকানন্দকে) জ্ঞানী বলে মনে হলেও তাঁর অন্তরটি ভক্তিময়।" [স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে : নিবেদিতা]

জ্ঞান ও ভক্তির দুটি ধারা মিলিত গঙ্গা-যমুনার মতো যে বিবেকানন্দ-সাহিত্যসৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে ভক্তির পরিচয় অন্তর্লীন। সংস্কৃত ও বাংলা স্তবরচনাগুলি বাদ দিলে ভক্তিরসের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য মাত্র দুটি কবিতায় পরিস্ফুট। কিন্তু "Thou Blessed Dream" কবিতার স্বপ্নচারণের মতো সে কবিতাগুলির মধ্যেও স্বামীজীর কবিসত্তার গভীরতম পরিচয় নিহিত।

বিবেকানন্দের হৃদয়াকাশের ধ্রুবতারা শ্রীরামকৃষ্ণ। "আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে 'দেই তুলসি তিল দেহ সমর্পিলু' করিয়াছি।"[২] "তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা

১ In Search of God : Vivekananda : p. 24 ; বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : অনুবাদ দ্র

২ প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা ২৬শে মে, ১৮৯০ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার নানা অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্য মাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি —কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।"[১]

এ দুই মহামানবের হৃদয়বন্ধন এক পরমাশ্চর্য ইতিহাস। এই ভালোবাসা মানবকল্যাণের জন্য নিঃশেষে আত্মদানের মধ্য দিয়ে প্রাচ্যে প্রতীচ্যে মানবজীবনে কত নব নব ভাবের কুসুম ফুটিয়ে তুলেছে—সেই নেপথ্য কাহিনীমালা অনাগত দিনের কবি-শিল্পীদের উপকরণ হয়ে রইল।

বিবেকানন্দের কবিতায় রামকৃষ্ণ-তন্ময়তার উদাহরণ মেলে "O'r Hill and dale and mountain range"—শীর্ষক ইংরেজী ও "গাই গীত শুনাতে তোমায়" শীর্ষক বাংলা কবিতা দুটিতে। প্রথম কবিতাটি শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের অমর গ্রন্থ "Swami Vivekananda In America: New Discoveries"[২]-এ পাওয়া গেছে; চিকাগো-ধর্মমহাসভার মাত্র এক সপ্তাহ আগে অধ্যাপক রাইটকে লেখা (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩) পত্রাংশ। দ্বিতীয় কবিতাটি ১৮৯৪ সালে কোনো গুরুভ্রাতাকে লেখা পত্রের মধ্যে প্রথম অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। বোধ হয়, কবিতার শেষাংশ পরবর্তীকালের সংযোজন।

প্রথম কবিতাটি থেকে দ্বিতীয় কবিতাটিতে ভাবের উত্তরণ ও প্রসার সুস্পষ্ট। সে হিসাবেও এ দুটি কবিতা পাশাপাশি আলোচ্য।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সতীর্থ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজের পার্থক্য-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন,—"সমস্ত বন্ধন ও অন্তহীন সংগ্রাম

১ প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা ৩রা মার্চ, ১৮৯০ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।
২ In Search of God: pp. 3-5

থেকে মুক্ত করবার মতো এমন কোনো মহাশক্তির সন্ধানে বিবেকানন্দের বারংবার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি শুধু তাঁকে বিশুদ্ধ হেতুবাদের সর্বোচ্চ মহিমার কথাই বলতে পারলাম, বিশ্বের অন্তর্নিহিত যে হেতুবাদের সঙ্গে একাত্মতার ফলে অন্তরে আসবে অমেয় প্রশান্তি। তখন আমার অন্তর্লোকে প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদের জয়জয়কার চলেছে।...কিন্তু এ সময় তাঁর সমস্যা আমার ছিল না, আমার অসুবিধাগুলিও তাঁর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তিনি স্বীকার করতেন যে, যদিও নির্বিশেষ তত্ত্বের দ্বারা তাঁর বুদ্ধি অধিকৃত, তবু তাঁর হৃদয় চায় ব্যক্তিসত্তার অহং, আর অনুযোগ করতেন যে রক্তহীন বিবর্ণ হেতুবাদ যা বাস্তবরূপে কখনো সর্বময় হয়ে ওঠে না, কেবল ভাবরাজ্যেই যার অধিষ্ঠান, তা কখনো তাঁকে প্রলোভনের মুহূর্তে রক্ষা করতে পারে না। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, আমার দর্শন কি তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠবে, আত্মার উদ্ধারের জন্য শরীরী প্রত্যক্ষতা লাভ করবে; সংক্ষেপে তিনি চাইলেন রক্তমাংসে সাকার মহিমাদীপ্ত সত্যের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি; সবার উপরে তিনি ব্যাকুল আহ্বান জানালেন এমন এক শক্তির করস্পর্শের জন্য যে তাঁকে উদ্ধার করবে, রক্ষা করবে, যা তাঁর অতীত অথচ যার দ্বারা তাঁর সব ব্যর্থতা, সব শূন্যতা মহান গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে—তিনি চাইলেন, একজন গুরু বা শিক্ষাদাতা যিনি রক্তমাংসের শরীরেই পূর্ণতার প্রতীক হয়ে তাঁর হৃদয়ের সমস্ত অশান্তির নিরাকরণ করবেন।"

তরুণ নরেন্দ্রনাথের এই ব্যাকুল-অন্বেষণের উত্তররূপে দেখা দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের সব অন্বেষণ, সব শূন্যতা পূরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আপন চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী রেখে মরদেহ ত্যাগ করলেন। ভবিষ্যৎ শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘনায়ক আলমবাজারে-বরাহনগরে গুরুভাইদের নিয়ে সন্ন্যাসজীবনের সাধনায় মগ্ন হলেন। যে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিত্যদিনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে লাভ করেছিলেন, আজ আবার তাঁকেই মর্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য নবীন সন্ন্যাসীদের কঠোর তপস্যা চলল। একে একে তাঁরা ভারতবর্ষের

নানা তীর্থে সাধনা ও পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লেন। সেই পরিব্রাজক দলেরই অন্যতম নরেন্দ্রনাথ—কখনো গুরুভাই বা শিষ্যসঙ্গে, কখনো একাকী—জীবনের সেই পরমমুহূর্তটিকে আবার ফিরে পাওয়ার সাধনায় আসমুদ্রহিমাচল পরিভ্রমণরত। সেই অন্বেষণের বেদনা-ব্যাকুল দিনগুলিতে—

O'r Hill and dale and mountain range,
In temple church and mosque,
In Vedas Bible Al koran
I had searched for thee in vain.
Like a child in the wildest forest lost
I have cried and cried alone,
'Where art thou gone my God my love ?'
The echo answered 'gone'.

পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়,
গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে—
বেদ বাইবেল আর কোরানে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।
মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মতো
কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ,—
তুমি কোথায়—কোথায়—আমার প্রাণ, ওগো ভগবান ?
নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।

দিন, রাত্রি, মাস, বর্ষ কেটে যায়।
আগুন জ্বলতে থাকে শিরে,
কিভাবে দিন রাত্রি হয় জানি না,
হৃদয় ভেঙে যায় দুভাগ হয়ে।

গঙ্গার তীরে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়,
রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি,
ধূলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু,
হাহাকার মিশে যায় জনকলরবে ;
সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের
নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীর হয়ে,
বলি, আমাকে পথ দেখাও, দয়া কর,
ওগো, তোমরা যারা পৌঁছেছ পথের প্রান্তে।
কত বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে,
মুহূর্ত মনে হয় যুগ যেন,
তখন—একদিন আমার হাহাকারের মধ্যে
কে যেন ডাকল আমাকে আমারি নাম ধরে।
মৃদু মধু আশ্বাসের মতো এক স্বর—
'পুত্র, আমার !'

...   ...

জ্বলে উঠলো আত্মা পরম জ্যোতিতে,
খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার,
আনন্দ ! আনন্দ ! একি অপরূপ !
প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বস্ব আমার,
তুমি এখানে, এত কাছে,—আমারি হৃদয়ে ?
আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল রাজার গৌরবে !'[১]

তারপর বিশ্বচরাচরের সর্বত্র প্রিয়তমের মধুময় আনন্দজ্যোতি পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল—পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে, প্রভাতসূর্যের অরুণরাগে, পবিত্র বন্ধুত্বে, অপার মাতৃস্নেহে—এমন কি জীবনের

---

১ 'সন্ধান ও প্রাপ্তি' : স্বামী বিবেকানন্দ ; অনুবাদ : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ; উদ্বোধন, শ্রাবণ-সংখ্যা, ১৩৬৮ এবং বাণী ও রচনা ; ৬ষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ৩৭১

দুঃসহতম দুর্দিনে মৃদুস্বরে ধ্বনিত হতে লাগল, "আমি আছি, একান্ত কাছেই রয়েছি।" দিব্যসম্বন্ধে আবদ্ধ এ দুই পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হয় নি।

তবু, একবার যেন বিচ্ছেদের আভাস দেখা দিয়েছিল। সে বড়ো গোপন বেদনার ইতিহাস। বাইরের ঘটনাবলী আমাদের সুবিদিত। পরিব্রাজক অবস্থায় ১৮৯০ সালে নরেন্দ্রনাথ গাজীপুরে পওহারীবাবার যোগীজীবনের আদর্শে কিছুকালের জন্য একেবারে অভিভূত। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী চিঠিতে লিখছেন—"বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি ও যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়েছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না।" সাধু-সন্ত মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা আর শরণাগতি এক কথা নয়। তারপর ৩রা মার্চের চিঠি—"পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি 'উল্টা সমঝলি রাম"!—কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধ হয়, ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইহাকে উদ্বেজিত করা ঠিক নহে, স্থির করিয়াছি: এবং বিদায় লইয়া শীঘ্রই প্রস্থান করিব।"—এর পরেই শেষে আবার পুনশ্চ—"আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—আপনাতে আপনি থেকো মন······

এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense Sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধজীবের জন্য—এ জগতে আর নাই।"

একমাসের মধ্যে এই মত পরিবর্তনের পিছনে শুধু যুক্তিগত

তুলনা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শনও বিবেকানন্দকে প্রভাবিত করেছিল। পওহারীবাবার কাছে দীক্ষার্থে কৃতসঙ্কল্প স্বামীজীর ভাবচিত্রটি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের "বিবেকানন্দ-চরিতে" সার্থক বাণীরূপ লাভ করেছে—'গভীর নিশীথে স্বামীজী পওহারীবাবার গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ না পওহারীবাবা? এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র তাঁহার হৃদয় দমিয়া গেল। বিহ্বল হৃদয়ে সংশয়-দ্বন্দ্বালোড়িত চিত্তে বিবেকানন্দ ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অসীম কৃপা, গভীর ভালোবাসা, সস্নেহ ব্যবহার পর্যায়ক্রমে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহার ব্যথিতচিত্ত আত্মধিক্কারে ভরিয়া উঠিল। সহসা তাঁহার অন্ধকারময় কক্ষ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বামীজী অশ্রুসজল নেত্র তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনের আদর্শ সেই অদ্ভুত দেব-মানব সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত নেত্রদ্বয়ে স্নেহ-সকরুণ ব্যথিত ভর্ৎসনা, বিবেকানন্দের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, প্রহরকাল প্রস্তর-মূর্তির মত ভূমিতলে বসিয়া রহিলেন। প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত দর্শন তিনি মস্তিষ্কের দৌর্বল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়া আগামী রজনীতে পুনরায় পওহারীবাবার নিকট যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। সেদিনেও সেই পূর্বদৃষ্ট জ্যোতির্ময় মূর্তি তেমনি-ভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া!! এইরূপে সপ্তবিংশতিদিবস অতিবাহিত হইলে পর, একদিন তিনি মর্মবেদনায় ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "না আমি আর কাহারও নিকট গমন করিব না। হে রামকৃষ্ণ! তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য, আমি তোমার ক্রীতদাস! আমার এ আত্মহারা দৌর্বল্যের অপরাধ ক্ষমা কর প্রভো!"

পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলে অব্যক্ত বেদনায় স্বামীজীর মুখখানি গম্ভীর হয়ে উঠত। জীবনের এই গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দজীবনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—একটু বিস্ময়ের হলেও এ কাহিনী তাঁর মানসজীবনের অন্তরতম সত্য।

এমনি সব ঘটনা ও ভাবনার মধ্য দিয়ে বিচ্ছেদ ও সংশয়ের পরমমূল্য আমরা উপলব্ধি করি।[১]

জীবনে যে বেদনা অকথিত ছিল, কবিতায় একদিন সে কথা আভাসে ফুটে উঠেছে, তারপর সে বেদনাকে অতিক্রম করে পরম-সত্যের অনাহত বাণী ধ্বনিত।

গাই গীত শুনাতে তোমায়,
ভাল মন্দ নাহি গণি,
নাহি গণি লোকনিন্দা যশকথা।
দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।
আছ তুমি পিছে দাঁড়াইয়ে
তাই ফিরে দেখি তব হাসিমুখ।
ফিরে ফিরে গাই, কারে না ডরাই,
জন্মমৃত্যু মোর পদতলে।
দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে!
তব গতি নাহি জানি,
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
ভুক্তি মুক্তি ভক্তি আদি যত,
জপ তপ সাধন ভজন,
আজ্ঞা তব, দিয়েছি তাড়ায়ে;
আছে মাত্র জানাজানি-আশ,
তাও প্রভু কর পার।[২]

---

১ বর্তমান লেখকের 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অধ্যায়ে 'গাই গীত শুনতে তোমায়' কবিতাটির আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২ 'স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র'—গ্রন্থে তুরীয়ানন্দের ৩৫।১৬ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য—"তাঁর দ্বারে পড়িয়া থাকিলে তিনি সময়ে সকল আশা পূর্ণ করেন। কিন্তু নিরাশ হইয়া থাকিতে পারিলে তিনি অধিকতর সুখী হন। "আছে মাত্র জানাজানি আশ, তাও প্রভু কর পার" স্বামীজী এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন।"

পরম নির্ভরতার এই অভয়সংগীত গাইতে গাইতে মনে পড়ে, জীবনে এমনও হয়েছে—

ছেলেখেলা করি তব সনে,
কভু ক্রোধ করি তোমা'পরে,
যেতে চাই দূরে পলাইয়ে,
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে
নির্বাক আনন, ছলছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে।
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা ?

বিবেকানন্দজীবনে অনন্য শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সমস্ত সংগ্রামের সখা ও সারথি, তাঁর অন্তরতম ধ্যানের নিভৃত ইষ্টদেবতা—

প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি,
বীণাপাণি কণ্ঠে মোর,...

"O'r Hill and dale" কবিতাটিতে ব্যক্তি রামকৃষ্ণ বিশ্বচেতনায় ব্যাপ্ত। "গাই গীত শুনাতে তোমায়" কবিতায় সে বিশ্বচেতনা অনাহত ধ্বনিতে পরিণত। বিশ্বসৃষ্টির আদি ও অবসানে পরিব্যাপ্ত এ কবিতার চির-উৎস এই মহাবাণী—

"আমি আদি কবি
মম শক্তি বিকাশ-রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।"

"রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিশ্চ"—সব রূপের মধ্য দিয়ে তাঁরই বিকাশ—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার।"

*

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "তোর সমাধির ঘরে চাবি দেওয়া রইল।" বিশ্বকল্যাণের মহাব্রতে ঝঞ্ঝাবেগে ধাবমান (স্বামীজীকে আমেরিকাবাসীরা নাম দিয়েছিল 'The Cyclonic Monk') এই বিশাল হৃদয় তবু কি কোনোদিন একেবারে সেই নিবাত নিষ্কম্প ধ্যানের মুহূর্তটি ভুলতে পেরেছিল? ফিরে ফিরে সেদিনের অমৃত অনুভবের কথা তাঁর বাণী ও রচনায় আভাসে ইঙ্গিতে দেখা দিয়েছে। 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি' অথবা 'গাই গীত শুনাতে তোমায়'—সেই আপাত নিষিদ্ধ নির্বিকল্প সমাধির ইঙ্গিতময় কাব্যরূপ।

আমেরিকার বিপুল কর্মপ্রবাহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কখনো কখনো তাঁর মনে হতো—

On little life's high, narrow bridge I stand
and see below
The struggling, crying, laughing throng
For what? no one can know.[১]

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমায় সেই শিশুটির মতো সংসারের খেলাঘর ছেড়ে বিশ্বজননীর কাছে ফিরে যাবার ব্যাকুলতায় জীবনের সবচেয়ে কর্মমুখর দিনগুলির মধ্যেই তিনি প্রার্থনা করেছেন—

Let never more delusive dreams veil off
Thy face from me
My play is done, O Mother; break my chains
and make me free!

'কর্মযোগে' স্বামীজী বলেছেন—"আদর্শ পুরুষ তিনিই, যিনি গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্রতম কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার

১ 'My Play is done'—১৮৯৫-এর বসন্তকালে নিউইয়র্কে লেখা : দ্রঃ In Search of God : pp. 9-12 বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : অনুবাদ দ্র

মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা অনুভবকারী।···বাণিজ্যবহুল মহানগরীতে ভ্রমণ করলেও নিঃশব্দ গুহাবাসীর মতো তাঁর মন শান্ত থাকে, অথচ, সে মন প্রবল কর্মপরায়ণ।" সব কর্মমুখরতার অন্তরালে এই কি সেই নিঃশব্দ ধ্যানের আহ্বান?

বিবেকানন্দের মতে জগতের অতুলনীয় গ্রন্থ—'গীতা'। সেই গীতার অমর অধ্যাত্মবাণী উচ্চারিত হয়েছে উদ্যত সংগ্রামের মুখোমুখি।

জীবনের ক্ষেত্রেও তাই—অনন্ত সংগ্রামের মধ্যেই অপার শান্তির উপলব্ধি। নিবেদিতার আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মচারিণী বেশ গ্রহণ উপলক্ষ্যে রচিত 'Peace' কবিতাটিতে সংগ্রামের অন্তর্লীন 'শান্তি'র উপলব্ধি অপূর্ব প্রকাশভঙ্গীগুণে মহৎ কাব্যের মহিমা লাভ করেছে—

Behold, it comes in might,
The power that is not power,
The light that is in darkness,
The shade in dazzling light.
It is joy that never spoke,
And grief unfelt, profound,
Immortal life unlived,
Eternal death unmourned.[১]

সমগ্র কবিতাটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ—

ওই দেখ—আসে মহাবেগে
মহাশক্তি, যাহা শক্তি নয়—
অন্ধকারে আলোকস্বরূপ,
তীব্রালোকে ছায়ার আভাস।
আনন্দ যা হয়নি প্রকাশ,
অবেদিত দুঃখ সুগভীর,
অযাপিত অমৃত জীবন—
অশোচিত মৃত্যু সনাতন।

[১] In Search of God : p. 31

দুঃখ নয়, আনন্দও নয়,
মাঝে তার তারে বোধ হয়,
রাত্রি নয়, উষাও সে নয়—
উভয়ের মাঝে জুড়ে রয়।
সঙ্গীতের মাঝে মধু সম—
সুপবিত্র ছন্দ মাঝে যতি,
নীরবতা কথার অন্তরে,
মাঝে দুই রিপু তাড়নায়
হৃদয়ের শান্ত ভাব সে যে!
অদেখা সে সৌন্দর্য সত্তায়,
সে যে প্রেম একাকী অদ্বয়,
অগাহিত জাগে মহাগান—
অজানিত পরিপূর্ণ জ্ঞান।
মৃত্যু দুই জীবনের মাঝে,
স্তব্ধতা সে ঝঞ্ঝাদ্বয় মাঝে,
মহাশূন্য—যা হতে সৃজন
যাহে পুনঃ আসিছে ফিরিয়া।
এরি লাগি ঝরে আঁখিজল
সারা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে
এ যে শান্তি লক্ষ্য জীবনের
—একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয়।[১]

ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের অতীত এ কবিতার ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের ভাষায় বলা যায়—"বোঝে প্রাণ বোঝে যার।"

১ অনুবাদ : স্বামী নিরাময়ানন্দ (পূর্বনাম : ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য) : বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৪৩০

অনুবাদক বিবেকানন্দ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদকের বিশিষ্ট ভূমিকা সব কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির জীবনেই আবশ্যিক। জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিধি যতো বিস্তৃত হয়ে চলেছে এবং মাতৃভাষায় সে জ্ঞানবিজ্ঞান-আহরণই যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা,—একথা যত স্বীকৃত হচ্ছে, ততই বিভিন্ন দেশের ভাষায় বিশ্ব-সাহিত্যের ও বিশ্বমননের অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় রূপে দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশে এখনো যথেষ্ট মনোযোগের সঙ্গে আমরা আত্মনিয়োগ করতে পারি নি। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় কিন্তু বিদেশী ও দেশী গদ্যলেখকদের হাতে দেশ-দেশান্তরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগ্রহ থেকেই বাংলা গদ্যসাহিত্যের জয়যাত্রার আরম্ভ। এই প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে সেকালের অনেকের মতো স্বামী বিবেকানন্দও বিশেষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। এ সংবাদ আমরা আভাসে-ইঙ্গিতে কিছুটা জানতে পারলেও এ পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাওয়া যায় নি বলে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্বামীজীর অনূদিত হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' বইখানির যে বাংলা রূপান্তর পেয়েছি, তাতে করে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের এই অনালোচিত অধ্যায়টি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার বলে মনে করি।

অনুবাদক দুই জাতের। আক্ষরিক অনুবাদক, যাঁরা যথাসম্ভব মূলের স্বাদ, গন্ধ ও গভীরতা বজায় রাখার চেষ্টা করলেও বহিরঙ্গ যাথার্থ্যের উপরেই জোর দেন বেশী। আর একদিকে আছেন ভাবানুবাদক, যাঁরা আক্ষরিক যাথার্থ্যের চেয়ে আদর্শ বা ভাবের সত্যটুকু পাঠকের মনে সঞ্চার করতে আগ্রহী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবাদকের মধ্যে পড়েন, যাঁরা বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের দৌত্যকার্যে নিয়োজিত। সে দৌত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে

সরকারী তকমা-আঁটা নয়, মানবপ্রীতি বা সাহিত্যপ্রীতির আন্তরিকতারই ফল।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ—এঁরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দূত। কিন্তু এঁদের রচনায় ইংরেজীতে ভারতীয় ধ্যানধারণার অনুবাদ যতটা হয়েছে, সে পরিমাণে বাংলায় বিদেশী রচনার অনুবাদ দেখা যায় না। তবু ভারতাত্মার অন্তরের বাণীকে বিশ্বসভায় ধ্বনিত করায় যে দায়িত্ব এঁরা পালন করেছেন, শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের তাই সবচেয়ে বেশী গৌরব।

পাশ্চাত্যের উদ্দেশ্যে ভারতের বেদ, উপনিষদ, পুরাণের ভাব ও ভাষার যথাসম্ভব সরল রূপায়ণ যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় রাজা রামমোহন। বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদের মাধ্যমে রামমোহন বিশ্ববাসীর কাছে ভারতপ্রজ্ঞার উদাহরণ স্থাপন করেছেন। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবলীতে ভারতীয় সাধনার সঙ্গে খৃষ্ট বা প্রতীচ্য-ভাবনার সম্মেলন লক্ষণীয়। বিবেকানন্দের আমেরিকা-য়ুরোপ-পরিক্রমার মূল প্রেরণা যে উপনিষদের অভীমন্ত্রপ্রচার, সেকথা নিজেই তিনি নানাভাবে বলেছেন। প্রতীচ্যের কাছে প্রাচ্যের বাণী ঘোষণা এবং প্রাচ্যের অন্তরে প্রতীচ্যের বৈশিষ্ট্যসঞ্চার—এ দুইই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সাধনার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা বা রচনায় এ জাতীয় ভাষান্তরের উদাহরণ মেলে যথেষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার উত্তরাধিকারীরূপে জগতের বিভিন্ন সাধনপন্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তৃতায় সবচেয়ে বেশী আলোচিত উপনিষদ বা বেদান্ত। সারাজীবন এই বেদান্তের অভয়বাণীকে স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারের ব্রত নিয়ে ঘূর্ণমান ঝড়ের মতো তিনি মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে ছুটে বেড়িয়েছেন। কখনো এই উপনিষদের বাণী তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের অধ্যাত্মমহিমায় রূপান্তরিত হয়েছে, আরও গভীরতর অর্থ লাভ

করেছে। উদাহরণস্বরূপ স্বামীজীর বহুব্যবহৃত 'অভীঃ' শব্দটি লক্ষণীয়। উপনিষদ থেকে আহরিত এই 'অভীঃ'[১] মন্ত্রটি ঠিক এই আকারে কোনো উপনিষদে আছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু আত্মোপলব্ধির অটলসংকল্পে স্থিরনিশ্চয় নচিকেতার মতো সত্যান্বেষণ ও সত্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আদর্শে এই 'অভীঃ' শব্দটির ব্যঞ্জনা সমগ্র উপনিষদকেই জাতীয় জাগরণের আধারশক্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কঠোপনিষদের 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'[২] চরণটি স্বামীজীর স্বচ্ছন্দ অনুবাদে 'Arise! Awake! And stop not till the goal is reached.[৩] (ওঠো জাগো, অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থামিও না।)—এই রূপ লাভ করেছে। কিন্তু এর মূল অর্থ দাঁড়ায়, 'ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে গিয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানো।' এক্ষেত্রে মনে হয়, আক্ষরিক অনুবাদের আদর্শকে অতিক্রম করে স্বামীজীর জীবনদর্শনই প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে এ যুগের কবির্মনীষীর বাণীমন্ত্রে অতীতের ঋষিকবির বাণী পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। সুতরাং 'Arise! Awake!' ছাড়া বাকি অংশটুকু অনুবাদ নয়, নূতন সৃষ্টি। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার মূলমন্ত্ররূপে স্বামীজী এই বাক্যটিই নির্দেশ করেছিলেন।

এ জাতীয় উদাহরণ স্বামীজীর বাণী ও রচনায় যে খুব বেশী মেলে তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিমূর্ত অদ্বৈততত্ত্বকে স্বামীজী যথাসম্ভব সর্ব

১ 'অভীঃ' শব্দটি না থাকলেও 'অভয়' শব্দটি কঠোপনিষদে লক্ষণীয়। 'অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি।' কঠোপনিষৎ ১।৩।২: উপনিষৎ গ্রন্থাবলী (১ম): স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত

২ কঠোপনিষদ ১।৩।১৪: তদেব।

৩ প্রসঙ্গত স্মরণীয় স্বামীজীর বাণী—" 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম।" বাণী ও রচনা: ৯।১৬৪ এক্ষেত্রেও স্বামীজী মূল শ্লোকের প্রথমাংশ ব্যবহার করেছেন।

জনের উপযোগী করে তুলেছেন। এ যে শুধু তাঁর জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টা তা নয়। স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও রচনা অনুধাবন করলে বোঝা যায় অধ্যাত্মদর্শনের এক সামগ্রিক পরিপূর্ণতাই তাঁর লক্ষ্য ও তাঁর রচনাবলীতে তা সাধিত। প্রয়োজন শুধু যোগ্য উত্তরাধিকারীদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা।[১]

বাংলা সাহিত্যকে দেশ ও বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রয়োজনে এই কিছুকাল আগেও স্কুল ও কলেজে বিদ্যার্থীদের ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদের রেওয়াজ ছিল। মূলতঃ সংস্কৃত এবং ইংরেজী, সেইসঙ্গে কিছু পরিমাণে ফারসী ও ফরাসী থেকে বাংলা অনুবাদসাহিত্য গড়ে উঠেছে। মূল রচনা জার্মান বা চীনা-জাপানী-সাহিত্যের অনুবাদও কিছু কিছু দেখা যায়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা থেকেও মাঝে মাঝে অনুবাদ হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য একাডেমীর প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজির অন্যতম টমাস-আ-কেম্পিসের নামে প্রচলিত 'Of The Imitation of Christ'-এর বাংলা অনুবাদের সূচনা করেছিলেন স্বামীজী 'ঈশা অনুসরণ' নাম দিয়ে। যীশুখৃষ্টের জীবন ও সাধনার প্রতি বিবেকানন্দের অন্তরতম অনুরাগ এবং সেই সঙ্গে এদেশে সমাগত বিদেশী পাদ্রী সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারের নামে রাজনীতির বেসাতির প্রতি স্বামীজীর সুতীব্র ভর্ৎসনা—এ দুয়ের সঙ্গে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকবৃন্দ সুপরিচিত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের এই অমর গ্রন্থটি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রধান প্রেরণা-উৎস। তাঁর সন্ন্যাসজীবনের প্রথম দিকে বরাহনগর থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছেন—"মহাশয়কে একখানি—কোন খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসীর লিখিত—Imitation of Christ নামক পুস্তক পাঠাইলাম।

১ সম্প্রতি কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার প্রকাশিত 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থখানি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য। খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এ প্রকার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।"[১]

তার আগের চিঠিতে নিজের জীবনে পরমসত্যের জন্য সর্বদুঃখ-বরণের আদর্শকে পরিচায়িত করেছেন 'ঈশা অনুসরণের' ভাষায়—"For 'we have taken up the cross'. Thou hast laid it upon us and grant us strength that we bear it unto death. Amen"[২] কারণ, যে ক্রুশকাষ্ঠ তুমি আমাদের অর্পণ করেছ, তা আমরা গ্রহণ করেছি; শক্তি দাও, যাতে এ ক্রুশকাষ্ঠ আমরা আমরণ বহন করতে পারি।'

'স্বামীজীর কথা' গ্রন্থে অনুগামী স্বামী শুদ্ধানন্দজী লিখেছেন—"স্বামীজী সংসার ত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থখানি (Imitation of Christ) বিশেষভাবে চর্চা করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থান কালে তাঁহার গুরুভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদা সর্বদা উহার আলোচনা করিতেন। স্বামীজী ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে উহার একটি সূচনা লিখিয়া 'ঈশানুসরণ' নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন।"[৩]

বাংলা ১২৯৬ সালের 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম থেকে পঞ্চম সংখ্যায় স্বামীজীর এই অমর অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'ঈশা অনুসরণে'র রচয়িতার একটি বিশেষণ স্বামীজীর অনুবাদের সূচনায় লক্ষণীয়—'ভক্তসিংহ।' মধ্যযুগের খ্রীষ্ট সাহিত্যের এই অমর গ্রন্থ কতকাল পরে আর এক ভক্তসিংহের দ্বারা অনূদিত হয়েছে! পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ যে হয় নি, তাতে অধ্যাত্ম-অনুরাগী পাঠকদের বেদনা অপরিমেয়।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ৭ই আগস্ট, ১৮৮৯-এর পত্র, পৃঃ ২৯০
২ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯-এর পত্র, পৃঃ ২৮৮
৩ তদেব : ৯ম খণ্ড : স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি : পৃঃ ৩৩৬

অনুবাদকের নিষ্ঠা ও সততার উদাহরণ এই অসমাপ্ত অনুবাদটির ভূমিকায় স্বামীজী লিখেছেন—"অনুবাদ যতদূর সম্ভব অবিকল করিবার চেষ্টা করিয়াছি—কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যে সকল বাক্য 'বাইবেল' সংক্রান্ত কোন বিষয়ের উল্লেখ করে, নিম্নে তাহার টীকা প্রদত্ত হইবে।"[১] কিন্তু অনুবাদ করতে গিয়ে পাদটীকায় বাইবেলের চেয়ে বেশী উল্লিখিত গীতা, উপনিষদ, মহাভারত, বিবেক-চূড়ামণি প্রভৃতি। ফলে তুলনামূলক অধ্যাত্মচিন্তার একটি সুন্দর পটভূমি আমাদের উপরি পাওনা।

'ঈশা-অনুসরণে'র লেখকের "দীনতা, আর্তি ও দাস্যভক্তির পরাকাষ্ঠা" স্বামীজীর অন্তরে গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই মহাবাণীর কথা জাগিয়ে তুলেছিল। গীতার অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি শুনেছেন—'দশবার গীতা গীতা বল্লে যা হয় তাই গীতার সার।' অর্থাৎ 'ত্যাগী'।[২] ত্যাগী শব্দটির সমার্থক তাগী-রূপও যে হতে পারে একথা শ্রীরামকৃষ্ণ সঠিক না জেনে বললেও 'গীতা'র অর্থই তাঁর কাছে ঈশ্বরের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ। আর ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত নরেন্দ্রনাথের কাছে 'ঈশা অনুসরণে'র ত্যাগ ও শরণাগতির আদর্শ যে বিশেষভাবে অনুসরণীয় হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! শ্রেষ্ঠ অনুবাদ সমগ্র জীবনের রূপান্তর-সাধনা।

এবারে স্বামীজীর অনুবাদ-ভঙ্গিমার উদাহরণ মূলের পাশাপাশি উদ্ধৃত করি—

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ঈশা অনুসরণ : পৃঃ ১৭

২ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত : ৪র্থ ভাগ : ১৮৮৪, ২রা অক্টোবর তারিখের দিনলিপি। কথামৃতের ৩য় ভাগে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনাও স্মরণীয়। ৩য় ভাগের একবিংশ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'তাগী' নামটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে আছে—"ঠাকুর পেনেটিতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলেছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন, তগ্ ধাতু ঘঞ্ 'তাগ' হয়, তার উত্তর ইন্ প্রত্যয় করলে তাগী হয়। তাগী ও ত্যাগী এক মানে।"

THE FIRST BOOK

Chapter 1

Of the Imitation of Christ and Contempt of all vanities of the World.

'He that followeth Me, walketh not in darkness,'[১] saith the Lord. These are the words of Christ by which we admonished how we ought to imitate His life and manners, if we will be truly enlightened, and be delivered from all blindness of heart.

Let therefore our chiefest eudeavour be, to meditate upon the Life of Jesus Christ.

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

'খ্রীষ্টের অনুসরণ' এবং সংসার ও যাবতীয় সাংসারিক অন্তঃসারশূন্য পদার্থে ঘৃণা।

১। প্রভু বলিতেছেন, 'যে কেহ আমার অনুগমন করে সে অন্ধকারে পদক্ষেপ করিবে না'।[২] যদ্যপি আমরা যথার্থ আলোকপ্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করি এবং সকল প্রকার হৃদয়ের অন্ধকার হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করি তাহা হইলে খ্রীষ্টের এই কয়েকটি কথা আমাদের স্মরণ করাইতেছে যে, তাঁহার জীবন ও চরিত্রের অনুকরণ আমাদিগের অবশ্য কর্তব্য।

অতএব ঈশার জীবন মনন করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।[৩]

১ John viii [12]

২ He that followeth me etc—যোহন ৮।১২

৩ দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীতা ৭।১৪

আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্য; যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে তাহারাই কেবল এই দুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

উদ্ধৃত অংশটুকুর পাদটীকায় ভগবদ্‌গীতার শরণাগতির আদর্শ তুলনা-মূলকভাবে উপস্থাপিত হয়ে বক্তব্যের গভীরতা সম্পাদন করেছে। সে যুগের তরুণমানসে বাইবেলের সমাদর যত ছিল, গীতার ততটা নয়। বোধ করি সেই কারণে ঈশার অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে গীতা অনুসরণের কথাও স্বামীজীর মনে জেগেছে। মূলকথা অবশ্য সকল দেশের মানুষের অন্তরে ভগবৎ-শরণের মূল সুরটি যে এক, সেই সত্য প্রতিপাদন।

প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় সূত্রে যথার্থ ঈশ্বরানুরাগের লক্ষণপ্রসঙ্গে আলোচনাসূত্রে 'ঈশা অনুসরণে'র গ্রন্থকারের বক্তব্য—

Surely high words do not make a man holy and just ; but a virtuous life maketh him dear to God··· .

If thou didst know Bible by heart, and the sayings of all the philosphers, what would all that profit thee without the love of God and without grace?

Vanity of vanities and all is vanity, except to love God, and to serve him only.

স্বামীজীর অনুবাদ—"নিশ্চয় উচ্চবাক্যচ্ছটা মনুষ্যকে পবিত্র এবং অকপট করিতে পারে না, কিন্তু ধার্মিক জীবন তাহাকে ঈশ্বরের প্রিয় করে।[১]······

"যদি সমগ্র বাইবেল এবং দার্শনিকদিগের মত তোমার জানা থাকে, তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে, যদি তুমি ঈশ্বরের প্রেম এবং কৃপাবিহীন হও ?[২]

১ বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্‌।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্‌ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥ বিবেকচূড়ামণি, ৫৮

(শ্লোকসংখ্যা এক্ষেত্রে স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত 'বিবেকচূড়ামণি' অনুসারে বর্তমান গ্রন্থলেখক কর্তৃক প্রদত্ত।)

নানাবিধ বাক্যবিন্যাস এবং শব্দচ্ছটা যে প্রকার শাস্ত্র ব্যাখ্যার কৌশলমাত্র, সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ কেবল ভোগের নিমিত্ত, মুক্তির নিমিত্ত নহে। (অনুবাদ: স্বামী বিবেকানন্দকৃত)

২ কোরিন্থিয়ান্‌; ১৩।২

"অসার হইতেও অসার, সার একমাত্র তাঁহাকে ভালবাসা, সার একমাত্র তাঁহার সেবা।"[১]

যে অধ্যাত্ম উপলব্ধির তুঙ্গ শিখরে একমাত্র ভক্ত ও ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই, 'ঈশা অনুসরণে'র সাধক সেই স্তরে পৌঁছেই অতিরিক্ত গ্রন্থপাঠ ও নানান মতবাদের অসারতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে বলেছেন—"O God, who art the truth, make me one with thee in everlasting charity.

It is tedius to me often to read and hear many things ; In Thee is all that I would have and can desire.

Let all doctors hold their peace ; let all creatures be silent in thy sight ; speak thou alone unto me.[২]

[Imitation of Christ : ch. III]

স্বামীজীর অনুবাদ[৩]—"হে ঈশ্বর, হে সত্য, অনন্ত প্রেমে আমাকে তোমার সহিত একীভূত করিয়া দাও।

বহু বিষয় পাঠ ও শ্রবণ করিয়া আমি অতি ক্লান্ত হইয়া পড়ি ; আমার সকল অভাব, সকল বাসনা তোমাতেই নিহিত।

আচার্যসকল নির্বাক হউক, জগৎ তোমার সমক্ষে স্তব্ধ হউক, প্রভো, কেবল তুমি [আমার সহিত কথা] বল।[৪]

১ Vanity of vanities, all is vanity etc—ইক্লিজিয়াষ্টিক, ১।২

২ "স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে" (Notes of Some Wanderings with The Swami Vivekananda) গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আছে—পরিব্রাজকজীবনে স্বামীজী শুধুমাত্র গীতা ও ঈশা অনুসরণ (ইংরেজী সংস্করণ) বই দুটি নিয়ে পরিভ্রমণ করতেন। এই প্রসঙ্গ আলোচনার সময় স্বামীজী 'ঈশা অনুসরণে'র এই বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন।

৩ অনুবাদের পাদটীকা, বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ঈশা অনুসরণ দ্রঃ

৪ বাণী ও রচনা : তদেব : পৃঃ ২৩

জগতের ধর্মসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থের অনুবাদে স্বামীজীর অন্তর্নিহিত ভক্তহৃদয়ের যে পরিচয় উদ্‌ঘাটিত, বিবেকানন্দ-মানসের অনুগামীদের পক্ষে তার মূল্য অপরিসীম। একদিকে অদ্বৈত বেদান্তের শিখরসীমা, অন্যদিকে বিগলিত ভক্তিপ্রবাহ—এ দুয়ের সুর-সঙ্গতিতে বিবেকানন্দমানসের পরিপূর্ণতা।

*

'ঈশা অনুসরণে'র আগে অথবা সমকালে স্বামী বিবেকানন্দ হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' বইটি অনুবাদ করেছিলেন। যতদূর মনে হয়, 'শিক্ষা' নামে এই অনুবাদটি তাঁর জীবনের প্রথম অনুবাদ। 'ঈশা-অনুসরণ' তাঁর সাধকজীবনের অন্যতম প্রেরণা-গ্রন্থ বলে অসমাপ্ত অনুবাদটির আলোচনা আগে করেছি। হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থটির অনুবাদ সম্বন্ধে এখন আলোচনা করছি।

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ও তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মচারী গিরিজা চৈতন্য (বর্তমানে স্বামী প্রভানন্দ) মহারাজের উদ্যোগে একটি শিক্ষাবিষয়ক আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার নানাদিক নিয়ে সে সম্মেলনে আলোচনা হলেও স্বামীজীর অনূদিত 'শিক্ষা' গ্রন্থটির কথা কেউই তখন আলোচনা করেন নি। কারণ, 'বসুমতী'-কার্যালয়-প্রকাশিত এবং

'বিবেকানন্দ সাহিত্যের একটি অনালোচিত অধ্যায়' প্রবন্ধ এবং উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৭৬ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখকের "স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদগ্রন্থ : শিক্ষা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর আর একটি এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত অনুবাদগ্রন্থের কথা স্মরণীয়। পিতৃবিয়োগের পর অনুবাদের দ্বারা উপার্জনের সঙ্কল্প করে স্বামীজী 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থখানি মূল ও বঙ্গানুবাদসহ মতিলাল বসুকে লিখে দিয়েছিলেন। মতিলাল বসু নিজের প্রেস থেকে সেটি প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের "শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী" : ১ম খণ্ড : পৃঃ ১৯০–১৯১ দ্রঃ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত বলে প্রচারিত 'শিক্ষা' গ্রন্থটিই যে স্পেন্সারের অমর গ্রন্থের অনুবাদ একথা সে সম্মেলনে যোগদানকারী আমরা জানতাম না।

বাংলার নবজাগরণে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ছিল বঙ্গমনীষার অন্যতম প্রধান চিন্তনীয়। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রাজনারায়ণ—প্রমুখ মনীষীদের জীবনসাধনায় বাংলা ও ভারতের শিক্ষাপ্রসারণে কতখানি সহায়তা হয়েছিল, সেকথা আজ সুবিদিত। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পার হয়ে শিক্ষাজগতে মৌলিক চিন্তার দিক থেকে যে দু'জন বাঙালী সর্বাগ্রে স্মরণীয় তাঁদের একজন রবীন্দ্রনাথ আর একজন বিবেকানন্দ। রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তার বিকাশকেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতী আজ বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার রূপায়ণে সন্ন্যাসীসঙ্ঘ স্থাপনের প্রচেষ্টা বাদ দিলে সর্বপ্রথম প্রয়াস ভগিনী নিবেদিতার। অবশ্য নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার আগে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করেন।[১] সে আশ্রমে হিন্দু মুসলমান-নির্বিশেষে দুর্ভিক্ষে পরিত্যক্ত শিশুরা সন্তানস্নেহে পালিত হত। তবে নির্দিষ্ট একটি শিক্ষাদর্শনের বিদ্যালয়গত রূপায়ণপ্রচেষ্টার নিদর্শনরূপে ভগিনী নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়কেই প্রথম স্বীকৃতি দিতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালিত স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস প্রভৃতি মাদ্রাজ ও কলকাতা থেকে

১ 'স্বামী অখণ্ডানন্দ': স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, স্বামী অখণ্ডানন্দই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাব্রত-গ্রহণের প্রথম সাধক। মুর্শিদাবাদের 'সারগাছি'তে (বহরমপুরের আগের স্টেশন) তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমেই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অনাথ আশ্রমটি গড়ে ওঠে। পরবর্তী কালে এই অনাথ আশ্রমটি আর আশ্রমের কার্যতালিকায় থাকেনি। কিন্তু আমাদের ধারণা, এই প্রথম স্থাপিত অনাথ আশ্রমটির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা ঐতিহাসিক কারণেও প্রয়োজন।

আরম্ভ করে ভারতের প্রায় সর্বত্র বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে নবযুগের তরুণ সমাজগঠনে ব্রতী।[১]

শিক্ষা বিষয়ে কোনো পূর্ণাঙ্গ মৌলিক গ্রন্থ স্বামীজী রচনা করেন নি। অদ্বৈত আশ্রম বা উদ্বোধন-কার্যালয় প্রকাশিত যথাক্রমে 'Education'—বা 'শিক্ষাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ দুটি শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা লেখা ও মন্তব্য থেকে সযত্নে সংগৃহীত। কেবলমাত্র 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থে বিধৃত 'জ্ঞানার্জন' নিবন্ধটি পরিণত বয়সে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে অনেকটা আভাস দেয়। এদিক থেকে স্পেন্সারের 'Education : Intellectual, Moral and Physical' নামে যে বইখানির ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ স্বামীজী করেছিলেন, সে বইটি স্বামীজীর প্রথম জীবনের শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা অনুযায়ী স্বামীজীর জীবনের "প্রথম অবস্থায়" মিল ও স্পেন্সারের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। "তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' পুস্তকখানি বাঙ্গলা ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। এই সময় হার্বার্ট স্পেন্সার নিজ হস্তে অনুবাদের অনুমতি প্রদান ও বিশেষ

---

১ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্যরূপে পরিচিত স্বামী সদানন্দ ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে তরুণ ছাত্রদের নিয়ে দুরদুর্গম তীর্থযাত্রা করে (কাঠগোদাম থেকে কেদারবদরী) তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এ ব্যাপারে প্রেরণাদাত্রী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এই অভিযাত্রীদলের সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন। (দ্রঃ 'ভগিনী নিবেদিতা', প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা : ১ম সং : পৃঃ ২৬৯-৭০ এবং রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী 'On the Edges of Time.')

স্বামীজীর শিক্ষাবিস্তার রূপায়ণ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের কথা মনে পড়ে। স্বামী বিমুক্তানন্দজীর আমরণ তপস্যার ফলে এ প্রতিষ্ঠানটি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ। 'বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হ'লে স্বামীজীর শিক্ষাবিস্তার রূপায়ণে সামগ্রিক প্রচেষ্টা সম্ভব হবে।

উৎসাহ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পত্রখানি তখন বিশেষ আদরের জিনিষ না বিবেচনা করায় যত্ন করিয়া রক্ষা করা হয় নাই……।"[১]

হার্বার্ট স্পেন্সারের মূল বইটির আখ্যাপত্রে লেখা আছে—'The Right of Translation is reserved' (অনুবাদের স্বত্ব সংরক্ষিত।) পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০; প্রকাশক Williams and Nograte, London. বইটির ভূমিকায় তারিখ ও স্থান: মে, ১৮৯১, লণ্ডন।

তরুণ নরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃবিয়োগের পর অর্থোপার্জনের জন্য কিছু অনুবাদকার্যে হাত দিয়েছিলেন, এমন উল্লেখ তাঁর জীবনীকারেরা করেছেন। আবার বন্ধু এবং গুরুভাই উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশনায় সহায়তার জন্যও এ অনুবাদ করা হয়ে থাকতে পারে। 'বসুমতী' পত্রিকার প্রকাশক উপেন্দ্রনাথের পত্রিকা ও গ্রন্থপ্রকাশনার ক্ষেত্রে স্বামীজীর উৎসাহ ও প্রেরণা অনেকখানি কার্যকর ছিল। এ বইটি ছাড়া জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'খানি স্বামীজী পুরো অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা গেলেও বইটি এ এ পর্যন্ত আমরা পাই নি।

স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের সূচনায় যে ভূমিকা[২] রয়েছে, স্বামীজীর অনূদিত গ্রন্থ 'শিক্ষা' থেকে তা বর্জিত। অবশ্য ভূমিকাটি ঠিক এ

---

১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী: মহেন্দ্রনাথ দত্ত: ২য় সং: পৃঃ ১৬৩-১৬৪; কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজের সৌজন্যে হার্বার্ট স্পেন্সারের মূল 'Education' বইটির প্রথম সংস্করণ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

২ পাঠকদের কৌতূহলের কথা মনে রেখে স্পেন্সারের ভূমিকাটুকু উদ্ধৃত করে দিলাম—

Preface

The four chapters of which this work consists originally appeared as four Review-articles; the first in the Westminister Review for July, 1859; the second in the North British

দেশী পাঠকের পক্ষে ততটা প্রয়োজনীয় নয়। স্বামীজী যখন মূল গ্রন্থ থেকেই বক্তব্য সংক্ষেপিত করেছেন তখন এই ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় বোধে তাঁর দ্বারা বর্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বসুমতী কার্যালয়-প্রকাশিত কোনো সংস্করণেই বইটির মূল, সংস্করণ-সংখ্যা, রচনাকাল বা অনুবাদকাল বা প্রথম প্রকাশকাল—এ সবের কোনও বিবরণ পাই নি। পরোক্ষ প্রমাণে অবশ্য বুঝা যায় যে, বইটির একাধিক 'সংস্করণ' হয়েছিল।

Review for May, 1854, and the remaining two in the British Quarterly Review, for April, 1858, and for April, 1859. Severally treating different divisions of the subject, but together framing a tolerably complete whole, I originally wrote them with a view to their republication in a united form; and they would sometime since have thus been issued, but not a legal difficulty stood in the way. This difficulty being now removed, I hasten to fulfil the intention with which they are written.

That in the first shape these chapters were severely independent, is the reason to be assigned for some slight repiti tions which occur in them: one leading idea, more specially, re-appearing twice. As, however this idea is on each occasion presented under a new from and as it can scarcely be too much enforced, I have not thought well to omit any of the passages embodying it.

Some additions of importance will be found in the chapter on Intellectual Education; and in the one on Physical Education there are a few minor alterations. But the chief changes which have been made, are changes of expression: all of the essays having undergone of careful verbal revision.

London, May, 1861

'Education' গ্রন্থের বিষয়বিভাগ স্বামীজীর অনুবাদে এইভাবে ভাষান্তরিত—

Chapter I	What knowledge Is of Most Worth ?
প্রথম পরিচ্ছেদ	সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?
Chapter II	Intellectual Education
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	জ্ঞানশিক্ষা
Chapter III	Moral Education
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	নৈতিক শিক্ষা
Chapter IV	Physical Education
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	শারীরিক শিক্ষা

স্বামীজীর অনূদিত 'শিক্ষা' গ্রন্থটির এ পর্যন্ত পাওয়া সর্বপ্রাচীন সংস্করণ দেখেছি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে। উক্ত গ্রন্থাগারের তারিখ অনুসারে বইটির গ্রন্থাগারটিতে অন্তর্ভুক্তির বছর ১৯১৭।[১]

প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম— শিক্ষা

শারীরিক, মানসিক, নৈতিক।

১ 'বিশ্ববিবেক' গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীবাণী বসু সংকলিত স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জীতে ১৯১৫-র আর একটি সংস্করণের উল্লেখ আছে। ১৯১৭-র সংস্করণটিকে তাঁরা ২য় সংস্করণ বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তেমন কোনো কথা জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংস্করণে মুদ্রিত নেই। স্বাভাবিকভাবেই সংকলয়িতাদ্বয় এই অনুবাদ-গ্রন্থটিকে স্বামীজীর মৌলিক রচনা মনে করেছেন; কারণ এটি যে অনুবাদ, সেকথা তাঁরা উল্লেখ করেন নি। 'শিক্ষা' গ্রন্থের ১৯১৫-র সংস্করণটি আমরা খোঁজ করেও দেখতে পাই নি। তবে 'বসুমতী' যে 'স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত' বলে 'শিক্ষা' বইটি অনেকদিন ধরে প্রকাশ করে এসেছেন, সেকথা প্রমাণিত। স্বামীজীর জীবৎকালে বইটি প্রকাশিত হয়ে থাকলে তাতে এই ভ্রান্তি অসম্ভব। মনে হয়, জীবৎকালের সংস্করণটি থেকে পরবর্তীকালে ছাপবার সময় হার্বার্ট স্পেন্সারের নামটি বর্জিত করে বইটি স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলে চালানোর চেষ্টা হয়। অন্যমনস্ক পাঠকসমাজ নামমাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে বইটির সংস্করণ বিস্তারে সহায়তা করে গেছেন।

পরবর্তীকালের মুদ্রণে প্রথম পরিচ্ছেদের উপরে শুধু 'শিক্ষা' কথাটি লেখা।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে পৃথিবীর শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' গ্রন্থের প্রথম অনুবাদক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের (অথবা সন্ন্যাসপূর্বকালে রচিত হয়ে থাকলে নরেন্দ্রনাথ দত্তের) কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। প্রথম প্রকাশের কাল থেকে স্পেন্সারের এই গ্রন্থটি কীভাবে সমাদৃত হয়েছে, তার দুটি নমুনা পরবর্তী লেখকদের রচনা থেকে একটু উদ্ধৃত করি।

১৯৪৯ সালে প্রকাশিত স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থটির নব সংস্করণের ভূমিকায় চার্লস্. টি. স্মিথ অভিমত প্রকাশ করেছেন— "......Spencer's treatise belongs to that brief list of immortal books which have real significance for pupils, teachers, parents, and administrators." (স্পেন্সারের নিবন্ধটি পৃথিবীর ইতিহাসে সেই অঙ্গুলিমেয় অমর গ্রন্থ-রাজির অন্যতম—ছাত্র, শিক্ষক, পিতামাতা ও পরিচালকবৃন্দ নির্বিশেষে সকলের কাছে যে জাতীয় গ্রন্থের সত্যিকার তাৎপর্য বিদ্যমান।)[১]

সাম্প্রতিককালে S. E. Frost Jr লিখিত 'Historical and Philosophical Foundation of Western Education' গ্রন্থে হার্বার্ট স্পেন্সারের শিক্ষাচিন্তা প্রসঙ্গে রয়েছে—"Spencer aimed to become the philosopher of the scientific movement in the nineteenth century. His friendship with many of the leading thinkers of the age gave him considerable insight into what was happening. Against the background he strove to express in a general formula the belief in progress that pervaded his age and to erect it into the supreme law of the universe.

১ **Education : Spencer : 1949 Edn : See Preface pxiii**

"His most notable contribution to education was contained in 'Education, Intellectual, Moral and Physical', published in 1861. In this book he took the position that psychology is the only solid basis for a complete and exact pedagogy. "Education will not be definitely systematised," he wrote, "till the day when science shall be in possession of rational psychology."

"The first chapter is entitled, "What knowledge is of Most Worth ?" In answering this question he asserted that the worth of any education must be determined by its function in preparation for complete living. In the modern world the knowledge of greatest value is that which one can verify for himself and use to solve his own problems. This is the knowledge given men through the sciences and scientific method.

When Spencer attempted to apply this thesis to actual human experience, he was forced to analyse the activities in which man engages. These fell in to five class: (1) self preservation, (2) securing the necessities of life, (3) rearing and disciplining of children, (4) maintaining proper social and political relations, and (5) leisuretime occupations. To Spencer this was also the order of their importance. An examination of these categories of activities convinced him that the traditional humanistic classic education was useless and that only the

sciences could prepare one to live effectively in all these areas.

The essay attained general popularity and was used in normal schosls, teacher's institiutes, and universities as a basic text in teacher training. In both the United States and England it enjoyed a status in educational circles accorded to no other book of the generation. Its effect was to strengthen the instrumentalist or utilitarian philosophy of education. It placed the Darwinian faith in objective study and evaluation squarely in the field of education and helped lay the foundations for the philosophy of John Dewey. [Ch 16; pp 422]

বিজ্ঞানভিত্তিক উপযোগিতাবাদী শিক্ষাচিন্তা হিসাবে স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থটি ইংল্যাণ্ড আমেরিকার শিক্ষাধারায় কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল উদ্ধৃত মন্তব্যে তা প্রমাণিত। এদেশের শিক্ষা-চিন্তায় তরুণ নরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে শিক্ষার এই ধারাকে বরণ করতে চেয়েছিলেন, এই অনুবাদেই তার প্রমাণ। কিন্তু স্পেন্সারের চিন্তা-ধারার সঙ্গে স্বামীজীর পরবর্তীকালের চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্যও রয়েছে। সে কথায় আসবার আগে আমরা সংক্ষেপে স্বামীজীর এই অনুবাদ-গ্রন্থটি পর্যালোচনা করবো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, স্পেন্সারের শিক্ষাচিন্তা তার অন্যতম উদাহরণ। শিক্ষাকে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রবণতা এই সময়ে যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি বিজ্ঞানকেই মানবচিন্তার একমাত্র কেন্দ্র করে তোলার প্রয়াসও লক্ষণীয়। স্পেন্সারের 'Education' গ্রন্থটির প্রথম পরিচ্ছেদের প্রশ্ন—What knowledge is of most worth? সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান

কি ?—তার উত্তরে এই বিজ্ঞানসচেতন দার্শনিকের বক্তব্য—Thus to the question we set out with—what knowledge is of most worth ?—the uniform reply is—Science. This is the verdict on all the counts. For direct self preservation, on the maintainance of life and health, the all important knowledge is—Science. For that indirect self-preservation which we call gaining a livelihood, the knowledge of greatest value is—Science. For the due discharge of parental functions, the proper guidance is to be found only in—Science. For that interpretations of national life, past and present, without which the citizen cannot rightly regulate his conduct, the indispensable key is—Science. Alike for the most perfect production and highest enjoyment of art in all its forms, the needful preparation is still—Science. And for the purpose of discipline—intellectual, moral, religious—the most efficient study is—Science."[১] স্বামীজীর অনুবাদের ভাষা—"দেখিলাম আমরা যাহা নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপযোগিতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম সে প্রশ্নের সকল দিক হইতে একমাত্র উত্তর আসিল—বিজ্ঞান। যদি জীবন সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি জীবিকানির্বাহরূপ অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি প্রাণবিমোহন সঙ্গীত শিল্পাদি শিখিতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান।"[২]

১ Education : Spencer : 1st Edn : p 53

২ 'শিক্ষা' : স্বামী বিবেকানন্দ : বসুমতী সংস্করণ (মুদ্রাকর : শশিভূষণ দত্ত) পৃ: ৪৫

মূল বক্তব্যকে একটু সংক্ষেপিত করে স্বামীজী যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে তরুণবয়সেই তাঁর ভাষানৈপুণ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ মেলে। অবশ্য স্পেন্সারের কাছে অনুবাদের অনুমতি চাওয়াতেই তার প্রমাণ এবং স্পেন্সারের দার্শনিক মতামত প্রসঙ্গে এই তরুণ এমন কিছু বক্তব্য পাঠিয়েছিলেন, যার দ্বারা স্পেন্সারের মনে এই নবীন দার্শনিক সম্বন্ধে উঁচু ধারণা জন্মেছিল—এমন বিবরণ আমরা বিবেকানন্দজীবনীতে পাই। তবে স্বামীজীর ভাষার বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখলে এই অনুবাদটির ভাষাই বোধ হয় তাঁর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত গদ্যরচনার প্রাচীনতম নমুনা। কারণ, 'সংগীত কল্পতরু' গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১২৯৪) যে ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন, তা যদি ১৮৮৬ সালে লিখিত হয়ে থাকে এবং স্বামীজী যদি পিতৃবিয়োগের পরে আর্থিক কারণে অনুবাদ গ্রন্থরচনায় হাত দিয়ে থাকেন তাহলে ১৮৮৬-র আগেই এ অনুবাদ প্রকাশিত। নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্তের দেহান্তর ঘটে ১৮৮৪-র গোড়ার দিকে, তখনো নরেন্দ্রনাথের বি, এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় নি। সেদিক থেকে 'শিক্ষা' গ্রন্থের অনুবাদ ১৮৮৪-র শেষ দিকে বা ১৮৮৫-তেই হওয়ার কথা। সম্ভবত বি. এ. পাসের অনতিকাল পরেই তরুণ নরেন্দ্রনাথ এ অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন।

সমকালীন বাংলা গদ্যরীতির মানদণ্ডে তরুণ নরেন্দ্রনাথের বাংলা ভাষায় দখলের নমুনা হিসাবে 'শিক্ষা' অনুবাদগ্রন্থটির ভাষা মনন-সাহিত্যের বিশেষ উপযোগী। পরবর্তীকালে 'হিন্দুধর্ম কি?' (১৩০৪) এবং 'উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা' স্বরূপ লেখা 'বর্তমান সমস্যা' (১৩০৫), আরো পরে 'জ্ঞানার্জন' (১৩০৫) প্রভৃতি প্রবন্ধ থেকে আরম্ভ করে 'বর্তমান ভারত' ('উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ১৩০৫-১৩০৭ এই দুই বছরে প্রকাশিত) ধারাবাহিক নিবন্ধ অবধি স্বামীজীর বিশিষ্ট রীতির সাধুগদ্যের প্রাক্ ভঙ্গিমারূপে 'শিক্ষা' গ্রন্থের ভাষারূপ লক্ষণীয়।[১]

১ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় (এখনকার স্কুল ফাইনালের সমতুল্য) নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় ভাষায় শতকরা ৭৬ (ছিয়াত্তর)

'বর্তমান ভারতে'র ভারতচিন্তায় যে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারত-ইতিহাসের বিশ্লেষণ রয়েছে, তারও মূলে স্পেন্সারের প্রভাব অনেকখানি। উদাহরণস্বরূপ স্পেন্সারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ইতিহাস লেখা সম্বন্ধে তাঁর মত স্মরণীয় —That which constitiutes History, properly so called, is in great part omitted from works on this subject. Only of late years have historians commenced giving us, in any considerable quantity, the truly vulnerable information. As in past ages the king was everything and the people nothing, so in past histories doings of the King fill the entire picture, to which the National life forms but an obscure background. While only now, when the welfare of nations, rather than of rulers is becoming the dominant idea, are historians beginning to occupy themselves with the phenomena of social progress. The thing it really concerns us to know, is the national history of society.[২]

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর ভারত-ইতিহাস-বিশ্লেষণেও এই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রাধান্য। 'শিক্ষা' গ্রন্থে স্বামীজীর অনুবাদ —"যথার্থ ইতিহাস অতি অল্প সংখ্যক পুস্তকেই পাওয়া যায়। পূর্বে প্রজারা রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অতি অল্পই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত। অতএব ঐতিহাসিকেরা তাহাদের প্রায় কোন প্রসঙ্গই করিতেন না। আধুনিক প্রজাদের ক্ষমতা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। লোকে প্রজারাই রাজ্যের সর্বস্ব, এ কথা ক্রমে বুঝিতেছে, সুতরাং আধুনিক

নম্বর পেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় ভাষা খুব সম্ভব বাংলা। [অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ধর : A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda : Vol I : p 106]

২ Education : Spencer : 1st Edn : p 34

ইতিহাসে ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে। বাস্তবিক ইতিহাস সমাজের জীবনবৃত্তান্ত।"[১]

স্পেন্সারের বক্তব্য অনেক সংহত আকারে ও অনুবাদে যে রূপ পেয়েছে, স্বামীজীর ইতিহাস-চিন্তার অন্যতম মূলসূত্র তাতে বিধৃত। পরবর্তীকালে 'বর্তমান ভারতে' সমাজে ও ইতিহাসে বিভিন্ন বর্ণের পর্যায়ক্রমে আধিপত্যপ্রসঙ্গে স্বামীজী আরো দূর প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে বলেছেন—'সমাজের নেতৃত্বে বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে তাহা তত পরিমাণে দুর্বল।'[২]

'বর্তমান ভারত' এবং সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দের ভারতচেতনার মূলে রয়েছে সাধারণ মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর প্রখর সচেতনতা। সুতরাং রাজকাহিনী নয়, গণশক্তির কাহিনীই বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনার মূলসূত্র।

'Education' গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'Intellectual Education' (জ্ঞান-শিক্ষা)-এর উপসংহারে ছাত্রজীবনের পরবর্তী জীবনব্যাপী জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে স্পেন্সারের মন্তব্য—"As suggesting a final reason for making education a process of self-instruction, and by consequence a process of pleasurable instruction, we may advert to the fact that, in proportion as it is made so, is there a probalitily that it will not cease when school-days end. As long as the acquisition of knowledge is rendered habitually repungant, so long will there be a prevailing tendency to discontinue it, when free from the coercion of

১ শিক্ষা: বসুমতী-প্রকাশিত [মুদ্রাকর শশিভূষণ দত্ত] সংস্করণ: পৃঃ ৩২
২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: বর্তমান ভারত: পৃঃ ২৪২

parents and masters. And when the acquisition of knowledge has been rendered habitually gratifying, then there will be as prevailing a tendency to continue without superintendence that selfculture previously carried on under superintendence. These results are inevitable. While the laws of mental association remain true,—while men dislike the things and places that suggest painful recollections and delight in those which call to mind bygone pleasures—painful lessons will make knowledge repulsive, and pleasurable lessons will make it attractive. The men to whom, in boyhood, information came in dreary tasks along with threats of punishment, and who were never led into habits of independent inquiry, are unlikely to be students in after years, while those to whom it came in the natural forms, at the proper time, and who remembers its facts as not only intersting in themselves, but as the occasions of a long service gratifying successes, are likely to continue through life that self-instruction commenced in youth."[১]

এই অংশটির অনুবাদে স্বামীজী কত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে বক্তব্যকে এ দেশীয় পাঠকের উপযোগী সরল করে তুলেছেন, তা লক্ষণীয়—"জ্ঞান-শিক্ষার দুইটি সাধারণ নিয়মের বিষয়ে আরও দুই একটি কথা না বলিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতে পারি না। সেই দুইটি নিয়মই অতি প্রয়োজনীয় অথচ অত্যন্ত অনাদৃত। প্রথমতঃ শৈশবাবধি আজীবন অধিকাংশ শিক্ষা আনন্দদায়ক হইবে। শিক্ষা

১ Education : Spencer : 1st Edn. pp 103-104

আপনার চেষ্টায় হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হইবে। শিক্ষা সহজ হইতে জটিল, অপরিস্ফুট হইতে উজ্জ্বল, মিশ্র হইতে শুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক—যদি মনোবিজ্ঞানের মত হয়, তাহা হইলে স্বাবলম্বন এবং আনন্দসহকারে শিক্ষা হইয়াছে কি না, এই দুইটি ইহার পরীক্ষাস্বরূপ। কারণ, যে পর্যায়ে আমাদের মনোবৃত্তি সকল স্ফুরিত হয়, সেই প্রকার শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট হইলে অল্পায়াসেই হইবে, অতএব কষ্টকর হইতে পারে না। স্বাভাবিক পর্যায়ে শিক্ষার আরও উপকার আছে। ইহা দ্বারা শিক্ষিত বিষয় কখনও স্মৃতিচ্যুত হয় না। যাহা আপনার যত্নে এবং ধারণাশক্তির বল অনুসারে শিক্ষা করা যায় তাহা মনোমধ্যে গ্রথিত হইয়া যায়। আবার এই প্রকার সযত্নে কতকগুলি বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিলে অপরগুলি আয়ত্ত করা সহজ হইয়া উঠে। আরও ইহা ছাড়া জীবনের প্রধান সহায় সাহস, মনোযোগ, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

"দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শিক্ষা আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। ফল বিবেচনা করিয়াই যে আনন্দদায়ক হইবে, তাহা নহে, স্বাভাবিক চেষ্টা বলিয়াই আনন্দদায়ক হইবে। আবার যে বিষয়ে আনন্দসহকারে শিখা যায়, তাহা অন্য বিষয়াপেক্ষা অধিক শিক্ষা করা যায়। যে বিষয় আনন্দ প্রদান করে, তাহাতে অধিক মনোযোগ হয়, অতএব অধিক মনে থাকে। পঠিতব্য অতি কর্কশ, কাজেই তাহাতে মনঃসংযোগ হয় না, সুতরাং সহজে আয়ত্ত হয় না, শিক্ষক ছাড়িবার নহেন, ভর্ৎসনা প্রহারাদি আরম্ভ করিলেন, জন্মের মত বালকের চরিত্রে দাগ পড়িয়া গেল। যতদিন বিদ্যালয়ে গুরুজনভয়ে, শিক্ষকের ভয়ে, সুখ্যাতির লোভে বালক পড়িত, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই সব সাঙ্গ হইল। কিন্তু যদি আত্মচেষ্টায় এবং আনন্দসহকারে পড়িত, তাহা হইলে চিরজীবন সেই আনন্দলাভের আশায় বিদ্যা উপার্জন করিত।"[১]

---

১ 'শিক্ষা' : পৃঃ ৬৭-৬৯

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ-মানসে হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাব যে সব দিক থেকে দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে Physical Education [শারীরিক শিক্ষা] অধ্যায়টি বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। যথার্থ শিক্ষা যে দেহমন আত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে,—সেকথা আমাদের পুঁথিসর্বস্ব শিক্ষার আদর্শে অনেকসময় অবহেলিত। সেদিক থেকে স্পেন্সার বরং শরীরচর্চার জন্য মননচর্চা একটু কমাতে রাজী। তিনি মনে করেন, দুর্বল দেহে পাণ্ডিত্যের চেয়ে একটু কম বিদ্যা থাকলেও যেটুকু বিদ্যা আছে জীবনে তার সুপ্রয়োগ বেশী কাম্য।[১]

দেহগত পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরেজ স্পেন্সার মাংস খাওয়ার উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। পরবর্তী কালে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নিরামিষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও জীবন-সংগ্রামে রজোগুণাত্মক কর্মের আদর্শের জন্য আমিষ আহারের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাছাড়া ব্যায়াম, ফুটবল বা অন্যান্য খেলাধূলার প্রতি স্বামীজীর অনুরাগ তো সর্বজনবিদিত। আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পক্ষেই বেদান্তের সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম ধ্যানধারণায় অধিকার সম্ভব—এই ছিল তাঁর প্রত্যয়। স্পেন্সার ফুটবল খেলার "brutalizing effect" (বর্বরতার প্রভাব) সম্বন্ধে বিচলিত হলেও ব্যায়ামবিদ্যার কলাকৌশলের চেয়ে খেলাধূলার সাবলীলতাকেই ছাত্রদের উত্তরজীবনে বেশী কার্যকরী মনে করেছেন।

১৮৯৫ সালে লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠিতে স্বামীজীর দৃষ্টিতে আদর্শ মানুষের চিত্র—"……আমি চাই এমন লোক যাদের পেশী লোহার মত দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ।"

স্পেন্সার তাঁর শরীরচর্চার আলোচনায় তৃণভোজী ও মাংসভোজী প্রাণীদের তুলনামূলক আলোচনায় দেখিয়েছেন—"Count up the wild races who are wellgrown, strong and active

১ Education : Spencer : 1st Edn : p. 185

as the Kaffirs, North American Indians and Pantagonians and you find them large consumers of flesh. The illfed Hindoo goes down before the Englishmen fed on more nutritive food, to whom he is as inferior in mental as in physical energy. And generally we think, the history of the world shows that well-fed races have been the energetic and dominant races."[১]

এই অংশটি অনুবাদকালে এর বক্তব্য সবটাই স্বামীজী নিশ্চয় অনুমোদন করেন নি। এমন কি অনুবাদে একটু ভাষাগত স্বাধীনতা নিয়ে বক্তব্যের তারতম্যও ঘটিয়েছেন। অবশ্যই মূল বক্তব্য থেকে দূরে সরে যান নি, কিন্তু একেবারে আক্ষরিক অনুবাদও করেন নি।

স্বামীজীর অনুবাদের ভাষা—"মানুষদিগের মধ্যে বুসম্যান অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি নিরামিষাশী অসভ্যেরা দুর্বল এবং খর্বাকৃতি, অন্যদিকে প্যাণ্টাগোনিয়ান, কাফ্রি প্রভৃতি মাংসাশী অসভ্যেরা কেমন দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ। অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্যসেবী হিন্দু অপেক্ষা মাংসাশী জাতিরাই যে চিরকাল তেজস্বী এবং প্রধান হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে জগতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে।"[২]

কিন্তু জগতের ইতিহাস কেবল মাংসাশী জাতিরই জয়ের ইতিহাস নয়, আসলে আত্মবিশ্বাসী জাতিরাই সর্বজয়ী। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকেরা একথা জানেন। স্পেন্সার ইংরেজের পুষ্টিকর আহারের মহিমাকীর্তনের সময় একথা ভুলে গেছেন যে, তাঁর সমকালীন ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র শ্রমজীবীদের অতি অল্পই এই আহার জুটত এবং দুর্বল হিন্দুদের (ভারতীয়দের) শোষণের উপরেই অধিকাংশ ইংরেজের দেহের পুষ্টি নির্ভর করত। লক্ষণীয়, অনুবাদকালে স্বামীজী 'illfed' কথাটির বদলে 'অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্যসেবী' কথাটি ব্যবহার

১ Education : Spencer : p. 158

২ শিক্ষা : 'শারীরিক শিক্ষা' অধ্যায় : পৃঃ ৯১

করেছেন। আক্ষরিক অনুবাদ না করাই এখানে ঐতিহাসিক সত্যের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, বৌদ্ধ বা জৈন প্রভাবের আগে হিন্দুদের মধ্যে মাংসাহার সর্বস্বীকৃত ছিল।

সমকালীন ইংল্যাণ্ডের তরুণদের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যহীনতার কারণ সম্বন্ধে স্পেন্সার যা লিখেছেন, তা অবশ্য একালের তরুণদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—"On old and young, the pressure of modern life puts a still increasing strain. In all business and professions, intenser competition taxes energies and abilitities of every adult and to fit the young to hold their places under this intenser competition, they are subject to severer discipline than heretofore. The damage is thus doubled. Fathers who find themselves run hard by their multiplying competitors, and labouring under this disadvantage, have to maintain a more expensive style of living, are all the year round obliged to work early and late, taking little exercise and getting but short holidays. The constitiutions shaken by this continued overapplication, they bequeath to their children, predisposed to breakdown even under ordinary strains on their energies, are required to go through a curriculum much more extended than prescribed for the unfeebled childern of past generations."[১]

উদ্ধৃত অংশটুকুর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ স্বামীজীর ভাষায়—"আধুনিক কালে কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলের উপর পূর্বাপেক্ষা সমাজের ভার—সংসারের ভার অনেক অধিক হইতেছে। সকল ব্যবসায়ে অনেক প্রতিযোগী হওয়াতে পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদ্যোগ এবং শক্তি

১ Education : Spencer : 1st Edn : p. 174

ব্যয় হইয়া যায় এবং এই শক্তি-সংগ্রামের উপযুক্ত হইবার জন্য সন্তানের উপর পূর্বাপেক্ষা কঠোরতর শিক্ষার আবশ্যক হইয়াছে। আবার পিতা ঐ প্রকার ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীর এবং মন দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, পুত্র সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকার ক্ষীণতা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কঠোর পরিশ্রম করে—কাজেই অকালে তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে। প্রত্যহ এই প্রকার অধিক পাঠ করিয়া শরীর এবং মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, এ প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।"

শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য সুসঙ্গত জীবনযাপনের আদর্শস্থাপন। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মস্তিষ্ক সঞ্চালন ছাড়া অন্যান্য দিক প্রায় অবহেলিত। সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্পেন্সার বলেছেন—"প্রকৃতির হিসাবের এক তিল ব্যতিক্রম হয় না;—এ দিকে অধিক ব্যয় কর, অপর দিকের লইয়া প্রকৃতি তাহা পূর্ণ করিবে।"[১] শুধু উপযোগিতা-বাদের দিক থেকেই নয়, চিরন্তন শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শের দিক থেকেই প্রকৃতির এই আপূরণ-শক্তির আদর্শ আমাদের স্মরণীয়।

স্পেন্সারের শিক্ষাদর্শ ডারুইনের ক্রমবিবর্তনবাদেরই অন্যতম স্বাভাবিক পরিণতি। এছাড়া রুশোর শিক্ষাচিন্তা, কোম্‌তের ধ্রুববাদ এবং বেন্থামের হিতবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছে। স্পেন্সারের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাচিন্তার মূলে রয়েছে ইহজীবনের পরিপূর্ণতায় বিশ্বাস। এমন কি, ধর্ম বা কবিতার মতো ভাবজগতের বিষয়বস্তুকেও স্পেন্সার বিজ্ঞানের আলোকে দেখতে বা দেখাতে চেয়েছেন। ফলে বিজ্ঞানের প্রতি এমন এক পক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর গ্রন্থে ফুটে উঠেছে, যা আধুনিক শিক্ষাচিন্তার জগতে সমর্থনযোগ্য নয়। অতিরিক্ত বিজ্ঞানের প্রতি পক্ষপাতের প্রতিবাদে এ যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় কারিগরীবিদ্যার ক্ষেত্রেও মানবিক বিদ্যার প্রয়োগের কথা শিক্ষাবিদ্‌দের অন্তরে জেগেছে।[২] তথ্যানুসন্ধানীদের মূল্য স্বীকার করেও একথা

---

১ শিক্ষা: পৃঃ ৯৫-৯৬

২ এ বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে মানবিক বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভাবা দরকার যে বেঁচে থাকার অর্থ কেবল অস্তিত্বের সমস্যা মেটানো নয়। মানবমানসের দূরাভিসারী ভাবনা ও চেতনার অভিযানে চন্দ্রলোকযাত্রা সামান্য পদক্ষেপ মাত্র। মানব-অন্তরের অনন্ত মহাকাশের তুলনায় বাইরের মহাকাশ অনেক সীমাবদ্ধ।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা বেদান্তের আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠায়। তাই তাঁর মতে 'Education is the manifestation of the perfection already in man.' ('মানব-অন্তরের চিরন্তন পূর্ণতার বিকাশসাধনই শিক্ষা।')[১] কারণ বৈদান্তিক বিবেকানন্দের মতে, (অনুবাদকালে স্বামীজীর চিন্তাধারা গড়ে উঠছে মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই স্পেন্সারের চিন্তাধারা আয়ত্ত করে তিনি যখন নিজস্ব শিক্ষাচিন্তা গড়ে তুলেছেন, এ তখনকার কথা)—"মানব-অন্তরের চিরন্তন ব্রহ্মত্বের প্রকাশই ধর্ম।"[২] পরবর্তীকালে স্বামীজী এও বলেছেন—"আমাদের চাই কি ? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর বিজ্ঞান পড়ানো ; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা) যাতে industry (শিল্প) বাড়ে ; লোকে চাকরি না ক'রে দু'পয়সা করে খেতে পারে।"[৩]

শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক বিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যার সংযোগের প্রয়োজন সম্বন্ধে রাজা রামমোহন থেকে প্যারীচাঁদ, ভূদেব, বঙ্কিম প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর মনীষিগণ সকলেই একমত। স্বামী বিবেকানন্দ এঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে বেদান্তের মুক্ত আত্মার অভয়বাণী সংযুক্ত ক'রে শিক্ষাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামের উপযোগী অস্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

স্বামীজীর চিন্তাধারায় স্পেন্সারের প্রভাবের ও সে প্রভাব অতিক্রমণের সামান্য কয়টি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হল। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় তাঁর এই অনুবাদগ্রন্থটি বিশেষ

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪০০ ৩রা মার্চ, ১৮৯৪ চিকাগো থেকে লেখা পত্র দ্রষ্টব্য।

৩ স্বামীজীর স্মৃতি : প্রিয়নাথ সিংহ ; বাণী ও রচনা ; নবম খণ্ড : পৃঃ ৪০৩

গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। এ গ্রন্থে আমাদের লক্ষ্য অনুবাদক বিবেকানন্দের পরিচয়-লাভ।

বাংলাসাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন এবং বিরাট সম্ভাবনা। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পরিকল্পনা যত বিস্তৃত হবে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা যত ব্যাপক হবে, ততই মননশীল অনুবাদের প্রয়োজন বাড়বে। সেদিক থেকে বিশ্বসাহিত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজিকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করাও প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে। সুখের বিষয়, এ বিষয়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ই সচেতন হয়েছেন। কিন্তু বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভূমিকা এক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

বিজ্ঞানসচেতন সমাজতান্ত্রিক মননের যে উত্তরাধিকার স্বামীজী স্পেন্সারের কাছে লাভ করেছিলেন, উত্তরকালে স্বকীয় সাধনা ও মননে তাকে আধুনিক ভারত ও পৃথিবীর শিক্ষাচিন্তার পক্ষে এক মৌলিক প্রেরণার উৎসে রূপান্তরিত করে গেছেন। এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়ে থাকলেও স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আজও শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে অপেক্ষিত। সে যাই হোক, প্রথম জীবনের এই অনুবাদ বিবেকানন্দজীবনে ও সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপাদান; সেইসঙ্গে অনুবাদক বিবেকানন্দের ভাষাশক্তি ও মননশীলতার সার্থক উদাহরণ।[১]

১ বিবেকানন্দসাহিত্যের ইংরেজী অংশে মূল বাংলা এবং সংস্কৃত থেকে তাঁর নানা অনুবাদের উদাহরণ মেলে। সেগুলি ইংরেজী অনুবাদ হিসাবেই আলোচিত হওয়া উচিত বলে আমরা এ বইয়ে উপস্থাপিত করলাম না। কৌতূহলী পাঠকদের কথা ভেবে তিনটি উদাহরণ উদ্ধৃত করি।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে') গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর ভ্রমণকাহিনী-বর্ণনা-প্রসঙ্গে ১৬ই জুলাই, ১৮৯৮ এর দিনলিপিতে লিখেছেন, ঝিলমের উপরে নৌকোয় যেতে যেতে স্বামীজী একের পর এক রামপ্রসাদের বা অন্য শাক্তগীতিকারের গান

গেয়ে চলেছেন, মাঝে মাঝে কোনো কোনো গান অনুবাদও করছেন। এমন একটি গানের অনুবাদের প্রথম চরণ—"I call upon thee Mother"। এ গানটির পুরো রূপ মেলে নিবেদিতার 'Kali the Mother'—গ্রন্থে (প্রকাশকাল ১৯০০)। সেখানে প্রথম চরণটি একটু পরিবর্তিত—

Whom else should I cry to Mother ?
The baby cries for its mother alone—
And I am not the son of such
That I should call any woman my mother !
Tho' the mother bit him,
The child cries, 'Mother, O Mother !'
And clings still tighter to her garment.
True I cannot see Thee,
Yet I am not a lost child !
I still cry 'Mother, Mother !"

('Two Saints of Kali' প্রবন্ধ)

রামপ্রসাদের গানের পুরো বা আংশিক অনুবাদ নিবেদিতার 'Kali the Mother' গ্রন্থে আছে। এগুলিও স্বামীজীর কৃত অনুবাদ হওয়াই স্বাভাবিক। মূল বাংলা থেকে এত সহজে অনুবাদের ক্ষমতা তখনো নিবেদিতার হয় নি নিশ্চয়। স্বামীজীর জীবিতকালেই নিবেদিতার Kali the Mother গ্রন্থের প্রকাশ—এ তথ্যটিও স্মরণীয়।

Notes of Some Wanderings—গ্রন্থে স্বামীজীর সংস্কৃত স্তোত্র অনুবাদের আর একটি উদাহরণ—"...he translated for us the Rudra-prayer—

"From the Unreal lead us to the Real.
Form darkness lead us into light.
From death lead us to immortality,
Reach us through and through our self.
And evermore protect us—Oh Thou Terrible !—
From ignorance, by Thy sweet compassionate Face.

যজুর্বেদের 'রুদ্রস্তোত্র' 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়' ইত্যাদি বাংলাসাহিত্যের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। এই স্তোত্রের 'আবীরাবীর্ম

এধি'—অংশটুকু মুখে মুখে অনুবাদের সময় স্বামীজী প্রথমে অন্যভাবে করেছিলেন। পরে বর্তমান রূপটি দেন। হিমালয়-ভ্রমণের সময় নিবেদিতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে উপরের স্তোত্রটির সঙ্গে একই দিনে মুখে মুখে রচিত এমনি আর একটি অনুবাদ মধুচ্ছন্দা ঋষির মন্ত্রমালা—

The blissful winds are sweet to us.
The seas are showering bliss on us.
May the corn in our fields bring bliss to us.
May the plants and herbs bring bliss unto us !
The very dust is full of bliss.
It is all bliss—all bliss—all bliss.

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিধৃত 'মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' ইত্যাদি মন্ত্রটি-প্রসঙ্গে নিবেদিতার (মূলতঃ স্বামীজীর) মন্তব্য—"one of the most beautiful of the Hindu sacraments".

ভগিনী নিবেদিতার 'Notes of Some Wanderings' গ্রন্থের Chapter IV দ্রঃ Complete Works of Sister Nevedita : Vol I : pp. 309—310.

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রিকা 'উদ্বোধন'

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনের মুখপত্রস্বরূপ তিনটি পত্রিকার কথা আমরা জানি—'ব্রহ্মবাদিন্', 'প্রবুদ্ধ ভারত' এবং 'উদ্বোধন'। এদের মধ্যে 'উদ্বোধন' বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও বাংলাসাহিত্যে স্বামীজীর দান আলোচনাপ্রসঙ্গে এবং সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শের প্রকাশরূপে এ পত্রিকাখানির কথা আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য।

'ব্রহ্মবাদিন্' পাক্ষিক পত্রিকারূপে ১৮৯৫-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় মাদ্রাজ থেকে। স্বামীজীর অশেষ স্নেহভাজন আলাসিঙ্গা পেরুমল এ পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে যে তিনজন বিবেকানন্দ-অনুরাগীর পত্র প্রকাশিত হয়, তাঁদের নাম জি, ভেঙ্কটেশ্বর রাও, এম. সি. নাঞ্জুণ্ডা রাও এবং এম. সি. আলাসিঙ্গা পেরুমল। ব্যক্তিগত জীবনে বিজ্ঞানশিক্ষক আলাসিঙ্গা স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ মাদ্রাজের তরুণদের অন্যতম। তাঁর এবং তাঁর মতো মাদ্রাজের আরো কিছু তরুণের আগ্রহেই চিকাগোর ধর্মসভায় যোগদানের আগ্রহ স্বামীজীর মনে জাগে। আমেরিকা থেকে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে যেসব চিঠি লিখেছেন সেগুলি ভাবের মহত্ত্বে ও অনুপ্রেরণার অগ্নিতাপে বিবেকানন্দসাহিত্যে চিরস্মরণীয়। স্বামীজীর প্রেরণাতেই ভারতীয় চিন্তাধারার প্রকাশের বাহনরূপে 'ব্রহ্মবাদিন্' প্রকাশের পরিকল্পনা করেন মাদ্রাজের তরুণেরা। চিকাগো ধর্মসভায় অসামান্য সাফল্যের পর আমেরিকায় একের পর এক নগরীতে বিজয়-অভিযান শেষে স্বামীজী যখন ইংল্যাণ্ডে, তখনই ভারতে স্বামীজীর ধ্যান-কল্পনার বাহনরূপে প্রকাশিত হলো 'ব্রহ্মবাদিন্'।

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকাটির আদর্শের কথা জনসাধারণকে জানিয়ে পূর্বোক্ত বিবেকানন্দ-অনুগামীরা লিখেছিলেন—

"Sir,

Under the advice and with encouragement of Swami Vivekananda, it is proposed to start a weekly journal to be named the Brahmavadin. The main object of the journal is to propagate the Vedantic Religion of India and to work towards the improvement of the social and moral conditions of man by steadily holding aloft the sublime and universal ideas of Hinduism. The power of any ideal in filling human heart with inspiration, and the love of the good and the beautiful, is dependent on how high and pure it is ; and it shall be the endeavour of the Brahmavadin to pourtray the Hindu ideal in the best and truest light in which it is found recorded in the historical sacred literature of the Hindus. Mindful of the fact that between the ideal of the Hindu Scriptures and the practical life of the Hindu peoples, there is a wide gulf of seperation, the proposed new journal will constantly have in view how best to try to bridge that gulf and make the social and religious institutions of the country accord more and more with the spirt of that lofty divine ideal."[১]

১ The Brahmavadin, Saturday, Sept. 14, 1895 Vol. I. No I (দি ব্রহ্মবাদিন্, শনিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা) ।

"মহাশয়, স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহ ও উপদেশ অনুযায়ী 'ব্রহ্মবাদিন্' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব করিতেছি। পত্রিকাটির মূল

'ব্রহ্মবাদিনে'র এই আদর্শই স্বামী বিবেকানন্দের উৎসাহে ও প্রেরণায় প্রকাশিত সব কয়টি পত্রিকার প্রাণের কথা। 'ব্রহ্মবাদিনে'র সম্পাদকমণ্ডলী আর্যধর্ম ও সাধনার গভীরতর মর্মানুসন্ধানের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। এমন কি এঁদের অতিরিক্ত সংস্কৃত-প্রধান রচনা সম্বন্ধে স্বামীজীও মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মোটের উপর যে সমুচ্চ মননের আদর্শ বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল প্রেরণা, তার পরিচয় 'ব্রহ্মবাদিনে' বিধৃত।

কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে গল্পকথায় বেদ, উপনিষদ, পুরাণের অমর গল্পকাহিনীগুলি ইংরেজীতে বিশ্ববাসীর কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনও স্বামীজী অনুভব করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তরুণ বয়সে শোনা সেই অপূর্ব গল্পমালার কথাও হয়তো তাঁর মনে জেগেছিল।[১] এই পদ্ধতিতে তিনি নিজেও উপকৃত হয়েছেন।

'ব্রহ্মবাদিনে'র প্রায় একবছর পরেই তাই প্রকাশিত হল 'প্রবুদ্ধ ভারত'। ১৮৯৬-এর জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়ে মাঝে সামান্য কিছুদিন বন্ধ থাকার পর পুনরুজ্জীবিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' আজ অবধি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইংরেজী মুখপত্ররূপে সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত।

উদ্দেশ্য ভারতীয় বেদান্তধর্মের আদর্শপ্রচার এবং হিন্দুধর্মের উচ্চতম সর্বজনীন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মানবজাতির নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন-প্রচেষ্টা। মানব-হৃদয়কে মহৎ প্রেরণা এবং শিব ও সুন্দরের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ করিয়া তোলা নির্ভর করে একটি আদর্শের মহত্ত্ব ও পবিত্রতার উপর; ব্রহ্মবাদিনের প্রচেষ্টা হইবে হিন্দুশাস্ত্রের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম সত্যের অনুসন্ধান। শাস্ত্রগত আদর্শ এবং ব্যবহারিক জীবনে উহার রূপদানের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য রহিয়াছে সে কথা মনে রাখিয়া প্রস্তাবিত এই নূতন পত্রিকা সর্বদা এই পার্থক্য দূর করিতে এবং দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধ্যাত্মিক আদর্শের উন্নত মহিমার উপযোগী করিয়া তুলিতে নিয়ত সচেষ্ট থাকিবে।"

১ বর্তমান লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থের "কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'প্রবুদ্ধ ভারত'—পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার নামের পাশে তারকাচিহ্ন দিয়ে লেখা আছে—"a name suggested by Swami Vivekananda, which, while means Awakened India, also indicates the close relationship that exists between Hinduism and Buddhism." "স্বামী বিবেকানন্দ-প্রস্তাবিত এই নামটির অর্থ প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত ভারত (ইংরেজীতে Awakened India)। নামটি 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র কথার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের নিকট সম্বন্ধের কথাও মনে করিয়ে দেবে।'

'প্রবুদ্ধ ভারত'-পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার—(The Prabuddha Bharata or Awakened India, Madras, July, 1896, Vol I, no I)—Ourselves (আমাদের) শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে—"···the eyes of the western world were themselves turned towards India, turned, not as of old for the gold and silver she could give, but for the more lasting treasures contained in her ancient sacred literature. Christian Missionaries in their eagerness to vilify the Hindu, had opened an ancient magic chest, the very smell of whose contents caused them to faint. Oriental scholars, the Livingstones of eastern literature, had unwittingly invoked a diety, which it was not in their power to appease. As philologists are succeeded by philosophers, Colebrooks and Caldwells give birth to Schopenhaurs and Deussens. The white man and his fair lady stray into the Indian wood, and there, come across the Hindu sage under the banyan tree. The hoary tree, the cool shade, the refreshing stream, and above all the hoarier, cooler and the more refreshing

philosophy that falls from his lips enchant them. The discovery is published, pilgrimis multiply. A Sannyasin from our midst carries the altar-fire across the seas. The spirit of the Upanishads make a progress in distant lands. The procession develops into a festival. Its noise reaches Indian shores and behold ! our motherland is awakening."[১]

১ "...পাশ্চাত্য জগতের দৃষ্টি ভারতের উপর এসে পড়েছিল, তবে এবার প্রাচীনকালের মতো সোনারূপোর জন্য নয়, তার চেয়ে যে চিরস্থায়ী সম্পর্ক ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে নিবদ্ধ, তারই উদ্দেশ্যে ভারতের প্রতি এই দৃষ্টিপাত। হিন্দুদের কুৎসাগান করতে গিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারীর দল এমন এক যাদুর বাক্স খুলে ফেললে, যার ভিতরের সৌরভেই তারা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। প্রাচ্যসাহিত্যের লিভিংস্টোনের সমান প্রাচ্যতত্ত্ববিদেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এমন এক দেবতাকে জাগিয়ে তুললেন, যাঁকে তৃপ্ত করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। ভাষাতত্ত্ববিদ্দের পরে যেমন দার্শনিকেরা দেখা দেন, তেমনি কোলব্রুক আর কল্ডওয়েলের পরে দেখা দিলেন সোপেনহাওয়ার এবং ডয়সন প্রভৃতি। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক তাঁর সুন্দরী পত্নীসহ ভারতীয় অরণ্যে প্রবেশ করে অশ্বত্থতলায় হিন্দুঋষিকে দেখতে পেলেন। প্রাচীন বৃক্ষটির শীতল ছায়া, প্রাণদ ঝর্ণাধারা আর সবার উপরে ঋষিমুখ-নিঃসৃত সুপ্রাচীন সুস্নিগ্ধ প্রাণবন্ত অমৃতবাণী তাঁদের বিমুগ্ধ করলো। আমাদের মধ্য থেকে একজন সন্ন্যাসী সমুদ্রপারে হোমাগ্নিশিখা বহন করে নিয়ে গেলেন। উপনিষদের মর্মবাণী দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে গেল। ক্ষীণ শোভাযাত্রাটি ক্রমে বিরাট উৎসবে পরিণত হল। সে উৎসবের কলকোলাহল ভারতের উপকূলে এসে পৌছুল। চেয়ে দেখুন, আমাদের মাতৃভূমি আবার জেগে উঠেছেন !"

এক্ষেত্রে একটু রূপকছলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্দের কৃতিত্ব এবং পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য অভিযানে ভারতের নবজাগরণপর্বের সম্ভাব্যতার কথা যে নিপুণতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা লক্ষণীয়। "শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি" থেকে উদ্ধৃত বাকি অংশটুকু 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র মলাটে ফোটানোর চেষ্টা কিছুটা বিজ্ঞাপনোচিত হয়েছিল। অঙ্কনশিল্প-হিসাবেও নিতান্ত স্থূল এই মলাটচিত্রকে বর্জনের নির্দেশ দিয়ে স্বামীজী পত্রিকাটির যথার্থ উপকার করেছিলেন।

পাশ্চাত্যে ভারতীয় বা প্রাচ্য আদর্শের প্রভাব-বিস্তারের প্রসঙ্গে এ প্রস্তাবে পাশ্চাত্যবাসীর প্রাচীন ভারতীয় জগতে প্রবেশের যে ছবি কথায় আঁকা হয়েছে, তাই "প্রবুদ্ধ ভারতের" মলাটেও আঁকা হয়েছিল। চিত্রকলার নিদর্শন হিসাবে সে ছবি স্বামীজীর কাছে এতই বিরক্তিকর হয়েছিল যে, যথাশীঘ্র 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র নতুন মলাটের জন্য তিনি উদ্যোক্তাদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এতে করে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র উদ্যোক্তাদের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। ১৮৯৮-এর জুন অবধি সম্পাদক রাজন্ আয়ারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে এই বছরের আগস্টমাসে উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ের আলমোড়া থেকে বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দজীর সম্পাদনায় 'প্রবুদ্ধ ভারত' আবার প্রকাশিত হতে থাকে। রাজন্ আয়ারের আকস্মিক দেহাবসানে পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়াতে বেদনার কারণ ঘটলেও এর পর থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ও কল্পনায় 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র নব-রূপান্তর ঘটে।

'প্রবুদ্ধ ভারতে'র এই নবজন্ম উপলক্ষেই স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'To the Awakened India' ('প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি') লিখেছিলেন। 'ব্রহ্মবাদিন্' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' দুটি পত্রিকাতেই তাঁর অজস্র বক্তৃতা ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাদুটি যে স্বামীজীর বিশ্বকল্যাণযজ্ঞেরই আর এক দিক সে সম্বন্ধে বারংবার চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুগামীদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৮—এই সময়ের মধ্যে আমরা দুটি ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশ দেখলাম। ১৮৯৯-এ প্রকাশিত হল স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা সাময়িক পত্র 'উদ্বোধন'।

২

'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার আদর্শবাণী ছিল—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার আদর্শ—"Arise! Awake!

and stop not till the goal is reached."[১] উদ্ধৃত বাক্যটি যে উপনিষদের বাণীর সঙ্গে স্বামীজীর নিজস্ব প্রেরণাযোগে সৃষ্ট সেকথা 'অনুবাদক বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে আলোচিত। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথমে আদর্শ হলো উপনিষদের মূল বাণী—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"[২]। প্রথম কয়েকটি সংখ্যার সূচনায় এই বাণীই রয়েছে। তার পর থেকে দেখা দিল—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"[৩]

ব্যক্তি আত্মা থেকে ভারতাত্মা, এবং ভারতবাসী থেকে সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁর এই আহ্বানের লক্ষ্য। তবু, বিশেষভাবে বাংলার সন্তান তিনি, বাঙালী হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কাছে তাঁর ঋণ-পরিশোধের উপায় হলো মাতৃভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শ-প্রচারের মাধ্যমরূপে একটি পত্রিকা-প্রকাশ। অনেকদিন থেকেই এ জাতীয় একটি পত্রিকা-প্রকাশের কথা নিয়ে গুরুভাইদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলছিল।

১৮৯৪-এর ২৫শে সেপ্টেম্বর বরাহনগর মঠের গুরুভাইদের উদ্দেশে স্বামীজী লিখছেন—"একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit (সম্পাদন) করতে হবে, আদ্দেক বাঙলা, আদ্দেক হিন্দি—পারো তো আর একটা ইংরাজীতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ—খবরের কাগজের subscriber (গ্রাহক) সংগ্রহ করতে ক-দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে, subscriber যোগাড় করুক। গুপ্ত[৪] হিন্দি দিকটা লিখুক......"[৫]

বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় 'খবরের কাগজে'র সঙ্কল্প তখনই রূপায়িত হয় নি। এর মধ্যে ইংরেজী পত্রিকা 'ব্রহ্মবাদিন্' মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হলো। তবু একে ঠিক সঙ্ঘের পত্রিকা বলা চলে না।

১ ওঠো, জাগো, অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থামিও না।
২ শ্বেতকেতু, তুমিই সেই (ব্রহ্ম)। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।১৬।৩
৩ ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর।
৪ স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ।
৫ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৮৮

১৮৯৬-এর জানুয়ারিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে লেখা স্বামীজীর আর একটি চিঠির অংশ—"……তোর কাগজের idea (সঙ্কল্প) অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০ টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো ……। খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশীধর্মের প্রচার এখন করে ওঠ দিকি। তবে কোনও আরবীজানা মুসলমান ভায়া ধরে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করতে পারো, ভাল হয়। কার্সী ভাষায় অনেক Indian History (ভারতীয় ইতিহাস) আছে। যদি সেগুলি ক্রমে তর্জমা করতে পারো, একটা বেশ regular item (নিয়মিত বিষয়) হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই মুশকিল। উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলাভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোক ধ'রে কাগজ গতিয়ে দিবি···চালাও কাগজ, কুছ্ পরোয়া নাই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরি করেছিস। বাহবা, সাবাস! গুঁজেগুঁজেগুলো পেছু পড়ে থাকবে হাঁ ক'রে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার করছে,—না হবে ওদের উদ্ধার, না আর কারুর।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বিবেকানন্দের প্রিয় গুরুভাইদের অন্যতম সারদা (বা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)[২] তাঁর পত্রিকাপ্রকাশের সঙ্কল্পের দ্বারা স্বামীজীর মনে কতখানি উৎসাহসঞ্চার করেছিলেন, তা এ পত্রটিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পত্রিকাপ্রকাশের পিছনে অধ্যাত্মপ্রেরণা ছিল বলেই প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ থেকে পরবর্তীকালে 'উদ্বোধনে'র বিশিষ্ট সম্পাদকমণ্ডলীর নিয়ত সাধনায় এ পত্রিকা আজো

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ২১০

২ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবীর কাছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-চিহ্নিত ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে এঁরা প্রথম থেকেই গণ্য হয়েছিলেন।

বাঙালী পাঠকের (বিশেষতঃ অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে) পরম শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে আছে।

বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো যদি শ্রেষ্ঠ নেতার লক্ষণ হয়ে থাকে, তাহলে পত্রিকাপ্রকাশের ক্ষেত্রে মাদ্রাজে আলাসিঙ্গা পেরুমল এবং কলকাতায় স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ—এঁদের দু'জনের নির্বাচন স্বামীজীর সহজাত নেতৃত্বশক্তির অন্যতম নিদর্শন।

৩

'উদ্বোধন'-প্রকাশের সমকালীন স্মৃতির দু'একটি উদাহরণ। প্রথমে স্বামী সুন্দরানন্দজী-সম্পাদিত 'উদ্বোধনে'র সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা'-প্রবন্ধে কুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের স্মৃতিচারণ—"'উদ্বোধন' প্রকাশের দিন এখনও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্বামীজীর লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া তাঁহাদের নয়ন-সম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হইয়াছিল! ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা—সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস ও ছোট ছাপাখানা, তবুও ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কারণ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আধ্যাত্মিক মহাশক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব প্রেরণা ও প্রদীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক বাণী এবং সর্বত্যাগী পরহিতব্রতী রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসিসঙ্ঘের সুদৃঢ় সংকল্প, নিষ্কাম কর্ম-প্রেরণা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়। আজ মনে পড়ে 'উদ্বোধনে'র সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা। তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাতা বলিলাম, কারণ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে, উপদেশে এবং সহায়তায় তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে 'উদ্বোধন প্রেস' এবং 'উদ্বোধন পত্রিকা'র সম্পাদনার গুরুদায়িত্বভার একাকী বহন করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যাপূত

জীবনে অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর পত্রিকাপ্রকাশের ইচ্ছাকে তিনি কার্যক্ষেত্রে আকার দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

"পত্রিকায় কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখিতে ভুল ত্রুটি থাকিলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করিলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে তিরস্কার সহ্য করিতে হইত। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমূলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীস্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ 'উদ্বোধনে' তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।[১] শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দেখিয়াই 'উদ্বোধনে' তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা রাখিলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বলিলেন, "কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তাতো বুঝতে চাও না!" স্বামীজী বলিলেন, "ওসব কথা রেখে দে—তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়—যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয় ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হল—তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল ভ্রান্তি ছাপবি—তবে উন্নতিটা কি হল বল?"[২]

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর লেখক শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা[৩]—"স্বামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন।

১ উদ্বোধন : ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১লা চৈত্র, ১৩০৫

২ উদ্বোধন, সুবর্ণজয়ন্তীসংখ্যা পৃঃ ২১৬-২১৭

৩ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : স্বামিশিষ্যসংবাদ : পৃঃ ১৭৩

কিন্তু উহা বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল…।

"পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীজী নিজে লিখিয়া দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ—এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। সঙ্ঘরূপে পরিণত রামকৃষ্ণমিশনের সভ্যগণকে স্বামীজী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মসম্বন্ধীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল।…

"স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে) 'উদ্বন্ধন' দেখেছিস ?

"শিষ্য। আজ্ঞে হ্যাঁ ; সুন্দর হয়েছে।

"স্বামীজী। এই পত্রের ভাব ভাষা—সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে।

"শিষ্য। কিরূপ ?

"স্বামীজী। ঠাকুরের ভাব তো সবাইকে দিতে হবেই। অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে। এই যেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদ ব্যবহার) করলে, ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে।"

দেখা যাচ্ছে আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষা নিয়ে নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষার সঙ্কল্পও স্বামীজীর মনে এই কালে জেগেছে। 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত স্বামীজীর বিভিন্ন রচনা সেই পরীক্ষামূলক সচেতন প্রচেষ্টার অঙ্গস্বরূপ।

"আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success (সাফল্য) হয় তো এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে।" পত্রিকার উদ্দেশ্য যে আর একভাবে নর-নারায়ণ-সেবা সেকথাও এক্ষেত্রে স্পষ্ট।

কথায় কথায় শরচ্চন্দ্র জানালেন, "ত্রিগুণাতীত স্বামী আমায় কাল বললেন, তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের প্রথম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তারপর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব!

"স্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস, আমি তার কাজে খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, তাকে সাহায্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।"

১৮৯৯-এর জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রথম সংখ্যা 'উদ্বোধন' (১লা মাঘ, ১৩০৫) প্রকাশিত হওয়ার কাছাকাছি একটি দিনে স্বামীজী এই পত্রিকার আদর্শ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কথাগুলি বলার পাশা-পাশি ঐদিন রাতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও সাহিত্য-সৃষ্টির একটি মূলসূত্র তুলে ধরেছিলেন—

"স্বামীজী। 'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive idea (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (নেতিবাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) করে দেয়। দেখছিস না, যে-সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে, 'এটার কিছু হবে না, বোকা গাধা'—তাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, Children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চস্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas (গঠনমূলক ভাবগুলি) দিতে পারলে সাধারণে মানুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ সব বিষয়ে কেমন করে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই ব'লে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মানুষের feeling wounded (মনে আঘাত) করা হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে

করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত!"

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন: "ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তার উপর নাকসিঁটকানো ব্যাপার বলে যেন বুঝিস নি। Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive ideas (গঠনমূলক ভাবধারা) দিতে হবে। কিন্তু ঘেন্না করে নয়। পরস্পরকে ঘেন্না করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে।..."

"তোদের history, literature, mythology (ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণ) প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ মানুষকে কেবল ভয়ই দেখাচ্ছে। মানুষকে কেবল বলছে—"তুই নরকে যাবি। তোর আর উপায় নেই।" তাই এত অবসন্নতা ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে। সেই জন্য বেদ বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যা-শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি। তবে জানব—তোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে।"[১]

'উদ্বোধন'-পত্রিকার পটভূমিকায় ভাষা-আন্দোলন, ভারতের জাগরণ ও মানব-কল্যাণের সুমহৎ সঙ্কল্প ছিল বলেই ১৩০৫ থেকে আজ অবধি—এই সুদীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের অক্লান্ত সাধনায় এবং অনুরাগী লেখক ও পাঠকমণ্ডলীর সমবেত সহায়তায় (তেমন অর্থকরী সাফল্য না থাকলেও) এ পত্রিকা ভারত-সংস্কৃতি-প্রচারে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে এসেছে। সবচেয়ে লক্ষণীয়—সাধারণভাবে গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দিকের 'উদ্বোধনে' গিরিশচন্দ্র

---

১ বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড: পৃঃ ১৭৬-১৭৭

প্রমুখ লেখকদের এ-জাতীয় রচনা যদিও বা কিছু থাকতো, পরবর্তীকালে আর তার কোনো নিদর্শনই প্রায় নেই। শুধুমাত্র মননিষ্ঠ রচনার বলে একটি পত্রিকার এত দীর্ঘকাল অচ্ছেদ্যভাবে পাঠকদের সঙ্গে যোগ রাখার উদাহরণ ইদানীং কালের বাংলাসাহিত্যে আর নেই।

প্রথম বর্ষ 'উদ্বোধনে'র বাঁধানো সংখ্যা থেকে এর আখ্যাপত্রটি একালের পাঠকদের আগ্রহের কথা ভেবে তুলে দিচ্ছি—

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

বাঙ্গালা পাক্ষিক পত্র

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান,

কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ

প্রভৃতি নানাবিধ-বিষয়ক।

প্রথম বর্ষ

১৩০৫ মাঘ হইতে ১৩০৬ পৌষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক সম্পাদিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—২৲

কলিকাতা, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কম্বুলটোলা, ১৪নং রামচন্দ্র মৈত্রেয় লেনস্থ উদ্বোধন প্রেস হইতে সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।[১]

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির সূচনা-প্রবন্ধটি স্বামী বিবেকানন্দ-লিখিত 'প্রস্তাবনা'। এই প্রস্তাবনাটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা উপলব্ধির পক্ষে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাণের সত্যটি ধারণায় আনার জন্যও প্রয়োজনীয়। এক হিসাবে

---

১ 'উদ্বোধন, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যার (১লা ফাল্গুন, ১৩০৭) প্রচ্ছদপত্রে আছে—

স্বামী বিবেকানন্দ—প্রধান লেখক

সম্পাদক—স্বামী ত্রিগুনাতীত

এ রচনাটি সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রস্তাবনারূপেই গৃহীত হতে পারে।[১]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐতিহ্য ও ইতিহাসের এক ভাবচিত্র উপস্থাপিত করে 'উদ্বোধনে'র প্রথম প্রবন্ধেই স্বামীজী ঘোষণা করলেন, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারী য়ুরোপ পূর্বপুরুষের "মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান", "আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।"

"কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।"

কিভাবে এই নবজাগরণ সম্ভব? "রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

"অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম, সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘ জীবন লাভ করে না। সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

"ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

"এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য।"

১ সমকালীন 'সাহিত্য' পত্রিকার দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০৬) 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে এ প্রবন্ধটি সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। লেখক খুব সম্ভব সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

পাশ্চাত্য প্রভাবের আতিশয্যে ভারতীয়তার বিলুপ্তি সম্বন্ধে যাঁদের ভয়, তাঁদের উদ্দেশে স্বামীজীর বক্তব্য—"আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান্ বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর, তাহার নাশ কে করে?"

প্রবন্ধপ্রান্তে এসে পাঠকমণ্ডলীর সামনে 'উদ্বোধনে'র আদর্শ ও পন্থা তুলে ধরে স্বামীজী লিখেছেন—" 'বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

"কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; আমরা কেবল বলি—হে তেজঃস্বরূপ। আমাদের তেজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর।" 'উদ্বোধনে'র সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই অসাম্প্রদায়িক মানব-মঙ্গলের শুভসঙ্কল্প অটুট থেকেছে—এইটিই বিবেকানন্দ-অনুগামীদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের কথা।

দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৬ 'উদ্বোধনে'র সূচনায় 'নববর্ষ প্রবেশ'। লেখকের নাম নেই।

"আজ উদ্বোধন নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। গত মাঘের প্রথম দিবসে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। "দেবগুরু প্রসাদে" এই এক বৎসর মধ্যে বঙ্গের প্রায় সকল স্থলেই এবং ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশেই, বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন। অনেক সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতাধিক সকলভালাভ আর কোনও সহযাত্রী করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

"...আবশ্যকীয় প্রসুপ্ত গুণাবলিকে জাগ্রত করিয়া দিবার চেষ্টা করাই উদ্বোধনের কার্য্য। প্রয়োজনীয় যে সকল গুণাবলি স্বদেশে

নাই তাহার আনয়ন করিতেই উদ্বোধনের আয়াস। নিঃস্বার্থভাবে পরহিত-সাধনাই ইহার জীবনোদ্দেশ্য।

"পরহিত সাধনের আবশ্যক? নিজ হিতকল্পে ব্যাপৃত থাকিলেই ত হয়। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি; পাঁচজনকে লইয়াই সমাজ; স্ব স্ব কর্তব্য করিলে কাহাকেও পরের কার্য্য করিতে হয় না। পরহিত আকাশ কুসুম বা সোনার পাথরবাটিবৎ; নিজ হিতই ত পরহিত। নিজের হিতই ত পরমহিত।

কিন্তু, কালের বিচিত্র গতি। সেকালে ছিল বটে ঐ প্রকার; একালে অন্য রকম,—কর্তব্যপালনের পরিবর্তে অহিতাচরণই যেন প্রথা। স্ব স্ব কর্তব্যপালন বিলুপ্তপ্রায়, নিজ নিজ হিতসাধন সুদূর পরাহত; সুতরাং পরহিতের আবশ্যক, নিঃস্বার্থতার উদ্ভব; এবং কাহারও কাহারও বোধ হইতে লাগিল, পরহিতই পরমপুণ্য, পরহিতই নিজহিত; দেখা গেল—এমন কি পশুপক্ষীর জন্যও কেহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"...

প্রবন্ধটির উপসংহার—"অতি মহৎ উদ্দেশ্যসহকারে উদ্বোধন জনসমাজে শুভযাত্রা করিয়াছেন; কামনা—পরহিত; না, পর—নহে, স্বজাতির, স্বদেশের,—নিজের অভিন্ন বন্ধুবর্গের হিতকামনা সমভিব্যাহারে; সম্বল—একমাত্র নিঃস্বার্থতা; বিশ্বাস—সেই সম্বলেই কৃতকার্য্য হইবে, স্বদেশের প্রভূত উপকার করিবে। সৎকার্য্যে নানা বিঘ্ন, বিপদ প্রতিপদে,—কেবল সহায়—পরমবন্ধু ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। ভরসা—উদ্যম। প্রসাদ—জগদীশ্বরের শ্রীচরণাশীর্বাদ। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

বর্ষপ্রবেশের এই রচনাটি খুব সম্ভব সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতের। স্বামীজীর ভাবধারা তিনি কীভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন তা যেমন এ রচনায় লক্ষণীয়, তেমনি বিচার্য ছোট ছোট বাক্যের সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য। পরবর্তী জীবনে আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শ-প্রচারে ইনি সত্যিই 'প্রাণ' দিয়েছিলেন।

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৭ এর সূচনা-নিবন্ধটির নাম 'নবানুরাগ'। এটিও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীরই লেখা মনে হয়। প্রথম অনুচ্ছেদ এইরকম—"আজ আমাদের শুভ দিন—উদ্বোধনের নববর্ষারম্ভ। আজ আশীর্বাদ করুন, নূতন উদ্যমের সহিত যেন ইহাকে চালাইতে পারি; উদ্বোধন যেন নববর্ষে—নবানুরাগের ভরে অধিকতর বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে। আজ একটু মঙ্গল-বাসনা করুন, যেন সকলে নব উৎসাহে, নব উদ্যমে স্ব স্ব কার্য্যে রত হইতে থাকেন; নব প্রেমে, নব অনুরাগে যেন সকলে নির্মল আনন্দমূর্ত্তি হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। আজ একটু শুভেচ্ছা করুন, যেন ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিয়া উঠে; অন্তরে অন্তরে, প্রতি অন্তরে, প্রতি হৃদয়ে, যেন আজ তড়িৎ-তন্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠে—"...

চতুর্থ বর্ষেও কার্ত্তিক সংখ্যা অবধি সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত। তবে এ বছরের প্রথম সংখ্যা (১লা মাঘ, ১৩০৮ সাল) শুরু হয়েছে বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কে তুমি?' কবিতা দিয়ে। তারপরই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র অংশবিশেষ মুদ্রিত।...এই চতুর্থ বর্ষেরই একাদশ সংখ্যার (১লা শ্রাবণ, ১৩০৯) সূচনায় স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ সংহত বেদনায় প্রকাশিত।

"আজ অতি কষ্টে, অতি কাতর প্রাণে গ্রাহকগণের হৃদয়ে এক অতি প্রবল শোকের উদ্দীপন করিয়া দিতেছি।

"কাহারও শুনিবার আর বাকি নাই যে আমাদের পূজ্যপাদ স্বামীজী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ যে-দিন তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই দিনের সমুদয় ঘটনার সামান্য বিবরণ দিতেছি। ইচ্ছা রহিল, তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী এক ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে গ্রাহকগণের হস্তে পরে অর্পণ করিব।

"বিগত ৪ঠা জুলাই, বাঙ্গালা ২০শে আষাঢ়, শুক্রবার, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।"—

এর পর ৪ঠা জুলাইয়ের সারা দিনটিতে স্বামীজীর বর্ণনা—"...যেদিন দেহত্যাগ করেন, সেই দিন প্রাতঃকালে যজুর্বেদের একটি

মন্ত্র ("সুষুম্নঃ সূর্যরশ্মি" ইত্যাদি) ও উহার টীকা একজন সন্ন্যাসী-শিষ্যকে পড়িতে বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, টীকাতে সুষুম্নঃ শব্দের যে অর্থ থাক পরবর্তী ষট্‌চক্রবাদিগণ সুষুম্না নাড়ীর যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, তাহার বীজ (অর্থাৎ ভিত্তি) এই মন্ত্রে রহিয়াছে দেখ।

"ইহাতে বোধ হয়, সে দিন তাঁহার মনে ষট্‌চক্রের ভাব ও সাধনাবিশেষ জাগরূক ছিল।

"পরে বেলা আটটা হইতে এগারোটা পর্যন্ত ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিলেন। অন্য অন্য দিন এতক্ষণ ধরিয়া ধ্যানও করিতেন না এবং যাহাও করিতেন, বায়ুশূন্য স্থানে বসিয়া করিতে পারিতেন না। সে দিন কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন।

"ধ্যানান্তে একটি সুন্দর শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতে লাগিলেন। অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গানটি এই—'মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো।'

"সেদিন আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলেন। আহারান্তে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ধরিয়া শিষ্যগণকে "লঘুকৌমুদী" ব্যাকরণ পড়াইলেন, পরে বৈকালে জনৈক গুরুভাইয়ের সহিত প্রায় ১॥০ মাইল বেড়াইয়া আসিলেন। অনেকদিন এত বেশী বেড়াইতে পারেন নাই। সে দিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর খুব ভাল ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া শৌচাদি করিয়া বলিলেন, শরীর খুব হাল্কা বোধ হইল। পরে খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর নিজের ঘরে যাইয়া জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, আমার জপের মালা আনিয়া দাও। পরে তিনি শিষ্যটিকে বাহিরে যাইতে বলিয়া সেই ঘরে একান্তে জপ করিতে বসিলেন।

"তাহার পরদিন শনিবার অমাবস্যায় শ্যামাপূজা করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সে দিন অনেক কথাবার্তা কহেন।

ঘণ্টাখানেক জপ করিতে করিতে শয়ন করিলেন ও সেই শিষ্যকে ডাকিয়া নিজের মাথায় একটু বাতাস করতে বলিলেন। তখনও তাঁহার হাতে মালা ছিল। শিষ্য মনে করিলেন, বোধ হয় তাঁহার নিদ্রার আবেশের মত আসিল। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁহার হাত একটু কাঁপিল। পরে দুইবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। শিষ্য মনে করিল যে, তাঁহার সমাধি হইল। তখন সে নীচে হইতে অনৈক সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া লইতে যাইল। তিনি গিয়া দেখিলেন, স্বামীজীর নাড়ী নাই ও নিশ্বাসবন্ধ। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ মনে করিয়া ক্রমাগত ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনমতে সমাধিভঙ্গ আর হইল না। সেই রাত্রে অনৈক বিচক্ষণ ডাক্তারকে আনয়ন করা হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, দেহত্যাগ হইয়াছে।"

স্বামীজী তো শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন, তিনিই প্রথম চারবছরের 'উদ্বোধনে'র প্রধান লেখক। একদিকে তাঁর মৌলিক বাংলা রচনাবলী, অন্য দিকে তাঁর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনার অনুবাদ এ দুয়ের দ্বারা পরিপুষ্ট 'উদ্বোধন' এখন থেকে সাধারণভাবে স্বামীজীর মৌলিক বাংলারচনাপ্রকাশের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'ল।[১]

'উদ্বোধনে'র এই চতুর্থ বর্ষেই কার্তিক মাসে সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকার স্যানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সোসাইটির ভার নিয়ে চলে গেলেন। স্বামীজীর আদর্শে 'উদ্বোধন' পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ। বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক 'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচয়িতা স্বামী সারদানন্দের 'ভারতে শক্তিপূজা' প্রবন্ধটি প্রথম পৃষ্ঠায় ধারণ করে ৫ম বর্ষের 'উদ্বোধন'-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ।

---

১ শব্দম বর্ষের 'উদ্বোধনে' স্বামীজীর চিঠিপত্র থেকে উদ্ধার করে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। হয়তো এর পরেও স্বামীজীর কোনো অপ্রকাশিত রচনা পাওয়া যেতে পারে।

ভারতে শক্তিপূজা

(স্বামী সারদানন্দ লিখিত)

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

"জড় চেতন সকলের মধ্যে গুপ্ত বা ব্যক্তভাবে অবস্থিতা শক্তি-রূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

"হে পাঠক! উদ্বোধন ৫ম বর্ষে উপনীত হইল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সত্ত্ব বা ব্রহ্মশক্তি বীরাগ্রণী শ্রীবিবেকানন্দ-হৃদয়নিহিত রজঃ বা ক্ষত্রশক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরমকল্যাণের নিমিত্ত ইহাকে জাগরিত করিয়াছে। সেইজন্য আপাততঃ শিশু হইলেও ইহা প্রবীণ, স্বল্পবয়স্ক হইলেও অমিতবলশালী এবং ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের একাংশের এবং কালে সমগ্র ভারতের কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য নহে,—সর্ষপতুল্য বীজেই বিশাল বৃক্ষ, নগণ্য অসহায় মনুষ্যশরীরেই জড়শক্তিনিয়ামিকা চৈতন্যময়ী অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার নিহিত রহিয়াছে। নববর্ষে নবোদ্যমে পুরাতনশক্তি আবার জাগরিত।"

উদ্ধৃত অংশের পর পূর্ণাভিষিক্ত তন্ত্রবিদ্ স্বামী সারদানন্দজী ভারতে শক্তিপূজার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্রতী। কিন্তু সূচনায় 'উদ্বোধনে'র আদর্শের বহ্নিশিখাটি স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম বর্ষের 'প্রস্তাবনা' থেকে সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হওয়ার শুভ-সঙ্কল্পে সারদানন্দজীর দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

৪

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম চারটি বৎসরে বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। বলা বাহুল্য, এ পত্রিকাটি না থাকলে স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনাই বিবেকানন্দ-সাহিত্য-প্রসঙ্গে আমাদের মূল অবলম্বনীয় হ'ত। তার ফলে বাঙালীর মনের মাটির সঙ্গে স্বামীজীর যোগ সহজে ঘটতো কিনা সন্দেহ।

বাংলাসাহিত্যে স্বামীজীর মৌলিক দানের মাধ্যম এই পত্রিকাটি তাই আমাদের মনন ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্টস্থানের অধিকারী।

স্বামীজীর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের রচনা হিসেবে নিঃসংশয়ে চিহ্নিত করা চলে মহেন্দ্রনাথ দত্ত-উল্লেখিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুবাদ (এখনো এই বইটির সন্ধান পাই নি), হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' গ্রন্থের অনুবাদ 'শিক্ষা' এবং 'সঙ্গীতকল্পতরু'র ভূমিকা-অংশ। এ ছাড়া বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থে নিবদ্ধ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন', 'ঈশা অনুসরণ' (ভূমিকা ও অনুবাদ), 'হিন্দুধর্ম কি ?'—এ কয়টি 'উদ্বোধন' প্রকাশের আগেই রচিত।[1] কিন্তু বাংলাসাহিত্যে স্বামীজীর আত্মপ্রকাশ প্রধানতঃ 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত রচনাবলী অবলম্বনে।

বাংলা ১৩০৫ সনের ১লা মাঘ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পাক্ষিক পত্রিকা' উদ্বোধনের আয়তন ছিল ডিমাই ৩২ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য ২৲। সাধারণতঃ প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে বা অন্য কোনো সময় একমাস 'উদ্বোধন' প্রকাশ বন্ধ থাকলেও প্রথম বর্ষে এমন কোনো বন্ধ ছিল না। প্রথম বর্ষে এই পাক্ষিক পত্রিকার বারোমাসে চব্বিশটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম চার বৎসরে 'উদ্বোধনে' স্বামীজীর যে যে মৌলিক বাংলা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তার তালিকা নিম্নরূপ—

১. প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৫—'প্রস্তাবনা'—['ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থে পরিবর্তিত নাম 'বর্তমান সমস্যা'] এটি 'উদ্বোধনে'র সূচনা-প্রবন্ধ।

২. প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৫ই মাঘ, ১৩০৫—'সখার প্রতি' (কবিতা)। এই সংখ্যা 'উদ্বোধনে'র দুটি মুদ্রণ হয়েছিল। একটি মুদ্রণে মূল কবিতার দু'টি চরণ বর্জিত এবং 'পক্ষহীন' স্থলে 'লক্ষ্যহীন' পাঠ। অন্য মুদ্রণে পুরো কবিতা এবং 'পক্ষহীন' পাঠ। 'বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে মুদ্রিত স্বামীজীর মূল পাণ্ডুলিপির

---

১ গদ্যে এই রচনাগুলি বাদে বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত স্তব, সংগীত ও কবিতা কিছু কিছু এই যুগে রচিত।

২ "ধর্ম তরে............................কাল যায়।"

প্রতিচ্ছবিতে এই দ্বিতীয় পাঠটিই আছে। তবে 'পক্ষহীন' স্থলে 'লক্ষ্যহীন' করবার চেষ্টা দেখা যায়। সে সংশোধন স্বামীজীর নিজের বা অন্য কারুর বলা কঠিন। মোটের উপর এই পাণ্ডুলিপির পূর্ণাঙ্গ বয়ানটিই বর্তমানে 'সখার প্রতি' কবিতা।

৩. প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১লা ফাল্গুন, ১৩০৫—'জ্ঞানার্জন' (প্রবন্ধ) এই সংখ্যার সূচনা প্রবন্ধ।

৪. প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১লা চৈত্র, ১৩০৫—'ম্যাক্স্‌মূলর কৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' (সমালোচনা)। ম্যাক্সমূলারের সুবিখ্যাত গ্রন্থের সমালোচনা। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী ও বাণীর উপাদান-সংগ্রহে ম্যাক্সমূলার অনেক পরিমাণে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের দ্বারা উপকৃত।

৫. প্রথম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, ১৩০৫—'বর্তমান ভারত' (ধারাবাহিক রচনা)

৬. ঐ ১০ম ও ১৪শ সংখ্যা, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ও ১৫ই শ্রাবণ, ১৩০৫—'ভাব্‌বার কথা' (রসরচনাগুচ্ছ)

৭. ঐ ১৫শ সংখ্যা, ১লা ভাদ্র, ১৩০৬—'বিলাতযাত্রীর পত্র' (ধারাবাহিক রচনা)

৮. দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৬—'নাচুক তাহাতে শ্যামা' (কবিতা)

৯. ঐ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, ১৩০৬—'স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। বাঙ্গালা ভাষা।' "কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জিলস্‌ নামক স্থান হইতে" উদ্বোধন-সম্পাদককে ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ তারিখে লেখা স্বামীজীর পত্র। এই সংখ্যার সূচনা প্রবন্ধ।

১০. ঐ ১০ম সংখ্যা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (ধারাবাহিক রচনা)

১১. ঐ ২০শ সংখ্যা, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭—'পারিস্‌ প্রদর্শনী' (প্রেরিত-পত্রের অনুবাদ) পত্রটি যে স্বামীজীর নিজেরই

লেখা তেমন কোনো কথা 'উদ্বোধনে' নেই। বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডে 'ভাব্‌বার কথা'-গ্রন্থে এটি মৌলিকরচনায় অন্তর্ভুক্ত। এমন হতে পারে যে মূল ইংরেজী রচনা স্বামীজীর, অনুবাদও তাঁর নিজস্ব। গ্রন্থবদ্ধ হবার কালে নাম 'পারি প্রদর্শনী'। রচনাভঙ্গী স্বামীজীর।

১২. তৃতীয় বর্ষ, মাঘ, ১৩০৭—পৌষ, ১৩০৮—ধারাবাহিক রচনা 'পরিব্রাজক' (তৃতীয় বর্ষ থেকে 'বিলাতযাত্রীর পত্রে'র—পরিবর্তিত নাম) এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'।

১৩. চতুর্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১লা আষাঢ়, ১৩০৯—'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (প্রবন্ধ)। ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ৬৫তম জন্মোৎসবে 'হিন্দুধর্ম কি?' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত। 'উদ্বোধনে' পুনঃপ্রকাশকালে এই নামে পরিচিত।

১৪. পঞ্চম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১লা আষাঢ়, ১৩১০—'গাই গীত শুনাতে তোমায়' (কবিতা)। কবিতাটির সূচনায় সম্পাদকীয় মন্তব্য —"এই কবিতাটি আমেরিকা হইতে মঠে প্রেরিত স্বামীজীর চিঠিপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।" ১৮৯৪ খ্রীঃ গ্রীষ্মকালে আমেরিকা থেকে লেখা উক্ত চিঠিতে জনৈক গুরুভাইকে স্বামীজী লিখেছেন—'তোমার পড়বার জন্য দু'ছত্র কবিতা পাঠালাম।' চিঠিতে এই কবিতার 'একা আমি হই বহু, দেখিতে আপন রূপ।'—এই পর্যন্ত আছে।

'উদ্বোধনে'র প্রথম চার বৎসরে প্রকাশিত স্বামীজীর ধারাবাহিক রচনাবলী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ—

ধারাবাহিক রচনার মধ্যে সর্বপ্রথম রচনা 'বর্তমান ভারত' প্রথম বর্ষের ৬, ৭, ৮, ১০ ও ১১শ সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় বর্ষের ৭, ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ও পরিসমাপ্ত। দ্বিতীয় রচনা 'বিলাতযাত্রীর পত্র' প্রথম বর্ষের ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ সংখ্যায়, দ্বিতীয় বর্ষের ৩, ৪, ৫ এবং তৃতীয় বর্ষের ১, ৩ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত। তৃতীয় বর্ষের 'উদ্বোধনে'ই 'বিলাতযাত্রীর পত্রে'র নাম হয় 'পরিব্রাজক'।

'পরিব্রাজকে'র এই অংশ অবধি 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত—"এদেরও এই হবে—কালস্য কুটিলা গতি, সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, সব 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' হবে, তার পর পচে মরা !!" এর পরের প্রায় সাত পৃষ্ঠা এবং সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্টের পাঁচপৃষ্ঠার উপকরণ (বাণী ও রচনা দ্রষ্টব্য) স্বামীজীর পাণ্ডুলিপি থেকে পরে যুক্ত হয়ে গ্রন্থাকারে 'পরিব্রাজক' প্রকাশিত। বাংলা ১৩১৮ সালে প্রকাশিত 'পরিব্রাজকে'র তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক একথা উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮ম সংখ্যা, ১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭—এই সংখ্যায় 'বর্তমান ভারত' সমাপ্ত। এই বর্ষের ১০ম সংখ্যা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭—এই সংখ্যা থেকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রকাশিত।[১] গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে পাওয়া এই রচনার অবশিষ্ট অংশ 'পরিশিষ্ট' নামে সংযুক্ত হয়।

'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের সমকালে ইংরেজী ২০শে জুন, ১৮৯৯ তারিখে স্বামীজী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করেন। ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০০ তারিখে রাত্রে বেলুড়মঠে হঠাৎ একাকী এসে সকলকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেন। মধ্যবর্তী সময়ে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত তাঁর রচনাবলী পত্র-যোগে প্রেরিত। প্রথম কয়েক বছরের 'উদ্বোধন' দেখলে বোঝা যায় যে মূলতঃ ধর্মবিষয়ক পত্রিকা হ'লেও সমকালীন পাক্ষিক ও মাসিকের আদর্শে প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, এমন কি উপন্যাস (গিরিশচন্দ্রের "ঐতিহাসিক ধর্ম উপন্যাস" 'ঝালোয়ার দুহিতা' : ১ম বর্ষ দ্রঃ) এতে নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তবে এ সবই মূল ধর্মভাবের বিকাশ-সাধনের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

শাস্ত্রচর্চার প্রতি স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহের ফলস্বরূপ 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষেই পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের আচার্য শঙ্কর ও মায়াবাদ,

১ উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ১০, ১২, ১৯ এবং ৩য় বর্ষ ২, ৪, ৫, ৭ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত।

গীতার শাঙ্করভাষ্যানুবাদ, বেদান্তসূত্রের রামানুজভাষ্যানুবাদ প্রভৃতি এবং পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যাভূষণের পাণিনীয় মহাভাষ্যের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া চারুচন্দ্র বসুর ধর্মপদ সম্বন্ধে আলোচনা, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর নাসদীয় সূক্ত অনুবাদ (ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তটি স্বামীজির বিশেষ প্রিয়) প্রভৃতি তো আছেই।

বাংলায় স্বামীজীর মৌলিক রচনা ছাড়া 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত স্বামী শুদ্ধানন্দ অনূদিত স্বামীজীর ইংরেজী বক্তৃতা ও রচনাবলীর অনুবাদও বাংলাসাহিত্যের বিশেষ সম্পদরূপে পরিগণিত। প্রথম বর্ষের 'উদ্বোধনে'ই শুদ্ধানন্দজীর অনূদিত 'রাজযোগ' প্রকাশিত হতে থাকে। এছাড়াও 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ', 'বহুত্বে একত্ব', 'কর্মজীবনে বেদান্ত', 'জ্ঞানযোগ' (ধারাবাহিক), পত্রাবলী প্রভৃতি নানা অনুবাদ শুদ্ধানন্দজী করেছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দই স্বামীজীর ইংরেজী কবিতা Song of The Sannyasin, যেটি প্রথম সংখ্যা 'ব্রহ্মবাদিনে' প্রকাশিত হয়েছিল, ২য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ১লা কার্তিক, ১৩০৭ এর 'উদ্বোধনে' সেটির 'সন্ন্যাসীর গীতি' নামে বিখ্যাত অনুবাদ করেন। প্রধানতঃ অনুবাদকরূপে পরিচিত হ'লেও স্বামী শুদ্ধানন্দ মৌলিক প্রবন্ধকার এবং 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদকরূপেও বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

প্রথম বর্ষের নবম সংখ্যা থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র অংশ বিশেষ প্রকাশিত হতে থাকে। লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তসহ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসহচরগণের অধিকাংশই তখন জীবিত। বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের নেতারূপে নরেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের এই স্মৃতিকথাগুলি স্বামীজীর মনে কীভাব জাগিয়ে তুলতো, জানতে ইচ্ছা হয়।

স্বামী সারদানন্দের রচনাবলীই 'উদ্বোধন' পত্রিকার ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের পরে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর 'ভারতে শক্তিপূজা', 'গীতাতত্ত্ব' (৫ম বর্ষ, নবম সংখ্যা), শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (১০ম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক রচনা) ও অন্যান্য রচনাবলী

ভাষানৈপুণ্য ও মনন-গভীরতার বিচারে বাংলাসাহিত্যে অতি উচ্চস্থানের অধিকারী। বিশেষতঃ 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতো একাধারে বিশ্লেষণমূলক অধ্যাত্ম-দর্শনের আকরগ্রন্থ ও জীবনীসাহিত্য এক 'চৈতন্য চরিতামৃত' ছাড়া বাংলা ভাষায় আর নেই। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'শ্রীরামানুজচরিত' নামে অমূল্য গ্রন্থখানি 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাসাহিত্যে চলতি ও সাধুভাষার তুলনামূলক আলোচনায় এবং চলতিভাষার প্রতি পক্ষপাতে 'উদ্বোধনে'র একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রথম বর্ষের ২৩ ও ২৪ সংখ্যায় গত "১৫ই আশ্বিনের সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা (সমালোচনা)" লক্ষণীয়। এই সমালোচনাটিতে চলিত শব্দ ও ভাষার প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরাগের সমর্থন করে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের গদ্যভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

এই সমালোচনাটি ছাড়া 'উদ্বোধনে'র ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যায়, প্রকাশিত "বাঙ্গালাভাষা" নামে স্বামীজীর গদ্যাংশটির কথা তো সর্বজনবিদিত।

'উদ্বোধন' পত্রিকার আর একজন বিশিষ্ট লেখক স্বামী অখণ্ডানন্দ, যাঁর 'স্বামীজীর পত্রাবলী'[১] সম্বন্ধে নিবন্ধটি বিবেকানন্দ-পত্র-সাহিত্যের ভূমিকাস্বরূপ গৃহীত হতে পারে। ষষ্ঠ বৎসরের 'উদ্বোধনে' অখণ্ডানন্দের তিব্বতভ্রমণ সম্বন্ধে ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সে-কালের কলকাতায় তথা সমগ্র বাংলার পাঠকের কাছেই এই ভ্রমণ-সাহিত্য বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

পাক্ষিক 'উদ্বোধনে'র লেখকমণ্ডলীর মধ্যে আর যাঁরা ছিলেন, বাংলাসাহিত্য ও ভারত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ স্বামী ব্রহ্মানন্দ,[২] হরপ্রসাদ

১ উদ্বোধন, অষ্টম বর্ষ, ১৫ই আষাঢ়, ১৩১৩, পৃঃ ৩২১

২ স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত 'পরমহংসদেবের উপদেশ'

শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র দত্ত, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী পরমানন্দ প্রভৃতি। 'উদ্বোধন'-সম্পাদকবৃন্দ[১] এ পত্রিকার পাক্ষিক থেকে আরম্ভ করে মাসিক অবধি 'উদ্বোধনে'র সব স্তরেই এর আদর্শ এবং সাহিত্য-মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থেকেছেন। তবু মনে হয় 'ব্রহ্মবাদিন্, পত্রিকার মতো সম্পূর্ণ গবেষণামূলক অথবা স্বামীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র মতো সর্বজনবোধ্য গল্পকাহিনীর মাধ্যমে আদর্শ-প্রচারচেষ্টা—এ দুই ধরনেরই পত্রিকা বাংলায়ও প্রয়োজন। অবশ্য 'প্রবুদ্ধ ভারত' এখন প্রধানতঃ উচ্চস্তরের মননধর্মী পত্রিকারূপেই গৃহীত। সেদিক থেকে ভারত-সংস্কৃতির সর্বজনবোধ্য প্রচারে এখনো অনেক কিছু করণীয় থেকে গেছে।

১ 'উদ্বোধন' পত্রিকার বিভিন্ন সময়ের সম্পাদকবৃন্দের নাম পত্রিকার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়—

প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (মাঘ, ১৩০৫) থেকে ৪র্থ বর্ষ, কার্তিক সংখ্যা অবধি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, ১৩০৯—১৩১৪—স্বামী শুদ্ধানন্দ, ১৩১৪—১৩১৮ স্বামী সারদানন্দ, ১৩১৮-১৩২০ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, ১৩২০-১৩২২ ব্রহ্মচারী নির্মল (স্বামী মাধবানন্দ), ১৩২২-১৩২৬ ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্য (স্বামী দয়ানন্দ) ও ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য (স্বামী গঙ্গেশানন্দ), ১৩২৬-১৩২৯ স্বামী বাসুদেবানন্দ, ১৩২৯ ভাদ্র থেকে ১৩৩৪, শ্রাবণ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ (যুগ্ম সম্পাদক), ১৩৩৪ ১লা ভাদ্র সংখ্যা থেকে ১৩৪২, আশ্বিন স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ (যুগ্ম সম্পাদক), ১৩৪২ কার্তিক সংখ্যা থেকে ১৩৪৩ আশ্বিন স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ, ১৩৪৩ কার্তিক সংখ্যা থেকে চৈত্র ১৩৫৮ স্বামী সুন্দরানন্দ ; বৈশাখ ১৩৫৯ থেকে পৌষ ১৩৬৩ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, মাঘ ১৩৬৩ থেকে পৌষ, ১৩৭১ স্বামী নিরাময়ানন্দ, ১৩৭১ সালের মাঘ সংখ্যা থেকে ফাল্গুন, ১৩৮৪ সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, তাঁর সঙ্গে যুক্ত বা যুগ্ম সম্পাদকরূপে স্বামী জীবানন্দ ভাদ্র, ১৩৮০ থেকে পৌষ, ১৩৮০ এবং সংযুক্ত সম্পাদকরূপে স্বামী ধ্যানানন্দ, (মাঘ, ১৩৮০ থেকে) ; স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর প্রয়াণের পরে সম্পাদকরূপে স্বামী আত্মস্থানন্দ চৈত্র, ১৩৮৪ এবং স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বৈশাখ, ১৩৮৫ থেকে, এঁদের সঙ্গে স্বামী ধ্যানানন্দ সংযুক্ত সম্পাদক।

দশম বর্ষ (১৩১৪ মাঘ—১৩১৫ পৌষ) থেকে 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। তখন আয়তন ছিল ডিমাই ৬৪ পৃষ্ঠা, বার্ষিক মূল্য আগের মতো দুই টাকা। "লীলাপ্রসঙ্গ" ছাড়া এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক রচনা স্বামী প্রজ্ঞানন্দের "ভারতের সাধনা"—বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শে ভারতের নবজাগরণ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

'উদ্বোধন'কে দৈনিক পত্রিকায় পরিণত করা স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল। সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষের অপরাপর পরিকল্পনার মতো কালে এটিও রূপায়িত হলে খুবই আনন্দের বিষয় হবে। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে আয়ুষ্মান পত্রিকাদের অন্যতম এই পত্রিকাটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থেকে যেভাবে ভারত ও বিশ্বের অন্তরঙ্গ যোগসাধনায় রত সেজন্য 'উদ্বোধনে'র প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিনিবেদন আমাদের পবিত্র কর্তব্য। জাতির জীবনে যে উদ্বোধন তাঁদের অভীপ্সিত ছিল, 'উদ্বোধন' তার পরিপূর্ণ রূপায়ণে আরো অগ্রসর হোক এই আমাদের প্রার্থনা।[১]

'উদ্বোধন'-পত্রিকা-প্রকাশের (মাঘ, ১৩০৫) অনতিকাল পরে 'সাহিত্য'-পত্রিকার দশমবর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০৬) 'মাসিক

সাহিত্য সমালোচনা'-বিভাগে এ পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

"উদ্বোধন। নূতন পাক্ষিক পত্র। "প্রস্তাবনা"য় স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,—"যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন শক্তির মহাসঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতা-বন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা ;—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।" "......রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হইয়া যায় ? ভোগ-শেষ না হইলে যোগ কি করিবে ? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে ? অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম ; সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান দীর্ঘজীবন লাভ করে না ; সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী, ইহার সাক্ষী ইতিহাস। ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব ; পাশ্চাত্ত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্যজগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।" ইহা অপেক্ষা আর কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে কি না, জানি না। উদ্বোধনের আহ্বানে এই চিরনিদ্রিত জাতি উদ্বুদ্ধ হউক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।—আমরা আর কখনও বিবেকানন্দস্বামীর বাঙ্গালা রচনা দেখি নাই। শুনিলাম, এই তাঁহার প্রথম রচনা। স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাষার নূতন ভঙ্গী ও লীলাগতি দেখিয়া মনে হয়, সত্যই প্রতিভা সর্বতোমুখী।"

উদ্ধৃত সমালোচনাটি 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নিজের লেখা বলেই মনে হয়। 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনা অংশ থেকে যেটুকু সমালোচক উদ্ধৃত করেছেন, তা বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলেই আমরাও অবিকল উদ্ধৃত করে দিলাম। ভাবের মহত্ত্ব ও ভাষার লীলাভঙ্গীতে বিবেকানন্দ-প্রতিভার সর্বতোমুখীনতা সম্বন্ধে এমন সাধুবাদ 'উদ্বোধনে'র প্রারম্ভিকপর্বেই দেখা দিয়েছে। এর আগে স্বামীজী বিচ্ছিন্নভাবে বাংলারচনায় হাত দিয়েছেন। 'উদ্বোধন' উপলক্ষেই ভাবে ও ভাষায় বাংলাসাহিত্যে যুগান্তরসৃষ্টির সঙ্কল্প নিয়ে স্বামীজীর বিভিন্ন বাংলারচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সে প্রকাশের মহিমা 'সাহিত্য'-পত্রিকার সমালোচকের দ্বারা 'উদ্বোধন'-প্রকাশের প্রথম লগ্নেই অভিনন্দিত।

'সাহিত্য'-পত্রিকার ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) 'মাসিক সাহিত্যসমালোচনা'-বিভাগে মন্তব্য—"উদ্বোধন। বৈশাখ; ৭ম ও ৮ম সংখ্যা। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দস্বামীর "বর্তমান ভারত" চিন্তাপূর্ণ সুপ্রবন্ধ চিন্তাশীলের সুপথ্য। "তিব্বতভ্রমণ"[১] চিত্তাকর্ষক, কিন্তু মাত্রায় অতি অল্প। ৮ম সংখ্যায় "পরমহংসদেবের উপদেশ"[২] পরম রমণীয়।'

একই বছরের 'সাহিত্য', ৩য় সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩০৬) উক্ত বিভাগে মন্তব্য—"'শ্রীম-কথিত' "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" উপাদেয়। "তিব্বত ভ্রমণ" কৌতূহলের উদ্দীপক, কিন্তু হায়! লেখক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি পাঠকের উদ্বুদ্ধ কৌতূহল কখনই চরিতার্থ করিবেন না। শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দস্বামীর "বর্তমান ভারত" নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অল্পমাত্র দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বাঙ্গাল" একটি ক্ষুদ্র গল্প,—বিশেষত্ব আছে।"

ওই বছরের ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩০৬) উক্ত বিভাগে আছে—"উদ্বোধন। আষাঢ়; ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। আষাঢ়ের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের "গোবরা" নামক ক্ষুদ্র গল্পটি

---

১ লেখক: স্বামী অখণ্ডানন্দ

২ সংকলয়িতা: স্বামী ব্রহ্মানন্দ

উল্লেখযোগ্য। বোধ করি ঘটনাসমাবেশে লেখকের দৃষ্টি ছিল না,—তাই কোনও কোনও ঘটনা অসম্ভব ও অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়—কিন্তু বাগদিনীর চরিত্রচিত্রে লেখক সফল হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের "বর্তমান ভারত" এবারও আছে। আষাঢ়ের দ্বিতীয় সংখ্যায় "শ্রীশ্রীরামানুজচরিত"[১] উল্লেখযোগ্য। ভাষার দারিদ্র্যে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের অনুবাদিত "কারিষ্ঠু" গল্পটি মাটি হইয়াছে।"

এ পর্যন্ত "উদ্বোধন"-পত্রিকা-প্রসঙ্গে স্বামীজীর রচনাভঙ্গীর সমর্থনই আমরা 'সাহিত্য'-পত্রিকার সমালোচনায় দেখলাম। এবারে অসমর্থনের দিকটিও লক্ষণীয়।

'সাহিত্য' দশম বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩০৬) সমালোচনাবিভাগের মন্তব্য—"উদ্বোধন। আশ্বিন। "বিলাতযাত্রীর পত্র" স্বামী বিবেকানন্দের লিখিত। স্বামীজীর পত্রসমূহ চিত্তাকর্ষক এবং তাঁহার বহুদিনসঞ্চিত বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু পত্রের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এই সকল পত্রে অসংযত চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কি উদ্দেশ্য, বুঝা যায় না। বিশুদ্ধ ভাষাও সরল, প্রাঞ্জল ও সর্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। "তিব্বত-ভ্রমণ" আর একটি সুখপাঠ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত।"

এর পর 'উদ্বোধন'-প্রসঙ্গে আবার মন্তব্য পাই 'সাহিত্য'-পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০৮)—"উদ্বোধন : চৈত্র : পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা। এই চৈত্রে 'উদ্বোধনে'র তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। পঞ্চম সংখ্যার "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রবন্ধ উপাদেয়। লেখক স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া এই সন্দর্ভে বিবিধ রত্ন ঢালিয়া দিতেছেন। আমরা স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যিনি না পড়িবেন, তিনি বঞ্চিত হইবেন। স্বামীজী ইচ্ছা করিয়া রচনাটিকে গ্রাম্যভাষার পরিচ্ছদ দিয়াছেন। চলিত গ্রাম্যভাষা নহিলে যে সাধারণ বাঙ্গালী বুঝিত না, এমন মনে হয় না। যে সকল পাঠক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবেন, প্রাঞ্জল সাধুভাষা তাহাদিগকে বাধা

১ লেখক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

দিতে পারিবে না। 'রাখাল বেশে' এই রচনাটির সৌন্দর্যহানি হইতেছে।"—এই সমালোচনাটিতে একটি তথ্যগত ভ্রান্তি স্মরণীয়,—'উদ্বোধনে'র বর্ষপূর্তি হয় পৌষমাসে, সুতরাং চৈত্রমাসের সংখ্যাটি বর্ষপূর্তির সংখ্যা নয়।

সমকালীন সাহিত্য-পত্রিকার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'সাহিত্য' থেকে কৌতূহলী পাঠকদের কথা ভেবে স্বামীজীর সমকালীন 'উদ্বোধনে'র সমালোচনা কী ধরনের হতো, তার উদাহরণ সাজিয়ে দেওয়া হলো। অন্যান্য পত্রিকায়ও এ-জাতীয় সমালোচনা কিছু কিছু পাওয়া যাবে। সেকালের মতামত একালে সবটা স্বীকৃতি না পাওয়াই স্বাভাবিক।

'সাহিত্য'-পত্রিকার সমালোচক 'উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা'কে স্বামীজীর প্রথম বাংলারচনা মনে করলেও আসলে 'সঙ্গীত কল্পতরু'র ভূমিকাকেই আমরা এ পর্যন্ত পাওয়া প্রথম রচনা বলতে পারি।

প্রথম বর্ষের আষাঢ় মাসের 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় কিরণচন্দ্র দত্ত-অনূদিত 'কারিষ্টু' গল্পের 'সাহিত্য'-পত্রিকায় প্রকাশিত নির্মম সমালোচনা পড়ে কিরণচন্দ্র কিছুদিন লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্বামীজী সেকথা শুনে বেলুড়মঠে একদিন কিরণচন্দ্রকে বলেছিলেন—"দ্যাখ্, আমরা ভাব-রাজ্যের ঐরাবৎ। ভাবের সমুদ্র তোলপাড় করে দিয়ে চলে যাবো। ভাষা ব্যাটারা গড়ে নিক। আমরা ভাষা দিতে আসি নি ; বাংলা ভাষার এখনও গঠনের যুগ। ঐ রকম গল্প—ত্যাগ, বৈরাগ্য, আত্মোৎসর্গের আদর্শ যে কোনও ভাষায় পাবি, তর্জমা করে দিবি।" একথা বলে স্বামীজী 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজীকে বলেছিলেন, "কিরণের লেখা যেন ছাপা হয়।"[১]

স্বামীজীর "চলতিভাষা"-সম্বন্ধে "সাহিত্য"-পত্রিকার মতামত কালের বিচার গ্রাহ্য হয় নি। সব মিলিয়ে দেখলে 'সাহিত্য'-পত্রিকা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার মনোভাবই গ্রহণ করেছিল। স্বামীজীর সাহিত্যপ্রতিভাপ্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সমুচ্চ ধারণাই উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যগুলিতে প্রকাশিত।

১ 'জীবন্মুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত' : ব্রহ্মগোপাল দত্ত : পৃঃ ৪০

বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ ঃ 'ভাব্‌বার কথা'

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গ্রন্থচতুষ্টয়ের মধ্যে নামকরণের বৈশিষ্ট্যে সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'ভাব্‌বার কথা'। এ যেন স্বামীজীর নিজের মুখের কথাটি বসিয়ে দেওয়া। আসলে এ বইয়ের নামটি স্বামীজীরই একটি রচনার নাম থেকে নিয়ে পরবর্তীকালের গ্রন্থসম্পাদক (খুব সম্ভব স্বামী সারদানন্দ) এই নামকরণ করেছেন।

'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষে প্রকাশিত স্বামীজীর ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী-গুচ্ছের নাম 'ভাব্‌বার কথা'। মনন ও জীবনের অসঙ্গতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার এক সহজাত ক্ষমতা স্বামীজীর ছিল। কলকাতার নাগরিক জীবনের তির্যক্ দৃষ্টিভঙ্গী এবং অধ্যাত্ম উপলব্ধির তুরীয় ভাবলোক থেকে সমগ্র জগৎসংসারকে নিরপেক্ষভাবে দেখে যাওয়ার শক্তি—এ দুয়ের সমাবেশে বিবেকানন্দমানসের যে বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল রূপ তাঁর জীবন শেষের কয়েক বৎসরের রচনায় প্রকাশিত, তার সূচনা অবশ্য তাঁর বাল্য কৈশোরের পরিহাসবিজল্পনের বৈশিষ্ট্যে। পরবর্তীকালে "পত্রাবলী"তে এ জাতীয় মন্তব্যের তীক্ষ্ণ সচেতনতা পাঠকমনকে সচেতন করে তোলে। 'ভাব্‌বার কথা'র কথিকাগুচ্ছে সেই ব্যঙ্গ ও কৌতুকের মিলিত সমাহার। এক হিসাবে 'উদ্বোধনে'র প্রথমবর্ষের এই রচনাগুলিই চলতিবাংলায় তাঁর সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির সূত্রপাত। এর আগে 'পত্রাবলী'তে চলতি গদ্যের ব্যবহার ঠিক সচেতন সৃষ্টি নয়। সেদিক থেকে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কোনো মৌলিক রচনাই সাহিত্যিক সৃষ্টিপ্রেরণার বাইরে নয়।

'ভাব্‌বার কথা'—এই নামের ব্যঞ্জনা যেমন ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী-গুলিকে অতিক্রম ক'রে নিগূঢ় জীবনসত্যের ইঙ্গিত করেছে, তেমনি সমগ্র প্রবন্ধ-সংকলনটির নামরূপেও বিবেকানন্দ-মননের গভীরতা ফুটেছে। অথচ একান্ত ঘরোয়া ভাষায় এই নামকরণে স্বামীজীর বাক্‌ভঙ্গিই আক্ষরিকভাবে বিধৃত।

'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থাবলীর সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ উক্ত রচনাবলীর ষষ্ঠখণ্ডে স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা হিসাবে 'ভাব্‌বার কথা' বইটিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। 'ভাব্‌বার কথা' বিভিন্ন সময়ে লেখা স্বামীজীর প্রবন্ধ-সংকলন। 'উদ্বোধন' প্রকাশের আগে ১২৯৬ সালে 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Imitation of Christ'-এর অনুবাদ 'ঈশা অনুসরণ'[১] এবং ১৩০৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে লেখা 'হিন্দুধর্ম কি ?' (উদ্বোধন, চতুর্থ বর্ষে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে প্রকাশিত) —রচনা দুটি বাদ দিলে এ গ্রন্থে সংকলিত আর সব প্রবন্ধই 'উদ্বোধন' পত্রিকার সমসাময়িককালে লিখিত বা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত রচনা।

আধুনিককালে কেউ কেউ মনে করেন স্বামীজীর জীবন-পরিক্রমার দ্রুত ঘটনাবর্তে তাঁর সাহিত্যকীর্তি নিতান্ত সাময়িক প্রচেষ্টামাত্র। কিন্তু 'সংগীতকল্পতরু'র ভূমিকা থেকে আরম্ভ করে স্বামীজীর শেষ জীবনের রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অবধি তাঁর গদ্যসাহিত্যের পরিধি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে স্বল্পসীমার মধ্যেই তাঁর শিল্পীমন গভীর চিন্তাশক্তি, মৌলিক দৃষ্টিকোণ এবং নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর গুণে সাহিত্যসৃষ্টির নিজস্ব সার্থকতায় মণ্ডিত। অবশ্য তাঁর বিদেশে ও স্বদেশে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী, বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা, বাংলাসাহিত্যে অনন্য পত্রাবলী—এসব যাঁরা অনুধাবন করেছেন, তাঁদের কাছে বিবেকানন্দের কবিমানস ও রচনানৈপুণ্য সম্বন্ধে নূতন পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যাঁরা তাঁর অন্যান্য রচনা বা বক্তৃতা পড়েন নি, তাঁরাও বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁর গ্রন্থচতুষ্টয়—ভাব্‌বার কথা, বর্তমান ভারত, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—পড়লেই বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখকের পরিচয় পাবেন। জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই বিবেকানন্দ সচেতন সাহিত্য-

---

১ 'ঈশা-অনুসরণে'র সম্বন্ধে 'সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ' এবং 'অনুবাদক বিবেকানন্দ' অধ্যায় দুটি দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া 'ভাব্‌বার কথা'র 'শিবের ভূত' নামে একটি অসমাপ্ত গল্পের আর কোনো আলোচনা অপ্রয়োজনীয়বোধে করা হয় নি।

স্রষ্টা। তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিচারে তাঁর ব্যক্তিত্বপ্রসঙ্গ নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু কোন্ বিশেষ লেখকের কথা এ কথা না জেনেও উক্ত চারটি বইয়ের পাঠক এক মৌলিক চিন্তাশক্তি ও গদ্যভঙ্গিমার বৈদ্যুতিক স্পর্শে উজ্জীবিত হবেন একথা নিশ্চয়। অর্থাৎ বিবেকানন্দের রচনা বলেই শুধু নয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপেই তাঁর রচনাবলী বিচার্য।

বলা বাহুল্য, এ বিচারে সকলে একমত হবেন, একথা আশা করা যায় না। কিন্তু আমাদের ধারণা যে, সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি বিবেকানন্দের রচনাবলীর মূল্য থাকে, তা অবশ্যই স্বীকার করব। কিন্তু সাহিত্যমূল্যের বিচারে তাঁর রচনাবলীর নিজস্ব সার্থকতা যদি থাকে, তাহলে সাহিত্যের আলোচনার আসরে সেইটিই সর্বাগ্রে বিচার্য। এদিক থেকে বিচার করে 'ভাব্‌বার কথা'র বিষয়বস্তু অনুসারে প্রবন্ধাবলীর আলোচনা করা যাক।

ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধ

'বাংলা ভাষা' নামে স্বামীজীর যে বহুখ্যাত রচনাটি বাংলা গদ্য সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারার নির্দেশরূপে স্বীকৃত, সেটি মূলতঃ উদ্বোধন-সম্পাদককে লেখা চিঠি। সাহিত্যে জ্ঞানের বিষয় বা ভাবের বিষয়—দুয়েরই প্রকাশক ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান রচনা ক'রে কৃত্রিম হয়ে পড়ে। স্বামীজীর মতে —'আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক —কল্পিতমাত্র, তাতে ছাড়া কি পাণ্ডিত্য হয় না?"[১]

উপরের এই উদ্ধৃতিটিতে বাংলা গদ্যে সংস্কৃতরীতির গুরুভার আমদানির বিপক্ষেই রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের সমুন্নতি

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৫

যে সংস্কৃত শব্দৈশ্বর্যের দ্বারাই সম্ভব, তার প্রমাণ 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বা 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধ-দুটিতে মেলে। স্বামীজী নিজেও সব সময় চলতি ভাষায় লেখেন নি। 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকাটি আত্যন্ত সংস্কৃতপ্রধান সাধু গদ্যে রচিত। সুতরাং বিষয়বস্তুর গভীরতার সঙ্গে ভাষার গাম্ভীর্য আপনিই দেখা দেয়—এমন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তও সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ" অবধি জগতের মহত্তম চিন্তানায়কদের যে উদাহরণ স্বামীজী দিয়েছেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের মুখের কথার মধ্য দিয়েই উচ্চতম চিন্তা ও ভাবনার প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজী তো স্পষ্টই লিখেছেন —"আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।...যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।"[১]

সত্যের প্রকাশ যেমন সরলতায়, সাহিত্যের বিকাশও তেমনি প্রাঞ্জলতায়। "ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে নেয়, দাঁত পড়ে না।"[২] বাংলা গদ্যের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে ঐ উদ্ধৃতির মধ্যেই স্বামীজী নবযুগের বাংলা ভাষার আদর্শ স্থাপন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যরীতির সাধু ও চলতি—দুই রূপেই তাঁর ব্যক্তিত্বের ওজস্বিতা দীপ্যমান। চলতি ভাষায় তিনি প্রাণময় বৈদ্যুতিকগতিসম্পন্ন; সাধু ভাষায় সংহত শাঙ্করভাষ্যের গভীর গম্ভীরতায় সমাসীন। বিবেকানন্দের গদ্যরীতির দ্বৈতরূপে তাঁর ব্যক্তিসত্তারই দ্বৈতপ্রকাশ।

তবু বলতে হয়, স্বামীজীর নিজস্ব পক্ষপাত ছিল চলতি ভাষার

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৫-৩৬

২ তদেব : পৃঃ ৩৪

প্রতি। তাঁর সমকালীন সাহিত্য থেকেই বোধ করি আসন্ন পরিবর্তনের আভাস তিনি পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—"এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, সেটা ভাবহীন, প্রাণহীন —সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।"[১]

ক্রান্তদর্শী সাহিত্যমনীষার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আধুনিক গদ্যরীতিতে। এই পত্রাংশটি 'উদ্বোধনে' ছাপা হবার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলা গদ্যে সাধুভাষার স্থান নিয়েছে চলতি ভাষা। কিন্তু স্বামীজীর গদ্যে যে প্রাণস্পন্দন মেলে, আধুনিক সাহিত্যিকদের অনেকের রচনায় তার একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক চলতি গদ্য অনাধুনিক সাধু গদ্যের চেয়ে কৃত্রিম শোনায়। স্বামীজী বলেছিলেন "ভাষা—ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে।"[২] সাহিত্যে ভাবের ক্ষেত্রে দৈন্য দেখা দিলে কেবল ভাষার আধুনিকতায় তাকে সজীব ক'রে তোলা যায় না।

ব্যঙ্গাত্মক রচনা : লোকাচার-বিষয়ক

'ভাব্‌বার কথা' নাম দিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট উদাহরণের মালায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার আকাশোপম বিস্তার এবং তারই তলায় লোকাচারের যুক্তিহীন শৃঙ্খলপাশের দৈন্য—এই পরস্পরবিরোধী মনোভাবের দরুন সমাজে ও ব্যক্তিচরিত্রে কতদূর অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার কয়েকটি উদাহরণ গল্পের মতো ক'রে উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে সুচতুর হাস্যপরিহাস-নিপুণ বিবেকানন্দের সার্থক পরিচায়ক এই গল্পসমষ্টি থেকে একটি উদাহরণ—

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৬-৩৭

২ তদেব : পৃঃ ৩৬

লক্ষ্ণৌ শহরে নবাগত দু-জন রাজপুত মহরমের জাঁকজমক দেখে মসজিদে ঢুকতে চাইলে দেউড়ির সিপাই তাদের নিষেধ করলে। "কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতা মারো, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এলো—ও মহাপাপী ইয়েজ্বিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাঁসেন হোঁসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজ্বিদ-মূর্তি পাঁচ জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কি কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টা সমঝলি রাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নী-কৃতবাস ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজ্বিদ-মূর্তির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর গদ্‌গদস্বরে স্তুতি—'ভেতরে ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখব? ভল্‌ বাবা আজিদ্‌, দেবতা তো তুহি হ্যায়, অস্‌ মারো শারোকো কি অভিতক রোবত।'—(ধন্য বাবা ইয়েজ্বিদ, এমনি মেরেছো শালাদের কি আজও কাঁদছে!!)"[১]

এই গল্পটির পরে স্বামীজী প্রচলিত হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন যে, আমাদের বেশীর ভাগ ধর্মভাবই লোকাচারের দ্বারদেবতা অবধি এসেই ঠেকে যায়, অন্তর্যামী ভগবান অবধি পৌঁছয় না।

'ভাব্‌বার কথা' গল্পসমষ্টিতে 'কড়ামাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে' ভগবানের মন ভিজানোর চেষ্টারত ভক্তটি, 'বেজায় বেদান্তী' ভোলাপুরী, অথবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-পারঙ্গম গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর ধর্মধ্বজীদের স্বরূপ-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার আদর্শটি ফুটিয়ে তোলাই স্বামীজীর লক্ষ্য। তাই তাঁর হাস্যরসে বিদ্রূপ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সমাজ-সমালোচনার সঙ্গে এইখানে স্বামীজীর মিল লক্ষণীয়। স্বামীজীর চিন্তাধারায় বেদান্ত

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪৪

এবং মানবপ্রেমের অনায়াস মিলনের মতো তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতেও গুরুগম্ভীর বক্তব্যের সঙ্গে সহজ রসবোধের মিলন ঘটেছে।

সমকালীন আর্যামি ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানচেষ্টাকে স্বামীজী যে তীব্র ভাষায় কশাঘাত করেছেন, হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত আর কেউ সেকালে তেমনটি করেছেন বলে জানা নেই। কেন যে বিবেকানন্দের উপর সেকালের 'বঙ্গবাসী গোষ্ঠী' এত চটা ছিলেন তার নানা কারণের মধ্যে একটি বোধ হয় 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষে প্রকাশিত 'ভাব্‌বার কথা' কাহিনীগুচ্ছের এই নকশাটি—

"গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলেন তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হলে ঐ রকম চেহারাই হ'য়ে থাকে। যাই হোক, কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই। বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ ক'রে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতি বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুন দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হ'তে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়। আবার প্রমাণ প্রয়োগ, সে তো বালকেও বুঝতে পারে, তিনি এমনি সোজা করে নিয়েছেন। বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে!!! অতএব গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল যা বলেন, তাহাই স্বতঃপ্রমাণ। মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে। লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠেছে। সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মা ভৈঃ, যে-সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে—বাঁচলুম, কি বিপদই

এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে। চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে থাক্ কৃষ্ণব্যাল' বলে আবার পাশ ফিরে শুলো। হাজার বছরের অভ্যাস কি ছোটে? শরীর করতে দেবে কেন? হাজারো বৎসরের মনের গাঁট কি কাটে! তাই না কৃষ্ণব্যালের আদর! 'ভল্ বাবা "অভ্যাস" অস্ মারো' ইত্যাদি।"[১]

সমস্ত নকশাটিতে আক্রমণের তীব্রতা ও ভাষাভঙ্গির দীপ্তি—দুইই লক্ষণীয়। প্রয়োজনবোধে শব্দপ্রয়োগে সঙ্কোচ এখানে অনায়াসে অতিক্রম করা হয়েছে! কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায় ও বিদ্রূপের তিক্ততায় এমন এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে যে পাঠকমাত্রেই (বিরুদ্ধবাদী হ'লে আরো বেশী) এ রচনার অন্তর্নিহিত জ্বালা প্রাণে প্রাণে অনুভব করবেন।[২]

বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সমুচ্চ মননের পাশাপাশি এক লঘু কৌতুক, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সহজাত ক্ষমতা নিহিত—যা তাঁর বাংলা গ্রন্থচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিকেই অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করেছে। কিন্তু 'ভাব্‌বার কথা'র নকশাগুলির মতো রচনা তাঁর অতি অল্প। ফলে এ-জাতীয় রচনায় তাঁর যে অসাধারণত্ব তা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপাত-আদর্শবাদীদের অন্তর্জীবনে আত্মপ্রতারণার প্রাধান্য। অথচ সে-প্রতারণার কথা তারা নিজেরা অতি অল্পই জানেন। বিশেষ করে আমাদের দেশে যারা কথায় কথায় ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দেন তাঁদের নিজস্ব জীবনচর্যায় অসঙ্গতির উদাহরণ অজস্র। আত্মপ্রতারিতের এই অপসংস্কৃতিকে স্বামীজী নির্মম অঙ্গুলিসঙ্কেতে কয়েকটি নকশার মাধ্যমে নির্দেশিত করেছেন। পরবর্তী নকশাটিতে আর একটি জিনিসও লক্ষণীয়। তৎসম শব্দের গুরুগম্ভীর সমাবেশে হাস্যরসের ফোয়ারা

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪২

২ শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়'-গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

যেন আপাতরুদ্ধ থেকে হঠাৎ মুক্ত হয়ে পাঠকহৃদয়কে মুহূর্তে উচ্চকিত করে চলে যায়। সাধুভাষা যে ব্যঙ্গজাতীয় রচনার কত উপযোগী—এ নকশাটি তার সার্থক উদাহরণ।

'ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শন-লাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদান-প্রদান সামঞ্জস্য করিবার জন্য গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়ে চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পূজারী, পহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ্‌ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণসাহসী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবল বেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষঃস্থলে 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণ-বর্ণ ঢুলুঢুলু দুটি নয়ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়া-মাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডীকরণ করিতেছে। সম্বিদানন্দ উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ মর্মাহত চোবেজী তীব্রবিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বলি বাপুহে, ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ!' ক্ষিপ্র উত্তর এল—'সুর তানের আবার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি।' চোবেজী—'হুঁ, ঠাকুরজী এমনই আহাম্মক কিনা! পাগল তুই, আমাকেই ভিজুতে পারিস নি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?"

কিন্তু এ জাতীয় আত্মপ্রতারণা তবু অজ্ঞতাপ্রসূত। কিন্তু 'সেয়ান পাগলে'র আত্মপ্রতারণার উদাহরণ—

'বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৫

নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টামিগুলিও ছাড়তে পার না, কি ক'রে জীবিকা কর, বল দেখি ?' রামচরণ—'সে সোজা কথা মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।'

এ জাতীয় রচনায় বিবেকানন্দের পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' বা রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক', এবং বিশেষভাবে 'ব্যঙ্গকৌতুক' রচনার কথা মনে আসতে পারে।[১] ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র স্বামীজীর এ-জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মিলিত প্রভাব অনুভব করেছেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেছেন, স্বামীজীর শব্দপ্রয়োগের অকুণ্ঠতা রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত, 'এসব ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁর সাদৃশ্য বেশি।' আমাদের ধারণা, সাধারণভাবে হিন্দুসমাজের বহির্বৃত্তের অধিবাসী রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কৌতুকের চেয়ে হিন্দুসমাজের অন্তরের ভিতর থেকে এমন শাণিত বিদ্রূপের সার্থকতা অনেক বেশী। বিবেকানন্দের এ জাতীয় রচনার উৎস তিনি নিজে, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁকে প্রভাবিত করেন নি। এ-জাতীয় রসসৃষ্টিতে প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিম থেকে আধুনিক-কালের প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলি অবধি লেখকবৃন্দের রচনায় যে পৌরুষ-সমুজ্জ্বল যুক্তির ক্ষুরধার ব্যঙ্গের প্রকাশ দেখি, তার সঙ্গেই বিবেকানন্দের গোত্রগত মিল বেশী। রবীন্দ্রনাথ-সমেত ব্রাহ্ম-প্রভাবিত লেখকগোষ্ঠীর পক্ষে কলকাত্তাই বুলির এমন অসঙ্কোচ প্রয়োগ অসম্ভব ছিল। অথচ এই জাতীয় শব্দ ও বাক্যব্যবহারের উপরেই নকশা-জাতীয় রচনার কৃতিত্ব নির্ভরশীল।[২]

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য : সংঘাত ও সামঞ্জস্য

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বর্তমান সমস্যা, জ্ঞানার্জন, রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি—প্রবন্ধচতুষ্টয় সাধুভাষায় লেখা। 'বর্তমান সমস্যা'[৩]

১ বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা : ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র : 'বিবেকানন্দের সাহিত্য' অধ্যায় : পৃঃ ২৩৮-২৩৯

২ এ গ্রন্থের 'বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস'-অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৯-৩৪

উদ্বোধন-পত্রিকার 'প্রস্তাবনা'। প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সংঘাত ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে দেখা দিয়েছিল স্বামীজী তার সামঞ্জস্যের উপায় চিন্তা করেছেন। তথাকথিত 'ইতিহাস' হয়তো ভারতবাসীর ছিল না; কিন্তু সে ইতিহাস তো "রাজা-রাজড়ার কথা"। ভারতবাসীর অন্তরের চিন্তা ও চেষ্টার কথা সাধারণ ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভালভাবে লেখা রয়েছে—"ভারতের ধর্মগ্রন্থ-রাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী"তে। তাই—"প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।"

একদিকে এই ভারতীয় সভ্যতা—আর অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, যার জন্মভূমি গ্রীস। "মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে।"

এমন কি এ যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বা ভারতবাসী সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। "প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; আমরা আধুনিক বাঙালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরু-দিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।"

এই গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার একবার মিলন হয়—আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের কালে। স্বামীজীর মতে —"...আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলন-কাল উপস্থিত। এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

আধুনিক ইউরোপবাসী প্রাচীন গ্রীসের যোগ্য উত্তরাধিকারী—আধুনিক ভারতবাসীর মধ্যে প্রাচীন ভারতের মহিমার অতি সামান্যই অবশিষ্ট। তাই ভারতবাসীকে ইউরোপীয় সভ্যতার কয়েকটি উপাদান

অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—"চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা ; চাই—সর্বদা পশ্চাদ্‌দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

অবশ্য ভারতবাসীর আদর্শ—পারমার্থিক মুক্তি। কিন্তু ক-জন এ সংসারে যথার্থ মুক্তির অভিলাষী ? "সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নর-নারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে ? এ পেষণেরই বা কি ফল ? দেখিতেছ না যে সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল ?" বিবেকানন্দের দৃষ্টি যে কী পরিমাণে অন্তর্ভেদী ছিল, ভারতীয়-মানসের এই বিশ্লেষণই তার প্রমাণ।

ভারতবাসীর পক্ষে তাই স্বামীজীর নির্দেশ—"রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় ? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে ? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে ?" সেই সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতার উদ্দেশে তাঁর বাণী—"ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে ? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ।"

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি ঊনবিংশ শতাব্দীর মননভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার যে দ্বন্দ্ব চলেছিল, স্বামীজীর চিন্তাধারার আলোকে এইভাবে তাদের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে।

শিক্ষা-বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ

'জ্ঞানার্জন'[১] প্রবন্ধটি আকৃতিতে ছোট হলেও ছোট্ট মুক্তার মতোই মননের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। প্রত্যক্ষবাদী আধুনিক ও অপ্রত্যক্ষে বিশ্বাসী প্রাচীন চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা স্বামীজী জ্ঞানার্জনের পন্থা নির্দেশ করেছেন। বেদান্তের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৮-৪১

থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান থেকে পারমার্থিক জ্ঞান অবধি সব স্তরের জ্ঞানই মূলতঃ এক—"···কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ···।" প্রাচীনপন্থীরা অনেক সময় এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে সব জ্ঞানই তাঁদের পূর্বপুরুষদের আয়ত্ত ছিল। কিন্তু "পরবর্তীদের নিকট এই লুপ্ত জ্ঞান থাকা না থাকা সমান ; নূতন উদ্যোগ করিয়া পুনর্বার পরিশ্রম করিয়া তাহা আবার শিখিতে হইবে।" সুতরাং জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষ সাধনা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বিদ্যা বিশেষ এক শ্রেণীর আয়ত্তাধীন ছিল—তাই সর্বসাধারণ সেই বিদ্যা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। এই শ্রেণীগত সুবিধাবাদের দিন গতপ্রায়। সর্বশ্রেণীর লোকই এখন বিদ্যাচর্চার অধিকারী হয়ে উচ্চবর্ণের সমান কৃতিত্বের অধিকারী। সুতরাং জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে "পিতৃপিতামহাগত গুণের পক্ষপাতিতা" আজকাল অচল। জ্ঞানার্জনের দুটি পথ—এক পূর্বপুরুষ বা গুরু-পরম্পরা ধরে জ্ঞানের প্রসার আর এক পূর্বনির্দিষ্ট কোনো পন্থার উপর নির্ভর না করে নব নব পথে অভিযান। প্রথম উপায়ে জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি হলেও নিজস্ব বুদ্ধি বা চিন্তার স্বাধীনতা কমে যায়। তার ফলে—প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজন দিগের অভিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ পূর্বপুরুষদিগের ঐশ্বর্যস্মরণেই কালাতি-পাত করে···।" অন্য দিকে আধুনিক বিদ্যাও গুরুনির্দেশ ছাড়া চলতে পারে না। তা যদি হ'ত, তবে প্রাচীন সভ্যতা কেবল জুলু কাফ্রী প্রভৃতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

আসল কথা এই যে, সব রকম জ্ঞানের জন্যই সাধনা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের জন্য দরকার চিত্তশুদ্ধির কঠোর তপস্যা, জাগতিক জ্ঞানের জন্য নিয়ত চর্চা, নূতন অনুসন্ধান। বাইরে থেকে যা অলৌকিক ব'লে মনে হয়, তার পিছনে ওই নিরন্তর কঠিন সাধনার ইতিহাস। তাই স্বামীজীর মন্তব্য—"অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত

বিকাশ, চিরোপার্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক—কেবল প্রকাশের তারতম্যে।"

•

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ

"'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'—প্রবন্ধ-দুটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য ও বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দান সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ধর্মচেতনাকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে বিদেশীরা অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, স্বদেশী পণ্ডিতেরা লোকাচার ও সংস্কারের বেড়ি পরিয়ে তৃপ্ত ছিলেন। হিন্দুধর্মের এই বহুশাখায়িত রূপ দেখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের শাখাটিকেই বড় ক'রে তোলার চেষ্টায় ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক প্রচার-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে হিন্দু-সাধনার মূল সত্য বেদান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মদের সাধনায় পাশ্চাত্য খ্রীষ্টধর্মীয় রীতিনীতি এত বেশী পরিমাণে দেখা দিতে শুরু করেছিল, যার ফলে মনে হয় পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে আমাদের ধর্মসাধনাকে শ্রদ্ধেয় ক'রে তোলার চেষ্টাই তাঁদের মধ্যে বেশী ছিল। পাশ্চাত্য-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে বুঝাবার চেষ্টা রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা'[১] বক্তৃতাটিতে কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বক্তৃতাটি অনেকটা পাশ্চাত্য ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বক্তৃতা নয়, জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যেই ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অনুভূতিলব্ধ সত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার কলরোল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্পর্শমাত্র করে নি।

---

১ বক্তৃতাটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'রাজনারায়ণ বসু ও সমকালীন বাঙালী মানস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের কারণ—"আর্যজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সততবিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম-নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়—এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোক-হিতের জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"[১]

ভারতের অধ্যাত্ম ঐতিহ্যে আস্থাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করবেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবেই ভারতবর্ষের নব-জাগরণের পরিপূর্ণতা।

উনবিংশ শতাব্দীর বেদচর্চার কেন্দ্র ভারতবর্ষ নয়—ইংলণ্ড ও জার্মানি। ম্যাক্সমূলার এই বেদোদ্ধার-আন্দোলনের প্রথম নায়ক। ম্যাক্সমূলার জানতেন, "অদ্বৈতবাদ ধর্মরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া"। ভারতবর্ষের ধর্ম বলতে সেকালের (এবং অনেকাংশ একালেরও) ইউরোপীয় সমাজ মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক জাদুবিদ্যাই জানতেন। এই মনোভাবের প্রতিবাদে ভারতবর্ষের যথার্থ ধর্ম ও আদর্শ ধার্মিকদের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলার 'প্রকৃত মহাত্মা' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে এই প্রবন্ধটিই বর্ধিতাকারে "The Life and Sayings of Ramakrishna" (রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী) নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'The Face of Silence' এবং রোমাঁ রোলাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী' প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপ আমেরিকার চিন্তাজগতে রামকৃষ্ণ-দেবের ভাবধারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বাণীর মধ্যে এমন একটি বিশ্বমানবিক আবেদন রয়েছে, যার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় চিন্তাজগতেই তিনি সমাদৃত ও স্বীকৃত। ম্যাক্স-

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪-৫

মূলারের প্রবন্ধটি নিয়ে তদানীন্তন ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মিশনরীরা তীব্র বাদানুবাদ আরম্ভ করেন। স্বামীজী জানতেন: সত্যমেব জয়তে। কিন্তু যাঁরা রামকৃষ্ণ-আদর্শে বিশ্বাসী তাঁদের সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণী: "মুখে—বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস করি, বলিলেই কি অন্যে বিশ্বাস করিবে? সকল হৃদ্‌গত ভাবই ফলানুমেয়; কার্যে পরিণত কর—জগৎ দেখুক।"[১]

বিশ্বমনা ম্যাক্সমূলর শ্রীরামকৃষ্ণসত্তার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ভগবৎ-প্রেমিকদের অন্তরঙ্গ মিলনভূমি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীর ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর মাধুর্যমুগ্ধ মনীষী লিখেছেন—"If we remember that these utterances of Ramakrishna recall to us not only his own thoughts, but the faith and hope of millions of human beings we may indeed feel hopeful about the future of that country. This constant sense of the presence of God is indeed the common ground on which we may hope that in time not too distant the great temple of future will be erected in which Hindus and non-Hindus may join hands and hearts in worshipping the same Supreme spirit—who is not far from everyone of us, for in Him we live and move and have our own being."[২]

'যদি একথা আমরা মনে রাখি যে, রামকৃষ্ণের এই বাণীসম্ভার শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব চিন্তার কথাই আমাদের মনে জাগায় না, বরং লক্ষ কোটি মানুষের আশা ও বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে সে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয়ই আশান্বিত হতে পারি। ঈশ্বরসান্নিধ্যের এই নিয়তচেতনাই সে মিলনভূমি, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে এমন এক মহামন্দির নির্মিত হতে চলেছে, যে মন্দিরে হিন্দু

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি': পৃ: ১৫

২ Ramakrishna: His Life and Sayings: ১ম সংস্করণের ভূমিকা।

ও অহিন্দু সকলেই মিলিত হৃদয়ে আমাদের অন্তরতম পরম সত্যের ধ্যানে মগ্ন হতে পারবে। কারণ তাঁরই মধ্যে বিধৃত আমাদের জীবন, গতি ও অস্তিত্ব।"

আলোচ্য প্রবন্ধদুটির আগে ও পরে দেওয়া স্বামীজীর দুটি বক্তৃতা থেকে তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গে মন্তব্য স্মরণীয়—"সংস্কারক ও সমালোচকদের কাজের ধরণ কেমন তা আমরা দেখেছি। তাঁরা কেবল অন্যদের দোষ দেখান, সব ভেঙে ফেলে নিজেদের কল্পিত নূতন ভাবে নূতন করে গড়তে যান। আমরা সকলেই নিজ নিজ মনোমতো এক-একটা কল্পনা নিয়ে বসে আছি। দুঃখের বিষয়, কেউ তা কাজে পরিণত করতে প্রস্তুত নয়, কারণ সকলেই আমাদের মতো উপদেশ দিতে প্রস্তুত। তাঁর কিন্তু সে ভাব ছিল না, তিনি কাউকে নিজে থেকে ডাকতে যেতেন না। তাঁর এই মূলমন্ত্র ছিল,—প্রথমে চরিত্র গড়ে তোলো, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব অর্জন কর, ফল আপনি আসবে। তাঁর প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিল, যখন পদ্ম ফোটে, ভ্রমর তখন নিজে নিজেই মধু খুঁজতে আসে। এমনি করে যখন হৃদয়পদ্ম ফুটে উঠবে, তখন শত শত লোক তোমার কাছে শিক্ষা নিতে আসবে। এইটি জীবনের এক মহা শিক্ষা।"[১]

দ্বিতীয়বার আমেরিকা-পরিক্রমার সময় ২৭শে জানুয়ারি, ১৯০০ তারিখে কালিফোর্নিয়ার প্যাসডেনাতে সেক্সপিয়র ক্লাবে স্বামীজী My Life and Mission (আমার জীবন ও উদ্দেশ্য) নামে একটি বক্তৃতায় তাঁর গুরুদেব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেছিলেন—"এক বৃদ্ধকে আমি গুরুরূপে পেয়েছিলাম, অদ্ভুত লোক, পাণ্ডিত্য তাঁর কিছুই ছিল

---

১ মদীয় আচার্যদেব : বাণী ও রচনা : অষ্টম খণ্ড : পৃঃ ৩৯৭ দ্রঃ। মূল ইংরেজী বক্তৃতা My Master দ্রষ্টব্য। ইংরেজী বক্তৃতাটি নিউইয়র্কে ও লণ্ডনে প্রদত্ত দুটি পৃথক বক্তৃতার সম্পাদিত সংস্করণ। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে রক্ষিত নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতাটির সম্পূর্ণ পৃথক সংস্করণে (১৯০১) প্রকাশক হিসাবে Baker & Tayler Co-র নাম আছে। এখন এই দুটি বক্তৃতা আলাদাভাবে বিবেকানন্দ-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

না, পড়াশুনোও বিশেষ করেন নি। কিন্তু শৈশব থেকেই সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে জেগেছিল। স্বধর্ম-চর্চার মাধ্যমে তাঁর সাধনার সূত্রপাত। পরে তিনি অন্যান্য ধর্মমতের মধ্য দিয়ে সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ে যোগ দেন। কিছুকাল তিনি সেই সম্প্রদায়ের নির্দেশ অনুসারে সাধন করতেন, এক একটি সম্প্রদায়ের সাধকদের সঙ্গে বাস করে তাদের ভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন। এইভাবে সব সাধনার শেষে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—সব মতই ভালো। কোনো ধর্মমতেরই তিনি সমালোচনা করতেন না। বলতেন, 'বিভিন্ন ধর্মমতগুলি একই সত্যে পৌঁছবার বিভিন্ন পন্থামাত্র। আর বলতেন, 'এতগুলি পথ থাকা তো খুবই গৌরবের বিষয়। কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ যদি একটিমাত্র হতো, তবে হয়তো সে পথ মাত্র একজনের উপযোগী হতো। যত মত তত পথ, তত আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সত্যে পৌঁছবার সুযোগ। যদি এক ভাষায় শিখতে না পারি, তো আর এক ভাষায় শিখতে চেষ্টা করব।'—সব ধর্মমতের প্রতি এমনি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা।

"যে সব ভাবধারা আমি প্রচার করছি, সে সবই তাঁরই চিন্তাধারার প্রতিধ্বনিমাত্র।"[১]

বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও আদর্শে অলৌকিক গল্পকথা যথাসম্ভব বর্জিত। সম্পূর্ণ অলৌকিক কাহিনী-বর্জিত একটি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী তিনি লেখাতে চেয়েছিলেন। আবার নিজে কখনও এমন জীবনী রচনায় হাত দেন নি, কারণ যদি আদর্শকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে ফেলেন! তবু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণী বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ এসবের সমন্বিত ফলস্বরূপ ভারতীয় সভ্যতার সংহত প্রকাশ। নবজাগ্রত ভারতাত্মার উদ্দেশে তাই বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে আহ্বান করেছেন—"মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সে রূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা

১ বাণী ও রচনা : অষ্টম খণ্ড : পৃঃ ১৬৩

হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পুজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে সত্তোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও।"[১]

সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অন্তর-প্রেরণারূপে শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলাসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছেন—'ভাব্‌বার কথা'র প্রবন্ধ দুটিতে তারই আংশিক নিদর্শন।

পারি প্রদর্শনী

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও য়ুরোপ-পরিক্রমাকালে ১৯০০খ্রীঃ আগস্টমাসে পারিতে অনুষ্ঠিত 'কংগ্রেস দ' লিস্তোয়ার দে রিলিজিঅঁ" (Congress of the History of Religions)-এ যোগদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই সভানুষ্ঠানের বিবরণ স্বামীজী মূল ইংরেজী ও তার অনুবাদসহ 'উদ্বোধনে' পাঠিয়েছিলেন বলে মনে হয়। 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষের ২০শ সংখ্যায় (১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭) এটিকে "প্রেরিত পত্রের অনুবাদ" বলা হলেও এই বিবরণীর ভাষাভঙ্গী স্বামীজীর নিজস্ব। অর্থাৎ অনুবাদটি স্বামীজীর করা। সুতরাং এ লেখাটিকে 'ভাব্‌বার কথা'র অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয়েছে সন্দেহ নেই।

চিকাগো-বক্তৃতায় স্বামীজীর ভারতীয় ধর্মাদর্শ-ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য যেমন আমাদের মুগ্ধ করে তেমনি এই পারি-সম্মেলনে স্বামীজীর যুক্তিস্থাপনের মৌলিকতা ও বুদ্ধিদীপ্তিও আমাদের সচকিত করে। অবশ্য স্বামীজীর বক্তৃতাবলীতে এই বৈশিষ্ট্য আরো অনেক জায়গাতেই আছে। কিন্তু নিজের ভাষণের সংক্ষিপ্তরূপ স্বামীজী কীভাবে দিয়েছেন এবং চিন্তার মৌলিকতার দিক থেকে তাঁর বিশিষ্টতা—এই দুই কারণে এ রচনাটি বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক। স্থান-সংক্ষেপের জন্য কেবল দুটি

১ ভাব্‌বার কথা : 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধ : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬

উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক। শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে যৌনপ্রতীক হিসাবে যে ধারণা তার উত্তরে স্বামীজীর বক্তব্য—"স্বামীজী বলেন যে, শিবলিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি অথর্ববেদ-সংহিতার যূপ-স্তম্ভের প্রসিদ্ধ স্তোত্র হইতে। উক্ত স্তোত্রে অনাদি অনন্ত স্তম্ভের অথবা স্কম্ভের বর্ণনা আছে এবং উক্ত স্কম্ভ যে ব্রহ্ম, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যজ্ঞের অগ্নি, শিখা, ধূম্র, ভস্ম, সোমলতা ও যজ্ঞকাষ্ঠের বাহক বৃষ যে-প্রকার মহাদেবের অঙ্গকান্তি, পিঙ্গল জটা, নীলকণ্ঠ ও বাহনাদিতে পরিণত হইয়াছে, সেই প্রকার যূপস্কম্ভও শ্রীশঙ্করে লীন হইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে।"[১]

ভারতীয় সভ্যতায় যাঁরা সর্ববিষয়ে গ্রীকপ্রভাব আবিষ্করণে ব্যস্ত, তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে সংস্কৃত নাটকে 'যবনিকা' শব্দটির প্রয়োগ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য—"...কালিদাসাদি কবি-প্রণীত নাটকে 'যবনিকা' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া যদি ঐ সময়ের যাবতীয় কাব্য-নাটকের উপর যবনাধিপত্য আপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রথমে বিবেচ্য যে, আর্যনাটক গ্রীক নাটকের সদৃশ কিনা। যাঁহারা উভয় ভাষায় নাটকরচনা-প্রণালী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এ সৌসাদৃশ্য কেবল প্রবন্ধকারের কল্পনা-জগতে, বাস্তবিক জগতে তাহার কস্মিনকালেও বর্তমানত্ব নাই। সে গ্রীক কোরস্ কোথায়? সে গ্রীক যবনিকা নাট্যমঞ্চের একদিকে, আর্যনাটকে তাহার ঠিক বিপরীতে। সে রচনাপ্রণালী এক, আর্যনাটকের আর এক।

আর্য নাটকের সাদৃশ্য গ্রীক নাটকে আদৌ নাই, বরং শেক্স্‌পীয়র প্রণীত নাটকের সহিত ভূরি ভূরি সাদৃশ্য আছে।"[২] তুলনামূলক সাহিত্য-চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাচীন সংস্কৃত নাটক, গ্রীক নাটক ও শেক্স্‌পীয়ারের নাটকের একত্র বিচারে স্বামীজীর এ মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

সব মিলিয়ে বিবেকানন্দ-মনীষার এক উজ্জ্বল উদাহরণ এই 'পারি-প্রদর্শনী'র বিবরণীও সত্যিই ভাববার কথা।

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৮, ৫০

'ভাব্‌বার কথা'-র প্রবন্ধসমষ্টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত করা যেতে পারে। বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ও রচনার সমাহার হলেও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার দীপ্তি, গভীরতা ও অনন্য মৌলিকতার নিদর্শনস্বরূপ এ গ্রন্থে বিধৃত প্রবন্ধ, রসরচনা, অনুবাদসাহিত্য প্রত্যেকটিতেই সাহিত্যিক বিবেকানন্দের যে পরিচয় মেলে সেই সাহিত্যসচেতনতা দীর্ঘকালের মনন ও প্রযত্ন-সাপেক্ষ। স্বল্পসীমাবদ্ধ জীবনে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যে বিচ্ছুরণ ঘটেছিল, তার অন্যতম পরিচয় প্রবন্ধকাররূপে তাঁর সিদ্ধি ও সার্থকতায়। মনে রাখতে হবে, 'বর্তমান ভারত'ও এমনি একটি দীর্ঘায়ত প্রবন্ধ। 'ভাব্‌বার কথা'র 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বর্তমান সমস্যা', 'জ্ঞানার্জন' প্রভৃতি নিবন্ধের মননিষ্ঠ সাধুগদ্যভঙ্গীরই দীর্ঘায়তরূপে 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস-সমীক্ষা গড়ে উঠেছে। অপরপক্ষে 'পরিব্রাজক' এবং অনেক পরিমাণে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গড়ে উঠেছে চিঠিপত্রে বিধৃত স্বামীজীর অতুলনীয় চলতি গদ্যরীতির আদর্শে। তরুণ রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ থেকে একদা 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণা পাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রে বা ডায়েরী জাতীয় লেখায় ছাড়া এই পত্রসাহিত্যের চলিতভঙ্গীকে প্রশ্রয় দেন নি। বিবেকানন্দ কিন্তু 'উদ্বোধন' পত্রিকাকে উপলক্ষ্য করে ১৮৯৯-এর জানুয়ারী থেকে ১৯০২-এর জুলাইয়ের মধ্যে সাধু ও চলতি দু'ধরনেরই গদ্যভঙ্গীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা চলতি গদ্যরীতির ক্রমবিকাশে রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্র' (১৮৫৪) বা প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ-পত্রে'র (১৯১৪) কথা উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এ দুয়ের মাঝখানে 'উদ্বোধন' (১৮৯৯) পত্রিকার বিশেষ ভূমিকার কথা স্মরণীয়। সাধারণত এ বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা দৃষ্টিপাত করেন না বলেই এ বিষয়ে সুধী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতিহাসসচেতন দার্শনিক মননে সমৃদ্ধ বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ 'ভাব্‌বার কথা'র আর একটি সম্পদ 'ভাব্‌বার কথা'

নামে রসরচনাগুচ্ছ। বস্তুত উচ্চাঙ্গের হাস্যরস মহত্তম চিন্তানায়কেরই সাধ্য। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের কথা প্রথমেই মনে আসবে। কিন্তু বিবেকানন্দের হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য তাঁর বৈদান্তিক-সুলভ নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সংসার ও সমাজের অন্তস্তল পর্যন্ত তীব্র ব্যঙ্গে আলোকিত করার দীপ্ত নিপুণতায়। 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এই হাস্যরসনৈপুণ্য তাঁর রচনাবলীকে পাঠকমনের একান্ত অন্তরঙ্গ করে তুলেছে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—একদিকে স্বামীজী চিন্তানায়ক, লোকশিক্ষক, অধ্যাত্ম-সাধনার গুরুস্থানীয়, আর একদিকে তিনি সমব্যথী, অন্তরঙ্গ, এমন কি বন্ধুজনের রঙ্গরসিকতায় আমাদেরই সমভূমির আপনজন।

উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যপুচ্ছগ্রাহী শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিবাদে জাতীয় শিক্ষাদর্শের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেকানন্দ তাঁর কথোপ-কথনে, বক্তৃতায় ও রচনাবলীতে নানাভাবে ঘোষণা করেছেন। জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষণ চিন্তার মৌলিকতায়। 'ভাব্‌বার কথা'র রচনাবলীতে সেই মৌলিকতাই পাঠকের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আকর্ষণ করে। তাছাড়া বিষয়বিন্যাসের নৈপুণ্য, প্রকাশের গাম্ভীর্য ও সংযম এবং ভাষাশিল্পের কারুবৈচিত্র্যে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে 'ভাব্‌বার কথা' বিশিষ্টস্থানের অধিকারী।

বিবেকানন্দের ভারতচেতনা ও 'বর্তমান ভারত'

বাংলায় মনন-সাহিত্যে অমর কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা যদি কেউ পেশ করতে বলেন, তাহলে রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ'; দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম'; অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (বিশেষতঃ এর দুটি খণ্ডের ভূমিকা), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি বইয়ের ধারা অনুসরণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারতে'র কথা মনে পড়বে। এ তালিকায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো গ্রন্থের উল্লেখ করলাম না। কারণ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী মিলিয়ে রবীন্দ্রমননের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। আর যদি রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি মাত্র বইয়ের কথা বলতে হয়, তাহলে আমি বেছে নেব তাঁর শেষ জীবনের 'মানুষের ধর্ম'—রবীন্দ্রনাথের স্ব-ধর্ম যে বইয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু সেটি বিংশ শতাব্দীর রচনা।

পাঠক ও লেখক-ভেদে সব সাহিত্যিকের রচনার নির্বাচিত সংকলন হতে পারে এবং তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু এমন কিছু বই থেকে যায়, যেগুলি গোটা দেশ ও যুগের প্রতিনিধিত্ব করে, শুধুমাত্র লেখক বা পাঠকের প্রিয় তালিকার অন্তর্ভুক্তই থাকে না। অথচ ব্যাপারটি এমন সহজেই ঘটে যে, লেখক হয়তো নিজেও ভাবতে পারেন না যে, তাঁর বিশেষ কোনো একটি বই পরবর্তীকালের মানুষকে বহুযুগ ধরে প্রভাবিত করবে। কারণ, লেখকের অজান্তেই তাঁর ব্যক্তিমন কখনো কখনো বিশ্বমনে পরিণত হয়ে সংহত আকারে ইতিহাসের অন্তরতম নির্যাস আহরণ করে আনে। বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' সমগ্র জাতির আত্মদর্শনের অভিজ্ঞান।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে 'বর্তমান ভারতে'র প্রকাশ। অবশ্য অধ্যাত্ম-সাধনা, ইতিহাস-অন্বেষণ, সমাজচেতনা ও গণদৃষ্টির মিলিত ফলস্বরূপ বিবেকানন্দের

ভারতচেতনার এক বিশিষ্টরূপ তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবন থেকেই ধীরে ধীরে বিকশিত। ভগিনী নিবেদিতার সাক্ষ্য অনুসারে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বর-চেতনার পরেই স্থান পেত জননী ভারতবর্ষের চেতনা। সে ভারতবর্ষ ভূগোল ও ইতিহাসের ভারত তো বটেই, সবার উপরে বিশ্ব-মানবের মহত্তম আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক। হয়তো অন্য দেশের মতো গ্রন্থবদ্ধ ইতিহাস এদেশের নেই। কিন্তু "ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী" আর একভাবে ভারতের ইতিহাসকে বিধৃত করে আছে; সেই সঙ্গে রয়েছে তথা-কথিত ইতিহাসের আড়ালে সাধারণ মানুষের চিরন্তন জীবন-প্রবাহ।

ইতিহাস লেখার পদ্ধতি যুগে যুগে পরিবর্তনশীল। বিবেকানন্দের প্রথম জীবনে হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রভাবের কথা মনে রাখলে বলা যায়, ইতিহাসকে সমাজ-বিজ্ঞানের অংশরূপে দেখার ধারণা তিনি স্পেন্সারের কাছেই প্রধানত পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বিবেকানন্দ-অনূদিত স্পেন্সারের 'শিক্ষা'-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে ইতিহাস-লেখা সম্বন্ধে স্পেন্সারের মতামত উল্লেখযোগ্য। 'অনুবাদক বিবেকানন্দ'-অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। কিন্তু 'বর্তমান ভারত' যে-জাতীয় ইতিহাস-সমীক্ষা, তার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য স্পেন্সারের বক্তব্য আমাদের আরো বিস্তৃতভাবে স্মরণীয়—"কি প্রকার শিক্ষা এবং জ্ঞান মনুষ্যকে সামাজিক ব্যবহারে পটু করিতে পারে? বলা যায় না যে, ঐ প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় স্বভাবতঃ সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে, ইতিহাস ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ।...বিদ্যালয়ে অধীত ইতিহাসই কোন প্রকার সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না। ভূপতিদিগের জীবন, পারিষদদিগের ষড়যন্ত্র, বলপূর্বক সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয়-সমস্ত সমগ্র জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক অমুক রাজ্যের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ের জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, এই জন্য অমুক যুদ্ধ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত সৈন্য সংগ্রহ এবং কামান ছিল। অমুক সেনাপতি এই প্রকার কৌশল অবলম্বন

করিয়া জয়লাভ করিলেন। বলুন দেখি, ইহা শিক্ষা করিয়া আপনার সামাজিক জীবনের কি উপকার হইবে? বলিবেন, ইহা সত্য, কিন্তু সত্যের অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহা মূল্যবান হইল? আপনার পক্ষে এই সকল যুদ্ধ-বিবরণ আদরের হইতে পারে; টিউলিপ-পুষ্প যিনি অত্যন্ত ভালবাসেন, তাঁহার নিকট একটি টিউলিপ-অঙ্কুর তৎপরিমাণ সুবর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান; হয়ত একজন ভগ্ন চীনার বাসনের অত্যন্ত আদর করেন; কেহ কেহ বিখ্যাত নরঘাতকদিগের কেশ-নখাদির পরিবর্তে বহুমূল্য প্রদান করেন; তবে কি বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের ভাল লাগে বলিয়াই ঐ সকল দ্রব্য অতি প্রয়োজনীয়?

"যে প্রকার অন্য সকল দ্রব্যের ব্যবহারানুযায়ী মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, সেই প্রকার ইতিহাসেরও ব্যবহার করা উচিত। যদি কেহ আসিয়া বলে, "ওহে, কাল সন্ধ্যাকালে তোমার প্রতিবাসীর বিড়ালের শাবক হইয়াছে"—এই সকল সংবাদ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ করেন না? এই পরীক্ষা ইতিহাসসঙ্কলিত রাশি রাশি ঘটনাবলীতে প্রযুক্ত হউক, দেখা যাইবে যে, তাহাও ঐ প্রকার অকিঞ্চিৎকর। এই সকল ঘটনা হইতে কোন প্রকারে জীবনোপযোগী বিশেষ সত্য নিষ্কাশিত হয় না। যদি আমোদ হয়, পাঠ কর, কিন্তু কদাপি উপকারক বলিয়া মনে করিও না।"[১]

ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিকায় স্থাপন করে স্পেন্সার চেয়েছিলেন সাধারণ মানবসমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার আদর্শ। "বাস্তবিক ইতিহাস সমাজের জীবন বৃত্তান্ত। কি প্রকারে সমাজ-বিশেষ গঠিত হইল, কি প্রকারে জাতিবিশেষের অভ্যুদয় হইল তাহাই আমাদের প্রয়োজন। রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব?"[২] অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যক্তি নিয়েই যদি সমাজ, তাহলে

১ শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত: শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত বসুমতী সংস্করণ: পৃঃ ৩০-৩২

২ তদেব: পৃঃ ৩২

সমাজের বিশেষ বিশেষ কর্মভার যাঁদের উপরে এবং যাঁদের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত, তাঁদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে ওয়াকিবহাল হওয়ার প্রয়োজন নেই কি? ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শুধু সমাজের সমগ্রতাই কি বিচার্য হতে পারে?

এর উত্তরে যিনি যে মতই পোষণ করুন, একথা স্বীকার্য যে, তুলনামূলকভাবে সমগ্র সমাজ বা জাতীয় জীবনের ধারাটি উপলব্ধি না করলে ইতিহাসদৃষ্টি স্বচ্ছ হতে পারে না। তাই স্পেন্সারের সঙ্গে এ যুগের মানুষ বিশেষভাবে একমত যে,—"কেবল যে সর্বোচ্চ শাসন সমিতির [ইতিহাস] আবশ্যক তাহা নহে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ-পরিচালক শক্তিসমষ্টিরও বিবরণ আবশ্যক। কি প্রকারে বিবিধ সামাজিক সম্প্রদায় নিম্নশ্রেণীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, কি প্রকারে নিম্নশ্রেণীর দ্বারা সম্মানিত হইতেছে, এই সমস্ত বিবরণের প্রয়োজন। গৃহে এবং বাহিরে সেই সমাজের লোকেরা কি প্রকার ব্যবহার করিত, কি কি কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বাণিজ্যের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহাদের শিল্পবিবরণ, তাহাদের মানসিক অবস্থা প্রকৃত ইতিহাসে সমুদয় বিবৃত থাকা উচিত; এই সকল বিবরণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিবৃত হওয়া উচিত যে, পাঠ করিলে সমস্ত সমাজের ছবি মানসপটে উদিত হইবে। বিবিধ সময়ে সেই সমাজের বিবিধ পরিবর্তন ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, এই প্রকার ইতিহাসই বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজতন্ত্রের যথার্থ সহচর।"[১]

১ শিক্ষা: পৃঃ ৩২—৩৩

প্রাসঙ্গিকবোধে স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের ভাষা—

…let us pass now to the function of the citizen. We have here to inquire what knowledge fits a man for the discharge of these functions. It cannot be alleged that the need for knowledge fitting him for these functions is 'wholly overlooked; for our school-courses contain 'certain studies

বলা বাহুল্য, দেশের এই ইতিহাস-লেখার মতো মানুষ এযুগেও এদেশে বিরল, সে যুগে তো আশার অতীত। কিন্তু তরুণ সন্ন্যাসী নরেন্দ্রনাথ সংসারবন্ধনমুক্ত হওয়ার ফলে পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর মানুষের আত্মীয়তার অধিকার পেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে ও সাধনায় ভারতের অধ্যাত্মসাধনার পুঞ্জীভূত বিগ্রহকে মনে প্রাণে প্রত্যক্ষ করার পর বিবেকানন্দের পরিব্রাজকজীবনের বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী মানসনেতৃত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল। আসমুদ্র হিমাচল পরিক্রমান্তে তিনি বুঝতে পারলেন, "জাতটা ঠিক

---

which nominally at least, bear upon political and social duties. Of these only one that occupies a prominent place is History.

But as already hinted, the information commonly given under this head, is almost valueless for purposes of guidance. Scarcely any of the facts set down in our school-histories, and very few of those contained in the more elabotate works written for adults, illustrate the right principles of political action. The biographies of monarchs (and our children learn little else) throw scarcely any light upon the science of society. Familiarity with court intrigues, plots, usurpations, or the like, and with all personalities accompanying them, aids very little in elucidating the causes of national progress. We read of some squabble for power, that it led to a pitched battle ; that such and such were the names of the generals and their leading subordinates, that they had each so many thousand infantry and cavalry, and so many cannons ;...... And now, out of the accumulated details making up the narrative, say which it is that helps you in deciding on your conduct as a citizen...... "But these are facts—interesting facts," you say. Without doubt they are facts (such, at least, as are not wholly or partially fictions) ; and to many they may be interesting facts. But this by no means implies that they are valuable. Factitious or morbid opinion often gives seeming value to things that have scarcely any. A tulipomaniac will not part with a choice

বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র।"[১] (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

তাঁর নিশ্চিত প্রত্যয় দাঁড়ালো 'এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি' আছে 'ধর্মে'। 'সেইটির নাশ কেউ করতে পারে নি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে। আচ্ছা, একজন দেশী পণ্ডিত বলেছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখ না কেন? যেমন অন্যান্য অনেক দেশে কথাটি তো হল সোজা; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্মকর্ম সব মিথ্যা, তাহলে কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার আর, হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে

bulb for its weight in gold. To another man an ugly piece of cracked old China seems his most desirable possession. And there are those who give high prices for the relics of celebrated murderers. Will it be contended that these tastes are any measure of value in the things that gratify them? If not, then it must be admitted that the liking felt for certain classes of historical fact is no proof of their worth; and that we must test their worth, as we test the worth of other facts, by asking to what uses they are applicable. Were some one to tell you that your neighbour's cat kittened yesterday, you would say the information was valuless. Fact though it may be, you would call it an utterly useless fact—a fact that could in no way influence your actions in life—a fact that would not help you in how to live completely. Well, apply, the same test to the great mass of historical facts, and you will get the same result. They are facts from which no conclusions can be drawn—unorganizable facts and therefore facts of no service in establishing principles of conduct, which is the chief use of facts. Read them, if you like, for amusement; but do not flatter yourself they are instructive....

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ সংস্করণ : পৃঃ ১৬১

বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দীকতক নানা সুখদুঃখের ভেতর দিয়ে ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা। না, তোমার বিদেশীর দু-পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা?···যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বই তো নয়।

কিন্তু এ বুদ্ধিটি আগা-পাস্তলা ভুল, মাপ করো, অল্পদর্শীর কথা।"[১] ভারত-পরিক্রমার পরে দ্বিতীয়বার বিশ্বপরিক্রমার সময়ে

We want all facts which help us to understand how a nation has grown and organized itself. Among these, let us ofcourse have an account of its government ; with as little as may be of gossip about the men who officered it, and as much as possible about the structure principles methods prejudices corruption etc. which it exhibited ; and let this account include not only the nature and actions of the central government but also those of local governments down to their minutest ramifications.... Let us know too that what were all the other customs which regulated the popular life out of doors and indoors.······. The only history that is of practical value, is what may be called Descriptive Sociology. And the highest office which the historian can discharge, is that so narrating the lives of nations, as to furnish materials for a Comparative Sociology, and for the subsequent determination of the ultimate laws to which social phenomenon conform.

[Education : Spencer : 1st Edn : pp 32-36]

কৌতূহলী পাঠক মূল গ্রন্থটি দেখে নেবেন। স্থানসংক্ষেপের জন্য আমরা সমগ্র ইংরেজী অংশটি দিতে পারিনি। স্বামীজীও অনুবাদে অনেক পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬০-১৬১

স্বামীজীর মনে এ কথাগুলি জেগেছিল। তখন 'উদ্বোধনে' 'বর্তমান ভারত' প্রকাশ হয়ে গেছে। নূতন রচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' ভারত-ইতিহাসের নিজস্ব ধারাটি সম্বন্ধে স্বামীজী যে-কথা লিখছেন, তার দার্শনিক রূপায়ণ 'বর্তমান ভারতে'ই পরিসমাপ্ত। তবু 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অংশে প্রাচীন ও নবীন ভারতবর্ষের যে তুলনামূলক আদর্শবিচারের প্রশ্ন জেগেছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যেন বিস্তৃতভাবে তারই উত্তরদানের চেষ্টা।

মনে রাখতে হবে, স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার অধিকাংশ পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে আতিথ্য নিয়েই কেটেছে। মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদ বা উচ্চবিত্ত মহলের সান্নিধ্যেও এসেছেন। কিন্তু দেশের দরিদ্র, পতিত ও অশিক্ষিতের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ নূতন ভারতের সম্ভাবনা দেখেছেন বেশী। তথাকথিত বিত্তবান উচ্চশিক্ষিত, উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্য থেকে নয়, 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বেরিয়ে আসুক চাষার কুটির, জেলে, মালা, মেথরের ঝুপড়ি, ভুনাওয়ালার উনুন, কারখানা, হাট, বাজার, ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে—এই ছিল তাঁর উদাত্ত আহ্বান।[১] সে আহ্বানের মূলে তাঁর নিজস্ব দেশ-দেখা চোখ।

আবার এই গণবিপ্লবের সফলতাকে তিনি বিচার করেছেন ভারতীয় ধর্মাদর্শের মাপকাঠিতে। ধর্ম অর্থে পরম সত্য উপলব্ধির প্রচেষ্টাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে তুচ্ছ দ্বন্দ্ব কলহের উর্ধ্বে সে ধর্ম-বোধের গভীরতম প্রজ্ঞার অবিচল আসন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক উত্থান পতন যাই ঘটুক না কেন, এই মূল ধর্মচেতনাই সমগ্র জাতির ধারণী-শক্তির কাজ করেছে। সুতরাং আধুনিককালে যাঁরা মনে করেন যে ধর্মবর্জিত রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবেই ভারতের কল্যাণ, বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী তাঁরা ভ্রান্ত, সন্দেহ নেই।

সে কথা বোঝাতে গিয়েই স্বামীজী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' লিখেছেন

১ বাণী ও রচনা : পরিব্রাজক : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৮২

—"দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়; তারপর যদি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরানো পুঁথি পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, ওপরে ছাইচাপা পড়েছে মাত্র; আর তোমার—রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!"[১]

পরবর্তীকালের বিবেকানন্দ-প্রভাবিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, এঁরা তিনজনেই ভারতীয় জাগরণের অধ্যাত্ম-সাধনার পটভূমিটি বিশেষভাবে মনে রেখেছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় ধর্মাদর্শের এই ইতিবাচক দিকটি এখন উপেক্ষিত। যতদূর মনে হয়, জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিযুক্ত এই রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা ভারতবর্ষের সামগ্রিক কল্যাণের অনুপযুক্ত। স্বামীজী তো স্পষ্টই বলেছেন—"মর্মস্থানে আঘাত না লাগিলে আমাদের জাতির বিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। সুতরাং এইটি বেশ স্মরণে রাখিবে, তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।"[২] তবে ১৮৯৭ সালে ভারত-প্রত্যাগত স্বামীজীর এই সাবধানবাণী সত্ত্বেও মনে হয়, ভারতের নিশ্চিত অভ্যুদয়ই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তাই 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনায় (১৮৯৯) লিখেছেন—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'।[৩]

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ১৬১

২ বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড: ভারতে বিবেকানন্দ: রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর: পৃঃ ৪৬

৩ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ: বর্তমান সমস্যা (উদ্বোধনের প্রস্তাবনা): পৃঃ ৩১

কিন্তু সেই ভারতের জাগতিক বিষয়ে উন্নতির পন্থা কি? এ নিয়েও তিনি ভারত ও বিশ্ব পরিক্রমাকালে নানাভাবে চিন্তা করেছেন। আমেরিকা-যাত্রার আগে ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে ধ্যানাসীন বিবেকানন্দের অন্তরে নরনারায়ণ-সেবার যে আদর্শ জেগেছিল, তাঁর 'পত্রাবলী'র ভাষায় তার অনবদ্য প্রকাশ—"দাদা এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comonrin (কুমারিকা অন্তরীপ) মা কুমারীর মন্দিরে বসে, ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphyics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।

"মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কোন্ কাজ করে?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী—গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গ্লোব) ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না।"[১]

এই একই চিঠিতে দরিদ্র ও নিপীড়িতের সপক্ষে সংগ্রামরত বিবেকানন্দ মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই নিপীড়নের জন্য ধর্ম দায়ী নয়।—'In every country the evils exist not with, but against religion. Religion is not to blame, but men'. 'সব দেশেই যা কিছু ত্রুটি, তা ধর্মের জন্য নয়, বরং ধর্মের বিরোধিতার ফলে দেখা দেয়। ধর্মের কোন দোষ নেই, দোষ মানুষের।'

কিন্তু মুশকিল এই যে ধর্মের নামে অধর্মাচারগুলিই শেষ অবধি পুরোহিতের বুদ্ধি, ক্ষত্রিয়ের বাহুবল বা বৈশ্যের বাণিজ্যশক্তির দ্বারা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪ তারিখের পত্র : পৃঃ

সংরক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষকে এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার প্রধান উপায় স্বামীজীর মতে 'শিক্ষা'র বিস্তার। এই শিক্ষার দ্বারাই মানুষের অন্তর্নিহিত সিংহশক্তির জাগরণ এবং একবার সে জাগরণ হ'লে তার দ্বারা পার্থিব অপার্থিব সব স্তরের অভ্যুদয়ই সম্ভব।

মানবকল্যাণের জন্য যুগে যুগে নানা দেশের ত্যাগী, সাধক, বীর, যোদ্ধা, দাতা, সেবাব্রতী—নানা ধরনের মানুষের চেষ্টা চলেছে। কতো দার্শনিক মতবাদ, রাজনৈতিক আন্দোলন বা সমাজবিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে সংঘটিত হ'ল! মানবমঙ্গলের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জিজ্ঞাস্য মানুষের পরিপূর্ণ কল্যাণ কিসে হবে এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি স্বচ্ছ? আমরা যে সুখ বা উন্নতির আশায় ধাবমান তার নির্দিষ্ট পরিণতি কিছু আছে কি?

বেদান্তের প্রত্যক্ষ রূপায়ণে বিশ্বাসী বিবেকানন্দও জানেন, এ জগতে সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতির সমস্যা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। স্বর্গ বা নরক হয়তো কল্পনা, কিন্তু সুখদুঃখে আন্দোলিত এই জীবন-নাট্যে চির-অপসৃয়মান বর্তমান মানুষকে কোনো স্থায়ী নির্ভরতার কথা না ভাবিয়ে পারে না। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' বিবেকানন্দ সেই কথাটি অন্যভাবে বলেছেন—সেই এক মহাশক্তিই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বাণিজ্যিক সুবিচার অথবা 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-রূপে পৃথিবীর নানা দেশে অভিব্যক্ত।

১৮৯৬-এর ১লা নভেম্বর স্বামীজী লণ্ডন থেকে আমেরিকার বিখ্যাত হেল-পরিবারের মেরী হেলকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে সর্বত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে আমাদের অস্তিত্বের রহস্যোপলব্ধির প্রচেষ্টা—"বাস্তব জগত—সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে; আর মৃত্যুরূপ ছায়াও চিরদিন এই পার্থিব জীবনের অনুসরণ করবে; আর জীবন যতই দীর্ঘ হবে, এই ছায়াও ততই দীর্ঘ হবে। সূর্য যখন ঠিক আমাদের মাথার উপর থাকে, কেবল তখনই আমাদের

ছায়া পড়ে না—তেমনি যখন ঈশ্বর এবং শুভ ও অন্যান্য সব কিছু আমাতেই রয়েছে—এই বোধ হয়, তখন আর অমঙ্গল থাকে না। বস্তুজগতে প্রত্যেক ঢিলটির সঙ্গে পাটকেলটি খেতে হয়—প্রত্যেক ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার মতো আছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে ঠিক সমপরিমাণ অবনতিও সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। তার কারণ এই যে, ভাল-মন্দ দুটি পৃথক বস্তু নয়, আসলে এক। পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।"[১]

এদিক থেকে দেখলে জাগতিক অভ্যুদয়-বিলয় আপেক্ষিক সমস্যা সন্দেহ নেই। কিন্তু অপরপক্ষে মানুষের চিরকালের চেষ্টা আরও উন্নতি, আরও সুখের অভিমুখী। এ প্রচেষ্টার একটি দিক দেখি ভারতের সমাজগত বর্ণবিভাগে। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাজনের দ্বারা এক সঙ্গতিস্থাপনের প্রচেষ্টাই এর মূলে। কিন্তু ভারতীয় সমাজের এই বর্ণাশ্রম-বিভাগ আসলে সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার নিহিত সত্য। শুধু গুণগত না রেখে ভারতবর্ষ এ বিভাগকে জন্মগত করে ফেলেছিল, এই যা প্রভেদ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টাও ইহলৌকিক উন্নতিপ্রয়াসের আর এক অভিব্যক্তি।

শ্রীমতী হেলকে লেখা পত্রের দার্শনিক অংশটুকুর শেষে মানব-কল্যাণপ্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের এই বর্ণাশ্রম বিভাগের আলোকে বিশ্ব-সভ্যতাকে বিশ্লেষণের যে সূচনা দেখি, পরবর্তীকালে 'বর্তমান ভারত'-গ্রন্থে তারই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ।

"মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণদ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য), এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে দোষগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশগত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকাররক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ছাড়া বিদ্যা শিখবার অধিকার কারও নেই, বিদ্যাদানেরও অধিকার কারও নেই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০১

বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় ব'লে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

ক্ষত্রিয়শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদার নন। এযুগে শিল্পের ও সামাজিক কৃষ্টির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন-যুগ। এর ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্ত-শোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ। এযুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এযুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, সমাজে অসাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ্যযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হ'লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব ?

বস্তুত প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে—এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।

সোনা অথবা রূপো—কোনটির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হলে কি কি অসুবিধা ঘটে, তা আমি বিশেষ জানি না—(আর বড় একটা কেউ জানেন ব'লে মনে হয় না)। কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, সোনার ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার ফলে গরীবেরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। ব্রায়ান যথার্থই বলেছেন, "আমরা এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ হতে নারাজ।" রূপার দরে

সব দর ধার্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে। আমি একজন সমাজতন্ত্রী (socialist), তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল ব'লে মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—এই হিসাবে।" (মূল পত্রে আছে 'half a loaf is better than no bread'—'একেবারে রুটি না পাওয়ার চেয়ে আধখানা রুটিও ভালো'—এ জাতীয় অনুবাদই এক্ষেত্রে প্রশস্ত।)

"অপর কয়টি প্রথাই জগতে চলেছে, পরিশেষে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ ও দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা যাতে পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হ'তে পারে, সেইটাই ভাল। জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকবে, তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই জোয়ালটি এক কাঁধ থেকে তুলে আর এক কাঁধে স্থাপিত হবে, এই পর্য্যন্ত।"[১]

সুতরাং ১৮৯৬ বা তার আগে থেকেই বিবেকানন্দ-মানসে শূদ্রপ্রাধান্যের কথা জেগেছে এবং সমাজতন্ত্রবাদকে তিনি মানুষের সর্বরোগহর কোনো মতবাদ মনে না করলেও সেকালে প্রচলিত অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার চেয়ে আপেক্ষিকভাবে ভালো মনে করেছেন।

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০১-৩০২ নিম্নরেখা লেখক-প্রদত্ত।

মূল ইংরেজী পত্রটির অংশবিশেষ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—Human society is in turn governed by the four castes—the priests, the soldiers, the traders, and the labourers. Each state has its golries as well its defects. When the priest (Brahmin) rules, there is a tremendous exclusiveness on hereditary grounds; the person of the priests and their descendants are hemmed in with all sorts of safeguards—none but they have any knowledge—none but they have the right to impart that knowledge. Its glory is, that at this period is laid the foundation of sciences. The priests cultivate the mind, for through the mind they govern.

ব্যক্তি হিসাবে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হলেও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ প্রকাশে যেমন তাঁর দ্বিধা ছিল না, (আধুনিককালে বিশ্বপ্রেমিকরা আবার স্বদেশপ্রেমকে তেমন সুনজরে দেখেন না,—ভুলে যান যে, যার নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা নেই তার পক্ষে অন্য দেশ বা সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেম এক অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়!) তেমনি ছিল না পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন শ্রেণীর সাময়িক প্রাধান্যের কাহিনী অনুসরণ করে আসন্ন শূদ্রযুগের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়ায়। তাঁর পত্রাবলী, বক্তৃতামালা ও রচনাবলীতে এই গণচেতনায় অভ্রান্ত পরিচয়ই তাঁকে আধুনিক মনের নিকট আত্মীয়ে পরিণত করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, শূদ্রযুগে সংস্কৃতির মান অবনমিত হবে। অন্নবস্ত্রের সংস্থানই যে-সমাজের প্রধান লক্ষ্য, তারা যে মানবমনের সূক্ষ্মতর ভাবকল্পনাকে

The military (Kshatriya) rule is tyranical and cruel, but they are not exclusive; and during that period arts and social culture attain their height.

The commercial (Vaishya) rule comes next. It is aweful in its silent crushing and blood-sucking power. Its advantage is, as the trader himself goes everywhere, he is a good disseminator of ideas collected during the two previous states. They are still less exclusive than the military, but culture begins to decay.

Last will come the labourer (Sudra) rule. Its advantages will be the distribution of physical comforts—its disadvantages, (perhaps) the lowering of culture. There will be a great distribution of ordinary education, but extraordinary geniuses will be less and less.

If it is possible to form a state in which the knowledge of the priesthood, the culture of the military, the distributive spirit of the commercial, and the ideal of equality of the last can be kept intact, minus their evils, it will be an ideal state. But is it possible?

অবান্তর বলে অস্বীকার করতে চাইবে, এ কিছু আশ্চর্য নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, শূদ্র বা সর্বহারাদের নেতৃত্ব যাঁরা করতে আসেন, তাঁদের সীমাবদ্ধ আদর্শের দ্বারাই সমগ্র সমাজের মানস-সংস্কৃতিকেও তাঁরা নিয়ন্ত্রিত করতে চান।

শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধনির্ণয়-প্রসঙ্গে স্বামীজী 'বর্তমান ভারতে' লিখেছেন—"সমাজের চক্ষে অনেক দিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূর নিক্ষিপ্ত হয়।"[১]

শূদ্র বা সর্বহারাদের যুগেও যদি সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ না হয়, তাহলে এর'ও পরিবর্তন হ'তে পারে। এ বিষয়ে স্বামীজীর সমাধান ছিল মহত্তম সংস্কৃতির আলোকে শূদ্রকে জীবন ও মননের ক্ষেত্রে উন্নীত করা; পূর্ব পূর্ব যুগের সংস্কৃতিকে ধ্বংস না করে, তাদের মহৎ আদর্শগুলির দ্বারা নবযুগের সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

Yet the first three have had their day. Now is the time for the last—they must have it—none can resist it. I do not know all the difficulties about the gold or silver standards (nobody seems to know much as to that), but this much I see that the gold standard has been making the poor poorer, and the rich richer. Bryan was right when he said, "We refuse to be crucified on a cross of gold." The silver standard will give the poor a better chance in this unequal fight. *I am a socialist not because I think it is a perfect system but half a loaf is better than no bread.*

Swami Vivekananda's Complete works : Vol VI : Centenary Edn : pp 381-82. বক্রাক্ষর লেখক প্রদত্ত।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৮

প্রাচীন ভারত সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিদের[১] মধ্যেই মনুষ্যমহিমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পেয়েছিল। সেই ব্রহ্মজ্ঞ যথার্থ ব্রাহ্মণের আদর্শই স্বামীজীর মতে ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। 'জগতের কাছে ভারতের বাণী' নামে যে অসমাপ্ত গ্রন্থে স্বামীজী পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্যে ভারতের বাণী ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন, তার সূচনায় বিয়াল্লিশটি সূত্রে তাঁর চিন্তাধারাকে সংহত করেছেন। সেখানেও দেখি 'ব্রাহ্মণে'র এই আদর্শ ঘোষণায় স্বামীজীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সর্বদ্বিধামুক্ত—"ভারতবর্ষের মহান্ আদর্শ 'ব্রাহ্মণত্ব'।

"স্বার্থহীন সম্পদহীন, একমাত্র নৈতিক নিয়ম ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার শাসন ও অনুশাসনের ঊর্ধ্বে।

"জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব—অতীতে ও বর্তমানে বহু জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিয়াছে, এবং অধিকার লাভ করিয়াছে।

"যাঁহারা মহৎ কর্মের অধিকারী, তাঁহারা কোনো দাবি করেন না, একমাত্র অলস অকর্মণ্য মূর্খেরাই দাবি করে।"[২]

শূদ্রযুগের সাংস্কৃতিক অবনতিরোধকল্পে সভ্যতার মহত্তর আদর্শে তাদের উজ্জীবিত করাই একমাত্র প্রতিষেধক। আর স্বামীজীর মতে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিই ভারতের জাতীয় চেতনার মূলসূত্র হওয়ায় ধর্মীয় আদর্শের দ্বারাই আগামীযুগের গণসংস্কৃতির সার্থকতা সম্ভব। সেদিক থেকে এই শূদ্রজাগরণের সত্যকেও স্বামীজী ধর্মচেতনার বৃহত্তর প্রকাশরূপেই দেখেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে তাই তো তিনি লিখেছিলেন—"পড়েছ 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব', দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে।"[৩]

১ বুদ্ধ ও শঙ্করের আবির্ভাবের পর থেকে সন্ন্যাসীরা অনেকটা সেই স্থান গ্রহণ করেছেন।

২ জগতের প্রতি ভারতের বাণী : সূচী : ১৯-২২ সূত্র : বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৩৭০-৭১

৩ ১৮৯৪ সালে লেখা : বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০

কিন্তু দরিদ্র তাঁর কাছে শুধু 'সর্বহারা' নয়, নারায়ণেরই রূপান্তর। আর এই দরিদ্রনারায়ণের পূজা কেবল অন্নবস্ত্রের উপচারে নয়, আত্মোপলব্ধির অসীম বিস্তারে। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রের আদর্শকে ভারতীয় অধ্যাত্মপ্রজ্ঞা এইভাবেই পূর্ণতা দিতে পারে।

* * *

সংস্কৃতির উত্তরাধিকার-প্রসঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের ভাষাগত দ্বন্দ্বের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। ভাষাবিচ্ছেদের ফলে আজ আমাদের গৃহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। মুষ্টিমেয় ইংরেজীশিক্ষিতের ইংরেজীর দাবি যাঁরা স্বীকার করেন না, তাঁরাও মানবেন যে, সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা হিসাবে যে কোনো একটি ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন। যাঁরা বিশুদ্ধ হিন্দী (সংস্কৃতপ্রধান) ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করতে চান, তাঁরা যে কেন সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করতে অনিচ্ছুক তার কারণ বোঝা যায় না। ভারতীয় প্রজ্ঞার আকরস্বরূপ 'সংস্কৃত' সম্বন্ধে যে দুরূহতার অভিযোগ, সে অভিযোগ আধুনিক হিন্দীর চাইতে বেশী কি? বরং 'সংস্কৃত' যদি সর্বভারতীয় ভাষামাধ্যমরূপে গৃহীত হতো, তাহলে সংস্কৃতের ব্যাকরণপদ্ধতির সরলীকরণের দ্বারা সমগ্র ভারতের আত্মিক যোগাযোগ অনেক সহজসাধ্য হতো।

'জগতের কাছে ভারতের বাণী'-তে স্বামীজী লিখেছেন— "এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা-সমস্যার) একমাত্র সমাধান।"

জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের বিশেষ ভূমিকার কথা স্বামীজী তাঁর 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় (মাদ্রাজে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতা The Future of of India) বিশ্লেষণ করেছেন, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়—"...সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব একটা শক্তির ভাব জাগিবে। মহানুভব রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর ভারতের নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে সেই মহাপুরুষগণের জীবৎকালে

অদ্ভুত ফল লাভ হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্যের এরূপ শোচনীয় পরিণাম কেন হইল, নিশ্চয় তাহার কিছু কারণ আছে; এই মহান আচার্যগণের তিরোভাবের পর এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে কেন সেই উন্নতি বন্ধ হইল? ইহার উত্তর এই—তাঁহারা নিম্নজাতি-গুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, তাহারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হউক, ইহা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ তাঁহারা করেন নাই। এমন কি, মহান বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল পথ ধরিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কার্যের আশু ফল-লাভ চাহিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ ভাবসমূহ তখনকার প্রচলিত ভাষা পালিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলেন। অবশ্য ভালই করিয়াছিলেন—লোকে তাঁহার ভাব বুঝিল, কারণ তিনি সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। এ খুব ভালই হইয়াছিল—তাঁহার প্রচারিত ভাবসকল শীঘ্রই চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। অতি দূরে দূরে তাঁহার ভাবসমূহ ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরব বোধ' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিককালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ অনেক জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাতে কি? সে-সকল জাতি ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—অসভ্য, কারণ তাহাদের কৃষ্টির অভাব। সভ্যতার ন্যায় তাহাদের জ্ঞানও গভীর নয়, একটু নাড়া দিলেই ভিতরের আদিম অসভ্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠে।"[১]

১ বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড: ১৮৭-১৮৮

শিক্ষাকে মজ্জাগত করার এই আদর্শ থেকেই স্বামীজীর সাধু-ভাষায় নূতন শৈলীর উদ্ভব। অপর পক্ষে চলতি ভাষায় তিনি বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ অবধি মহাপুরুষগণের চলতিভাষায় জ্ঞানবিস্তারের অনুগামী। মননের সমুন্নতি ও গভীরতায় ভাষার প্রকাশরীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। 'বর্তমান ভারতে'র সাধু গদ্যরীতি-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ-মননের এই সূত্রটি স্মরণীয়।

* * *

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্তমান ভারতে'র ভাষারীতি বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"তিনি যে ক্লাসিক গদ্যরীতি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন, ওই ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকেই তা বোঝা যাবে। এর ভাষারীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে তিনি দু'ধরনের বাক্রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি তৎসম-শব্দবহুল, সমাস-সন্ধি-সমাকীর্ণ, দীর্ঘ বিলম্বিত ছাঁদের বাক্যপরম্পরা ; আর একটি খণ্ড খণ্ড উপবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত সহজ হালকা বাক্রীতি।"[১] এ জাতীয় বাক্যসন্নিবেশ স্বামীজীর 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থের 'বর্তমান ভারতে'র আগে লেখা প্রবন্ধগুলিতেও দ্রষ্টব্য। আসলে এই দুই জাতীয় রীতি পরস্পরের পরিপূরক। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের সূত্র ও ভাষ্য রচনায় এ দুই জাতীয় বাক্যরীতির সন্নিবেশের উদাহরণ অজস্র। সাধু গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর সাধু-গদ্যের দীর্ঘবিস্তারী বাক্রীতিকে বাগ্মিতার প্রকাশরূপে দেখেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা অবশ্যই স্বীকার্য। সর্বক্ষেত্রে না হ'লেও স্বামীজীর কোনো কোনো গদ্যস্তবক যে তাঁর বক্তৃতাভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত তার সবচেয়ে সেরা প্রমাণ 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদ, যেখানে 'হে ভারত'—এই সম্বোধনে নবযুগের ভারতবর্ষের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান কম্বু কণ্ঠে-

---

১ উনিশ বিশ : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য : পৃঃ ১৩৮-১৪১

ধ্বনিত। একদিকে 'হে ভারত' অন্যদিকে 'হে বীর'—এ দুটি সম্বোধনে স্বামীজী আধুনিক ভারতবাসীর উদ্দেশ্যেই তাঁর স্বদেশমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। সমগ্র অনুচ্ছেদটি বিবেকানন্দের ভারতচেতনার প্রাণ-স্পন্দনে এমনভাবে অনুরণিত যে একে অনেকটা শ্রেষ্ঠ কবিতার মতো অখণ্ডসৃষ্টির মর্যাদা দিতে হয়। এমন এক একটি গদ্যস্তবক রচনায় বিবেকানন্দের অন্তর্নিহিত কবিসত্তাই বিপুল ভাবরাশিকে স্বতোৎসারিত বাক্যগৌরবের মহিমায় চিরকালের স্মরণীয় বাণীতে পরিণত করেছে।

তুলনামূলকভাবে স্বামীজীর অসমাপ্ত ইংরেজী রচনা 'জগতের প্রতি ভারতের বাণী'র ভারত-অনুধ্যানের অংশ-বিশেষ পাঠকমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপিত করছি।—And what a land! Whosoever stands on this sacred land, whether alien or a child of the soil feels himself sorrounded—unless his soul is degraded to the level of brute animals by the living thoughts of the earth's best and purest sons, who have been working to raise the animal to the divine through the centuries, whose beginning history fails to trace. The very air is full of the pulsations of spirituality. The land is sacred to philosophy, to ethics and spirituality, to all that tends to give a respite to man in his incessant struggle for the preservation of the animal to all training that makes man throw off the garment of brutality and stand revealed as the spirit immortal, the birthless, the deathless, the everblessed—the land where the cup was full, and fuller has been the cup of misery, until here, first of all, man found out that it was all vanity; here, first of all in the prime

of youth, in the lap of luxury, in the height of glory and plentitude of power, he broke through the fetters of delusion. Here, in this ocean of humanity, amidst the sharp interaction of strong currents of pleasure and pain, of strength and weakness, of wealth and poverty, of joy and sorrow, of smile and tear, of life and death, in the melting rhythm of eternal peace and calmness, arose the throne of renunciation! Here in this land, the great problems of life and death, of the thrist for life, and the vain mad struggles to preserve it, only resulting in the accumulation of woes, were first grappled with and solved—solved as they never were before and never will be hereafter; for here, and here alone was discovered that even life itself is an evil, the shadow only of something which alone is real. (তুলনীয়—'তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র'—'বর্তমান ভারত') This is the land where alone religion was practical and real and here alone men and women plunged boldly in to realise the goal, just as in other lands, they madly plunged in to realise the pleasures of life, by robbing their weaker brethren. Here, and here alone men and women plunged boldly in to realise the goal, just as in other lands, they madly plunged in to realise the pleasures of life, by robbing their weaker brethren. Here, and here alone the human heart expanded till it included not only the human, but birds, beasts and plants; from the highest gods to grains of sand, the highest and the lowest, all find a place in the heart of man, grown great, infinite. And here alone the human

soul studied the universe as one unbroken unity whose every pulse was his own pulse."[১]

'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদ, 'হে ভারত! ভুলিও না' সম্বোধনে যার শুরু, বাংলাসাহিত্যে স্বদেশমন্ত্ররূপে স্বীকৃত সেটি এই উদ্ধৃতির সঙ্গে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে স্বামীজীর ভারতচেতনায় রজোগুণাত্মক সংগ্রামের আহ্বান এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত ধ্যানতন্ময়তা দু'য়েরই উদাহরণ পাওয়া যাবে। এরই সঙ্গে তুলনা করা চলে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে তাঁর ভারতীয় শ্রমিকের উদ্দেশে প্রণামমন্ত্র অথবা ভারতের তথাকথিত উচ্চবর্ণদের উদ্দেশে সাবধানী নির্দেশ।[২] বিবেকানন্দের গদ্যরীতিতে এ-জাতীয় এক একটি আবেগস্পন্দিত স্তবক স্বদেশ ও বিশ্বের উদ্দেশে তাঁর অমোঘ আহ্বানশক্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তো বটেই, সেই সঙ্গে এদের চিরন্তন সাহিত্য-সৌন্দর্যও মুগ্ধ বিস্ময়ে অনুধাবন করার মতো।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদ বা স্তবকটির (গদ্যে লেখা হলেও সংস্কৃতের 'কাব্য' শব্দটি এ জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যবহার্য) প্রসঙ্গে লিখেছেন—"এই অগ্নিস্রাবী বাক্‌পুঞ্জ কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণে স্তনিত হয়, কখনো ঋক্‌মন্ত্রের মতো কানে বাজতে থাকে, কখনও ফরাসী বিপ্লবের Egalite Liberte Fraternite-এর অশনি-নির্ঘোষ এর প্রতিছত্রে ধ্বনিত হয়। ভাষা বাঙ্‌ময় হলেও আসলে তা হৃদ্‌স্পন্দন ছাড়া কিছু নয়, তা স্পষ্ট হয় এটুকু অনুধাবন করলে। এ রচনা একটা দিব্য মুহূর্তের সৃষ্টি, আবিষ্ট মনের আত্মপ্রকাশ, তন্ময়ীভূত সম্বিতের বিদ্যুৎপ্রবাহ যা শ্রোতার অন্তরকে শুধু স্পর্শ করে না, সমগ্র মন প্রকৃতিকেই পরম আশ্বাসে ভরে তোলে। চেতনার আবরণভঙ্গ এর ফলশ্রুতি।"[৩]—সে কথা

১ Comp. Works of S. Vivekananda : Vol 4 : Centenary Edn : p p 313-314 অনুবাদ : 'বিবেকানন্দের কবিতা' অধ্যায়, পৃঃ ২০৭-৮ দ্রষ্টব্য।

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৭, ১০৬, ৮১-৮২

৩ উনিশ বিশ : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃঃ ১৪১

তাঁর চলতি গদ্যের কোনো কোনো রচনাংশ (যেমন 'পরিব্রাজকে'র উল্লেখিত অংশ), ইংরেজী ও বাংলা পত্রাবলীর বা দেশে বিদেশে প্রদত্ত ভাষণাবলীর অংশবিশেষ সম্বন্ধেও বলা চলে।

উদাহরণস্বরূপ 'ভারতে বিবেকানন্দ' (Lectures from Colombo to Almora) থেকে স্বদেশীযুগের বিপ্লবীদের প্রিয় আর একটি গদ্য অনুচ্ছেদ পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করছি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, স্বামীজীর এই বইটি একদা বাঙালীপাঠকসমাজে এত বেশী প্রচলিত ছিল যে, এটি স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলেই অনেকে মনে করে থাকেন। আর প্রধানত স্বামী শুদ্ধানন্দজীর প্রচেষ্টায় স্বামীজীর জীবৎকালেই তাঁর ভাষাভঙ্গী এত সার্থকভাবে অনুসৃত হয়ে তাঁর অনেক রচনা অনূদিত হয়েছে যে, সেগুলি এখন বাংলাসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তাই উদ্ধৃত অনুবাদটির সঙ্গে মূল ইংরেজী আর দেওয়া হ'ল না। "হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশ-হিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ—কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম

সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।'[১]

* * *

স্বদেশপ্রাণ বিবেকানন্দের মানসনেত্রে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস। তাই তাঁর ভারত-পরিক্রমায় বিশ্বপরিক্রমার সূচনা এবং বিশ্বপরিক্রমায় ভারত-উপলব্ধির পূর্ণতা। 'ভারতে বিবেকানন্দ' পর্বেই 'কলিকাতা অভিনন্দনে'র উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, "পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজী, বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবের মুকুটধারী মহাশক্তি-শালী পাশ্চাত্যদেশে চারবৎসর ভ্রমণের পর মাতৃভূমি আপনার কেমন লাগিবে?' আমি বলিলাম, 'পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বায়ু আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত আমার নিকট তীর্থস্বরূপ।'[২]

স্বামীজীর ভারতচিন্তার দুটি প্রান্ত—একদিকে ভারতের অতীত ও বর্তমানের বাস্তব ইতিহাসের উত্থান-পতন কাহিনী. অন্যদিকে ভারতের মনোময় ইতিহাসের ধ্যানলব্ধ পরিপূর্ণতার আদর্শ। ফলে, ভারত-ইতিহাসের বিশ্লেষণ-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের আবর্তনকেই লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। ইতিহাসকে এমন কোনো নির্দিষ্ট প্রণালীতে বাঁধা উচিত কি না, এ নিয়ে ইতিহাসের দার্শনিকদের মতভেদ যথেষ্ট! কিন্তু পৃথিবীর কোনো ইতিহাসই যেহেতু ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ নয়, সেহেতু ব্যক্তির বিশিষ্ট মত-নিরপেক্ষও হতে পারে না। ভারত-ইতিহাস-ব্যাখ্যায় স্বামীজী যে বিশেষ প্রণালীটি অবলম্বন করেছেন, সর্বাগ্রে সেইটি আমাদের বিচার্য।

---

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : 'আমার সমরনীতি' : পৃঃ ১১৬ Complete Works of S. Vivekananda : Vol III (Centenary Edn). My Plan of Campaign : P 225-26

২ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ২০৫

সমগ্র সমাজের কর্মধারাকে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারভাগে বিভক্ত করে যে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিল, জন্মগত অর্থে না হলেও কর্মগত অর্থে সে বিভাগ অল্প-বিস্তর সব দেশেই রয়েছে। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতির এই বিভাগ-বৈশিষ্ট্য জাতিগত (Racial) নয়, কর্মগত। পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদেরা এই জাতি বিভাগকে আর্য-অনার্যের ভিত্তিতে স্থাপন করতে চেয়েছেন। স্বামীজী এই ভ্রান্তির নিরসন করে দেখিয়েছেন ভাষাগত বিভাগ থাকলেও জাতিগত দিক থেকে আর্য অনার্য বিভাগ এদেশে নেই। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda : Patriot Prophet' গ্রন্থে (বাংলা 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে 'সমাজতাত্ত্বিক ভাবধারা অধ্যায়) স্বামীজীর নৃতত্ত্ববিষয়ক ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তধারার বিশ্লেষণে এই দিকটি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তথাকথিত আর্যদের ভারত-বিজয় বা তাদের শ্বেতবর্ণ দীর্ঘদেহ, নীল-নয়নের বর্ণনা—এর কোনো প্রমাণই বেদে উপনিষদে নেই, অন্যত্র তো আরো মেলে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এ জাতীয় আর্য বিজয়ের তত্ত্ব দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামীজীর মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁর 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। (বাণী ও রচনা : পঞ্চম খণ্ড)

স্বামীজীর মতে—"সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতনকাল হইতেই সকল সভ্যসমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য ও প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।"

("বর্তমান ভারত"—'বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়' : সূচনা অংশ লক্ষণীয়)

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের যে স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তারই ভিত্তিতে ভারতীয় বর্ণাশ্রমধারা গড়ে উঠেছে বলে স্বামীজীর ধারণা।

গীতার 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' (গীতা : জ্ঞানযোগ : ৪।১৩) ইত্যাদি শ্লোক স্বামীজীর এ ধারণার পরিপোষক।

গীতার পূর্ববর্তীকালে ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্তে' সম্ভবতঃ চতুর্বর্ণ প্রথার প্রথম উল্লেখ।

"যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূপাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

(ঋগ্বেদ ১০।৯০)

"যে পুরুষকে (বিরাটস্বরূপকে) বিভিন্নরূপে ভাবনা করা হয়েছিল, তখন তাঁকে কতরকমে কল্পনা করা হয়েছিল ? ঐ (বিরাটপুরুষের) মুখ ও বাহুদ্বয় কিভাবে কল্পিত হয়েছিল ? তাঁর উরুদ্বয় এবং পাদদ্বয়রূপে কারা কল্পিত হয়েছিল ?

"এই প্রজাপতির মুখ (থেকে) ব্রাহ্মণ (উৎপন্ন হলেন), ক্ষত্রিয় বাহুরূপে নিষ্পন্ন হলেন, উরুদ্বয় হলো বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্র জাত হলেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।" "গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের স্রষ্টা।"

গীতার 'মোক্ষযোগে' সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির লক্ষণগুলি আগে বিচার করে তারপর কর্মবিভাগের কথা আলোচিত। 'সুখং ত্রিবিধং'—ত্রিবিধ সুখের উদাহরণের মধ্যে সাত্ত্বিক সুখ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥

গীতা ১৮।২৬,৩৭

'যে সুখের দীর্ঘকাল অভ্যাস বা অনুশীলনের দ্বারা মানুষের সকল দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হয়, যে সুখ আরম্ভে বিষের মতো দুঃখদায়ক, পরিণামে অমৃতের মতো, যে সুখ আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসন্নতা থেকে আসে, সে সুখই সাত্ত্বিক সুখ।'

এই সাত্ত্বিক সুখ সাধারণভাবে ব্রাহ্মণদেরই রয়েছে বলে সেকালে মনে করা হতো। করণ জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা, আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রথমে আপাতত দুঃখ মনে হলেও পরিণামে সে অমৃত—এই জেনে ব্রাহ্মণেরা সাত্ত্বিক সুখে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইতেন। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ গীতার প্রবক্তা বা যে বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারতে'র লেখক তাঁরা বর্ণাশ্রমের দিক থেকে 'ব্রাহ্মণ' ন'ন। সেদিক থেকে সাত্ত্বিক সুখে প্রতিষ্ঠিত এঁদের ব্রাহ্মণই বলতে হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ব্রাহ্মণদেহ সন্ন্যাসী ন'ন বলে বিবেকানন্দকে অনেক সময়ই নানা অস্বস্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

গীতায় সাত্ত্বিক সুখের পরে বলা হয়েছে 'রাজসিক' সুখের কথা। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের যোগে লব্ধ এই সুখ প্রথমে অমৃতের মতো মনে হলেও পরিণামে বিষতুল্য।[১] তারপরে আছে তামসিক সুখের কথা। যে সুখ আরম্ভে এবং পরিণামে আত্মার মোহকর, যা নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ থেকে দেখা দেয় তাই তামসিক।[২] এর পরে গীতার মন্তব্য—

> ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
> সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিগুণৈঃ॥

এ পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যে এমন কিছু বা এমন কেউ নেই, যে বা যিনি এই প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত।

এই তিনগুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েই সাধক পরমসিদ্ধি লাভ করেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, স্বামীজী 'বর্তমান ভারতে' এবং অন্যত্র

১,২ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ গীতা। ১৮।৩৮-৩৯

অধিকাংশ ভারতবাসীর মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য দেখতে পেয়ে, তাদের প্রথমে রজোগুণের দ্বারা জীবনসংগ্রামে উদ্দীপ্ত করে পরে সত্ত্বগুণের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সত্ত্বগুণই আমাদের আদর্শ, নিম্নতর স্তর থেকে এই আদর্শের দিকে যাত্রাই মানবস্বভাবের পক্ষে কল্যাণকর। মোটের উপর, সাধারণ মানবস্তরে এইভাবে মানবচেতনাকে ভারতীয় সাধনার দৃষ্টিতে ভাগ করা হয়েছে। এরই ভিত্তিতে সমাজের বর্ণবিভাগ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্যং তেজং ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥

(গীতা : মোক্ষযোগ : ১৮।৪১-৪৩)

'হে পরন্তপ (অর্জুন)! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসকল স্বভাবজাত গুণানুসারেই (শাস্ত্রকারেরা) ভাগ করে দিয়েছেন। শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আস্তিক্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য, কার্যকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, প্রভুত্বের ভাব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বাভাবিক।'

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়—ভারতের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয়শক্তিরূপে অঙ্গাঙ্গীভাবে দেখা দিয়েছে। যদি স্বভাবজ গুণের দিক থেকে বিচার করা যায় উপরিউদ্ধৃত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের গুণ অনেক বৈশ্য শূদ্রের মধ্যেও দেখা যায়। সেদিক থেকে তাঁদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই গ্রহণ করা উচিত। অনেক সময় বিপরীত উদাহরণও মেলে। জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব অনেক সময় নামমাত্র পরিচয় হয়ে বৈশ্য শূদ্রের স্বভাবই বড়ো হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে জন্মগত অধিকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের সমাজব্যবস্থাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

এই পটভূমিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতীক এবং বিবেকানন্দকে ক্ষত্রিয় আদর্শের প্রতিভূরূপে গণ্য করা যায়। ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে যুগে যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহযোগের বিশেষ ভূমিকা। ক্ষত্রিয় সাধকেরা অনেকেই তাঁদের ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে এদেশের অধ্যাত্ম আদর্শকে সমুন্নত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণজীবন-সাধনা পূর্ণতালাভ করেছে বিবেকানন্দ-জীবন ও মননের মাধ্যমে।

বৈশ্য ও শূদ্রদের স্বভাবজগুণের দিন থেকে কর্মবিভাগ—

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

গীতা : ১৮।৪৪

কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম। সেবা পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবধর্ম। স্বামীজী 'বর্তমানভারতে' এই সেবা বা পরিচর্যাকারী শূদ্রদের অভ্যুত্থান সম্বন্ধেই ভবিষ্যবাণী করেছেন—

"...শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে।"

"...শূদ্রধর্মকর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।" ('বর্তমান ভারত' 'শূদ্র জাগরণ' অংশ দ্রষ্টব্য)

'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের 'কুম্ভকোনম্' বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন —"সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন...ব্রাহ্ম বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ (অর্থাৎ বর্ণবিভাগ) পরে ব্রাহ্মণ থেকেই উৎপন্ন। আমরা মহাভারতে দেখতে পাই—প্রথমে পৃথিবীতে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

স্বামীজীর এই চিন্তাধারার উৎসপ্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে ভীষ্মের উক্তি স্মরণীয়—

অবজন্নিহ সত্রৈস্তে তৈস্তৈঃ কামৈঃ সবাহিতাঃ।
সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণৈরেব ত্রিষু বর্ণেষু সৃষ্টয়ঃ॥ ৫৯।৪৪

... ...

তস্মাদ্বর্ণা ঋজবো জ্ঞাতিবর্ণাঃ সংসৃজ্যন্তে তস্য বিকার এব।
এবং সাম যজুরেকয়ুগেকা বিপ্রশ্চৈকো নিশ্চয়ে তেষু সৃষ্টঃ॥ ৫৯।৪৭

একমাত্র ব্রাহ্মণ থেকেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের উদ্ভব, সেজন্য এই তিন বর্ণের (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) স্বভাবতই সমুদয় যজ্ঞে অধিকার রয়েছে।

যেহেতু একমাত্র ব্রাহ্মণ থেকে আর তিন বর্ণের উৎপত্তি, তাই আর তিনবর্ণ ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিবর্ণ বলেই পরিগণিত ; আর তিন বর্ণ সেই ব্রাহ্মণেরই সন্তান। ঋক্ যজুঃ ও সামবেদ যেমন একমাত্র অকার থেকে আবির্ভূত হয়েছিল, তেমনি একমাত্র ব্রাহ্মণ থেকেই আর তিন বর্ণের আবির্ভাব।

বেদ, মহাভারত ও গীতার এই সব উক্তির দ্বারা মনে হয় বৈদিক যুগ থেকেই ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকারের সূচনা। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে এই অধিকার বিভাগের শৃঙ্খল জাতীয় জীবনে দৃঢ়তর হয়। একালে আবার রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্রয়ে শূদ্র বা নিম্নবর্ণের বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্রমবর্ধমান দাবি আর একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি করতে চলেছে। কিন্তু মূলত একথা ঠিক যে, ভারতের ইতিহাসে, এমন কি জগতের ইতিহাসে এমন পুরোহিত, ক্ষত্রিয় ও বণিকের যুগ শেষ হয়ে শ্রমজীবী মানুষের যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিকতা এই শ্রমজীবী তথা শূদ্র সাধারণের নবজাগরণ সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই ভারতবাসীকে সচেতন করে দেওয়ায়।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার অতীত ও ভবিষ্যৎ-প্রসঙ্গে ২রা নভেম্বর, ১৮৯৩ তারিখে লেখা স্বামীজীর পত্রে আছে—"ধর্মকে উহার নির্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখিতে হইবে, আর সমাজকে উন্নতির স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতের সকল সংস্কারই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, পৌরোহিত্যের সর্ববিধ অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁহারা ধর্মকেই দায়ী করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গ ভাঙিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহার ফল কি হইল ?—নিষ্ফলতা। বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান ; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই একসঙ্গে ভাঙিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন।"

বুদ্ধ থেকে রামমোহন অবধি ব্যাপ্ত আন্দোলন-সম্বন্ধে এই চমকপ্রদ মন্তব্যের পরে স্বামীজী লিখছেন— "… জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা নিজে কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়।" (বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড)

স্বামীজীর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি যে শূদ্রযুগকেও অতিক্রম করে গেছে সেকথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। পূর্বোল্লেখিত কুম্ভকোনম্ বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন—"…আবার যখন যুগচক্র ঘুরে সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হ'বেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরে গিয়ে সত্যযুগের সূচনা হচ্ছে……।" এক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি জাতি হিসাবে নয়, ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি অর্থেই ব্যবহৃত।

স্বামীজীর মতে শুধু ভারতবর্ষ নয়। সমস্ত জগৎকে ব্রাহ্মণের আদর্শে গড়ে তোলাই আমাদের সাধনা। "আমাদের জাতিভেদেরও তাই লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য—ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাতে আদর্শ ধার্মিক, অর্থাৎ ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, শান্তি, উপাসনা, ও ধ্যানপরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ করতে পারে।"

সমগ্র সমাজের কর্মধারাকে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারভাগে বিভক্ত করে যে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিল, জন্মগত অর্থে না হ'লেও কর্মগত অর্থে সে-বিভাগ অল্প বিস্তর সব দেশেই আছে। ভারতীয় সমাজের এই পদ্ধতি ঋগ্বেদ ও গীতায় রূপান্তরিত। বিশ্ব-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলেও আমরা দেখতে পাই সভ্যতার এক এক স্তরে এক এক বর্ণের প্রাধান্য।

এদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর আর এক চিন্তানায়কের প্রভাবও স্বামীজীর চিন্তাধারায় এসে থাকতে পারে। কোম্‌ত্ যখন পৌরাণিক যুগ থেকে আধুনিককালের বিজ্ঞানের যুগ অবধি সভ্যতার রূপান্তরের

কথা বলেন, তখন সভ্যতার প্রকৃতিবিচারই তাতে প্রাধান্য পায়।[১] কোম্‌তদর্শন-অনুসারে যুগবিভাগ প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক ; দ্বিতীয় দার্শনিক, কাল্পনিক শক্তিমূলক ; তৃতীয় বৈজ্ঞানিক প্রামাণিক বা নিয়মমূলক। বিবেকানন্দ সভ্যতার প্রকৃতি এবং সভ্যতার ধারকবাহকদের প্রকৃতিও একই সঙ্গে বিচার করেছেন। কোম্‌তের মতে আধুনিক যুগ, বিজ্ঞানের যুগ আর বিবেকানন্দের ভাষায় 'শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের' প্রাধান্যের যুগ। এ দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম যোগটুকু লক্ষণীয়—দুইই এক হিসাবে বস্তুবাদী চিন্তার যুগ আর্থাৎ মানুষের অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন একদিকে এবং 'প্রত্যক্ষপ্রমাণবাহন' বিজ্ঞান আর একদিকে—এ নিয়ে বর্তমান যুগের চিন্তা। কোম্‌তের মতো মেরীর আদলে কোনো মানব-দেবতার পূজার কল্পনা স্বামীজীর নেই। মূর্তিপূজা বা অবতারতত্ত্ব তিনি ভক্ত হিসাবে মানলেও শেষ অবধি তিনি অদ্বৈতবাদী। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈতের প্রতিটি ধাপ যে মানবমনের অবস্থা অনুসারে ক্ষুদ্রতর সত্য থেকে মহত্তর সত্যের প্রতি যাত্রা—একথা স্বামীজী জানেন। সুতরাং 'মানুষ' তাঁর কাছে ব্রহ্মেরই প্রকাশ এবং পার্থিব সমস্যার সমাধানই তাঁর জীবনের শেষ উদ্দেশ্য নয়! বরং বলা চলে যে 'সমগ্র মানবজাতির অধ্যাত্মরূপান্তরে'র সংকল্পই তাঁর সাধনা। আধ্যাত্মিক উত্তরণ ছাড়া মানবজীবন যে কখনো চরিতার্থ হ'তে পারে না, তার প্রমাণ তিনি নিজের জীবনে তো পেয়েছেনই, সমগ্র ভারতের ইতিহাসই তাঁর কাছে সে সত্যের সাক্ষীস্বরূপ।

সাম্প্রতিককালে অধ্যাত্মসাধনা ও পুরোহিততন্ত্রের একার্থক চিন্তার ফলে আমাদের বামপন্থী চিন্তানায়কেরা মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মের প্রগতি ও প্রেরণামূলক দিকটি স্বীকারই করতে চান না। বিবেকানন্দ-মানসের অনুধাবনে কিন্তু সর্বাগ্রে এ ভ্রান্তি পরিহার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে এসে শ্রেষ্ঠ ত্যাগের আদর্শে বিবেকানন্দ যে অধ্যাত্মসত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তার সঙ্গে 'চালকলাবাঁধা বিদ্যা'র কোনো সম্পর্কই

১ 'কোম্‌তদর্শন' : রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮১ এবং 'নানা প্রবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

ছিল না। এ বিষয়ে ভারতের পুরোহিতবৃত্তি ব্রাহ্মণসম্প্রদায় ও বিদেশের খ্রীষ্টান মিশনারী—দুই দলকে বিবেকানন্দ নির্মম সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মানবসভ্যতার উষাকালে প্রকৃতির অন্তরালে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের আভাস যাঁরা পেয়েছিলেন, প্রায় সব সভ্যতার সূচনায় সেই পুরোহিত বা উপাসকসম্প্রদায়ের দ্বারাই সভ্যতার প্রথম উন্মেষ, একথা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং 'বর্তমান ভারতে'র সূচনায় বৈদিক যুগ থেকে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের প্রাধান্যের কাহিনী দিয়ে বিবেকানন্দ তাঁর ভারত-ইতিহাস-দর্শনের আলোচনা আরম্ভ করেছেন।

* * *

'উদ্বোধন'-পত্রিকা থেকে সংকলিত হয়ে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সালে। সে সময় স্বামী সারদানন্দ এর যে ভূমিকা লেখেন তাতে 'বর্তমান ভারতে'র লেখকরূপে স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য এইভাবে প্রতিভাত—"আমাদের ধারণা, ভারতে ইতিহাসের যে অভাব তাহা নহে, কিন্তু উহার সম্বন্ধ সংযোজনে ভারতসন্তানই একমাত্র সমর্থ এবং উহার যথার্থ পাঠক্রম তাঁহাদের দ্বারাই একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হইবে। বহুল পরিভ্রমণ, গর্বিত রাজকুল হইতে দরিদ্র প্রজা পর্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে মিলন, ভারত ও ভারতেতর দেশের আচার ব্যবহার এবং জাতীয় স্বভাবসমূহের নিরপেক্ষ দর্শন, অশেষ অধ্যয়ন এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অপার প্রেম ও তাহাদের দুঃখে গভীর সহানুভূতির ফলে স্বামীজীর মনে ভারতের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, 'বর্তমান ভারত' তাহারই নিদর্শন স্বরূপ।...

"অধিকন্তু ইহা একখানি দর্শনগ্রন্থ। ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব দশসহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া উহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত ও পরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখদুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রাস, কখন বা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অসম্বন্ধ ভারতীয়

জাতিসমূহ কোনসূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই 'বর্তমান ভারতে'র আলোচ্য বিষয়।"[১]

'বর্তমান ভারতে'র এই দার্শনিক আলোচনার পাশাপাশি স্মরণীয় স্বামীজীর আর একটি বিশিষ্ট ইংরেজী প্রবন্ধ 'Historical Evolution of India' (ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ)[২]। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন তাঁর 'বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা' গ্রন্থে এই প্রবন্ধটির বিশদ আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধে স্বামীজীর মূল দৃষ্টিভঙ্গির একটি বক্তব্য—'In ancient India the centres of national life were always the intellectual and spiritual and not political. ···The outbrust of national life was round colleges of sages and spiritual teachers.'[৩]—একথার অনুসরণে অধ্যাপক সেন মন্তব্য করেছেন—"···রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় জাতির বলিষ্ঠ অব্যাহত সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন স্বামীজী।···যুগে যুগে এ জাতীয় সংহতির ও ঐক্যবদ্ধতার প্রাণকেন্দ্র হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ এবং দিল্লী প্রভৃতি রাজধানীতে ততটা ছিল না, যতটা ছিল নৈমিষারণ্যে, কাশীতে, মিথিলায়, তক্ষশীলায়, নালন্দায়, বিক্রমশীলায় এবং নবদ্বীপে। ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের কাহিনীতে স্বামীজী জাতির এই প্রাণকেন্দ্রগুলির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এদেশের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানীর কাছে এ মূলতথ্যটি আশ্চর্যভাবে তুলে ধরেছেন।"[৪]

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২১৯-২২০

২ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৮৫-৩৯৫

৩ Complete Works of S. Vivekananda : Vol VI : p 161

৪ বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা : শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন : 'ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ত্ব' অধ্যায় : পৃঃ ৮-৯

'বর্তমান ভারতে'র বক্তব্য উপলব্ধিতে স্বামীজীর 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' বিশেষ সহায়ক। এ প্রবন্ধে স্বামীজী ইতিহাসের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিশেষ ইতিহাসের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যখন বিশ্ব-ইতিহাসের মূলমন্ত্রসন্ধানী তখনই 'বর্তমান ভারতে'র মতো ইতিহাস-দর্শনের সৃষ্টি।

মানবমনের অনন্ত জিজ্ঞাসার আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটেছে ভারতবর্ষে। কিন্তু কেবলমাত্র জাদুবিদ্যা, ভয়-বিস্ময় ইত্যাদি থেকেই যদি এ জিজ্ঞাসার সূচনা হতো, তাহলে পরবর্তীকালে সংসার-বাসনার ঊর্ধ্বে মানবকল্পনার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ চেতনার অতীত অদ্বৈতবাদের ঘোষণা ভারতবর্ষে সম্ভব হত না। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনাই উচ্চতর অধ্যাত্মচিন্তার জগতে এসে দেবতা ও ঈশ্বরকে নিম্নতর স্থানে নির্দিষ্ট করেছে।

প্রাচীন ভারতীয় যাগযজ্ঞ থেকেই যেমন জ্যামিতির উদ্ভব, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় মননশীলতার ছন্দোময় প্রকাশই সর্বভারতীয় সংস্কৃতির বাহন 'সংস্কৃত বা দেবভাষা'।

"এদেশের প্রকৃতি ছিল কল্যাণময়ী, পরিবেশ ছিল আশু ফলপ্রসূ। সুতরাং জাতির সমষ্টি-মন সহজেই উন্নত চিন্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জীবনের বৃহত্তর সমস্যাসমূহের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। ফলে দার্শনিক এবং পুরোহিত ভারতীয় সমাজে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় নয়।

পুরোহিতগণ আবার ইতিহাসের সেই আদিম যুগেই পূজা-অর্চনার বিস্তারিত বিধিনিয়ম প্রণয়নে নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল। পরে কালক্রমে, যখন সে-সকল প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মের বোঝা জাতির পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই দার্শনিক চিন্তা দেখা দিল। এবং ক্ষত্রিয়েরাই প্রথম মারাত্মক আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়াছিল।"[১]

সভ্যতার এই বিশেষ মুহূর্ত থেকে জড়বাদী দার্শনিকদেরও উদ্ভব হতে থাকে। প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতে অধ্যাত্ম দর্শন ও জড়বাদী

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৮০

দর্শন—দুয়েরই পাশাপাশি অবস্থান। পুরোহিত, শাসক ও জড়বাদীদের চিন্তাসংগ্রামের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁর প্রতিভায় অধ্যাত্মদর্শন এক পরিপূর্ণতা লাভ করল, তিনি ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ—'গীতা' তাঁর সেই সমন্বয়-কারী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জাতি-নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করলেও সামাজিক ক্ষেত্রে সে উদারতা আনতে পারেন নি। ফলে বুদ্ধ থেকে কবীর, নানক, রামানন্দ, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির আন্দোলন এই সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে আবর্তিত।

"প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও অধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণকেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়। বস্তুতঃ আধুনিককালের মতো প্রাচীনকালেও রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষমতা—আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিদ্যাবুদ্ধিচর্চার নিম্নে স্থান পাইত। মুনি-ঋষি এবং আচার্যগণ যে-সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জাতীয় জীবন উচ্ছ্বসিত হইত।

"সেইজন্য দেখা যায়, পাঞ্চাল, বারাণসী ও মিথিলাবাসীদের সমিতিগুলি অধ্যাত্ম-সাধনা ও দার্শনিক উৎকর্ষের মহান্ কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে আবার এগুলিই আর্যসমাজের বিভিন্ন দল-উপদলের পক্ষে রাজনীতিক উচ্চাভিলাষ পূরণের কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।"[১]

আধিপত্যলাভের জন্য কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধের কাহিনীর কাব্যরূপ 'মহাভারত'। বৌদ্ধপ্রভাবে মগধপ্রভৃতি অঞ্চলে যে প্রাধান্য ঘটে, পরবর্তী যুগে হিন্দু রাজাদের পুনরভ্যুত্থানে সে প্রাধান্য হ্রাস পায়। বৌদ্ধধর্মই ভারতে প্রথম বৃহত্তম সাম্রাজ্য ও সম্রাটদের সৃষ্টি করে। কিন্তু অতিরিক্ত উদারতার বশে সব জাতির লোককে আশ্রয় দিতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের নীতি ও শুচিতা ব্যাহত হয়। সীথিয়ানদের ভারত-আক্রমণ ও পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ফলে বৌদ্ধ প্রভাব অনেকাংশে বিনষ্ট হওয়ার পর ইতিহাসের দীর্ঘ যবনিকা-শেষে দেখা

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৮৯

গেল বৌদ্ধ প্রভাব মুছে গেলেও একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর একদিকে সন্ন্যাস—এ দুইশ্রেণীর নবপুরোহিতশক্তি সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

"সেই প্রতিক্রিয়া-আন্দোলন উত্তরে কুমারিল্ল এবং দক্ষিণে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজকর্তৃক পরিচালিত হইয়া বহু মত, বহু সম্প্রদায়, বহু পূজাপদ্ধতি পুঞ্জীভূত হইয়া হিন্দুধর্মে তাহার শেষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। বিগত সহস্র বৎসর কিংবা তদপেক্ষা অধিক কাল ধরিয়া এই অঙ্গীভূত করাই ছিল তাহার প্রধান কাজ।"[১]

আচার্য শঙ্করের জ্ঞানযোগের চেয়ে রামানুজের উদার ভক্তিযোগই জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরিয়ে আনতে বেশী সহায়তা করে। কিন্তু শঙ্কর এই নবজাগ্রত হিন্দু সভ্যতাকে এক দার্শনিক পটভূমি দিলেন। "...প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপ হইতেই নবজাগ্রত ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। নির্ভীক রাজপুতজাতির বীর্যে ও শোণিতের বিনিময়ে সে ভারতবর্ষের জন্ম, মিথিলার সেই ঐতিহাসিক জ্ঞান-কেন্দ্রের নির্মম ক্ষুরধারবুদ্ধি জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সেই নব-ভারতের স্বরূপ ব্যাখ্যাত ; আচার্য শঙ্কর এবং তাঁহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়-প্রবর্তিত এক নূতন দার্শনিক ভাবের দ্বারা সেই ভারত পরিচালিত এবং মালবের সভাকবি ও সভাশিল্পিবৃন্দের সাহিত্য ও শিল্পদ্বারা সে-ভারত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"[২]

ভারতের উত্তরাখণ্ডে বারংবার বিদেশীদের অভিঘাত দেখা দিলেও দাক্ষিণাত্য সে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। আরওঙ্গজেবের জীবনের শেষদিকে এই দক্ষিণ-বিজয়-প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়াতে শিবাজী ও তাঁর অনুচরবৃন্দের আবির্ভাব। মুসলমানযুগে যাঁরা সমন্বয়-পথিক তাঁরা ইসলামের তরবারিকে কিছুটা শান্ত করেছেন এবং ইসলামের অনুপ্রবেশও অনেকটা ঠেকিয়েছেন (যা একমাত্র ভারতেই সম্ভব হয়েছে), তবু রামানন্দ, কবীর, দাদু, শ্রীচৈতন্য বা নানক—এঁরা কেউই সমগ্র সমাজকে তাঁদের সাম্যের বাণীতে প্রভাবিত করতে

১ তদেব পৃঃ ৩৯২

২ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৯১

পারেন নি। সমগ্র মধ্যযুগে এক প্রধান সমস্যা ছিল আর্য-সংস্কৃতির আত্মরক্ষা। পূর্বোক্ত মহাপুরুষদের প্রচেষ্টা সেদিক দিয়ে সার্থক আবার এই আত্মরক্ষার প্রতিক্রিয়াতে মারাঠা ও বিশেষভাবে শিখেরা যে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তার দ্বারাও ভারতীয় রাজনীতি প্রভাবিত। কিন্তু এই দুই শক্তির দ্বারা ভারতের নবজাগরণ সম্ভব হয় নি।

কারণ হিসাবে স্বামীজী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকেরই পর্যবেক্ষণফল—"ভারতের ইতিহাসে বরাবর দেখা গিয়াছে, যে-কোন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের পরে, তাহারই অনুবর্তি-ভাবে একটি রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে এবং ঐ বোধই আবার যথানিয়মে নিজ জনয়িত্রী যে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা, তাহাকে শক্তিশালী করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাষ্ট্র বা শিখ-সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল তাহা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল। মালব এবং বিদ্যানগরের কথা দূরে থাকুক, মোগল দরবারেও তদানীন্তনকালে যে প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তির গৌরব ছিল, পুণার রাজদরবারে কিংবা লাহোরের রাজসভায় বৃথাই আমরা সে দীপ্তির অনুসন্ধান করিয়া থাকি। মানসিক উৎকর্ষের দিক হইতেই এই যুগই ভারত-ইতিহাসের গাঢ়তম তমিস্রার যুগ এবং ঐ দুই ক্ষণপ্রভ সাম্রাজ্য—ধর্মান্ধ গণঅভ্যুত্থানে প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সর্ববিধ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের তাহারা একান্ত বিরোধী; উভয়েই মুসলমান রাজত্ব-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সকল প্রেরণা ও কর্মপ্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।..."[১]

এর পরে স্বামীজী ইংরেজশাসনের সমকালীন অবস্থার সামান্য উল্লেখ করে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। আকস্মিক পরিসমাপ্তি মনে হয় ব্যস্ততাজনিত অথবা ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ তিনি তখনো সমীচীন মনে করেন নি। অবশ্য ইংরেজশাসনের যুগ সম্বন্ধে তাঁর তীব্র ও তিক্ত মতামতের বেশ কিছু নিদর্শন এখন পাওয়া

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৭৪

গেছে। সে-আলোচনায় স্থান অন্যত্র। আমরা এখন 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর বক্তব্য সম্বন্ধে মনোযোগী হব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা জানেন সে যুগে ইতিহাস-লেখার দিকে বাংলা গদ্যসাহিত্যে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। তার কারণ, তখন অবধি আমাদের ইতিহাসের অনেকাংশই অনাবিষ্কৃত। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রং' জাতীয় গদ্যপ্রচেষ্টা থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' অবধি বিদেশী ও স্বদেশী ইতিহাসকাহিনীর বিচ্ছিন্ন উপকরণের সমাবেশ-প্রচেষ্টা বাঙালীর নবজাগ্রত ইতিহাস-কৌতূহলের উদাহরণ।

কিন্তু ইতিহাসের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণের দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনাকে যাঁরা প্রথম বাংলাসাহিত্যে ধ্বনিত করেছিলেন, সেই প্যারীচাঁদ, ভূদেব, রাজনারায়ণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ভারতবর্ষকে আপন মাতৃভূমি জেনে হিন্দু কলেজের যে তরুণ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অধ্যাপকটি পরাধীন ভারতবর্ষের উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, তাঁর কথাও মনে পড়ে। কিন্তু সেই ডিরোজিও এবং ডিরোজিওর তরুণ শিষ্যবৃন্দের অধিকাংশই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিটির কথা ততটা গভীরভাবে বিচার করে দেখেন নি। তাই প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবীনের মোহ তাঁদের যতটা সমাচ্ছন্ন করেছিল, প্রাচীনের মর্যাদা ততটা আত্মস্থ করে নি।

তবু এ কথা স্বীকার্য যে, ডিরোজিওর শিষ্যেরা উত্তরজীবনে যখন চিন্তাজগতের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন, তখন ধীরে ধীরে নবীনের বিদ্রোহ প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতায় অনেকখানি স্বচ্ছ ও সুসমঞ্জস হয়ে এসেছে। ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাবলী থেকে এই সামঞ্জস্য-সাধনের একটি উদাহরণ—

"বাহ্য আড়ম্বরীয় শিক্ষাতে সমাজ সুশোভন হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণত্বের ব্যাঘাত, আত্মবলের হ্রাস ও প্রকৃতির প্রাবল্য। ঈশ্বরপরায়ণত্বের ও আত্মবলের জন্য এ দেশের মহিলাগণ পূর্ব হইতেই বিখ্যাত। কোন দেশে পতির জন্য স্ত্রীলোক অগ্নিতে গমন করে ও সর্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করে? সামাজিক বিবেচনায় ইহা যদিও প্রসিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু আত্মবলের পক্ষে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ। আর্যজাতীয় মহিলাগণ! সতী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ঈশ্বরপরায়ণা নারীদের চরিত্র সর্বদা স্মরণ কর। তাঁহাদিগের ন্যায় শম, দম, তিতিক্ষা অভ্যাস কর ও সমাহিত হইয়া উপরতিতে পূর্ণ হও।" (এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা)

ডিরোজিও-যুগের সর্বব্যাপী পরিবর্তনের মুখেও মননের স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ভূদেব তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' লিখেছেন—"যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম, তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ ঐ ভাবার্থপ্রকাশক কোন বাক্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসনিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। তখন 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ হইতে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বিবরণ জানিতাম। কিন্তু সেই বিবরণ জানিয়াও শিক্ষক মহাশয়ের কথার প্রকৃত উত্তর অথবা আপন মনকে প্রবোধ প্রদান করিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিয়েছি যে, আর্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্নপীঠ-সমন্বিত সমুদয় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরীদেহ।"

ভূদেব ও মধুসূদনের সহপাঠী ও বন্ধু রাজনারায়ণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধারূপে স্বীকৃত। তাঁর সুবিখ্যাত 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বলেছিলেন—"...আমরা নিউজিল্যাণ্ডবাসী নহি যে, একদিনেই হেট্ কোট্ পরিয়া সকলে সাহেব সাজিয়া উঠিব, ইহা ক্রীতদাসের কার্য, আমরা কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি, আমাদের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে, হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে, তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের উন্নতি

আপনারাই সাধন করিবে, হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা-আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য সুজাতির সমকক্ষ হইবে, ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, সে সভ্যতা এখনো পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, আবার আশা হইতেছে যে, হিন্দুজাতি পুনরায় প্রাচীনকালের ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা, এমন কি তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ধর্মোৎপাদ্য সভ্যতা লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই জাতীয় রচনাবলীতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধমালার পূর্বসূচনা দেখতে পাই। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উপাদানে সুসম্পূর্ণ ইতিহাস-রচনার ব্যাকুলতা আমরা বঙ্কিম-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করি। অবশ্য বঙ্কিমের ইতিহাস-চেতনা মূলত বঙ্গকেন্দ্রিক[১]—তাঁর 'বন্দে মাতরম্'-ও তো বাংলার চিত্রকল্পেই সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখেছেন—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না।"

বঙ্কিমের ইতিহাস-সচেতন দৃষ্টি বাংলা ও ভারতের ইতিহাসের পটভূমিতে সঞ্চরণ করে উপন্যাসের কবিকল্পনায় যে পরিবেশ ও চরিত্রসৃষ্টি করেছে, আমাদের জাতীয় চেতনা তার দ্বারা অনেক পরিমাণে সঞ্জীবিত।[২] এদিক থেকে বঙ্কিম-বন্ধু রমেশচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধমালায় ও ঋগ্বেদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভারতাত্মার সন্ধানী পথিক।

১ ভারত-কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি প্রভৃতি প্রবন্ধ বা 'কৃষ্ণচরিত্র' মনে রেখেও বঙ্কিমের স্বদেশচেতনায় বাংলাদেশের প্রাধান্য স্বীকার্য।

২ বঙ্কিমসাহিত্য বিবেকানন্দের ভালোভাবেই পড়া ছিল এবং সেকালের তরুণদের তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চাইতেন,

বাংলাসাহিত্যে ইতিহাসচেতনার এই পটভূমিতে স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' আর একটি স্মরণীয় সংযোজন। রামমোহনের যুগ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাদর্শের যে সংঘাত বাঙালীর মননভূমিতে দেখা দিয়েছিল, তার একটি সমন্বিত দার্শনিক রূপ আমরা 'বর্তমান ভারতের'র ছোট্ট প্রবন্ধসীমার মধ্যে বিধৃত দেখি। বস্তুত এ প্রবন্ধ-পুস্তিকাটি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের দর্শন। তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় স্বামী সারদানন্দজী এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন—"···ইহা একখানি দার্শনিক গ্রন্থ।"

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর ভারতচিন্তা প্রধানত ভারতের অন্তরের ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বামীজী তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলীতে অসংখ্যবার আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে মানবজাতির আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতীক। সুতরাং ব্রহ্মচিন্তা ও স্বদেশচিন্তা তাঁর চিন্তাজগতে একান্ত কাছাকাছি স্থান পেয়েছে। তবু ভারতবর্ষকে তিনি বিশুদ্ধ ভাববাদের দিক থেকেই বিচার করেন নি। ইতিহাসের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় চেতনার মূলসূত্র আধ্যাত্মিকতা তাঁর লক্ষ্য হলেও আধুনিকযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর পাশ্চাত্যজাতিদের সঙ্গে আদানপ্রদানেই যে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। 'ভাব্‌বার কথা'র 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটিতে তিনি দেখিয়েছেন যে, ঘটনাপঞ্জীমূলক ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভালোভাবে ভারতের ইতিহাস লেখা রয়েছে—'ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী'র মধ্যে।

বিশেষভাবে 'আনন্দমঠ' পড়তে বলতেন—এ সংবাদ পাওয়া যায় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে। বিশ্ববিবেক (২য় সংস্করণ) গ্রন্থে শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 'দেশের মুক্তিপ্রয়াসী স্বামিজী' (পৃঃ ২১৬) দ্রষ্টব্য। স্বামীজীর প্রথম বয়সের সংগীতসংকলন 'সঙ্গীতকল্পতরু' গ্রন্থে 'বন্দেমাতরম্‌' গানটি সংকলিত।

ভারতের বর্ণাশ্রম-ধর্মের চার বিভাগের অনুসরণে স্বামীজী পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসকেও চারভাগে ভাগ করেছেন। "সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতে সকল সভ্যসমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে। চীন, সুমের, বাবিল, মিসরি, খল্‌দে, আর্য, ইরাণি, য়াহুদী, আরাব এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজনেতৃত্ব প্রথমযুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-হস্তে। দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজ বা একাধিকারী রাজার অভ্যুদয়।

"বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজনেতৃত্ব কেবল ইংলণ্ডপ্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য-জাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে।"[১]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুরোহিতশক্তির সঙ্গে বহুকালব্যাপী সংঘর্ষের পর শেষ অবধি রাজশক্তিরই প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ আমলে প্রাধান্য বৈশ্যতন্ত্রের। ইংরেজ আমলেই বিবেকানন্দ আসন্ন শূদ্রযুগের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। আধুনিক-কালে শ্রমজীবীদের কেন্দ্র করে সর্বত্র যে গণজাগরণের সূচনা দেখা দিয়েছে, তারই পূর্বাভাস দেখি 'পরিব্রাজকে'[২] স্বামীজীর শ্রমিক-বন্দনায়। বাংলাসাহিত্যে গণচেতনার এই অভ্রান্ত স্বাক্ষর আগামী "শূদ্রযুগে" ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা লাভ করবে। সাম্প্রতিক বৈশ্য ও শূদ্রযুগের সন্ধিক্ষণে ভারতের তথাকথিত উচ্চবর্ণ ও সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের কর্তব্য স্বেচ্ছায় সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ অধিকারকে স্বীকৃতিদান।

বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষের সমাজজীবনে যে সব পরিবর্তনমুখী আন্দোলন দেখা দিয়েছে, সেগুলি একদিকে যেমন অধ্যাত্ম-জীবনে

---

১ বর্তমান ভারত : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২২৯

২ বাণী ও রচনা : পরিব্রাজক : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১০৬

নতুন প্রাণস্পন্দন সঞ্চারিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে সমাজ-চেতনার শূন্যতা পূরণ করেছে। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ—এ সব আন্দোলন বা ব্যক্তিত্বের পিছনে তিনি ঐ এক উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছেন। সমাজ-জীবনে যখনই সমষ্টিকে ভুলে ব্যষ্টির আরাধনা শুরু হয়, অথবা কোনো সম্প্রদায়বিশেষের আধিপত্য ঘটে, তখনই বিপ্লবের শুরু—"সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"[১]

বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন—"...এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্রধর্ম- সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্যজগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজ্‌ম্‌, এনার্কিজ্‌ম্‌, নাইহিলিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির সমগ্র আয়োজন যখন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত, সেই সময়ে বিবেকানন্দ যে গণ-সংযোগের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, আজকের বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ সেকথা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। এই গণচেতনার অভাবেই আমাদের নবজাগরণ অসম্পূর্ণ। আজকের দিনেও গণশিক্ষার একান্ত তুচ্ছ আয়োজন দেশহিতৈষীমাত্রেরই গভীর বেদনার কারণ।

মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের নেতৃত্বের উত্থানপতন সম্বন্ধে এ যুগের নেতৃবৃন্দের বিশেষভাবে স্মরণীয় বিবেকানন্দের এই সাবধান-বাণীটি—

"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহু-বলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ।

---

১ বর্তমান ভারত : 'বাণী ও রচনা' : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৮

২ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪১

যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা, যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়।"[১]

ইংরেজরাজত্বের বৈশ্যশক্তি একদিন এই ভুল করেছিল। পৃথিবীর যেসব দেশে শূদ্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে হয়, সে সব দেশেও এই ভুলের পুনরাবৃত্তি চলেছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা বর্তমান ভারত কতখানি গ্রহণ করবে তারই উপর ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাবনা নির্ভরশীল।

ইংরেজরাজত্বের মূল স্বরূপটি বিশ্লষণ করতে গিয়ে স্বামীজী বাস্তব ইংলণ্ডের পরিচয় বিশ্লেষণে কয়েকটি উপমাত্মক চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন—"ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী*—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"[২] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অবধি ইংরেজের রাজদণ্ড যে আসলে বণিকের মানদণ্ডই ছিল—একথা সর্বজনবিদিত। ইংরেজশোষণের নির্মম ইতিহাস স্বামীজী গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। তবু এই পরাধীনতার যুগেও ইংরেজশাসনের দ্বারা যে কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রথমত, "...এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র" এদেশে এর আগে কখনো দেখা যায় নি। দ্বিতীয়ত, "এই বিজাতীয় ও

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪২, ২৩১

* রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৩৭-১৯০১ সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রাণী ছিলেন। স্বামীজীর বক্তব্য ভিক্টোরিয়া নামে রাণী হলেও আসল রাণী হলেন ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যলক্ষ্মী অথবা বাণিজ্যসূত্রে লব্ধ সঞ্চিত স্বর্ণ। স্বর্ণ ও সুবর্ণাঙ্গী শ্রী এখানে একার্থক। তবে রাণী ভিক্টোরিয়ার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমাধুর্য তাঁর রাজত্বকালে রাজতন্ত্রকে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছিল।

প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসঙ্ঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে।"[১]

এই নবজাগরণের উচ্ছ্বাসে হয়তো জাতীয় জীবনে বা ব্যক্তিগত আচার-আচরণে ভুলভ্রান্তি দেখা দিতে পারে, কিন্তু নির্বিবাদে পূর্বগামীদের অনুসরণ করে যাওয়াও তো মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। সে কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে মানবাত্মার চিরস্বাধীনতায় বিশ্বাসী বিবেকানন্দ বলেছেন—"যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না। প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। ···মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন।···দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?"[২]

সমকালীন ইংরেজশাসনে একটি দুর্বলতা স্বামীজী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—পাছে ভারতবর্ষ হাতছাড়া হয় এই ভয়ে সেকালের ইংরেজরা "ইংরেজ জাতির গৌরব" সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছিল। আসলে এ মনোভাব দুর্বলতারই নামান্তর।

অপরপক্ষে সমকালীন 'শিক্ষিত' ভারতীয় মানসের দ্বন্দ্ব অনুভব করে স্বামীজী মন্তব্য করেছেন—"একদিকে পাশ্চাত্যসমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্মবলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ।"[৩] এই দুই সভ্যতার পারস্পরিক ভাববিনিময়ের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যারা বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীর ভাষা ও বেশভূষা অবলম্বনকেই উন্নতির চরমসীমা জেনে দরিদ্র, অজ্ঞ স্বদেশ-

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৪

৩ তদেব : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৬

বাসীকে তুচ্ছ মনে করতেন বা এখনও করেন, তাদের উদ্দেশে স্বামীজীর অসংশয় মন্তব্য—"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?"[১]

ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ-আমেরিকা পরিভ্রমণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বিবেকানন্দ এই ধ্রুব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, "...পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে।"[২] সুতরাং অনুকরণ নয়, স্বীকরণ; আর সেই স্বীকরণের জন্য আত্মানুসন্ধান। বর্তমান ভারতের উদ্দেশে বিবেকানন্দের এই আত্মস্থতার বাণীতেই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পরিপূর্ণতা।

বাংলাসাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি স্বদেশপ্রেমের দীপ্ত অনুভূতির উদাহরণ অজস্র। তবু 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদে বিবেকানন্দের ভারতপ্রেম প্রজ্ঞা ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের মিলিত সৌন্দর্যে যে মন্ত্রোচ্চারণের মহিমা লাভ করেছে, তার অনন্যতার কথা স্মরণ করে সে অংশটি পাঠকদের কাছে আবার নিবেদন করি—

"হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেববেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার

১, ২, বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৮, ২৪৯

স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"[১]

* * *

'বর্তমান ভারতে'র চিন্তাবীজ যে ১৮৯৬ সাল থেকেই স্বামীজীর অন্তরে অঙ্কুরিত হতে থাকে, শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা ঐ বছরের ১লা নভেম্বরের পূর্বোদ্ধৃত পত্রটি তার প্রমাণ। স্বামীজীর দৃষ্টিতে সভ্যতার স্বরূপ-বিশ্লেষণের সংহত ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ই এ পত্রের শেষাংশে রয়েছে। এই বক্তব্যকেই 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনাকালে স্বামীজী সম্প্রসারিত করেছেন।

তবে 'বর্তমান ভারতে' তাঁর বিষয়বিন্যাসে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমদিকে তিনি সংক্ষেপে বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগ থেকে মুসলমান এবং ইংরেজ শাসনের যুগ অবধি চতুর্বর্ণ-প্রথার আলোকে ভারত-ইতিহাসের চারটি যুগকে পর পর স্থাপন করেছেন। তারপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারবর্ণের শাসনকালে প্রত্যেক যুগের গুণ ও দোষ বিশ্লেষণান্তে সেই সেই যুগের বৈশিষ্ট্যের বিশদ আলোচনা করেছেন।

তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষে বা পৃথিবীতে তখনও শূদ্রযুগের পূর্ণ আবির্ভাব হয় নি। কিন্তু স্বামীজীর মননলোকে সমাজতাত্ত্বিকের দূর-প্রসারী দৃষ্টি আসন্ন শূদ্রযুগকে নিশ্চিত সম্ভাবনারূপে গ্রহণ করেছে। 'সমাজতন্ত্র' যে মানবসভ্যতার সমস্ত ব্যাধির উপশম, এমন কথা মনে না করলেও বেদান্তের আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত বলেই সর্বমানবের সহজাত সাম্য স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত, বিশেষ শ্রেণীর সুবিধাভোগের অবসান তাঁর অবশ্যই কাম্য।

এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর কনিষ্ঠ সহোদর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের শেষ-জীবনের অতিমূল্যবান গ্রন্থ 'স্বামী বিবেকানন্দে' বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ও সেযুগের আরো কিছু তরুণের সঙ্গে ঢাকায় স্বামীজীর সাক্ষাৎকারের

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৯

(১৯০১) বিবরণের অংশবিশেষ স্মরণীয়—"...ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা স্বামীজী যেন স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন : 'হ্যাঁ, পৃথিবীর শূদ্রদের অভ্যুত্থান ঘটবে। সামাজিক গতিশীলতার নির্দেশই এই, সেই হলো শিবম্। নতুন পৃথিবী গঠনের জন্য সমগ্র প্রাচ্যভূমিতে নবজাগরণ ঘটবে, আজ দিবালোকের মতো তা স্পষ্ট। চেয়ে দেখো চীনের ভবিষ্যৎ, মহান্ অভ্যুত্থান এবং তার অনুসরণে সমগ্র এশিয়ার দেশসমূহের জাগরণ।'

"আমি বিনীতভাবে বললাম, তিনি কীভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছো না, আমি ...পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ছায়া প্রত্যক্ষ করছি।...তোমরা আমার কাছ থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে যাও, শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ভারত।"[১] উদ্ধৃত পত্রাংশের ভাষা অবশ্য ঠিক স্বামীজীর ভাষার মতো নয়। স্মৃতি থেকে বিধৃত এই বক্তব্যের সমধর্মী বক্তব্য আমরা আগেই পেয়েছি বলে এই স্মৃতিকথনকে ভাবের দিক থেকে প্রামাণ্য বলা চলে।

* * *

১৮৯৯-এর জানুয়ারিতে (মাঘ, ১৩০৫) 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় ৬ষ্ঠ সংখ্যা থেকে 'বর্তমান ভারত' প্রকাশিত হতে থাকে। ঐ বৎসরই ১৫শ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয় 'বিলাতযাত্রীর পত্র'—স্বামীজী তখন দ্বিতীয়বার য়ুরোপ-যাত্রার পথে। বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগের পটভূমিকায় 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' (বিলাতযাত্রীর পত্র) রচনা দুটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ঐ বৎসরই জুন মাসে

---

১ 'স্বামী বিবেকানন্দ' : ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : 'জাতীয় ভাবাদর্শ'-অধ্যায় : পৃঃ ৩২৯ : এ প্রসঙ্গে ভগিনী ক্রিষ্টিনের স্মৃতিতে রাশিয়া অথবা চীনে জন-জাগরণের ইঙ্গিত সম্বন্ধে আলোচনা স্মরণীয়। এ-গ্রন্থের 'বিবেকানন্দ : মনন ও সাহিত্য' অধ্যায় : পৃঃ ১১ দ্র

স্বামীজীর বিদেশযাত্রা। সুতরাং 'বর্তমান ভারতে'র কিছু অংশ বিদেশ থেকেই 'উদ্বোধনে' প্রেরিত। 'পরিব্রাজকে' এর একটু রসমধুর উল্লেখও আছে। "যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু ভায়া উদ্বোধন-সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক ক'রে তুলতেন! আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে!" তু-ভায়া অর্থাৎ স্বামীজীর সঙ্গী স্বামী তুরীয়ানন্দ সেদিন Sea-sickness বা সমুদ্রযাত্রার অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

'বর্তমান ভারত' সমগ্র গ্রন্থটি একসঙ্গে লেখা হয় নি, এটা ঠিক। কিন্তু মূল বক্তব্য তাঁর কাছে স্পষ্ট থাকায় ধীরে ধীরে সেই বক্তব্যকে ভারত ও জগতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিন্যস্ত করতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নি। সুদূর অতীতের বৈদিক যুগ থেকে আগামী যুগের গণশক্তির জাগরণ অবধি সমগ্র মানবসভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার তাঁর এই নিগূঢ় তাৎপর্যময় মননগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু সে ইতিহাসে তাঁর প্রধান লক্ষ্য বিভিন্ন দেশে ও কালে সাধারণ মানুষের অধিকার। ইতিহাসকে তিনি ক্ষমতাশালীদের উচ্চমঞ্চ থেকে না দেখে সমস্ত ক্ষমতার উৎস বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের স্তর থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), ক্ষত্রিয় (রাজা) বা বৈশ্য (ব্যবসায়ী)—এই সব সভ্যতার শেষ লক্ষ্য সভ্যতার ধারক ও বাহক 'মানুষে'র কাহিনী। এতকালের বঞ্চিত এই সাধারণ মানুষ (ভারতবর্ষে যাদের পরিচয় 'শূদ্র') তাদের শ্রমজীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়েই সভ্যতার পরিচালনা-ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী তাই বিবেকানন্দের দ্বারাই এদেশে প্রথম উচ্চারিত হতে পেরেছে।

পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিক ও নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক মতগুলির সঙ্গে স্বামীজীর যে একালে ভালই পরিচয় ছিল, সেকথা এ প্রসঙ্গে যেমন

স্মরণীয়, তেমনি মনে রাখা দরকার যে তাঁর দৃষ্টিতে অধিকার-সাম্যের মূলেও বেদান্তচিন্তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল। এ প্রসঙ্গে লণ্ডনে প্রদত্ত তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা Vedanta and Privilege (বেদান্ত ও বিশেষ অধিকার) থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি—"বিশেষ সুবিধাভোগের ধারণাটি মানুষের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ। দুটি শক্তি যেন অনবরত ক্রিয়াশীল—একটি শক্তি বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করছে, আর একটি তা ভেঙে চলেছে। একটি সুবিধার সৃষ্টি করছে, অন্যটি তা ভেঙে দিচ্ছে। আর যতই ব্যক্তিগত সুবিধা ভেঙে যায়, ততই সে সমাজে জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি দেখা দেয়। আমাদের চারদিকে এই সংগ্রাম চলেছে। অবশ্য প্রথমে আসে পশুসুলভ ক্ষমতার প্রচেষ্টা—দুর্বলের উপর সবলের অধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। এ দুনিয়ায় ধনের অধিকারও ঐ জাতীয়। একটি লোকের যদি অন্যের তুলনায় বেশী টাকা হয়, তাহলে সে তার চেয়ে কম টাকাওয়ালা লোকের উপর আধিপত্য করতে চাইবে। বুদ্ধিমান লোকদের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা আরো সূক্ষ্ম, আরো প্রভাবশালী। যেহেতু একটি লোক অন্যদের চেয়ে বেশী জানে শোনে, তাই সে বেশী অধিকার দাবী করে বসে। সবার শেষে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট অধিকার দাবী হলো আধ্যাত্মিক সুবিধার অধিকার। এটিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, কারণ এটির মতো পরপীড়ক কিছু আর নেই। ···বৈদান্তিক কাউকে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সুবিধাভোগী হ'তে দেবে না, একেবারেই না।"[১]

"অধিকারবাদের যদি বিশেষ কোনো দেশ থাকে, তাহ'লে সে এই দেশ, যে দেশ অদ্বৈতদর্শনের জন্মভূমি—এই দেশেই অধ্যাত্মনিষ্ঠ মানুষের এবং উচ্চবংশজাতদের বিশেষ অধিকার রয়েছে। অবশ্য অর্থগত সুযোগসুবিধা ভোগের কথা এদেশে ততটা নেই (আমার মনে হয়, এইটি ওর ভালো দিক), কিন্তু জন্ম ও ধর্মগত অধিকার ভোগ এদেশে সর্বত্র।"[২]

১ বাণী ও রচনা : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৩৩৬

২ তদেব : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৩৩৭

ভারতীয় সমাজব্যবস্থা আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়াতে যে ধন বা ক্ষমতার অহঙ্কার ততটা মাথা তুলতে পারতো না, সেটা ঠিকই। কিন্তু জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের অসারতা যত প্রমাণিত হয়েছে, ততই পাশ্চাত্যের মতো ভারতেও অর্থনৈতিক জাতিভেদ ক্রমবর্ধমান। পুঁজিবাদী যুগের অর্থনৈতিক জাতিভেদের জায়গায় সাম্যবাদী দেশগুলিতে রাজনৈতিক জাতিভেদ দেখা দিয়ে প্রচলিত সাম্যবাদের আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তাশীল মানুষকে সন্দিহান করে তুলেছে। অপরপক্ষে, ভারতবর্ষ অদ্বৈতবাদের আলোকে সর্বজীবে ব্রহ্ম-দর্শনের সত্য স্বীকার করে নিলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভেদের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বেদান্তনিষ্ঠ বিবেকানন্দ সব ধরনের বিশেষ অধিকারবাদেরই বিরোধী।

ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথার বিশেষ তাৎপর্যের কথাটি অবশ্য স্বামীজী নানাভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র —'উদ্বোধনে' প্রকাশিত শেষ কিস্তিতে এ বিষয়ে স্বামীজীর মন্তব্য— "ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ ক'রে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান ক'রব, আমাদের চেয়ে বড় ক'রব। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার; আর্যের উপায় বর্ণবিভাগ।"[১] এই বর্ণবিভাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীকে এক বৃহত্তর সভ্যতার পক্ষপুটে আশ্রয় দেওয়া।

প্লেটো তাঁর 'Republic'[২]-গ্রন্থে (ক) শাসকশ্রেণী (এঁরা 'perfect guardians' বা পরিপূর্ণ অভিভাবক'), (খ) সৈনিকশ্রেণী (এঁদের আগে 'guardians' বা অভিভাবক বলা হলেও পরে বলা হয়েছে 'auxiliaries' বা সহায়ক শ্রেণী), (গ) উৎপাদক শ্রেণী (যাঁদের প্লেটো বলছেন 'farmers' বা কৃষকশ্রেণী)—এই তিন

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২১১

২ Greek Political Theory : Ernest Barker : 1947 Edn pp 198-203

শ্রেণীতে তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রের জনসাধারণকে বিভক্ত করেছেন। শাসক শ্রেণীর মধ্যে যে 'Philosopher King' বা দার্শনিক রাষ্ট্রনায়কের কথা প্লেটো ভেবেছিলেন, ভারতবর্ষে তারই প্রতিরূপ 'ব্রাহ্মণ'-শ্রেণী।[১] অবশ্য 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি আরো গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রতীক। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এঁরা প্রত্যক্ষ শাসনদণ্ড হাতে নেন নি। ক্ষত্রিয় নৃপতি বা সামন্তদের সহায়তাই ছিল ব্রাহ্মণদের জীবিকা। একদিকে মন্ত্রিত্ব, আর এক দিকে পৌরোহিত্য—এ সব কিছুর ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মজ্ঞানের সাধনায় তপস্বী জীবনযাপনই আদর্শ ব্রাহ্মণের করণীয়।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যেত আধ্যাত্মিক প্রাধান্যের দোহাই দিয়ে পুরোহিতেরা চিরকালই সমগ্র সমাজকে হাতের মুঠোয় রাখতে চেয়েছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যোদ্ধা বা ব্যবসায়ী দল যখন রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছে, সমাজ-কেন্দ্রিক ভারতবর্ষে তখন রাজনৈতিক উত্থানপতনের অপেক্ষা না রেখেই পুরোহিততন্ত্র গণজীবনকে নিয়মিত করেছে। "চীন, সুমের, বাবিল, মিসরি, খল্‌দে, আর্য, ইরাণি, য়াহুদী, আরাব—এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগের ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত হস্তে।"[২] কিন্তু এক ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-শ্রেণীর আধিপত্য সবচেয়ে বেশী কাল স্থায়ী। হয়তো এর রাষ্ট্রগত কারণ ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা, সেইসঙ্গে দার্শনিক কারণ, ভারতীয় জনসাধারণের অধ্যাত্ম আদর্শে বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বৈদিক, বৌদ্ধ বা পৌরাণিক যুগে সমাজের শীর্ষস্থানীয় পুরোহিত বা শাসকশ্রেণী সাধারণ প্রজার

১ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় নৃপতিরা অনেকেই পরবর্তীকালে একাধারে দার্শনিক ও শাসক। পৌরাণিক যুগের রাম বা কৃষ্ণ এবং ঐতিহাসিক যুগের বুদ্ধ বা মহাবীর—এঁরা ক্ষত্রিয়বংশজাত এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধি।

২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২২৯

মতামতের কথা[১] কখনোই চিন্তা করেন নি। বরং বৌদ্ধ শাসনের কালে কিছু কিছু স্বাধীনতন্ত্র রাজ্য এদেশে ছিল এবং বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ আন্দোলন আমাদের বর্ণাশ্রম-বিভক্ত সমাজকে পরিবর্তিত করতে পারে নি। এই যুগে সমাজের শাসনব্যবস্থার মূলে হয় 'ঋষির আদেশ, দৈবশক্তি বা ঈশ্বরাবেশ', নয়তো সম্রাটের সর্বব্যাপী ক্ষমতা।

প্রাচীন শাস্ত্রের বা ঐতিহ্যের প্রামাণ্য ধরে যে শাসনব্যবস্থা তার উপর প্রজাদের সম্মিলিত ইচ্ছার কোনো প্রভাবই থাকতো না। পুরোহিততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের একান্ত প্রভাবাধীন প্রজাশক্তি, কেবল 'পালিত' ও 'রক্ষিত' হয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির কথা ভুলেই ছিল। আবার প্রাচীন যুগে রাজশক্তিও প্রধানত পুরোহিতশক্তির অধীনে। ফলে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে গণশক্তিকে পদানত রাখা পুরোহিতদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদকারী ভারতের ক্ষত্রিয় নৃপতিবৃন্দ। রামায়ণ মহাভারতের রাজর্ষি জনক, রাজা রামচন্দ্র, শস্ত্র ও শাস্ত্রে সমান নিপুণ কৃষ্ণ—এঁদের মধ্যে ক্ষত্রিয় নেতৃত্বের চিহ্ন। ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতিও ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব। "বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাটগণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর ভারত সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান।"

পুরোহিত ও রাজশক্তির দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাসে "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমানবপ্রতিভা" বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একদিকে ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অখণ্ড জাতীয়চেতনার সূত্র-ধারণ, আর একদিকে মহত্তম অধ্যাত্মচিন্তার আলোকে ভারতবাসীর

---

১ 'যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য শূদ্রেরও গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, সীতার বনবাসের জন্য গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে'।—এ জাতীয় বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা অবশ্য স্বামীজী উল্লেখ করেছেন। বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২২২-২৩

চিরন্তন ধর্মসাধনার উত্তরাধিকার 'গীতা' সৃষ্টি—এ দুয়ের দ্বারাই কৃষ্ণ-চরিত্র ভারত-ইতিহাসে অনন্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক এই চরিত্রের কথা ইতিহাসচেতনার পক্ষে এইজন্যই আবশ্যিক যে প্রাচীনভারতের মূল ইতিহাস আছে পুরাণগ্রন্থের অন্তর্লোকে।

বৌদ্ধযুগের অবসানের পর পুনরভ্যুত্থিত হিন্দুচেতনার যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিল পরস্পরের সহায়ক। কিন্তু পুরাকালের তপস্যা, মৌলিকতা, জীবনীশক্তি সবই তখন গতপ্রায়। তার ফলেই সহস্র বিবাদবিচ্ছিন্ন ভারতরাষ্ট্রে ইসলামের রাজশক্তির অনুপ্রবেশ।

মুসলমানরাজত্ব মূলত ক্ষত্রিয় আদর্শের রাজত্ব। পুরোহিত এবং রাজা—ইসলামশাসনে একব্যক্তি। এই একচ্ছত্র প্রতাপের ফলেই বৌদ্ধ সম্রাটদের সমতুল্য সর্বব্যাপী শাসনদণ্ড নিয়ে মুসলমান বাদশাহদের দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠা। মুসলমানশক্তির অভ্যুদয়ের আগে এদেশে বৌদ্ধ প্রভাব নিরস্ত হয়ে কুমারিলভট্ট থেকে শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রভৃতির প্রচেষ্টায় বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দুশক্তির নব-জাগরণের প্রচেষ্টা দেখা দিলেও রাজনৈতিক সিদ্ধির দিক থেকে তা বিশেষ সাফল্য লাভ করে নি। কিন্তু শঙ্করাচার্যের মনীষাকে কেন্দ্র করেই হিন্দুর দার্শনিক চিন্তা এক বিশেষ রূপান্তর লাভ করে।

মুসলমান রাজত্বের অবসানে ইংরেজ-শাসনে 'বণিকের মানদণ্ড'ই মূলত শাসনকর্তা। তাই এই যুগটি স্বামীজীর মতে "বৈশ্যযুগ।" সমকালীন বৈশ্যযুগ অবধি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে স্বামীজী তাঁর পরিকল্পিত ঐতিহাসিক বিভাগের প্রতিটি পর্বের গুণ ও দোষের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোম্‌ত্‌ যাকে পৌরাণিক বা আধ্যাত্মিক যুগ বলেছেন, বিবেকানন্দ যে যুগকে পুরোহিত যুগ বলেছেন, সে যুগের প্রধান লক্ষণই জগৎরহস্যের বুদ্ধি ও কল্পনাগত সমাধানপ্রচেষ্টা। ফলে পরা ও অপরা—আধ্যাত্মিক ও পার্থিব দুই ধরনের জ্ঞানচর্চারই সূত্রপাত পুরোহিতপ্রাধান্যের যুগে। স্বামীজীর ভাষায়—"পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম

বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পশুবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার বিকাশ। পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহ-পরলোকের সংযোগ-সহায়, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু। বহু কল্যাণের প্রথমাঙ্কুর তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভূত···।"[১]

এদিক থেকে বিচার করলে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ তার অধ্যাত্ম অন্বেষণের বিশেষ ভূমিকা নিয়ে কম-বেশী সব সমাজেই ছিলেন ও থাকবেন। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের সর্ববিধ অধিকারহরণের অপপ্রয়াস দেখা দেয়, "যেখানে শক্তির আধার বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে বা অন্যান্য মানসিক প্রয়োগবিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে।"[২] সুতরাং জড়বাদী দার্শনিকেরা যখন মন্ত্রতন্ত্র জাদুবিদ্যা প্রভৃতিকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এক করে দেখেন, তার মূলে পুরোহিতদেরও দায়িত্ব থাকে। শাস্ত্র বা পুরাণের কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োজন নেই। ফলে, সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে নানা কূট-কৌশল ও অপযুক্তির দ্বারা সমাজকে শৃঙ্খলিত করা সহজ। কিন্তু এইভাবে দেশ ও জাতিব্যাপী অজ্ঞতার অন্ধকার পুরোহিতদেরও আচ্ছন্ন করতে থাকে। অন্যকে ভোলাতে গিয়ে দেশাচার ও লোকাচারের শৃঙ্খলে পুরোহিতেরা নিজেদেরই আবদ্ধ করে ফেলেন।

পুরোহিতযুগের আলোচনাতে স্বামীজী একটি চিরন্তন সামাজিক সত্য আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন—"শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধির সঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩২

২ তদেব

জন্য শিক্ষা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে সে সমাজ নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"[১] বলা বাহুল্য, পুরোহিতেরা ভারতবর্ষে সে চেষ্টা অতি অল্পই করেছেন। স্বামীজীর রচনাবলীতে তাই পুরোহিতদের উদ্দেশে নির্মমতম ভর্ৎসনা বারংবার উচ্চারিত। সমকালীন ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক সুবিধাবাদের দোহাই দেওয়ার বিপক্ষে তাঁর এই সাবধানবাণীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

* * *

পুরোহিত-শক্তির পরে স্বামীজী ক্ষত্রিয়শক্তির দোষগুণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, স্বামীজী নিজেকে কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় বলে গৌরববোধ করতেন। ভারতের চিরন্তন আদর্শ 'ব্রাহ্মণ' তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আপন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যক্তিত্বে। এক হিসাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শক্তির মিলনের প্রতীক নয় কি?

পাশ্চাত্য সাহিত্য যাকে Age of Heroes বলা হয়, স্বামীজীর "ক্ষত্রিয় যুগ" অনেকটা সে-জাতীয়। সভ্যতার উন্নয়নের যুগ এই ক্ষত্রিয় নরপতিদের আধিপত্যকাল। গ্রামীণ সভ্যতা এই যুগে নগরমুখী। রাজশক্তিকে কেন্দ্র করে সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও অন্যান্য বিদ্যার বহুমুখী বিকাশ এই যুগেই দেখা দেয়। সমাজমানসকে বাল্য কৈশোর অবস্থা থেকে যৌবনে উপনীত করে এই রাজতন্ত্র। কিন্তু এই রাজতন্ত্রেই প্রজার অধিকার সবচেয়ে সঙ্কুচিত।

ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় নৃপতিদের আদর্শ অবশ্য অন্যান্য দেশের রাজতন্ত্রের চেয়ে আলাদা। এ দেশের অনেক রাজর্ষিই একাধারে বীর ও দার্শনিক। প্লেটোর 'Philosopher King' (দার্শনিক নৃপতি) এর আদর্শ এদেশেই বোধ করি সবচেয়ে সার্থকতা পেয়েছে। যাঁরা ঠিক এ-জাতীয় ন'ন, তাঁরাও অনেকেই রাজত্বের শেষভাগে স্বেচ্ছায়

১ বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৫

বানপ্রস্থ ও পরে সন্ন্যাস নিয়ে দর্শন ও ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করেছেন। "ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজগণ অন্তে অরণ্যাশ্রয়ী হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা—উপনিষদ, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রচারিত।"[১] কোম্‌ত্‌ পৌরাণিক যুগের পরবর্তী দার্শনিক যুগের কথা বলেছেন। একদিক থেকে স্বামীজীর "ক্ষত্রিয়যুগ" সেই দার্শনিক যুগ।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজকুলকাহিনীতে ভারতীয় নৃপতিদের মতো বৈরাগ্যের নিদর্শন মেলে না, এ আদর্শ বিশেষভাবে ভারতীয় জীবনদর্শনের সৃষ্টি। ভারতীয় চতুরাশ্রমে জীবনের পূর্ণতাসাধনের চরম অভিব্যক্তিরূপে সন্ন্যাসের আদর্শ। বুদ্ধদেবের প্রভাবে পরবর্তীকালে এই সন্ন্যাস জীবনের সর্বক্ষণের আদর্শেও পরিণত হয়েছে। কিন্তু, মানবমনস্তত্ত্বসম্মত জীবনশিল্পের বিচারে ভারতীয় চতুরাশ্রমের (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস) আদর্শই যে সাধারণ মানুষের পক্ষে অধিকতর সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রাজশক্তির প্রাধান্যের সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসে পুরোহিতেরা প্রায় সব সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বী। মধ্যযুগের খৃষ্টধর্মের ইতিহাসেও রোমের পোপ ও য়ুরোপের রাজশক্তির দ্বন্দ্ব-প্রসঙ্গ এ দিক থেকে স্মরণীয়। বৌদ্ধ বা মুসলমান যুগে পুরোহিত-প্রাধান্যের প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই পুরোহিতেরা সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা নিজেদের প্রাধান্য রাখতে চেয়েছে।

অপরপক্ষে রাজশক্তি-নিয়ন্ত্রিত প্রজাসাধারণও চিরকালের মতো নির্বিবাদে প্রভুত্ব স্বীকার করতে পারবে না। স্বামীজীর বক্তব্য— " 'প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশক্তি কি সে ষোড়শবর্ষ কথনই প্রাপ্ত হয় না?

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৬

ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।"[১]

সুতরাং প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে শাসন ও শাসিতের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। স্বামীজীর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালির জাতীয় জাগরণ এবং ভারতের সিপাহীবিদ্রোহ—এ সব ঘটনাই অল্পবিস্তর সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসক-শ্রেণীর সংগ্রামের প্রতীক।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই সংগ্রামচেতনার কথা স্মরণ করেই কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্ ১৮৪৮-এ প্রকাশিত Manifesto of the Communist Party (কম্যুনিস্ট পার্টির ইস্তাহার) পুস্তিকায় ঘোষণা করেছিলেন—'A spectre is haunting Europe—the spectre of Communisum.' (সারা য়ুরোপে আজ এক ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছে—কম্যুনিজ্‌মের ধূমকেতু।)[২] প্রাচীনকাল থেকে শ্রেণীসংগ্রামের নজির দেখিয়ে আধুনিককালে সে সংগ্রাম যে বুর্জোয়া ও প্রোলিতারিয়েতের (শোষক ও সর্বহারা শ্রেণীর) সংগ্রামে পরিণত সেকথা এ-গ্রন্থে ঘোষিত। আধুনিকতম সাম্যবাদী আন্দোলনের মূলভিত্তি এই পুস্তিকায়ই স্থাপিত। সর্বহারাদের একনায়কত্বের যে ভবিষ্যদ্বাণী মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌স্ করেছিলেন তার সঙ্গে বিবেকানন্দের এ মন্তব্য তুলনীয়—"...এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে...।"[৩]

ইংরেজী সাহিত্যে মার্ক্‌স্-এঙ্গেল্‌সের এ ইস্তাহার অনূদিত হয় ১৮৫০ সালে অর্থাৎ স্বামীজীর জন্মকালের এগারো বৎসর আগে। সমকালীন য়ুরোপের রাজনীতি সম্বন্ধে প্রখরভাবে সচেতন বিবেকানন্দ

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৭

২ Marx Engels : Selected works : Vol I ; Moscow : 1958

৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪১

কিন্তু কোথাও মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের নাম করেন নি। কিন্তু তাঁদের এই রচনাটি বা অন্য কোনো রচনা বা তাঁদের মতবাদের কথা—কিছু না কিছু তাঁর পক্ষে জানা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের মতো শ্রেণীসংগ্রামের সরলীকরণ স্বামীজী করেন নি। বরং একথাই মনে হয় যে শূদ্রের আধিপত্যসত্ত্বেও সমাজ-গঠনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা তিনি স্বীকার করেছেন এবং এদের ইতিমূলক দিকটির সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ সভ্যতার পরিকল্পনা করেছেন। প্রসঙ্গত পূর্বোল্লেখিত স্বামীজীর কুম্ভকোণম্‌ বক্তৃতাটিও স্মরণীয়। মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌স্‌ যে শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা করেছেন, তা যেমন আদর্শবাদী কল্পনা, বিবেকানন্দের সর্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ দিকগুলির সমন্বয়ের কল্পনাটিও সেই জাতীয় আদর্শবাদী কল্পনা বলে বিবেচিত হতে পারে।

কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসকে স্বামীজী যে ভাবে অনুধাবন করেছিলেন, সেদিক থেকে মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের জড়বাদভিত্তিক চিন্তা-ধারা মূলত সমর্থনযোগ্য নয়। মার্ক্‌সের নিজস্ব বক্তব্য আংশিকভাবে উদ্ধৃত করে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

নীতি, ধর্ম, ঐতিহ্য প্রভৃতির ধারণা যে মূলত অর্থনৈতিক বনিয়াদের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে, সেকথা বোঝাতে গিয়ে মার্ক্‌স্‌ লিখেছেন—"The phantoms formed in the human brain are also, necessarily, sublimates of their material life-process, which is empirically verifiable and bound to material premises. Morality, religion, metaphysics, all the rest of ideology and their corresponding forms of consciousness, thus no longer retain the semblance of independence. They have no history, no development; but men, developing their material production and their material intercourse, alter, along with their real existence, their thinking and the products

of their thinking. Life is not determined by consciousness. but consciousness by life."[১]

মার্ক্‌স্‌ মানবচৈতন্যকে যে স্তর থেকে দেখেছেন, বিবেকানন্দ তার চেয়ে লক্ষগুণ গভীরে অধ্যাত্মসত্যের আলোকে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু বাস্তবজীবনক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে বিবেকানন্দ ও মার্ক্‌সের চিন্তাধারায় মিলটুকুও লক্ষণীয়। পৃথিবীর ইতিহাস যে শাসক ও শোষিতের চিরসংগ্রামকাহিনী সেকথা দু'জনেই স্বীকার করেন এবং শ্রমজীবী সভ্যতার আসন্ন আবির্ভাব সম্বন্ধে দু'জনেই নিশ্চিন্ত। তবু বলবো—তুলনামূলক বিচারে 'এহ বাহ্য।'

ভারতের ইতিহাস-বিশ্লেষণকারী বিবেনানন্দ লিখেছেন—"ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে রাজনৈতিক অভাবের পূরণ।[২] তুলনামূলকভাবে য়ুরোপে খৃষ্টধর্মের বিস্তারও এই কারণে। কিন্তু খৃষ্টধর্মের ত্যাগ, তপস্যা, আধ্যাত্মিকতার চেয়ে গ্রীক মানবিকতাই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণধর্ম।

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের স্তরে স্তরে পূর্বগামীদের চিন্তা ও আচরণের দৈন্য পরবর্তীদের দ্বারা সংশোধিত। শাস্ত্রশাসিত যুক্তিবিহীন মানসিকতার বিরুদ্ধে একদা জড়বাদী চার্বাকপন্থীরা এগিয়ে এসেছিলেন। জৈন এবং বৌদ্ধদের অহিংসা ও জাতিভেদবিরোধী মনোভাব হিন্দুধর্মের বহুল পরিবর্তন সাধন করেছে। আবার বৌদ্ধ অবক্ষয়ের যুগে এসেছে শঙ্কর ও রামানুজের মতো জ্ঞান ও ভক্তির ধারণীশক্তি। কবীর, নানক, চৈতন্য, আর্যসমাজ বা ব্রাহ্মসমাজ—এঁরা সকলেই মূল ভারতীয় চিন্তাধারার বিস্তার ও সংরক্ষণে সহায়ক।

১ The German Ideology

২ ও রচনা : পৃঃ ২৩৭

কিন্তু ধর্মান্দোলনের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও জীবন-জিজ্ঞাসার রূপায়ণে ভারতের বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন বা বিপ্লব ভারতবর্ষের এতকালের পন্থা ছিল না। আধুনিক যুগের কর্মপন্থায় এই ধর্মচেতনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বলা যায়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় ভারতের সেই সনাতন ও অদ্যতন সমস্যার মিলিত উত্তর। মানবজীবনের বিকাশের স্তরে অর্থনীতির নিজস্ব প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েও স্বামীজীর ভাষায় বলা যায়, "টাকায় মানুষ করে না। মানুষেই টাকা করে।" আর সে মনুষ্যত্বের অর্থ আত্মোপলব্ধির শক্তিসম্পন্ন মানুষ। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক মানদণ্ডে পরমসত্যের মূল্যায়ন প্রচেষ্টা শেষ অবধি সীমাবদ্ধ হ'তে বাধ্য। মার্ক্স্ যে 'বাস্তব' মানুষকে তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন, সে মানুষ অধ্যাত্মসংকেতরূপে বিবেকানন্দের কাছে 'নরনারায়ণ'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞরূপে তাঁর কাছে ঈশ্বরই প্রতীয়মান। বলা বাহুল্য, ভারতীয় চেতনার পক্ষে এ আদর্শই ঐতিহ্যসম্মত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য।

মার্ক্স্ যে শ্রেণীহীন সমাজ বা আদর্শ সাম্যবাদী সভ্যতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা অন্তত সাম্যবাদী দেশগুলিতে পূর্ণ সত্য নয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেদেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজেদের ব্যবধানের প্রাচীর সযত্নে রক্ষা করেন। পুরানো বুর্জোয়ার জায়গা নেন বিশেষদলের ছোট বড় দলপতিরা।

অপরপক্ষে বিবেকানন্দ মনে করতেন বিভিন্ন শ্রেণী চিরকালই রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সদ্‌গুণগুলির সমন্বয়ে এক নূতন আদর্শসমাজ করে তুলতে হবে। সুতরাং জগতের ইতিহাসে যতই বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রাম কাহিনী থাকুক না কেন, বিবেকানন্দের লক্ষ্য সমন্বয়।

* * *

বৈশ্য যুগের বিশদ আলোচনায় আসবার আগে স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন—"সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব। এ অনন্ত সত্য—জগতের

মূল ভিত্তি।”[১] “বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য ; একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।”[২]

বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় ও রাজশক্তিকে অর্থবলে নিয়ন্ত্রিত করতে বণিকেরা সদাসচেষ্ট—এবং সেই সঙ্গে শ্রমজীবীদের শোষণ করে চির-পদদলিত রাখা তাদের স্বার্থ। তবু বণিক-সভ্যতার গুণের দিক হলো বিশ্বমৈত্রীর প্রসার। “‘বণিক কোন দেশে না যায়?’ নিজে অজ্ঞ হইয়াও ব্যাপারের অনুরোধে একদেশের বিদ্যাবুদ্ধি, কলা-কৌশল বণিক অন্যদেশে লইয়া যায়।”[৩] এইভাবেই বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, বিদ্যা ও সম্পদ বিশ্বময় বিস্তারিত হয়। ইংরেজ আমলের বৈশ্যযুগেই ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ।

সাধুভাষায় নিগূঢ় ব্যঙ্গসৃষ্টিতে স্বামীজীর দক্ষতার একটু নমুনা এই বৈশ্য মনোবৃত্তির বিশ্লেষণে লক্ষণীয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যের মূলে বিদ্যা ও অস্ত্র। তার পরের যুগে এলো বৈশ্যের দল, তাদের বক্তব্য— “…‘অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং’ তোমরা যাহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত শক্তিমান্ আমার হস্তে। দেখ ইঁহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান্। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি—ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইঁহার কৃপায় আমার অভিমত সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানা-সকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ—তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে? আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।”[৪]

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৮
৩ তদেব : পৃঃ ২৪০
৪ তদেব : পৃঃ ২৩৯

ভবিষ্যতে এই শূদ্রেরাই যে পৃথিবী পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে, এ বিষয়ে স্বামীজী নিশ্চিন্ত হয়েই পরবর্তী আলোচনায় শূদ্রজাগরণ-প্রসঙ্গে উপনীত। শূদ্রযুগের বিশ্লেষণে স্বামীজী কয়েকটি মৌলিক চিন্তাসূত্র তুলে ধরেছেন—

(ক) ইংরেজ-অধীনে ভারতবর্ষে আত্মনির্ভরতাহীন ভারতবাসী মাত্রই শূদ্র।

(খ) য়ুরোপে শূদ্রজাতির জাগরণের অন্তরায় বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন শূদ্র বা শ্রমিক কৃষক সহজেই অভিজাত সমাজে উন্নীত হয়ে নিজের সমাজ ত্যাগ করে।

ভারতেও একদা বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, নারদ, দাসীপুত্র সত্যকাম বা ধীবরজননীর পুত্র ব্যাস এঁরা ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয়ে নিজের সমাজ ত্যাগ করেছিলেন।

(গ) আধুনিক ভারতবর্ষে জন্মগত জাতিভেদের ফলে তথাকথিত নিম্নবর্ণের প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা নিজের সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে শূদ্র-জাগরণে সহায়তা হয়।

(ঘ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মতো বৈশ্যেরাও সমাজের সম্পদ পুঞ্জীভূত করে শূদ্র বা শ্রমিকদের অধিকার হরণে উদ্যত। "এই স্থানে এ শক্তির মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"[১]

(ঙ) স্বার্থরক্ষার জন্যই অন্যের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আবার আপন স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রতি বিদ্বেষও পৃথিবীর ইতিহাসে নানাদেশের উন্নতির কারণ। গ্রীস, রোম, আরব স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি সবদেশেরই আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান, কার্থেজ, কাফের, মূর, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতি একান্ত বিদ্বেষ তাদের উন্নতি ও সংহতির মূল।

এক্ষেত্রে জাতিবিদ্বেষ ও শ্রেণীবিদ্বেষ—এ দুয়েরই বিশেষক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা স্বামীজী স্বীকার করেছেন। তাই শূদ্রপ্রসঙ্গে শ্রমিক

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৩

ও ধনপতিদের লড়াই এবং শূদ্র ভারতের সঙ্গে বৈশ্য ইংরেজের লড়াই এই দুই লড়াইয়েরই ব্যঞ্জনা স্বামীজীর বক্তব্যে পরিস্ফুট।

ইংরেজের সঙ্গে এই সংঘাতমূলক মনোভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা বঙ্কিমও তাঁর বিখ্যাত "জাতিবৈর" নিবন্ধে লিখেছিলেন—"...আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে।...বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে—স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।"[১]

(চ) সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির পদানত হওয়ার চেয়ে প্রজাতন্ত্র-নিয়মিত রাজশক্তির পরাধীনতা আরো দুর্বহ। তুলনীয় রোমান সম্রাটদের অধীন জাতিদের অবস্থা ও ভারতের অবস্থা।[২]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজশাসন আত্মগৌরবঘোষণায় ব্যস্ত, সেইসঙ্গে ভারতবাসীর অন্তরে হীনমন্যতা সঞ্চারে সচেষ্ট। বিবেকানন্দ মনে করিয়ে দিয়েছেন এই বৃথা গৌরব-ঘোষণায় ইংরেজ শাসনের বিশেষ কোনো সহায়তা হবে না। বরং ভারতবাসীর কল্যাণসাধনে অগ্রসর হলেই ইংল্যাণ্ডেরও কল্যাণ।

বলা বাহুল্য, অর্থগূঢ় সংস্কৃতপ্রধান এই গদ্যরীতির আবরণ ভেদ করে জাতিবৈর ও শ্রেণীবৈরের যে ইঙ্গিত রয়েছে, তা সেকালের শাসক সম্প্রদায়ের উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিল না। 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী যে কেবল ভারত-ইতিহাসের মননমূলক চর্চাই করেছেন তা নয়, প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও আসন্ন বৈশ্য-শূদ্র-সংঘাতের কথাও ঘোষণা করেছেন।

১ বঙ্কিমরচনাবলী (২য়) : সাহিত্যসংসদ সংস্করণ : পৃঃ ৮৮৪-৮৫
২ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৫

কিন্তু মার্ক্‌স্‌বাদী চিন্তাধারায় যে চিরন্তন বিপ্লবের (Permanent Revolution) কথা রয়েছে, সে-জাতীয় কোনো সিদ্ধান্ত স্বামীজীর রচনায় পাই না। শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের সঙ্গে তাঁর বৈদান্তিক মননজাত বিশেষ অধিকারবর্জনের আদর্শের তুলনা চলে—এই মাত্র।[১]

* * *

'বর্তমান ভারতে'র শেষ পর্যায়ে এসে সমকালীন ভারতবাসীর মানসিক দ্বন্দ্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘাত উপলব্ধি করে বিবেকানন্দ জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের পুনর্বিচারে জাতিকে আহ্বান করেছেন। 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে 'স্বদেশমন্ত্রে'র মর্যাদা লাভ করেছিল। 'হে ভারত! ভুলিও না'—শীর্ষক এই গদ্য অনুভূতির আগ্নেয় উত্তাপে এমন এক মহামন্ত্রধ্বনিসৌন্দর্য লাভ করেছে যার তুলনা বাংলাসাহিত্যে বিরল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্ব আজ অতিক্রান্ত। যথার্থ স্বাধীনতার যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর আজও অপেক্ষিত, সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিক থেকে স্বামীজীর ওই স্বদেশমন্ত্র অনুধ্যানের সার্থকতা আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

'শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য'-সম্ভাবনার কথা স্বামীজী নিশ্চিত জানতেন। ইতিহাসস্রষ্টার সেই ক্রান্তদর্শী মন্তব্য এদেশে ও বিদেশে নানাভাবে সত্য হতে চলেছে। কিন্তু স্বামীজী বিশেষভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে একথাও বলেছিলেন, 'পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রেই এদেশে নিষ্ফল হইবে।' সেকথা একালের রাজনৈতিক

১ এ প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তের 'বিবেকানন্দের সমাজদর্শন' গ্রন্থ, 'বিবেকানন্দ শিলাস্মারক গ্রন্থে' প্রকাশিত লেখিকার 'ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিচারে স্বামী বিবেকানন্দ', 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লেখিকার 'স্বামীজীর সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা'; ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়ের 'দি ফিলজফি অফ ম্যানমেকিং' ('The Philosophy of Man making's) গবেষণা-গ্রন্থ; এবং 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী সোমেশ্বরানন্দের 'নতুন পৃথিবীর সন্ধানে মার্ক্‌স্‌ ও বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ—কৌতূহলী পাঠকেরা অবশ্য দেখবেন।

দলগুলির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয় কি ? এ প্রশ্নও আজকের দিনে স্বাভাবিক যে, যে শ্রমজীবীদের যুগ আমরা আজ স্থাপন করতে চাই, তা কেবলমাত্র রাশিয়া, চীন বা অন্য কোনো দেশের বিপ্লবের অনুকরণে হবে, না ভারতীয় ইতিহাসের প্রাণধর্মই স্বাভাবিক বিকাশের এই শ্রম-কেন্দ্রিক সভ্যতাকে সফল করে তুলবে ? স্বামীজী তো বলেছেন—'এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম'।

কিন্তু গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী পাশ্চাত্যের কোনো দেশই ধর্মকে এতটা প্রাধান্য দেয় নি, বরং সমাজতন্ত্রী দেশের চিন্তাধারায় ধর্ম অনেকটা আফিমের নেশার মতো পরিত্যজ্য। 'ধর্ম' শব্দটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আধুনিক মানুষের মনে স্বভাবতই সংশয় দেখা দেয়। "মানব অন্তরের নিহিত পরিপূর্ণতার বিকাশসাধনই ধর্ম"—স্বামীজীর এই সংজ্ঞা জড়বাদী সভ্যতার কাছে স্বীকৃত নয়।

স্বামীজী তাঁর জীবনব্যাপী ভারত-সাধনায় উপনিষদ থেকে ধর্মের প্রধান প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন 'অভীঃ'-মন্ত্র। তাই মানব-জীবনের সমস্ত পর্যায়ে তিনি ধর্মের প্রয়োগ দেখতে চেয়েছিলেন—"Vedanta must come out, must remain not only in the forest, not only in the cave, but······must come out to work at the Bar and the Bench, in the Pulpit, and in the cottage of the poorman, with the fisher-men that are catching fish, and with the students that are studying."[১]

"বেদান্তের তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না, তাকে বাস্তবজীবনে কার্যকরী রূপ নিয়ে দেখা দিতে হবে বিচারালয়ে, উপাসনাগারে, দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, মৎস্যজীবীর জাল ফেলায়, ছাত্রের অধ্যয়নে।" স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ উপাস্য 'above all God the poor in all races'—সব 'জাতির দরিদ্রতমদের মধ্যে রয়েছেন যে নারায়ণ!' তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসী—"...This Vedanta can

১. Lectures from Colombo to Almora : 5th Ed. : p 160

be carried into over everyday life, the city life, the country life, the national life and the home life of every nation."[১] "আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গ্রামীণ, নাগরিক, জাতীয় জীবনে, এমন কি প্রত্যেক জাতির ঘরে ঘরে এই বেদান্তের আদর্শ রূপায়িত করা যায়।"[২]

স্বামীজীর চিন্তাধারা অনুসরণে বলা যায় প্রেম, শান্তি ও সৌভ্রাত্র্য যদি রাজনীতির লক্ষ্য হয়ে থাকে, ধর্মেরও কি সেই একই লক্ষ্য নয়? আসলে 'রাজনীতি'র নামে আমরা কি 'ধর্মনীতি'র কথাই বলি না? স্বামীজীর ধর্মচেতনা মানুষের নিবিড় আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধনে। এই ধর্মবোধ শুধু ভারতের নয়, জগতের কল্যাণে অবশ্য প্রযোজ্য। যে ধর্ম শাস্ত্র বা মহাপুরুষের নামাবলী ধারণ করে অর্থ, সম্পদ বা শোষণে মগ্ন তা কোনোকালেই ধর্ম নয়। ধর্মের বিকৃতিই আফিম হতে পারে, কিন্তু যে ধর্মের আহ্বানে বুদ্ধ, যীশু, নানক, চৈতন্য বা রামকৃষ্ণের মতো সর্বত্যাগী অথচ বিশ্বপ্রেমিক মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে, সে ধর্ম মানবচৈতন্যের সমস্ত শুভপ্রয়াসের প্রেরণাদাতা। ধর্ম যদি আফিম হয়ে থাকে, তবে অবস্থাভেদে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি,—এ সবই আফিম হয়ে উঠতে পারে। যা কিছু আমাদের সত্যদৃষ্টির নিরপেক্ষতাকে আচ্ছন্ন করে তাই আফিম। ভাষান্তরে স্বামীজী আমাদের সাবধান করতে চেয়েছিলেন অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণের আফিম সম্বন্ধে।

'বর্তমান ভারতে'র শেষ স্তবকটিতে স্বামীজী ঘুরে ফিরে 'ভুলিও না' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি কি অনুমান করেছিলেন যে, একদিন ভারতবর্ষ ঠিক ওই কথাগুলিই ভুলতে বসবে? আশ্চর্য নয়! আমরা বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসেও আবার যে দ্বিগুণ বেগে পাশ্চাত্যের অশন, বসন, সাহিত্য, শিল্প, 'হাঁচি ও কাশি' অনুকরণ

---

১ Practical Vedanta : 3rd ed : pp 12-13

২ এ প্রসঙ্গে 'বিশ্ববিবেক' দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মূল্যবান প্রবন্ধ 'বিবেকানন্দের বেদান্ত' দ্রষ্টব্য।

করে সভ্যতার ধ্বজাধারী হতে চাইবো—এ হয়তো তাঁর দূরদৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল!

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'নানা চর্চা' বইটিতে 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে তুলনামূলক আলোচনার শেষে মন্তব্য করেছেন—"বর্তমান ইউরোপের মনে প্রাচীন হিন্দুধর্মের ছোপ লাগবার কোন সম্ভাবনা নেই। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা একথা ইউরোপের কানে ঢুকবে না। বর্তমান ইউরোপের মেটেরিয়ালিজ্‌ম্‌ই নবীন এশিয়ার মনকে মুগ্ধ করতে পারে। কারণ এ মেটেরিয়ালিজ্‌ম্ দার্শনিক মেটেরিয়ালিজ্‌ম্ নয়, ব্যবহারিক মেটিরিয়ালিজ্‌ম্।" বাস্তবিক পাশ্চাত্যসভ্যতার ব্যবহারিক দিকটি আমাদের সহজেই মুগ্ধ করে। ফলে আমরা জড়বাদী চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতার কথা সহজেই ভুলে যাই। অবশ্য ভারতীয় বৈরাগ্যধর্মের আদর্শ যে য়ুরোপকে একেবারেই স্পর্শ করে নি একথা বলা যায় না। কিন্তু সে তুলনায় পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রাধান্য ভারতে অনেক বেশী।

'ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ'—স্বামীজীর এই সাবধানবাণী-প্রসঙ্গে এ যুগের নারীপ্রগতির কথা সহজেই মনে জাগবে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় নারীর যে সমানধর্মা হবার আকাঙ্ক্ষা তা ভারতীয় নারীজীবনে একহিসাবে বেশী পরিমাণেই সফল হয়েছে। তবু জায়া ও জননীরূপে যে নৈতিক পবিত্রতার আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর নামোচ্চারণে স্বামীজী প্রকাশ করেছেন—সব দেশের নারীসমাজেই তা আকাঙ্ক্ষিত। এদিক থেকে সাধারণভাবে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা কতদূর অগ্রসর তা সন্দেহের বিষয়। বরং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নারীজীবনের নিষ্ঠা ও শুচিতার মহিমা বেশী বলেই আমাদের ধারণা। দাম্পত্যজীবনের যে একনিষ্ঠ অতন্দ্র সাধনা তার দ্বারাই ভবিষ্যৎ সন্তানের মাধ্যমে যে মঙ্গলময় সমাজসৃষ্টি সম্ভব—একথা ভারতবর্ষের যুগযুগবন্দিতা ওই নারীত্রয়ের মাধ্যমে সুপ্রমাণিত। তবু প্রশ্ন এই—আমরা কি সে আদর্শে অবিচল থাকতে পেরেছি?

'উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর'—ভারতের আদর্শ গৃহী ও

আদর্শ সন্ন্যাসী। কিন্তু তিনি সর্বত্যাগী। যাঁরা সর্বমানবের অন্ন-বস্ত্রের অধিকারগত সাম্যের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দেন তাঁদের ত্যাগ যেমন মহিমান্বিত, তেমনি আবার যাঁরা মানবচিন্তার সর্বোচ্চসত্যের জন্য সর্বস্বত্যাগ করেন তাঁদের ত্যাগও পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী। স্বামীজীই তো ভারতের একটি কুকুর পর্যন্ত যতদিন অভুক্ত থাকবে ততদিন মুক্তির সামান্যতম আকাঙ্ক্ষাও বিসর্জন দিয়েছিলেন। দুরারোগ্য কর্কটরোগে মৃত্যুশয্যায় শয়ান শ্রীরামকৃষ্ণ মানবের অধ্যাত্ম-কল্যাণের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর অমৃতবাণী বিতরণ করে তাঁর শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে গেছেন।

বিবাহ, ধনসম্পদ, ইন্দ্রিয়সুখ—আজকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রধান ভারতবর্ষে এ সবই প্রধানত আত্মসর্বস্বতার প্রয়োজনে। এককালের ভারতবর্ষ সমাজকেন্দ্রিক ছিল, সে সমাজের ভঙ্গুরদশায় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের অভিমান ও যন্ত্রণা—দুইই সমাজের চারদিকে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অতিরিক্ত সামাজিক নিপীড়ন আর উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিসত্তার যথেচ্ছাচার—এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোনো পন্থা নিশ্চয় আজ আমাদের প্রয়োজন। স্বামীজীর ভাষায় "স্বার্থই স্বার্থত্যাগের শিক্ষক।" ইন্দ্রিয়সুখের জন্যই চাই পরিমিত ইন্দ্রিয়চর্চা। আবার ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের জন্য চাই ইন্দ্রিয়মগ্নতার অবসান।

ভারতের লক্ষ্য ছিল পরমসত্যের অভিমুখী। তাই জীবনযাপনকে আমরা উপায় বলে জেনেছি। এখনো উদ্দেশ্য বলে মনে করি নি। বিবাহের প্রয়োজন তাই কল্যাণের আবির্ভাব কামনায়। কুমার-সম্ভবের পটভূমিকা গৌরীর তপস্যা। ভারতের আদর্শ গৃহী, আদর্শ প্রেমিক উমানাথ শঙ্কর তাই সর্বস্বত্যাগী। সংসার বা সন্ন্যাস—কিছুই এ ভারতে বৈরাগ্যের বাইরে নয়। অর্থ, পদ, দেহসুখ—এদের যে দাস হয়েছে সত্য তার কাছে স্বতঃই আবৃত। সে আবরণ যতই হিরণ্ময় হোক, তাকে অপাবৃত না করে আমাদের মুক্তি নেই।

"তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"—স্বামীজীর এই নির্দেশবাণী-ই কি শত শত বিপ্লবীর অন্তরে সেযুগে প্রেরণার আগুন

জ্বালিয়ে তোলে নি? কিন্তু এ আহ্বান শুধু স্বদেশজননীর উদ্দেশে আত্মদানের আহ্বানই নয়, পরমসত্যের জন্য আমরা যে সবাই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হয়ে চলেছি—এ শুধু সেই কথাটি আমাদের অন্তরে ধ্বনিত করে দেওয়া। মহাবলি ছাড়া মহাপূজা সম্পন্ন হয় না। তাই জীবনের চরম উত্তর লাভের জন্য আমরা বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায়েই আত্মোৎসর্গের জন্য নির্বাচিত। অর্থাৎ বলিপ্রদত্ত। "জীবনের যতো মহত্তম উপলব্ধি—তারা সব কি বেদনার পাত্রটি তিক্ততম রসে পূর্ণ হয়ে ওঠার মুহূর্তেই ধরা দেয় নি? সর্বরিক্ততার বুক-ভাঙা কান্নার মুহূর্তেই কি আমরা প্রেমের বিজয়ীমূর্ত্তিতে পরমতমের দর্শন লাভ করি নি?"[১]

'নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর'—তারা যে আমাদেরই রক্ত, আমাদেরই ভাই—একথা যে বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছিলেন তিনি কোনো সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক প্রবক্তা বা উচ্চমঞ্চের দেশনেতা নন। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলেই সমাজের সর্বস্তরে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশতে পেরেছেন এবং আসমুদ্র হিমাচল পদব্রজে পরিক্রমান্তে রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে পর্যন্ত ভারতের সত্য পরিচয় উপলব্ধি করেছেন। শ্রেণীহীন সমাজপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, তাঁরাও সাম্যবাদী সমাজে নেতা বা পরিচালকগোষ্ঠীর ভূমিকায় এসে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েন। বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ মানুষের সর্বপ্রকার privilege বা বিশেষ অধিকারভোগের বিরোধী। আর একথাও তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণদের শূন্যে বিলীন হওয়ার দিন সমাগত।

দরিদ্রনারায়ণের পূজারী বিবেকানন্দ ভারতের ভবিষ্যৎ কী ক্রান্তদর্শী দৃষ্টি নিয়ে ছবির মতো প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেকথা ভারত-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে প্রমাণিত হতে চলেছে। আজ আর এ বিষয়ে

১ Kali the Vision of Shiva: Kali, the Mother: Sister Nivedita [অনুবাদ: লেখককৃত] এ রচনাটি মূলত স্বামীজীর বাণী, নিবেদিতার লেখনীতে সংহত কাব্যরূপ লাভ করেছে মাত্র।

কোনো সংশয়েরই কারণ নেই যে, আসন্ন নেতৃত্বের জন্য, নূতন ভারত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শ্রমিক ও কৃষকের অভ্যুত্থান। কিন্তু শ্রমের সার্থকতা কোনখানে? জীবনের লক্ষ্য কোন পথে? অন্নবস্ত্র শিক্ষার সাম্য শেষ অবধি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করবে কোন আত্মিক অধিকারে? একদিকে স্বামীজী আমাদের মনে রাখতে বলেছেন—'তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র'—জীবের মধ্যে সেই অনন্ত সত্যের প্রতিফলন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, আর একদিকে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত নব ভারতের মন্ত্রবাণী—'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে!' 'গুরুজীর জয় হোক!'

শিখ খালসা সৈনিকের ঐ উৎসাহবাণী ও রণসঙ্কেত তাঁর অধ্যাত্ম আদর্শেরই বিজয়বার্তা। ভারতের নবযুগে সাধারণ মানুষের নেতৃবৃন্দের আত্মত্যাগ, কর্মকুশলতা, নেতৃত্বের সঙ্গে প্রয়োজন ঐ আধ্যাত্মিক চরিত্রশক্তিতে অটলপ্রতিষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ভগবান লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।" সে ভগবান বা ব্রহ্মতত্ত্বকে বিবেকানন্দ ছাত্রের অধ্যয়নে, শ্রমিকের কর্মপ্রেরণায়, গৃহীর সংসারসাধনায়, যোগীর গুহানিহিত ধ্যান-তন্ময়তায় সর্বত্র সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। অধ্যাত্মলক্ষ্যহীন সাম্যবাদী প্রেরণার অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিধ্বস্ত রূপ দেশে বিদেশে আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ তার দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞ, সব শ্রেণীর মানুষকে মহত্তম সত্যের আলোকে অভিষিক্ত করে এই বাণীই ঘোষণা করবে—'ওয়াহ্ গুরু কী ফতে'।

ভ্রমণকথা ঃ পরিব্রাজক

'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশের মাস দুয়েক পরে স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকা-যুরোপ-পরিক্রমারত। মনপ্রাণ পড়ে আছে ভারতের কর্মপদ্ধতির উপর—নানাজনকে নানা ভার দিয়ে এসেছেন—তার মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত (সারদা) মহারাজের উপর 'উদ্বোধন' পত্রিকার দায়িত্ব। পত্রযোগে বাংলা ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকা-সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ আসে। এইকালের তেমনি এক নির্দেশ—"সারদা বলে, কাগজ চলে না।···আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত খুব advertise (বিজ্ঞাপন) ক'রে ছাপাক দিকি—গড় গড় করে subscriber (গ্রাহক) হবে। খালি ভটচায্যিগিরি তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ করে!"[১]

নিজের রচনাশক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস না থাকলে এ জাতীয় নির্দেশ কেউ দিতে পারেন না। 'বর্তমান ভারতে'র দুরূহ ভাষা ও চিন্তনের খুব কাছাকাছি সৌন্দর্যতন্ময় কবিহৃদয়ের স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা নিয়ে দেখা দিল স্বামীজীর 'বিলাতযাত্রীর পত্র'—পরে যা 'পরিব্রাজক' নামে রূপান্তরিত। মূলত পত্রাকারে রচিত হলেও বিশ্বসভ্যতার প্রাঙ্গণে পরিক্রমারত বিবেকানন্দমানস কীভাবে সমকালীন জগৎ ও জীবনের মর্মপরিচয় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে,

১ 'উদ্বোধনে'র আর্থিক সমস্যাপ্রসঙ্গে স্বামীজী এই পত্রে আরো লিখছেন—"যাহোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। টাকাকড়ি বিদ্যাবুদ্ধি, সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আনব। আবার লেখাও আমার সব—তোমরা কি করবে?···একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই। এক লাইন লিখবার ······ক্ষমতা কারুর নাই—সব থামকা মহাপুরুষ।···আমি কাজ চাই। মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট করে যা খাড়া করেছি, তা একরকম চলছে।" বাণী ও রচনা: ৮ম খণ্ড: পৃঃ ৬৩: ১০ই আগস্ট, ১৮৯৯ তারিখে লেখা চিঠি।

তার অভিনব দৃষ্টান্ত এই 'পরিব্রজক' সমকালীন পাঠকসমাজে কতখানি বিপুল আগ্রহ সঞ্চার করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রথমবারের বিদেশযাত্রায় যে নবীন উৎসাহে পাশ্চাত্যসভ্যতার বিপুল কর্মবেগ স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল, দ্বিতীয়বারের যাত্রায় সে মুগ্ধতা কেটে গিয়ে নিরপেক্ষ বিচারের প্রশান্ত মনন প্রাধান্য পেয়েছে। পাশ্চাত্যের সহস্র গুণের প্রশংসাসত্ত্বেও ভারতীয় আদর্শের মানদণ্ডে এখন বিশ্বসভ্যতার সার্থকতাবিচার।

'পরিব্রাজকে'র পূর্বনাম 'বিলাতযাত্রীর পত্র'। নামটি সাধারণ হলেও গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উপযোগী ছিল। 'পরিব্রাজক' নামকরণের সঙ্গে যে ভারতভ্রমণরত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দণ্ডধারী মূর্তি আমাদের কল্পনালোকে দেখা দেয়, তার সঙ্গে জাহাজযোগে ভ্রমণকারী বিলিতি পোশাকপরা বিবেকানন্দের বাহ্যত কোনো মিল নেই। কিন্তু গ্রন্থারম্ভেই সন্ন্যাসীর ভক্তি ও বৈরাগ্যমণ্ডিত হৃদয়টি প্রকাশিত—"স্বামীজী! ওঁ নমো নারায়ণায়—'মো'কারটা হৃষীকেশী ঢঙে উদাত্ত কোরে নিও ভায়া।" এর একটু পরেই লিখেছেন—"রাম কহো! কোথায় তোমার সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ চঙ মসলা বার্ণিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কি না আবল তাবল বকচি। ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে। এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বল।"

বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহজাত নিরাসক্তি এখানে সূক্ষ্ম হাস্যরসের আভাসে পরিস্ফুট। এই নিরাসক্ত দৃষ্টি 'পরিব্রাজকে'র সর্বত্র জীবনের পরিহাসদীপ্ত মণি-মাণিক্য অনুসন্ধান করে ফিরেছে। তবু প্রাণের গভীরে রয়েছে ভারতসংস্কৃতির যুগযুগান্তবাহী অধ্যাত্মচেতনার ঐতিহ্য —'সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ;' —তাই পরিব্রাজক ভারতের সাধনার বাণী বহন করে চলেছেন; আর দেশবাসীর উদ্দেশে জগতের বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদ সরলতম ভাষায় বিতরণ করেছেন। হুগলী নদীতে চড়া পড়ার ইতিহাস, জাহাজ-শিল্পের ক্রমবিবর্তন, সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম, এডেনের

ইতিবৃত্ত, আরব ও মিশরীসভ্যতার কাহিনী, নৃতাত্ত্বিক আলোচনা, প্রাচীন দক্ষিণ ভারত (পণ্ট) ও মিশরের সম্ভাব্য যোগাযোগ, বাবিল সভ্যতা, ইহুদীধর্ম ও বাইবেল, যীশুখৃষ্টের ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত নিপুণ বর্ণনায় সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে এই জ্ঞানভিক্ষুর সজীব আগ্রহ আমাদের মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে একথাও মনে হয়, আধুনিক কালের পণ্ডিতমণ্ডলী সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য আলোচনায় এই সহজ ভঙ্গীটি গ্রহণ করলে বাংলা-সাহিত্য কতো সমৃদ্ধ হতে পারে।

বিবেকানন্দমনীষাপ্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো তাঁর স্নাতকপর্ব (বি. এ.) অবধি। কিন্তু সমস্ত জীবনই তিনি নানা বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি আগ্রহশীল। বক্তৃতা ও সেবাধর্মের সহস্র ব্যস্ততা সত্ত্বেও যখনই অবসর পেয়েছেন স্বামীজী তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারটি নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। 'পরিব্রাজক' বা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' অতি সহজকথায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের বিবরণ থাকায় এমন কথা মনে করার কারণ নেই যে বিষয়গুলিও জলবৎ। বরং যে কোনো একটি আলোচনার আনুপূর্বিক উপস্থাপনা-টুকু অনুধাবন করলে দেখা যাবে বহুদিনের সঞ্চিত পঠন ও মননের সমাবেশেই এমন বিস্তৃত অথচ গভীর আলোচনাভঙ্গী সম্ভবপর।

উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করি—"আবার এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কতদিন আগে থেকেও হিন্দুধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দক্ষিণ মুলুকেই—সামনে টিকি, নারকেল-তেলখেকোজাত—শঙ্করাচার্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই মধ্বমুনির জন্মভূমি। এঁদেরই পায়ের নিচে বর্তমান হিন্দুধর্ম। তোমাদের চৈতন্যসম্প্রদায় ও-মধ্বসম্প্রদায়ের[১] শাখামাত্র; ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাদু, নানক, রাম সনেহী প্রভৃতি সকলেই; ঐ রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি

১ এ বিষয়ে একালের পণ্ডিতেরা একমত হবেন না।

দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণ দেশেই—যখন উত্তর ভারতবাসী 'আল্লা হু আকবর, দীন দীন' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন ঠাকুর দেবতা স্ত্রীপুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, [তখন] রাজচক্রবর্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণদেশেই সেই অদ্ভুত সায়ণের জন্ম—যাঁর যবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্করাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়মার্গে দাক্ষিণাত্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা, যাঁর আশ্চর্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ 'পঞ্চদশী' গ্রন্থ সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়ণের এই জন্মভূমি। মাদ্রাজ সেই 'তামিল' জাতির আবাস, যাদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের সুমের নামক শাখা 'ইউফ্রেটিস'-তীরে প্রকাণ্ড সভ্যতাবিস্তার—অতি প্রাচীনকালে—করেছিল, যাদের জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি, আচার বিচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি, যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল, যাদের আর এক শাখা মলবর উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যাদের কাছে আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা বীর-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করছে। এই যে এতবড় বৈষ্ণবধর্ম—এও এই 'তামিল' নীচবংশোদ্ভূত শঠকোপ হ'তে উৎপন্ন, যিনি 'বিক্রীয় সূর্পং স চচার যোগী' এই তামিল আলওয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন। এখনও এদেশে বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট বা অদ্বৈত—সমস্ত মতের যেমন চর্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এখনও ধর্মের অনুরাগ এদেশে যত প্রবল ; তেমন আর কোথাও নাই।"[১]

পরিব্রাজকজীবনে স্বামীজী দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ-অঞ্চলের যুবকদের কাছেই আনুগত্য ও সমর্থন সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে দ্রাবিড় সভ্যতার বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা যেমন ঐতিহাসিক দৃষ্টির ফল তেমনি দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা-

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৮৪-৮৫

কালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারও সঞ্চয়। উত্তরকালে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে তিনি আর্য ও তামিল (Aryans and Tamilians)[১] নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাতে পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিতদের ভারতে আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সংঘাত সম্বন্ধে কাল্পনিক মতবাদের নিরসনই তাঁর লক্ষ্য। দ্রাবিড় সভ্যতার সর্বপ্রাচীন সূত্র তামিল সভ্যতা সম্বন্ধে স্বামীজীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর অখণ্ড ভারত-চেতনায় সার্থক নিদর্শন। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে ভারত ও বিশ্বসভ্যতায় তামিলদের দান এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের অন্তরেতিহাসে তামিল সভ্যতার বিশিষ্ট ভূমিকার কথা কতো সংহত আকারে কী বিপুল তথ্যরাশি ধারণ করে আছে, সেইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আজীবন জ্ঞানচর্চায় উৎসাহী এই তাপসের পঠনরীতি সম্বন্ধে একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ তখন মীরাটে। নানা যোগাযোগে তাঁর তপস্বী গুরুভাইদের মধ্যে আরো ছ'জন সেখানে এসে মিলেছেন। "স্বামীজীর অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রতিদিন স্থানীয় পুস্তকাগার হইতে স্যার জন্ লাবকের গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড লইয়া আসিতেন, এবং পরদিবসই ফেরত দিয়া বলিতেন যে, ঐ গ্রন্থ স্বামীজীর পড়া হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থাগারিক ইহা বিশ্বাস করিতেন না, এবং ভাবিতেন ইহা লোক-দেখানো পড়ার ভানমাত্র। ইহা জানিতে পারিয়া স্বামীজী স্বয়ং একদিন পুস্তকাগারে উপস্থিত হইয়া গ্রন্থাগারিককে বলিলেন, "মহাশয়, আমি সব কয়খানি বই-ই আয়ত্ত করেছি। আপনার সন্দেহ হলে আপনি যে কোন বই থেকে যে কোন প্রশ্ন করে দেখতে পারেন।" তখন কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া এবং সমুচিত উত্তর পাইয়া গ্রন্থাগারিক বুঝিলেন, তিনি ভুল করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আশ্চর্যের সীমা রহিল না—ইহাও কি সম্ভব? পরে অখণ্ডানন্দজী এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, এ আপনি কি করে করলেন?" তাহাতে স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কখনও কোনো বই প্রতিটি শব্দ

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৭৭ ; বর্তমান লেখককৃত অনুবাদ।

ধরে পড়ি না। আমি গোটা একটা বাক্য ধরে পড়ি, এমন কি, একটা প্যারা ধরেও পড়ে যাই যেমন নাকি ছবির কলের সামনে একসঙ্গে একখানি বহু বর্ণের চিত্র ভেসে ওঠে।"[১] স্বামীজীর জীবনে এনসাইক্লোপিডিয়া পাঠের ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনার নজির মেলে।

এই বিস্তৃত অধ্যয়নের ফলে বিশ্বসভ্যতার তুলনামূলক এক চিত্রধারা স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সব গ্রন্থেই লক্ষণীয়। 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধে তাঁর বিখ্যাত সিদ্ধান্ত 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—এই বিশ্বসভ্যতার তুলনামূলক বিচারের মূল কেন্দ্র। ভারতের আদর্শগত সমুচ্চমহিমার পাশাপাশি বর্তমান পতনের গভীরতার আলোচনা থেকে স্বামীজী কিন্তু নৈরাশ্য পোষণ করেন নি কখনো—বরং ভারতমহিমার অভ্যুদয় সম্বন্ধে তাঁর আস্থা প্রবলতর হয়েছে। একি শুধু পরাধীন জাতির মানস-প্রতিক্রিয়া অথবা অধ্যাত্মদিব্যদৃষ্টির অমোঘ সত্যলাভ—ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তার উত্তর দেবে। আপাতত রাশিয়া ও চীনে গণজাগরণ সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমরা মনে রাখতে পারি।

* * *

ভ্রমণকাহিনীর কাছে পাঠকের দাবি লেখকের চোখে দেখা ও অদেখা জগতের সৌন্দর্য দর্শন। বিবেকানন্দের সৌন্দর্যদৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে "পরিব্রাজক" বিশেষভাবে স্মরণীয়। "মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফল খাওয়ার"[২] কথা বললেও বহুরূপে পরমসত্যের প্রকাশ যিনি দেখেছেন তাঁর দৃষ্টিতে বাংলার সজল শ্যামলিমা, নদী ও সমুদ্রের তরঙ্গিত শোভা, দেশ দেশান্তরের রূপ ও রীতি—এ সব কিছুই আপন স্পর্শ রেখে গেছে।

"হৃষীকেশের গঙ্গা"র "নির্মল নীলাভ"[৩] কান্তি বা অনন্তশষ্প-শ্যামলা সহস্র স্রোতস্বিনীমাল্যধারিণী"[৪] বাংলার জলময়রূপ বা সবুজের হাজারো রকমারি ভেদের কথা "বাংলা গদ্যের চলতি রূপ ও

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ : ১ম খণ্ড : স্বামী গম্ভীরানন্দ : পৃঃ ২৯৬-৯৭

২, ৩, ৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬০, ৬১-৬৪

স্বামী বিবেকানন্দ" অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। স্বামীজীর সৌন্দর্য-চেতনার আরো একটি উদাহরণ আমরা মনে করতে পারি। যেমন ধরুন, স্বামীজীর জাহাজ যখন বঙ্গোপসাগরে এসে পড়ল তখন যেন জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজী তাঁর পার্শ্ববর্তী কাউকেই বলছেন—"কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীল জল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ'। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহাগর্জন বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে!"[১]

সমুদ্রযাত্রায় রঙের পরিবর্তনের খেলা দেখে যাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন, স্বামীজীর এ বর্ণনা তাঁদের কাছে যেমন পরিচিত ছবির অন্তরালে অপরিচিতের উন্মোচন বলে মনে হবে, তেমনি যাঁরা সমুদ্রে কখনো যান নি, তাঁরাও সমুদ্রের বিশাল আলোড়নের শব্দ ও বর্ণচ্ছটায় স্তম্ভিত হবেন।

রঙের নেশায় বিবেকানন্দের সৌন্দর্যচেতনা যে কী গভীরে ডুব দিয়েছে তার সেরা উদাহরণ গঙ্গাতীরে বঙ্গভূমির শ্যামলিমা বর্ণনাচ্ছলে স্বামীজী যখন লিখছেন—"বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি,—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"[২] শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিটি এ নেশার স্পর্শ পেলে ধন্য মনে করবে।

শিল্পরসিক স্বামীজী যখন ফরাসি ও জার্মান শিল্পচেতনার তুলনা-

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ : পৃ: ৬৫

২ তদেব : পৃঃ ৬৪

মূলক ছবি আঁকছেন, তখনও তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয় মনটির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—"কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস ; আর এক দিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানির স্থূলহস্তাবলেপ।···ফরাসীর বলবিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ ; জার্মানির রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর ; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্যবিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মতো—কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘর-দোর ভরিয়ে দেয় ; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো—পারার মতো ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে ; ফরাসীর নরম শরীর—মেয়েমানুষের মতো ; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা ; তার বেগ সহ্য করা কঠিন।"[১]

ফরাসী শিল্পিমানস যেভাবে বাঙালী বিবেকানন্দকে আকর্ষণ করেছে, তাতে এ দুই জাতের মানস-সাধর্ম্যের কথা সহজেই মনে জাগবে। কিন্তু বিবেকানন্দের সৌন্দর্যচেতনার আধার তাঁর দৃপ্ত পৌরুষসমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাই জাতীয় জীবনে অতি নমনীয় সুকুমার-ভাবের প্রতি বিদ্রূপবর্ষণে তিনি সিদ্ধহস্ত, অথচ দেশজ শিল্পের প্রাণশক্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। "বাঙ্গালা ভাষা" নামে তাঁর বিখ্যাত পত্রাংশটিতে ভাষাপ্রসঙ্গ থেকে শিল্পপ্রসঙ্গেও এই প্রাণচেতনার পরিচয়—"বাপরে, সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে,—"রাজা আসীৎ"!!! আহাহা ! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ !! ওসব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি ; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১২৬

ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম !! গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না ; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম !···এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে।"[১]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র শেষাংশে য়ুরোপীয় চিত্র বা ভাস্কর্যবিদ্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেকালের অতিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্মা প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য এদিক থেকে স্মরণীয়—"বড্ড জোর ওদের (ইউরোপীদের) নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায় !! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায় !! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।"[২]

ছবি-আঁকায় স্বামীজীর হাত ছিল, এমন সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর মেজো ভাই মহেন্দ্রনাথ। স্বামীজীর চিত্রবিদ্যার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমরা না পেলেও কথার ছবি আঁকায় স্বামীজীর দক্ষতার উদাহরণ তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র। তাছাড়া বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির-পরিকল্পনায় অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সীলমোহরটিতে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগের প্রতীকস্বরূপ সর্পবেষ্টিত চিত্রটির কথা তো

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৬-৩৭

২ তদেব : পৃঃ ২১৪-১৫

সুবিদিত। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কল্পনায় ছাড়া এ জাতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা চিত্রাঙ্কনের কথা জাগতে পারে না। 'পরিব্রাজকে'র পরিশিষ্ট-অংশে গ্রীক শিল্পকলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে—পরে বিস্তৃতাকারে লেখা হবে ভেবেছিলেন, তা কার্যকরী হয় নি। কিন্তু দেশ-বিদেশের শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের নিদর্শনরূপে এই নোট উল্লেখযোগ্য।

* * *

'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক' (প্রথম দিকে 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে) 'উদ্বোধন' পত্রিকায় খুব কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয়েছে। 'উদ্বোধনে'র দ্বিতীয় বর্ষে 'বর্তমান ভারত' শেষ হলেও 'পরিব্রাজক' তৃতীয় বর্ষের গোড়ার অবধি প্রকাশিত হয়েছে। 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর ভাষায় 'ভটচায্যিগিরি'—দুরূহ মননশীলতা যথেষ্ট রয়েছে, সে তুলনায় 'পরিব্রাজক' মুক্তমানসের বিশ্বভ্রমণকথা। আত্মোপলব্ধির তুঙ্গ শিখরে আসীন বিবেকানন্দের মধ্যে কোলকাতার রঙ্গরসময় তরুণটি সবসময় নিহিত রয়েছে; অথবা উচ্চতম মননেরই আর এক দিক বোধ হয় সহজ প্রাণের আনন্দলীলা। 'ভাব্‌বার কথা'র রসরচনাগুচ্ছের মতো টিপ্পনীজাতীয় গল্প বা মন্তব্য পরিব্রাজকেরও নানা জায়গায় ছড়ানো। ভ্রমণকাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতিবেগের এরা একান্ত স্বাভাবিক প্রকাশ এবং বিবেকানন্দের শাণিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কৌতুকময় লেখনীর উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

পরিব্রাজকের সূচনা থেকেই আনন্দময় বিবেকানন্দের প্রাণোচ্ছল প্রকাশ—'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের উদ্দেশে সম্বোধন—"স্বামীজী ওঁ নমো নারায়ণায়—'মো'কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত ক'রে নিও ভায়া।" ভারতীয় সন্ন্যাসী-জীবনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃষীকেশ-অঞ্চলে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের পারস্পরিক সম্বোধনের রীতিটি মনে পড়বে। 'নমো'-র মো অংশটি সেখানে খুব টেনে উচ্চারিত। কখনও একাকী, কখনও গুরুভাইদের সঙ্গে পরিব্রাজক স্বামীজীর জীবনকাহিনীও এই সঙ্গে পাঠকমনে জাগবে—অন্তত সম্পাদক ত্রিগুণাতীত নিশ্চয় মনে করেছিলেন!

'আজ সাতদিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে, খবরটা লিখবো মনে করি, খাতাপত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর—কুড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা আরও 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে করো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—রাম হৃদয়ে ব'লে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, মোটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুড়েমি। কি উৎপাত! 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ'—থুড়ি, হ'ল না 'ক্ব সূর্যপ্রভববংশচূড়ামণি রামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ' আর কোথা আমি দীন।"[১] সমুদ্র-ভ্রমণের সূচনায় অনেকেরই সমুদ্রপীড়া (Sea sickness) দেখা দেয়। ঘটনাচক্রে এই সমুদ্রপীড়াকে স্বামীজী কীভাবে কৌতুকের উপাদানে পরিণত করেছেন, 'পরিব্রাজকে'র হাস্য-রসসৃষ্টির তা অন্যতম সার্থক উদাহরণ—"জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধ'রে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।...যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া 'উদ্বোধন' সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক করে তুলতেন! আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, 'বড়ই শোচনীয়—বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে!"[২]

কলকাতার গঙ্গা যে মাঝে মাঝে জলাভাবে শুকিয়ে যেত, সে-ইতিহাস-প্রসঙ্গে স্বামীজীর সকৌতুক মন্তব্য—"আর এক রিপোর্টে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৫৯।

২ তদেব : পৃঃ ৬৬; তু-ভায়া—স্বামী তুরীয়ানন্দ।

পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বারবেলায় এইটে ঘটলে কি হ'ত তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফিরতেন না।"[১]

গঙ্গার চড়ায় চোরাবালিতে আটকে নানা জাহাজের দুর্দশার কথা বলে ভালয় ভালয় গঙ্গা পার হয়ে আসার জন্য স্বামীজী মা-গঙ্গাকে প্রণাম জানালেন। "তু-ভায়া বললেন, 'মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে'; আমিও বলি, 'তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।' পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার—কি হল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই—খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও তো আপনি খাচ্ছেন।' তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হ'ল যে—কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়; সেখানে খাবার সময় চারিদিকে ঢাক ঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটীতে যেই চুমুকটি দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই! আমি কলকেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হ'য়ো না। ভায়া যে গম্ভীর প্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল—বোঝা গেল না।"[২]

সিংহলে বৌদ্ধমন্দিরে 'সিলোনিরা দুষ্টুমি করলে নরকে তাদের কি হাল হয়' সে বিষয় নিয়ে আঁকা ছবিগুলির বীভৎসতাপ্রসঙ্গে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৬৭

২ তদেব : পৃঃ ৬৮-৬৯

—"এদিকে তো অহিংসা, আর সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র বাড়ীতে ঢুকেছে—চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া করে বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিসনি, মারিসনি ; অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' বাচ্চা-অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কি করা যায় ?' কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।' চোর জোড় হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আহা কর্তার কি দয়া!'[১] হাস্যরসের এই জাতীয় চুটকি গল্পে স্বামীজীর যেমন কৃতিত্ব, তেমনি আবার দীর্ঘ বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গপ্রিয়তা কী-জাতীয় কৌতুকরস সৃষ্টি করতে পারে তার উদাহরণ 'পরিব্রাজকে'র 'হাঙ্গর-শিকার' বর্ণনায়।[২] সমগ্র বর্ণনাটিতে এমন এক চলচ্চিত্রধর্মী প্রত্যক্ষতা আছে, যা ভ্রমণকাহিনীর ক্ষেত্রে বিশেষ সম্পদ ; সেই সঙ্গে আছে বিদগ্ধ মনের পরিহাসকুশলতা। স্থানসংক্ষেপের জন্য এ বর্ণনার সামান্য অংশমাত্র পাঠকের কাছে উপস্থিত করছি।

সেরখানেক মাংস এক 'কুয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুরদাদা[৩]-গোছের বড়শিতে গেঁথে সমুদ্রজলে হাঙরের উদ্দেশ্যে ফেলে দিয়ে যাত্রীরা সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষারত—"...আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে, ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম ; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হ'তে লাগলেন—অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো।"[৪]

প্রথম 'বাঘা' হাঙরটি বড়শি ছিঁড়ে পালাবার পর মাংসখণ্ডের লোভে 'থ্যাব্‌ড়া'মুখো দ্বিতীয় হাঙরের আগমনদৃশ্য—'আগে যান

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৮৯

২ তদেব : পৃঃ ১০০-১০৪

৩ তদেব : পৃঃ ১০১

৪ তদেব : পৃঃ ১০২

ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা'···শঙ্খধ্বনি তো শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস', আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাব্ড়া'; তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা, ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিকঝিক করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত কতদূর ছুটেছে, তা 'থ্যাব্ড়া'ই বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য —সাদা, লাল, জরদা—এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!"[১]

প্রথম বাঘা হাঙর তার বড়শি-বেঁধা অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয় থ্যাবড়ামুখো হাঙরকে কেন জানালো না সে সম্বন্ধে কৌতুককল্পনায় অনেকটা 'অ্যালিস্ ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'[২] জাতীয় কল্পনার আভাস— "আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান ক'রে দিত। নিশ্চিত ব'লত, 'দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি করছি, কত রকম জানোয়ার—জ্যান্ত, মরা, আধমরা—উদরস্থ করেছি, কত রকম হাড় গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-টুকরো পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম!! এই দেখ না—আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে'—ব'লে একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান করে আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীন-বয়সসুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ মাছের পিত্তি, কুঁজো ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ বনৌষধির কোন না কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে,

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১০৩

২ অ্যালিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড—লুই ক্যারোলের এ বইটি স্বামীজীর বিশেষ প্রিয় ছিল।

কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতএব যতদিন না কোন প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হবে, ততদিন সে ভাষা ব্যবহার কেমন করে হয়?—অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই 'থ্যাব্‌ড়া'কে আসল খবর কিছু না ব'লে, মুচকে হেসে, 'ভাল আছ তো হে' ব'লে সরে গেল।—'আমি একাই ঠকবো?"[১]

'বাঘা' চরিত্র সম্বন্ধে শেষ অনুমানটি মানবচরিত্র-বিশ্লেষণে নিপুণ অন্তর্দৃষ্টি ও বঙ্কিম কটাক্ষের সংমিশ্রণে উচ্চাঙ্গের রসসৃষ্টি। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মিশ্রিত স্বাদে স্বামীজীর মন্তব্য-কণা 'পরিব্রাজকে'র সর্বত্র ছড়ানো থাকায় ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে বিশ্ব-ইতিহাস-প্রসঙ্গ অনেক পরিমাণে সরসতা লাভ করেছে। যেমন ধরুন সিংহলের অধিবাসীদের বর্ণনা—"···ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বলবে না, বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো—ঘাগরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমানুষি চেহারা। আবার—রোগা-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম শরীর! এরা রাবণ কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে—বাঙলাদেশ থেকে এসেছিল তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইত পারেন না, আর ভূমিষ্ঠি হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাঁসেন হোঁসেন করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে।"[২]

উনবিংশ শতাব্দীর আর্যামির মোহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ কেউই ব্যঙ্গকটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তবে স্বভাবতই স্বামীজীর ব্যঙ্গ আরো তীব্র। 'ভাব্‌বার কথা'র গুড়্‌গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্যের কথা স্মরণ করে 'পরিব্রাজকে'র—'আর্যামি'-প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে—"এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১০২-১০৩

২ তদেব : পৃঃ ৮৮

আর্য। তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চায় পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ-কাঁচ্চা। তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য! আর শুনি, ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমী নন। এ দেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মতো। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পরদা ইত্যাদি ইত্যাদি—ও-সব ওঁদের ধর্মে আদৌ নাই। ও-সব ঐ কায়েত-ফায়েতের বাপ-দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতো। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজের মতো ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল!"[১]

পাশ্চাত্যের বিশেষভাবে ইংরেজের অনুকরণে যাঁরা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পছন্দমতো যুক্তিবাদ এবং ভক্তিবাদের জগাখিচুড়ি করতে চাইতেন, তাঁদের সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য—"তবে ঐ যে একদল আছে —পরের বেলা দোষটি দেখতে, যুক্তিটি আনতে কেমন তৈয়ার; নিজের বেলায় বলে, 'আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়'—তাদের কথাগুলো একদম অসহ্য। আ মরি!—ওদের আবার মন! ছটাকও নয় আবার মণ! পরের বেলায় সব কুসংস্কার, বিশেষ করে যেগুলো সাহেব বলেছে; আর নিজে একটা কিম্ভূতকিমাকার কল্পনা করে কেঁদেই অস্থির!!"[২]

বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের একটি নিজস্ব অনন্য ভূমিকা রয়েছে—সাধারণত তাঁর দর্শনপ্রাজ্ঞ ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায় সে পরিচয় আচ্ছন্ন। হাস্যরসে স্বামীজীর সহজাত নিপুণতা। তাঁর রচনায় কোনো ক্ষেত্রেই তা কষ্টকৃত বা বিকৃত রুচিসঞ্জাত নয়। অথচ প্রতিপক্ষের উদ্দেশে তাঁর ব্যঙ্গে যথেষ্ট তীব্রতা, তাঁর শ্লেষ হৃদয়বিদ্ধকারী। এও তাঁর সংগ্রামীসত্তারই আর এক দিক। নির্ভীকহৃদয় এই সন্ন্যাসী সত্য ও মঙ্গলের জন্য সব দুর্বলতা, কাপুরুষতা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৭৫
২ তদেব : পৃঃ ৯৬

ও হীনতার বিরুদ্ধে খরখড়্গ ভাষায় উজ্জ্বল হাস্যদ্যুতি বিকীর্ণ করেছেন—কোনো রকম ভাবের ঘরে চুরির সঙ্গে আপোস তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলীতে একটি বৈশিষ্ট্য পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সেটি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের অনিবার্য অমোঘ শক্তি। এই শক্তিই তাঁর বক্তব্যকে কেবল আলোচনার স্তরে না রেখে নিত্যকালের বাণী ক্'রে তুলেছে। এ-জাতীয় বাক্য বা স্তবকসৃষ্টিতে তাঁর বিধিদত্ত অধিকার। যেমন ধরুন তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উক্তি বা লেখন—

'যদি জন্মেছিস্ ত একটা দাগ রেখে যা।'

'চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না।'

'Education in the manifestation of the perfection already in man.'

'Arise! Awake! and stop not till the goal is reached.'

'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।'

'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদটির কথা আগেই আলোচিত। সেখানে যে বাক্য-পরম্পরা স্বামীজীর ধ্যানের ভারতকে সমগ্র দেশ ও জাতির পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলেছে, বিবেকানন্দহৃদয়ের বহ্নিতাপে বিগলিত সেই বাক্যধারা এক বিপুল ছন্দোবেগে পাঠকহৃদয়কে অভিভূত করে। এর সঙ্গে তুলনীয় তিনটি স্তবক আমরা 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে পাই, বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উদ্ধৃতিহিসাবে যারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সুয়েজখালে য়ুরোপ-প্রবেশের সময়ে যুগ যুগ ধরে ভারতের ধনসম্পদে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধির কথা স্বামীজীর মনে জেগেছে। "বাবিল ইরান গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর ক'রত, তা অনেকে

জানে না।"[১] ভারতের ঐশ্বর্যের মূলে তো—"ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না!"[২]

'বর্তমান ভারতে' আমরা দেখেছি বিবেকানন্দের ইতিহাসদৃষ্টি সাধারণ প্রজার জীবনধারা অনুসরণ করে বিভিন্ন যুগের উত্থানপতন বিশ্লেষণে রত। পরিব্রাজক-গ্রন্থে আসন্ন শূদ্রযুগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বিবেকানন্দ বাংলা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম শ্রমজীবীদের উদ্দেশে তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন—"হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকসান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন—তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়: কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।"[৩]

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১০৫
২, ৩ তদেব : পৃঃ ১০৬

গণজীবনের প্রতি বিবেকানন্দের এই শ্রদ্ধা ও একান্ত আত্মীয়তা তাঁর পরিব্রাজকজীবনে ভারতভ্রমণের ফল তো বটেই, সেই সঙ্গে নিখিল বিশ্বের সর্বজাতির সর্ববর্ণের দরিদ্র পতিত, অজ্ঞ ও মূর্খের তিনি সমব্যথী। ভারতবর্ষে মেথরের হুঁকোয় তামাক খেতে যেমন তিনি অনায়াসে সংস্কার বিসর্জন দিয়েছেন, আমেরিকায় নিগ্রোরা যখন তাঁকে স্বজাতীয় ভেবেছে তখনও অনায়াসে নিজেকে তাদেরই একজন-রূপে পরিচিত করেছেন।

জাহাজপথে যাত্রাকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মাঝিমাল্লাদের নৈপুণ্য ও বীরত্বপ্রসঙ্গেই পরিব্রাজকের আর একটি অমর গদ্যস্তবক দেখা দিয়েছে। ভারতের ভবিষ্যৎ যে এই সাধারণ অবজ্ঞাত জনসমষ্টির মধ্যেই নিহিত, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দের বাণীর বিদ্যুদ্দীপ্তি যেন মহাকালের মন্দ্রস্বরের মহিমায় প্রতিধ্বনিত—"আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্‌' বলে ডম্ফই[১] কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা! তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম তোমাদের আচার ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মরু মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল—লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট্‌ সব এক সঙ্গে। বর্তমান কালে

১ ডম্ফ এখানে দম্ভ অর্থে। একটু আগে সমকালীন আর্যামির আতিশয্য প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখেছেন—"একটা ভোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌!' কিন্তু মজাটি দেখেছ? জাতের বেশী বিটলেমিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেইখানে!"—পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৭৭

তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা, আর দেরী করছ কেন? ভূত-ভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয় আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্ন-পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্য—অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।"[১]

পরিব্রাজক-জীবনে ভ্রাম্যমাণ বিবেকানন্দের রাজার প্রাসাদ থেকে

১ বাণী রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৮১-৮২

আরম্ভ করে দরিদ্রতম চাষী, মজুর, মেথর—সর্বস্তরের মানুষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে সাধারণ ভারতবাসী-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি কী পরিমাণ প্রসারিত হয়েছিল, উদ্ধৃত স্তবকদ্বয়ে তার সমুজ্জ্বল প্রমাণ। পরবর্তীকালে য়ুরোপের সাধারণ শ্রমজীবীর তুলনায় ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনের আদর্শগত নীতিগত মানদণ্ড যে উঁচু—এ বিশ্বাস তাঁর সুদৃঢ় হয়।

তখন অবধি সাম্যবাদের ঢেউ এদেশে দেখা দেয় নি—একথা মনে রাখলে বিবেকানন্দের গণচেতনার তাৎপর্য আরো গভীর অর্থ বহন করে আনে। শ্রমজীবিসভ্যতার বন্দনায় এমন মন্ত্রোচ্চারণের পূর্ণতা, এমন আপনবোধের অন্তর্দৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম দেখা দিয়েছে। অনেক পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যে যখন সাম্যবাদী গণ-আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছে, তখনও সাহিত্যের বিচারে বিবেকানন্দের শ্রমিক-বন্দনার সঙ্গে তুলনীয় রচনা একান্ত দুর্লভ।

সাম্যবাদের ধারণায় শ্রেণীসংগ্রামকে অনেক সময় আমরা অনিবার্য বলে মনে করি। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় এক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনি চাইছেন, উপযুক্ত সময় থাকতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের দল যেন নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকার রক্ষায় অগ্রসর হয়ে আসেন—কারণ ভবিষ্যৎ যখন এই শ্রমজীবী মানুষের, তখন সে ভবিষ্যতের জন্য যথাযথ প্রস্তুতিই বাঞ্ছনীয়। অন্যথা ভবিষ্যতে যে অপ্রীতিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেবে, তার ফলে এই উচ্চশ্রেণীরা হাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে যে, শ্রেণীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়েছে, তার অনেকটা কারণ বিবেকানন্দের এই সাবধানবাণীতে কর্ণপাত না করার ফল। জন্মগত জাতিভেদ বা অর্থগত শ্রেণীভেদ—এ দুয়েরই অবসানকল্পে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর যা কর্তব্য ছিল, আমরা ভারতবাসীরা তা পালন করি নি।

অপরপক্ষে একথাও মনে রাখতে হবে যে সাধারণমানুষের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ গুণাবলী তাদের অন্তরে সঞ্চার

করে শ্রমজীবী সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার পরিকল্পনাও বিবেকানন্দের ছিল। সহযোগিতার দ্বারাই এ আদর্শ সম্ভব—পরস্পরকে উচ্ছেদ করার মনোবৃত্তি এ আদর্শের অন্তরায়। আবার প্রয়োজনক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামও স্বামীজীর দ্বারা স্বীকৃত। 'আনন্দ-মঠের' সন্ন্যাসীদের দেশের জন্য সংগ্রামকে তিনি তরুণ বিপ্লবীদের কাছে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করতেন।[১] অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজারা যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ—"যেথায় সমাজশরীর বলবান্, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকা-রক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।"—একথা 'বর্তমান ভারতে'[২] তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। সন্দেহ নেই, ফরাসী বিপ্লবের কথাই এ ক্ষেত্রে তাঁর মনে জেগেছিল।

য়ুরোপীয় সভ্যতার বিকাশে সাধারণ মানুষের স্থান সম্বন্ধে স্বামীজী লিখেছেন—"তবে একটা কথা বলে রাখি,—গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড। বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে, কিছুই এসে যায় না, তাঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ।"[৩]

সাধারণমানুষের সাথে এই সহমর্মিতায় সন্ন্যাসের সর্বত্যাগের আদর্শ বিবেকানন্দমননে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এই স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের ফলেই ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডী অতিক্রম করে স্বামীজী বিশ্বজনের আপন মানুষ হতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের

১ স্বামী বিবেকানন্দ : ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : পৃঃ ৩২৮

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৯

৩ দ্রষ্টব্য : পরিব্রাজক : পৃঃ ১১৭-১৮

'জীবে দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীবসেবা'র বীজমন্ত্র তো ছিলই। ধীরে ধীরে এই বিশ্ব-পরিব্রাজকের অন্তরে সে বীজ কখন বিশাল বটের মতো নিখিল মানবাত্মার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে, বিবেকানন্দ-সাহিত্য সেই বিশাল বটের প্রাঙ্গণ-বেদিকায় ছায়ারৌদ্রের মিলিত আভাস।

* * *

'পরিব্রাজকে'র ইউরোপ-পরিক্রমায় আমাদের বিশ্ব-ইতিহাস-পরিক্রমা হ'তে থাকে। একদিকে প্রাচীন শিলালিপি থেকে আহরিত উনবিংশ শতাব্দীর মিশর প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস-চর্চা, অন্য-দিকে ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হুঙ্গারি, তুরস্ক, ঈজিপ্ট, গ্রীস—প্রভৃতি নানাদেশের টুক্‌রো টুক্‌রো চলচ্চিত্র—এ দুয়ে মিলে ভ্রমণসাহিত্যপাঠের সর্বোত্তম ফল লেখকের সঙ্গীরূপে মানসভ্রমণ যখন সারা হয় তখন একজন সেরা ভ্রমণরসিকের সঙ্গসুখলাভ পাঠকের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

"আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাকলে সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন?—পা নিরীক্ষণ করে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল; সে শীতের চোটে পা ফেটে খালি চৌ-চাকলা, তায় চক্কর-ফক্কর বড় দেখা গেল না। যা হোক—যখন কিংবদন্তী রয়েছে তখন মেনে নিলুম যে, আমার পা চক্করময়।"[১]

এর আগে তো তিনি একাধিকবার ভারত-পরিক্রমা করেছেন, আমেরিকা ইংল্যাণ্ড-পরিক্রমাও ততোধিকবার—কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাসাহিত্যে সে চক্রচিহ্নের ছাপ খুবই অল্প। 'পরিব্রাজকে' তাঁর সারা জীবনের দেশভ্রমণের অংশমাত্র বিধৃত। তবু সেইটুকুই ইতিহাস-চেতনার বিরাট প্রেক্ষাপটে বিধৃত হয়ে দেশ-দেশান্তর ও বর্তমান কাল থেকে সুদূর অতীতে ব্যাপৃত কালান্তরের ব্যঞ্জনায় পাঠকহৃদয়কে সজীব কৌতূহলে ভরে রাখে।

১ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পরিব্রাজক: পৃঃ ১১৮

পরিব্রাজকের সঙ্গে ভ্রমণরত আমরা কখনো সুদূর অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে জানতে পারি—"য়াহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পণ্ডিতদের মতে 'বাইবেল' নামক ধর্মগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ হ'তে আরম্ভ হয়ে খ্রীঃ পর পর্যন্ত লিখিত হয়।...এই বাইবেলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি 'বাবিল' জাতির। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবনবর্ণনা অনেক স্থলে বাইবেল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদশারা যখন আশিয়া মাইনরের উপর রাজত্ব করতেন, সেই সময় অনেক পারসী মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবেলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব—আত্মা বা পরলোক নাই। নবীনভাগে পারসীদের পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয়; এবং শয়তানবাদটি একেবারে পারসীদের।"[১]

কখনো পারিতে (বা প্যারিসে) বিবেকানন্দের বন্ধু ও অনুরাগী বিশ্ববিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। যেমন সেযুগের সেরা অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ডের সঙ্গে পরিচয়—"পাশ্চাত্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্ণহার্ড...বর্ষীয়সী[২]; কিন্তু সেজে মঞ্চে যখন ওঠেন তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ [স্ত্রী বা পুরুষ চরিত্র] অভিনয় করেন, তার হুবহু নকল! বালিকা বালক[৩], যা বল তাই—হুবহু, আর সে আশ্চর্য আওয়াজ! এরা বলে তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে![৪] বার্ণহার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারংবার বলেন, তোমাদের দেশ, 'ত্রেজ্‌ াসিএন, ত্রেসিভিলিজে'[৫]—

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১১৫

২ জন্ম ২৩শে অক্টোবর, ১৮৪৪—মৃত্যু ২৬শে মার্চ, ১৯২৩

৩ নেপোলিয়নের বালকপুত্রকে নিয়ে Edmond Rostand-এর লেখা l' Aiglon (স্বামীজীর ভাষায় 'গরুড়শাবক' নাটকে) বার্ণহার্ড ওই ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রথম অভিনয়—১৭ই মার্চ, ১৯০০ তারিখে। তখন তাঁর ৫৬ বছর বয়স।

৪ লিটন স্ট্র্যাচির ভাষায়—"there was more than gold, there was thunder and lightning, there was heaven and hell."

৫ trés ancien trés civilisé

অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তাতে মঞ্চের উপর বিলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা—বিলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন, 'আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোশাক, রাস্তা, ঘাট পরিচয় করেছি।'[১] বার্ণহার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—'সে মঁ র‍্যাভ (C'est mon rave) সে মঁ র‍্যাভ'—সে আমার জীবনস্বপ্ন।"[২]—এমন মানুষের সঙ্গে স্বামীজীর সখ্যস্থাপনা আশ্চর্য কি!

এ ছাড়া হিরাম ম্যাক্সিম, জুল বোওয়া, মাদাম কালভে, পেয়র হিয়াসান্থ—এমন কতোজনের সঙ্গে পরিব্রাজক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং বর্ণনার গুণে তাঁরাও আমাদের অন্তরঙ্গজনে পরিণত! আবার প্যারিসের মহাপ্রদর্শনীতে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ খুঁজছেন কোথায় সেই মানুষ—যে তার অভাগিনী জন্মভূমির নামটি উজ্জ্বল করে তুলে ধরবেন এই বিশ্বমনীষীর সম্মেলনে! "এই মহা-কেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভমণ্ডলীর মধ্য হ'তে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির—আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক

১ নাটকটি ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নানাসাহেবকে নিয়ে লেখা। লেখকের নাম Jean Richepin, নাটকের নাম 'নানাসাহেব'। বার্ণহার্ড এ নাটকে নানাসাহেবের (কল্পিত) প্রিয়তমা Djammar ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রথম অভিনয় ১৮৮৩ সালে।

২ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১২৪

আজ বিদ্যুদ্‌বেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—যে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি।"[১] জগদীশচন্দ্রের প্রতি বিবেকানন্দের এই প্রীতিই পরবর্তীকালে জগদীশ-চন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় নিবেদিতার আন্তরিক সহায়তার কারণ। আবার অস্ট্রিয়ার পথে যেতে যেতে নেপোলিয়নের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার মানী রাজবংশের সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাসের চকিত দর্শন—"অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের এখনও ইউরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর। তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ। এ বংশের বে-থা বড় দেখে-শুনে হয়। ক্যাথলিক না হ'লে সে বংশের সঙ্গে বে-থাই হয় না। এই বড় বংশের ভাঁওতায় পড়ে মহাবীর ন্যাপোলেঅঁর অধঃপতন!! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুকলো যে, বড় রাজবংশের মেয়ে বে করে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। যে বীর, 'আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ?'-এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'আমি কারু বংশের সন্তান নই, আমি মহাবংশের স্থাপক' অর্থাৎ আমা হ'তে মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোন পূর্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাই নি। সেই বীরের এ বংশমর্যাদারূপ অন্ধকূপে পতন হ'ল!"[২] নেপোলিয়ন বিবেকানন্দ-মানসে তরুণ বয়স থেকেই পরম শক্তিমান্ বীরের আদর্শ।—আর সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে বিবেকানন্দের সবচেয়ে শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছে ফ্রান্স।

এমনি ক'রে সারা য়ুরোপ ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী ঈজিপ্টেও এসেছিলেন, কিন্তু সে-কাহিনী আর লেখা হয়ে ওঠে নি। ভারতবর্ষে ফিরে যাবার এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিল মনে। বিশেষতঃ তাঁর স্বাস্থ্য

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১১৯

২ তদেব : পৃঃ ১৩০

স্বদেশত্যাগী সেভিয়ার দম্পতি—যাঁরা সুদূর হিমালয়ে 'মায়াবতী'তে রয়েছেন, তাঁদের কল্যাণচিন্তা তাঁকে ফিরে যেতে আরো উৎসুক করে তুললো। অকস্মাৎ একদিন বেলুড় মঠে ফিরেও এলেন—কিন্তু মিঃ সেভিয়ার তার আগেই দেহত্যাগ করেছেন। প্রথমে স্বামীজীর বক্তৃতারাশির সাঙ্কেতিক লেখক গুডউইন, তারপর শিষ্য ও অভিভাবক-তুল্য সেভিয়ার—এ দু'জনের মৃত্যুবেদনা তাঁকে মর্মান্তিক আঘাত করেছিল সন্দেহ নেই।

কিন্তু স্বামীজীর আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তে 'পরিব্রাজক'ও আকস্মিক পরিসমাপ্তি লাভ করল। সমকালীন ভারতবর্ষে স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্র পরিভ্রমণকারী রচনাদক্ষ এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু স্বামীজীর মতো ভারতের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা রবীন্দ্রনাথের হয় নি, আবার বিশ্বসভায় গৌরবের মুকুট লাভ করে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও য়ুরোপে মহিমান্বিত অতিথির মর্যাদালাভও বিবেকানন্দজীবনে রবীন্দ্রনাথের আগেই ঘটেছে। বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের ভ্রমণকাহিনীর অতি সামান্য অংশ নিয়েই 'পরিব্রাজক' পাঠকসমাজের সামনে উপস্থাপিত। তবু বাংলার ভ্রমণ-সাহিত্যে বর্ণনার অভিনবত্বে, ভাষার দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, বিশ্বমানবের অন্তরঙ্গ সম্মেলনে 'পরিব্রাজক' আজও পাঠকহৃদয়ে সমান সমাদরের বস্তু।

* * *

'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের ২৩ সংখ্যায় (১লা পৌষ, ১৩০৬) "গত ১৫ই আশ্বিনের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা (সমালোচনা)" 'পরিব্রাজক'-গ্রন্থের প্রথমযুগের সাহিত্যমূল্যনিরূপণপ্রচেষ্টার দিক থেকে স্মরণীয়। তখন সাহিত্যপরিষদের কার্যালয় ছিল ১০৬।১ নং গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে। সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩০৬-এর ৪ঠা বৈশাখ সাহিত্যপরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন, 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র ২য় সংখ্যায় (১৫ই আশ্বিন, ১৩০৬) তা প্রকাশিত হয় এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায়

পর পর কয়েকটি-সংখ্যায় আলোচিত হয়। বিশেষভাবে গদ্যভাষা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রস্তাবই আমরা এখানে আলোচনা করলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বহুমুখী সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই বক্তৃতাটি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

'পরিব্রাজক' তখন 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় চলতি গদ্যের সমর্থন 'উদ্বোধন'-পত্রিকার পরিচালকদের নিশ্চয় খুবই উৎসাহিত করেছিল। ভাষাভঙ্গী দেখে আমাদের ধারণা এই সমালোচনাটি সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দেরই লেখা।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চলতি ভাষাপ্রীতির উদাহরণরূপে এই সম্পাদকীয়ের লেখক নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি তাঁর বক্তৃতা থেকে উল্লেখ করেছেন—"ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতে হয়, একদিকে সার্বভৌমিক ব্যাকরণ; আর একদিকে দেশীয় চাসাভুসা এবং অন্তঃপুর মহলের ব্যাকরণ, সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ; আর একদিকে খাস্ সংস্কৃত ব্যাকরণ; এই তিন ব্যাকরণের ত্রিবেণীসঙ্গমকে আদর্শ করিয়া একখানি সুপাঠ্য এবং সমীচীন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলা হইলে ভাল হয়।"

"আর এক স্থলে বলিতেছেন, 'আর তাহার মহৎ দোষ হচ্ছে—চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী দীন হীন শব্দগুলির প্রতি অশ্রদ্ধা।' আরও একস্থলে বলিতেছেন, 'বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে বর্বর ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞলোকের কার্য্য; যেহেতু সেগুলা প্রকৃত পক্ষেই সংস্কৃতের সন্তান সন্ততি।'

"আরও বলিতেছেন, 'স্থলবিশেষে সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশী কার্য্যকরী হয়। কেহ যদি বলে যে, "অমুক কথাটার বন্ধন শিথিল" তবে সে বাক্যটির অর্থ উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে যদি বলে যে "অমুক কথাটির বাঁধুনি আলগা" তবে

তাহার অর্থ বুঝিতে শ্রোতার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না।' কথাগুলি যাহা বলিয়াছেন—অতি সমীচীন।"[১]

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতার ভাষায় চলতি ভাষার ধাঁচ এত স্পষ্ট ছিল যে সমগ্র বক্তৃতাটিকে সাধুভাষা থেকে চলতিভাষার পথে যাত্রার নিদর্শনই বলা চলে। এটি লিখিত বক্তৃতা। সুতরাং বাংলা চলতি গদ্যের ইতিহাসে এর বিশিষ্ট স্থান আছে। 'উদ্বোধনে'র সমালোচনার প্রথম কিস্তিতে এর ভাষার প্রশংসা—"বক্তৃতাটির ভাষা অতি স্বাভাবিক, সুললিত মধুর এবং নূতন-ধরণের। এরূপ ধরণ বাঙ্গালা গদ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিবে। ভাষা যতই স্বাভাবিক হইবে, ততই মিষ্ট ও প্রশংসনীয়। যে ভাষায় মন ও মুখ এক করিয়া বলা বা লেখা যায় না, সে ভাষা ভাষাই নয়। সে ভাষা সরল ভাষা নয়—কপট। মনে ভাবছি এক—হয়ত মুখে কইছি এক —আর লিখ্‌বার সময় লিখ্‌ছি আর এক।..."[২]

সমকালীন প্রচলিত গদ্যের মিশ্র ধরনের রীতির মধ্যে এই সমালোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের গদ্যরীতিকে 'উচ্চমিশ্র' ধরনের বলা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণে চলতি ক্রিয়াপদ—হচ্চে, হ'চ্চে, হচ্ছেন, হ'চ্ছেন ইত্যাদির ব্যবহার সেকালের গোঁড়াপন্থীদের অসহ্য ঠেকলেও 'উদ্বোধনে'র সমালোচক এই সব প্রয়োগকে সাগ্রহে সমর্থন করেছেন—"এরূপ উন্নতি বা পরিবর্ত্তনের গতিরোধ দুঃসাধ্য। কি করা যায় বলুন?—নাচার। লেখক যদি এইরূপ ঘরোয়া চলিত ধরণে লিখিয়া ভাষার আর এক মূর্তি চিত্রিত করিতে ইচ্ছা করেন। বিশেষ, প্রসিদ্ধ গভীর চিন্তাশীল লেখকের লেখনী হইতে যাহা কিছু নিঃসৃত হইবে, তাহা ত নিন্দনীয় হইতেই পারে না বরং সে সর্ব্বকালে, কালেতে ক'রে সাধারণে চলিয়া যাইতেই থাকে।... এ হেন সুশাসিত ও বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ হিন্দুসমাজ যখন "যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে জীবাস্থিবিশোধিত শর্করা পর্য্যন্তর" ব্যবহার

১ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, পৃঃ ৭৪৮-৪৯

২ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, পৃঃ ৭২৫

হইল, তখন সামান্য বঙ্গভাষায় 'হইতেছে' 'খাইতেছে'র পরিবর্তে স্থানে স্থানে যে 'হচ্চে', যাচ্চে' চলিয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য কি ? পরন্তু ভাষার গৌরব—বচনবিন্যাসে ততটা নয়, যতটা ভাব-প্রকাশে।"[১]

'উদ্বোধনে'র সমালোচক উচ্চবিমিশ্র ধরনের ভাষার উদাহরণরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত ভাষণ ও বিবেকানন্দের "বিলাতযাত্রীর পত্র" এ দুয়েরই নানা বাক্য ও অনুচ্ছেদ, বিশিষ্টার্থক বাক্যের প্রয়োগ, ক্রিয়াপদ ও চলতিশব্দের ব্যবহার ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি তুলনায় বেশ ধরা পড়ে যে স্বামীজীর ভাষা ক্রিয়াপদেও সম্পূর্ণ চলতি, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ চলতি ও সাধু দু'ধরনের ক্রিয়াপদই ব্যবহার করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ উদ্বোধনের সমালোচনা থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের ভাষার উদ্ধৃতি—"সেই আরণ্যক পতিত ভূমিতে কোথাও বা ফুলের মালঞ্চ, কোথাও বা সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনের ছায়াময়ী বীথিকা, কোথাও বা ফলের উদ্যান উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বিহিত প্রণালী পদ্ধতি। কতক বা আমি দেখিয়া শিখিয়াছি, কতক বা আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছি, কতক বা হাতে কলমে করিয়া কম্মিয়া শিখিয়াছি, আর তা যাহা শিখিয়াছি তাহাতে জো শো করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কাজ চালানো যাইতে পারে না এমন নহে।"—দ্বিজেন্দ্রনাথ।

"...কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী কত বারিনিধি—দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম, কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে টিকটিকি, ইঁদুর, ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে—কিবা পানের পিক-বিচিত্রিত দেয়ালে—দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে, আঁব কাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে,—কবি শ্যামাচরণ

---

১ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, পৃঃ ৭২২

হিমালয়, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতির যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত ক'রে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন,—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা।"

(বিলাতযাত্রীর পত্র—বিবেকানন্দ)[১]

'উদ্বোধনে' তখন 'বিলাতযাত্রীর পত্র' বা 'পরিব্রাজক', 'হাঙ্গর ধরা'র বিবরণ অবধি প্রকাশিত। এর মধ্যেই বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভাষার তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশিত হ'ল। লেখক বিবেকানন্দের সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধে 'উদ্বোধনে'র এই সমালোচকের কতটা উচ্চ ধারণা তার পরিচয় যেমন এতে ফুটেছে, চলতি ভাষার আন্দোলনে 'উদ্বোধন' পত্রিকার অগ্রগামিতাও তেমনি প্রমাণিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—দু'জনেই মননশীলতায় উচ্চতম দর্শনচিন্তার অধিকারী। কিন্তু রচনাভঙ্গীতে যে সরসতা, বাকনৈপুণ্য এবং চলতি ভাষার প্রতি অনুরাগ এঁরা দেখিয়েছেন, তা সমকালীন সাহিত্যে ঠিক এইভাবে অন্যেরা অনুসরণ করেন নি। কিশোর রবীন্দ্রনাথের পত্র ও ডায়ারী তখন অবধি যুবক রবীন্দ্রনাথই অনুসরণ করার কথা ভাবেন নি! 'উদ্বোধন'-পত্রিকা (১৮৯৯) প্রকাশের পর সবুজপত্র (১৯১৪) অবধি চলতি ভাষাকে বাঙলার লেখকসমাজের অগ্রগামিতার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে।

'য়ুরোপ-প্রবাসী'র পত্র-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লিখেছেন—"য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীয়া নয়। এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা। নিশ্চিত বলতে পারি নে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।···আমার বিশ্বাস বাংলা ভাষার সহজ-প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে।"[২]

১ উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা পৃঃ ৭৫০, ৭৫২ নামান্তরে 'পরিব্রাজক'।

২ রবীন্দ্ররচনাবলী: ১শর খণ্ড শতবার্ষিক সংস্করণ: 'পাশ্চাত্যভ্রমণ গ্রন্থের প্রবেশক': পৃঃ ৩৪০

সতেরোবছর বয়সে লেখা এই পত্রগুলির যে সাহিত্যিক মূল্য রবীন্দ্রনাথের মনে পরিণত বয়সে (১৯৩৬-এ লেখা উদ্ধৃত অংশ) দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে বাংলাসাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা অনেকেই একমত হ'বেন। তরুণ মনের যে তীক্ষ্নতা এ চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশিত সে তীক্ষ্ন ঋজুভঙ্গী পরবর্তী রবীন্দ্রগদ্যে অনুসৃত হয় নি। তাঁর কাব্য-প্রেরণা গদ্যরীতিকে আবিষ্ট করেছে।

এর বারো বৎসর পরে 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্যের আর এক পদক্ষেপ। ভাষা আরো গম্ভীর, গভীর ভারবহনের উপযুক্ত, মননের পরিণতি দৃষ্টিভঙ্গীতে সামঞ্জস্য এনে দিয়েছে। তবু, আশ্চর্যের বিষয়, সতেরো এবং উনত্রিশ বছরের রবীন্দ্রনাথের এই চলতি গদ্যরীতি তাঁর নিজের রচনায় তো অনুসৃত নয়ই, সমকালীন আর কেউ এ রচনার দ্বারা প্রভাবিত ন'ন।

১৮৯৯-এর জুন মাসে বিবেকানন্দ যখন 'পরিব্রাজক' ('বিলাত-যাত্রীর পত্র' নামে) লিখতে শুরু করলেন, তখন কি তাঁর মনে 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'য়ুরোপযাত্রীর পত্রে'র আদর্শ জেগেছিলো? 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' বা 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী'—এ দুটির কোনোটির ভাষার সঙ্গেই বিবেকানন্দের চলতি গদ্যরীতির প্রকৃতিগত মিল না থাকলেও মূলত কলকাতার চলতি ভাষা হিসাবে এদের সাধর্ম্য আশ্চর্য নয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বই ভাষার মূল চাবিকাঠি—একথা মনে থাকলে ভাষার আদর্শ-বিচারে দু'জনের বিস্তর পার্থক্যের কারণ বোঝা যায়।

উদাহরণস্বরূপ 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'র ভাষাভঙ্গীর নমুনা—"আমি ইংলন্ড দ্বীপটাকে এত ছোটো ও ইংলন্ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনাশীল মনে করেছিলাম যে, ইংলন্ডে আসবার আগে আমি আশা করেছিলেম যে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মনে করেছিলেম, এই দুই-হস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন, গ্লাড্-স্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমূলরের বেদব্যাখ্যা, টিন্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব,

কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাব; মনে করেছিলেম, যেখানে যাই-না কেন intellectual আমোদ নিয়েই আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝি উন্মত্ত। কিন্তু, তাতে আমি ভারী নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে—কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা-কিছু কোলাহল শোনা যায়।"[১]

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'-তে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যময় গদ্যভঙ্গীর উদাহরণ—"তখন পূর্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে উদয় হচ্ছে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্বসীমান্তে চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ পড়ে একটা অনাদি অনন্ত বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চাঁদের উদয়পথের ঠিক নিচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌-ঝিক্‌ করছে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন্ এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মতো আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে নিঃশব্দে চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে।"[২]

এই সঙ্গে 'ছিন্নপত্র' অবধি রবীন্দ্রনাথের চলতি গদ্যরীতি অনুধাবন করলে প্রকাশভঙ্গীর প্রাঞ্জলতা, চিত্ররীতি, শব্দসুষমা ও অন্তর্নিহিত কাব্যধর্মে রবীন্দ্র গদ্যভঙ্গিমা প্রথম যৌবনের অতিরিক্ত আত্ম-সচেতনতার ফল চঞ্চল ও তির্যক্ গতিভঙ্গী থেকে উপলব্ধির গভীরতার পথে অগ্রসর। অপরপক্ষে বিবেকানন্দের গদ্যরীতি একটু পরিণত বয়সেও ('পরিব্রাজক' লেখা শুরু ৩৬ বছর বয়সে) রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা যেমন বজায় রেখেছে, তেমনি মহত্তম প্রজ্ঞার বাণীরূপদানেও সমান দক্ষতা অর্জন করেছে। কবিজনোচিত তন্ময়তা বিবেকানন্দের গদ্যরীতিতে মাঝে মাঝে দেখা দিলেও মূলত তাঁর গদ্যের গতিধর্ম,

১ রবীন্দ্ররচনাবলী : শতবার্ষিক সং : দশম খণ্ড : য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র : দ্বিতীয় পত্র : পৃঃ ২৪২-৪৩

২ রবীন্দ্ররচনাবলী : শতবার্ষিক সং : দশম খণ্ড : য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী : পৃঃ ৩৮৭

সাবলীলতা ও পৌরুষশক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' নয়, বরং 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'ই বিবেকানন্দ-গদ্যরীতির পূর্বসূচনা। রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যের প্রথম রচনা হিসাবে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র কথা ভাবেন নি, তার মূল কারণ হয়তো রুচির বিভিন্নতা। বিবেকানন্দের সঙ্গেও হুতোমের রুচিগত মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। কিন্তু উত্তর কলকাতার আঞ্চলিক গদ্যরীতির যে পরিমার্জিত রূপ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত ছিল, তার বদলে হুতোম (যদি তিনি ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও হয়ে থাকেন) এবং পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের গদ্যরীতিতে পরুষ অথচ প্রাণশক্তিসম্পন্ন লোকরীতির আমেজই বেশী দেখা দিয়েছে। অবশ্য স্বামীজীর চলতি গদ্যে তৎসম বা মূল সংস্কৃত পদের অজস্র নিপুণ ব্যবহার তাঁর গদ্যে যে ক্লাসিক স্বাদ সঞ্চার করেছে, হুতোমের গদ্যে তা নেই। অপরপক্ষে একথাও সত্য যে বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নক্শা-জাতীয় রচনায় আজ অবধি 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' অনতিক্রান্ত।

চলতি ভাষাকে যাঁরা সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিভোজনে প্রথম আভিজাত্যের আসনে বসিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিন্তু সচেতন শিল্পী-মনের দিক থেকে বিবেকানন্দই প্রথম বন্দনীয়। হুতোম নক্শা-সাহিত্যকে কিছু মহৎ সাহিত্য ভাবেন নি, রবীন্দ্রনাথ পত্রের ভাষায় যে চলতিরীতি, তাই বজায় রেখে য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র ছাপিয়েছেন, মনন-সাহিত্যে এর প্রয়োগের কথা ভাবেন নি। অপরপক্ষে বিবেকানন্দ তাঁর ভ্রমণকথা 'পরিব্রাজক' ও মননসাহিত্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—এ দুই গ্রন্থে চলতি ভাষার সর্বময় প্রকাশ-ক্ষমতা প্রমাণিত করে পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের রাজপথটির শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন করে গেছেন।

বিবেকানন্দের দুই পৃথিবী : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'

"Bold has been my message to the people of the West."

Bolder to those at home.—"India's message to the World."[১]

"পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠ, স্বদেশবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।"—'জগতের কাছে ভারতের বাণী।'[২]

আমেরিকা ও য়ুরোপে দ্বিতীয়বার পরিক্রমার সময় 'পরিব্রাজক' লিখতে লিখতে স্বামীজীর অন্তরে ভারতীয় বা প্রাচ্য আদর্শ এবং য়ুরোপীয় পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক মূল্যায়নপ্রচেষ্টা স্বাভাবিক-ভাবেই দেখা দিয়াছে। নেপ্‌ল্‌স থেকে স্বামীজীর জাহাজ মার্সাইতে লেগেছিল, তারপর একেবারে লণ্ডন। 'পরিব্রাজকে' এই অবধি বিবরণের পর তাঁর মন্তব্য—"ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের তো নানা কথা শোনা আছে,—তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতি-নীতি আচার ইত্যাদি—তা আর আমি কি ব'লবো! তবে ইউরোপী সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত—এ সব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার রইল।"[৩]

সেই অসমাপ্ত বক্তব্যই দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধনে' ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৫ সংখ্যা থেকে তৃতীয় বর্ষের ১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্যা অবধি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—এই নামে ধারাবাহিক রচনারূপে প্রকাশিত। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'—এই দুই সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার মনোজ্জ্বল রসসমৃদ্ধ প্রকাশরূপে এ গ্রন্থ বিবেকানন্দ-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

১, ২ Complete Works of Swami Vivekananda : Centenary Edn : Vol IV : p. 308 ; বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৩৬৯

৩ পরিব্রাজক : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১১৭

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গমনীষা রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—এই তিনজনের মাধ্যমে ভারত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনসাধনকল্পে সংস্কৃতিক দূত প্রেরণ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ কালের দিক থেকে এঁদের অনুজ। তবু পাশ্চাত্যের কাছে ভারতীয় বা প্রাচ্য অধ্যাত্মমহিমা ঘোষণা এবং পাশ্চাত্যের রজোগুণদীপ্ত জীবনপ্রবাহ ভারতে সঞ্চারের প্রয়াসে তিনি যে ভাববিনিময়ের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তারই ফলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়। একদিকে 'চিকাগো-বক্তৃতা', অন্যদিকে 'ভারতে বিবেকানন্দ'-গ্রন্থে বিধৃত প্রথমবার আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যন্ত ভারতব্যাপী অভিনন্দনের উত্তররূপে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী—স্বামীজীর চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক বিচারের পটভূমি।

আমেরিকাযাত্রার অব্যবহিত আগে স্বামীজী আসমুদ্র-হিমাচল পরিক্রমার দ্বারা রাজার প্রাসাদ থেকে দরিদ্রতমের পর্ণকুটির অবধি সর্বত্র ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আপাতম্রিয়মাণ ভারতাত্মার প্রাণস্পন্দন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বিদেশকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে সবার আগে দরকার স্বদেশকে পরিপূর্ণভাবে জানা। প্রথমবার পাশ্চাত্য-পরিক্রমার সময় যে-অভিজ্ঞতা হয়েছিল, দ্বিতীয়-বার পাশ্চাত্য পরিক্রমার সময় স্বামীজী সে-অভিজ্ঞতার দ্বারা ভারতীয় বা প্রাচ্যসভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐক্য বা পার্থক্য সম্বন্ধে আরও দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলেন।

স্বামীজী মনেপ্রাণে অনুভব করতেন যে, বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের উদ্দেশে বিশেষ বাণী ছিল, তেমনি তাঁর নিজের বিশেষ বাণী রয়েছে পাশ্চাত্যের উদ্দেশে। আবার একথাও ঘোষণা করেছেন—"পাশ্চাত্য-বাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠ, স্বদেশবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।"

('জগতের প্রতি ভারতের বাণী' : বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড দ্র)

বিবেকানন্দজীবনের সমগ্র ধ্যান-ধারণার উৎস স্বদেশজননীর যে বাণী সমগ্র বিশ্বের অবগতির জন্য ঘোষণা করা প্রয়োজন, সেকথা ভেবে "India's Message to the World"—নামে একটি গ্রন্থের প্রাথমিক সূচনা তিনি করেছিলেন। স্বামীজীর অকাল প্রয়াণের ফলে সে-গ্রন্থটি সম্পূর্ণ না হ'লেও গ্রন্থ-সূচনায় সূত্রাকারে "জগতের কাছে ভারতের বাণী"র যে মূলসূত্রগুলি বিধৃত, তাদের অবলম্বন করে স্বামীজীর বিস্তৃত রচনা ও ভাষণাবলীর সাহায্যে এ-বিষয়ে স্বামীজীর সমগ্র চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রবল বন্যায় সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্য অনুকরণের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, স্বামীজী সে সম্বন্ধে ভারতবাসীকে বারংবার সাবধান হতে বলেছেন। 'বর্তমান ভারতে'র শেষাংশে সমকালীন শিক্ষিত শ্রেণীর মানসদ্বন্দ্বের নিপুণ বর্ণনা—"একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য-জ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষী-উদ্ঘাটিত, যুগযুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী বলদ, আশাপ্রদ, পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব-কাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি?"[১]

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৬

যুগমানসের এই সংঘাতে সে যুগে বা এযুগে যাঁরা বিচলিত, তাঁরা স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই পৃথিবীর মূল পার্থক্য-বিশ্লেষণটুকু অনুধাবন করতে পারেন—"পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি ; আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে, 'ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ। কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥' "[১]

দুই সভ্যতার এই মূলগত পার্থক্যটি অনুধাবন করলে আধুনিক মনের কাছে এ দুয়ের সমন্বয়সাধন অসম্ভব মনে হবে না। কিন্তু এখন অবধি অনুকরণসর্বস্ব আমাদের শিক্ষিতসমাজে যে কোনো বিদেশী মুদ্রাই স্বদেশী সম্পদের চেয়ে সহজে বরণীয়। তাই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মনন আজকের দিনেই আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

প্রয়োজনমতো বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ ও সভ্যতার ভালো দিকগুলি গ্রহণ করে সেগুলি ভারতীয়ভাবে আত্মস্থ করাই স্বামীজীর আদর্শ। স্বামীজীর ধারণায়, আগামী যুগের বিশ্ব-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল য়ুরোপ নয়, ভারতবর্ষ। 'উদ্বোধন' পত্রিকার আদর্শ আলোচনা-প্রসঙ্গে (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা 'উদ্বোধন'—'প্রস্তাবনা') স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আসন্ন সম্মিলন-কাল সম্বন্ধে লিখেছেন—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

"ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান ; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা ; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ' ; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী ; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত ; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ ; একজন নিত্যসুখের

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৬

আশায় ইহলোকের অনিত্যসুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্য-সুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।...ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।"[১]

স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীই বিস্তৃত বিশ্লেষণে ও চলতি ভাষার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-গ্রন্থে অভিব্যক্ত। বলা বাহুল্য, ভারতের সব মানুষই যে অধ্যাত্ম আদর্শে সমুন্নত বা পাশ্চাত্যের প্রতিটি ব্যক্তিই যে ঐহিকসুখে আসক্ত—এমন কথা স্বামীজীর অভিপ্রেত নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মানসপ্রবণতার মূল লক্ষণগুলিই তাঁর আলোচনার বিষয়। ব্যতিক্রম সব দেশেই স্বীকার্য।

সময়ের দিক থেকে 'বর্তমান ভারত'-রচনার সমাপ্তি আর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ধারাবাহিক রচনার সূত্রপাত খুব কাছাকাছি। 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যা থেকে তৃতীয় বর্ষের ১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্যা অবধি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ধারাবাহিক প্রকাশকাল। ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যাটির দু'সংখ্যা আগে (১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭) 'বর্তমান ভারত' পরিসমাপ্ত। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনার সূচনায় ভাষাভঙ্গী যে 'বর্তমান ভারতে'র অনুরূপ, সেকথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিছু পরেই অবশ্য সংস্কৃতের সংহৃত ভঙ্গিমা পরিবর্তিত হয়ে চলতি ভাষার জোয়ার দেখা দিয়েছে। 'পরিব্রাজকে' স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বিশ্বপরিক্রমায় সহযাত্রী। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' সে ভ্রমণের অন্তরতম ফল উপলব্ধির প্রয়াস।

বাংলায় লেখা স্বামীজীর মৌলিক মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'ই ১৩০৯ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত। 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : বর্তমান সমস্যা : ভাব্‌বার কথা : পৃঃ ৩১-৩৩

ভারত' গ্রন্থাকারে প্রকাশের বৎসর ১৩১২ ; 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থবদ্ধ হয় ১৩১৪ সালে। গ্রন্থাকারে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রকাশের সময় স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে পাওয়া অংশ পরিশিষ্টরূপে যোগ করা হয়। বইটির সমাপ্তির ধরনে মনে হয়, ভবিষ্যতে আরও কিছু বক্তব্য সংযোগের পরিকল্পনা স্বামীজীর ছিল।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকা খুব সম্ভব স্বামী সারদানন্দজীরই লেখা। পরিচায়িকারূপে তিনি লিখেছেন—"এই প্রবন্ধটি 'উদ্বোধন' পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় ; একদলের মতে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর, দেশী জিনিষের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ঠিক ইহার বিপরীত-মতাবলম্বী ; হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোন-কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন ; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, আশা করিয়া ইহার পুনর্মুদ্রণ করা গেল।"[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের হিন্দুমেলার দ্বারা তরুণ বিবেকানন্দ যে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণস্বরূপ 'সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রথম সংস্করণে অনেকগুলি দেশপ্রেমের গানের তলায় শুধু 'হিন্দুমেলা' কথাটি লেখা অর্থাৎ হিন্দুমেলা উপলক্ষ্যে এরা রচিত বা সে মেলায় গীত। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী হিন্দুমেলার আগে এবং সমকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী

১ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৪৭

সত্তার অভ্যুদয় ঘটিয়েছে। স্বামীজীর দেহাবসানের পর ভগিনী নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে স্বদেশী আন্দোলনের ধারা বহন করে চলেছেন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' স্বামীজী সেই স্বদেশী ভাবধারার মূলপ্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (এটিও খুব সম্ভব স্বামী সারদানন্দেরই লেখা) আছে —"স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে আমাদের দৃষ্টি নিজ দেশের প্রতি কিছু আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বদেশভক্তির মূলভিত্তি সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্যদেশ হইতেই বা কিরূপে তাহাদের কি কি গুণ গ্রহণ করিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধারণের একটা পরিষ্কার ধারণা নাই। কেহ কেহ পাশ্চাত্য জাতির উপর অযথা বিদ্বেষ-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছেন। আশা করি স্বামীজীর এই নিরপেক্ষ সমালোচনাগ্রন্থ-দ্বারা লোকশিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে।"

স্বামীজীর বাংলা গ্রন্থচতুষ্টয়ের মূল বিষয় 'ভারতচিন্তা'। কিন্তু এই ভারতচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত থেকেই বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিশ্বপরিক্রমারত। সেদিক থেকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দুই জীবনাদর্শের আচার-বিচার, অশন-ভূষণ থেকে আরম্ভ করে আধ্যাত্মিক পরমলক্ষ্য অবধি উভয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় আজ অবধি অনতিক্রান্ত গ্রন্থ।

ওজস্বিতা, প্রসাদগুণ, নিপুণ বিশ্লেষণ, বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গী, বিদগ্ধ পরিহাসনৈপুণ্য এবং ভারতাত্মার গভীরতম ধ্যানসত্যের মিশ্রণে বাংলা গদ্যের চিরোজ্জ্বল আদর্শসৃষ্টির নিদর্শনরূপে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম অক্ষয় কীর্তি।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধ নামে অভিহিত। তবে সাধারণত প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' তার চেয়ে কিছু বেশী। বিশ্বসভ্যতার দুটি প্রধান ধারার অনুধাবনে এ গ্রন্থে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি বিস্ময়কর এর প্রকাশভঙ্গীর স্বাচ্ছতা। এশিয়া ও য়ুরোপের ইতিহাসকে

মৃদু হাস্যরসের ভিয়েনে চাপিয়ে যে অনায়াস শিল্পকুশলতায় বিবেকানন্দ এ গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তাতে তাঁর জ্ঞানের বিস্তার, দৃষ্টির মৌলিকতা ও জ্বলন্ত দেশানুরাগ পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। অতি সহজ করে বলেছেন বলেই তাঁর বিশ্লেষণ এত গভীর। এমন কি প্রকাশের এই সারল্য অনেকসময় তথ্যমেদপুষ্ট গবেষকদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর প্রকাশ-সারল্যই বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসচর্চায় প্রযুক্ত হয়ে বিবেকানন্দ-সাহিত্যকে একই সঙ্গে গভীর ও উদার করে তুলেছে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র মনন-প্রাধান্য অনেক পরিমাণে স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তার আনন্দময় সংস্পর্শে রূপান্তরিত হয়ে ব্যক্তিত্ব-সুরভিত রচনায় (ইংরেজী literary বা personal essay-র সগোত্র) পরিণত।[১]

*　　　　*　　　　*

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্লাবন তখনকার তরুণমানসে কি প্রভাব বিস্তার করেছিল সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তার অজস্র নিদর্শন। হিন্দুকলেজের যে তরুণ ছাত্রদল সেকালে নব্যবঙ্গ (Young Bengal) নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের চিন্তাধারা সম্বন্ধে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইটিতে মন্তব্য করেছেন—"নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিনজনই তাঁহাদিগকে একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন ;—প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রতীচিতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্যপক্ষপাতিতার ঝোঁকে বঙ্গসমাজ বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে।"[২]

১ বাংলাসাহিত্যের একদিক : ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : প্রবন্ধ ও রচনার পার্থক্য আলোচনা স্মরণীয়।

২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : সপ্তম পরিচ্ছেদ : পৃঃ ১৪২ (নিউ এজ সংস্করণ)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ১৮৯৬-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকা-প্রত্যাগত বিবেকানন্দকে কলকাতাবাসীরা যে অভিনন্দন দিয়েছিলেন তার উত্তরে যেন ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশই স্বামীজীর কণ্ঠে ধ্বনিত—"প্রত্যেক জাতিরই উদ্দেশ্য-সাধনের ভিন্ন ভিন্ন কার্যপ্রণালী আছে। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজসংস্কার, কেহ বা অপর কিছুকে প্রধান উদ্দেশ্য করিয়া কাজ করিতেছে। আমাদের পক্ষে ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া কাজ করার অন্য কোনো উপায় নাই। ইংরেজ রাজনীতির মাধ্যমে ধর্ম বোঝে; বোধহয় সমাজ-সংস্কারের সাহায্যে মার্কিন সহজে ধর্ম বুঝিতে পারে; কিন্তু হিন্দু রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার ও অন্যান্য যাহা কিছু সবই ধর্মের মধ্য দিয়া ছাড়া বুঝিতে পারে না। জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের এইটিই যেন প্রধান সুর, অন্যগুলি তাহারই একটু বৈচিত্র্য মাত্র। আর ঐটিই নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই মূল ভাবটিকে সরাইয়া উহার স্থানে অন্য একটি ভাব স্থাপন করিতে যাইতেছিলাম। যদি আমরা ইহাতে কৃতকার্য হইতাম, তবে আমাদের সমূলে বিনাশ হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার নয়।"[১]

তা হবার নয় ব'লেই, স্বামীজীর মতে, এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণসত্তায় ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার মহত্তম প্রকাশ। তরুণ সন্ন্যাসী সে যুগের তরুণতরদের আহ্বান করেছিলেন—"আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি, বিশেষ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কথনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। 'আমি প্রায় গত দশবৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই 'সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে।"[২]

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ২১০-১১

২ তদেব পৃঃ ২১৭

স্বামীজীর এ আহ্বানে সে যুগে যে পরিমাণ সাড়া জেগেছিল, স্বাধীনতা-উত্তর পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রবাহে আজ তা কিছু পরিমাণে স্তিমিত। রাজনীতির সর্বগ্রাসী উন্মাদনা জাতীয় প্রাণসত্যকে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন করে আছে বলেই বিবেকানন্দ-বাণী ও সাহিত্যের নূতন চর্চা ও মূল্যায়ন এই বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে আমাদের একান্ত করণীয়।

সেকালের নব্যবঙ্গের তরুণদলের অনেকেই কিন্তু অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের প্রতিই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মিশনরীদের প্রাণপণ চেষ্টাসত্ত্বেও মধুসূদনের অনুসরণ সেকালে খুব কম বাঙালীই করেছেন। আবার মধুসূদনের সতীর্থ মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় তো সেই ইংরেজীয়ানার যুগে বিশেষ ব্যতিক্রম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ব্রাহ্মসমাজের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও মূলত ভারতীয় স্বাদেশিকতার আদর্শে অটল দেবেন্দ্রনাথ এবং চিরাগত ঐতিহ্যের কল্যাণপ্রদ ভূমিকায় নিশ্চিত বিশ্বাসী ভূদেব—এঁদের দু'জনকেই আমরা নব্যবঙ্গের ইতিহাসে ব্যতিক্রম মনে করতে পারি। সেই সঙ্গে রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ সে-যুগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও স্মরণীয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে আমরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিচারবিহীন অনুসরণের বদলে যে স্বাধীন বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাই, তার মূলেও অন্যতম প্রেরণা ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দিগ্বিজয়-অভিযানের পাশাপাশি কলকাতার অদূরে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে নবযুগের ভারতবর্ষ অতীতের অধ্যাত্মসাধনার ঘনীভূত বিগ্রহরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কথামৃত'-প্রসাদের সৌভাগ্যলাভ করেছে। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের অনন্যতা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী লিখেছিলেন—সঙ্কীর্ণ সমাজে ধর্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা সমধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা

ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রামকৃষ্ণ-শরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহাপ্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।"[১]

তরুণ নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর সমুদ্রোপম গভীরতা ও আকাশকল্প বিস্তারের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, দুরূহতম অধ্যাত্মসত্য-প্রকাশে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর অনায়াসনৈপুণ্য ও শিল্পকুশলতায়। বস্তুত বিবেকানন্দমানসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয়প্রচেষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার উদার সমন্বয়েরই আর এক রূপান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেই তিনি জেনেছিলেন জগতের বিভিন্ন ধর্মমত আর কিছুই নয়, একই সত্যকে প্রকাশের নানান্ ভাষা মাত্র।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এই সমন্বয়দৃষ্টির অন্যতম উদাহরণ মেলে বিভিন্ন জাতির মূলগত বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনায়—"অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছরূপে বিকাশ হয়েছে।"[২]

কঠোপনিষদের—অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।[৩]—'সেই একই অগ্নি যেমন পৃথিবীতে প্রবেশ করে দাহ্যবস্তুর আকার অনুসারে

১ স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ : সরলাবালা সরকার : 'রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী' অধ্যায় : পৃঃ ১২২

২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬০

৩ কঠোপনিষৎ : স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী : ২।২।৯

সেই সেই আকার লাভ করে, তেমনি সকল সত্তার অন্তর্নিহিত আত্মা নানারূপে আপনাকে প্রকাশ করেছেন, অথচ সেই রূপের অতীতরূপেও তিনি বিরাজিত।'—এই শ্লোকটির কথা এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়বে। স্বামীজীর জীবনে এ উপলব্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী—'যত মত তত পথ।' উপনিষদের ব্রহ্মোপলব্ধির পরিপূর্ণ আদর্শরূপে শ্রীরামকৃষ্ণই আধুনিক ও প্রাচীন ভারতের চিরন্তন যোগসূত্ররূপে বিবেকানন্দের মননদৃষ্টিকে বিশ্বতোমুখী মৈত্রী ও করুণায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তর্নিহিত এক ও অদ্বয় সত্যকে স্বামীজী বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রেরণায় প্রকাশিত দেখেছেন।

বিবেকানন্দ-রচনাবলীর ভূমিকায় ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর একটি বাণী উদ্ধৃত করেছেন—"Art, science and religion are but three different ways of expressing a single truth"[১] "চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করবার বিভিন্ন পন্থামাত্র।"—এ উপলব্ধির মূলে রয়েছে অদ্বৈতপ্রত্যয়। বলা বাহুল্য সে প্রত্যয়ের মূলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী—"ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুইই—তাঁর মধ্যে সাকার নিরাকার দুইই মিলেছে।" (নিবেদিতার অনুবাদে—God is both with form and without form. And He is that which includes both form and formlessness.)[২]

উল্লিখিত ভূমিকাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বাণীটি উদ্ধৃত করে নিবেদিতার বক্তব্য—"এইখানেই আমাদের আচার্যদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, কারণ এই উপলব্ধিতেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনক্ষেত্রে পরিণত তা নয়, সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতেরও সংযোগস্থল। বহু এবং এক যদি সত্যিই এক সত্তা হয়, তা হলে

১, ২ Complete Works of S. Vivekananda : Vol I : Introduction : p xiv ; xiii, Centenary edition. বাংলা অনুবাদ লেখককৃত।

শুধু কেবল সবধরণের উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সব কাজ, সব সংগ্রাম, সমস্ত সৃষ্টিই পরমসত্যলাভের বিভিন্ন পন্থা। এর পর থেকে লৌকিকে ও আধ্যাত্মিকে আর কোনো প্রভেদ থাকতে পারে না। পরিশ্রমই প্রার্থনা, জয়ই ত্যাগ, সমগ্র জীবনই ধর্ম। প্রাপ্তি ও সংরক্ষণ ত্যাগ ও বর্জনের মতোই কঠোর দায়িত্বে পূর্ণ।" "It is this which adds its crowning significance to our Master's life, for here he becomes the meeting point, not only of East and West, but also of past and future. If the many and the one be indeed the same Reality, then it is not all modes of worship alone, but all modes of work, all sort of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation. No distinction henceforth between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion. To have and to hold is as stern a trust as to quit and avoid."

অবশ্য এক্ষেত্রে স্বামীজীকে একটু ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সে ভ্রান্তি-সম্ভাবনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মননই আমাদের পন্থা নির্দেশ করতে পারে। যে অদ্বৈত উপলব্ধির দৃষ্টিতে পার্থিব সমস্ত প্রচেষ্টাই আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ সে দৃষ্টি যাঁদের নেই, তাঁরা স্বামীজী বা নিবেদিতার ব্রহ্মদৃষ্টিকে বাদ দিয়েই বস্তুমুখী জীবনচর্যাকে একমাত্র সত্য মনে করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু বলেছেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।"[২] তিনি উপমা দিতেন আঙুলে তেল মেখে কাঁঠাল-ভাঙার, নইলে জড়িয়ে যায়। কিছুকাল নির্জনে সাধনার দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরসত্তার উপলব্ধি না হ'লে সংসার-চেতনা তেমনি মানবমানসকে আচ্ছন্ন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভিন্নসত্তার আদর্শ তাই সত্যলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগ।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সে সত্য কখনোই ব্যবহারিক সমুন্নতির বাসনা নয়, সব বাসনার অতীত পরম লক্ষ্যে সেই সত্যের প্রকাশ।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সাহিত্যকৃতি আলোচনার আগে এই অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের ভূমিকাটুকু স্মরণীয়।

* * *

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনাপ্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত 'উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা' ('বর্তমান সমস্যা') প্রবন্ধে স্বামীজী লিখেছেন—"ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান ; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃ স্ফুরণ হইবে।"[১]

সমস্যা এই কীভাবে সেই নবজাগরণ ঘটবে? স্বভাবতই সেকালের একদল পণ্ডিত মনে করতেন যে প্রাচীন শাস্ত্র ও সমাজের আধিপত্যের যুগ ফিরিয়ে আনাই বর্তমান ভারতের উন্নতির উপায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের অভ্যুদয় ঘটেছিল জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে। আধ্যাত্মিকতা জীবনের পূর্ণতার ফল, রিক্ততার সৃষ্টি নয়। শাস্ত্রাচার ও দেশাচারের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল বলেই ভারতের অভ্যুদয় ঘটে নি, জাতীয় ইতিহাসের নানা স্তরে সমকালীন প্রয়োজন-অনুসারে এজাতীয় আচার-বিচারের প্রাদুর্ভাব। তাছাড়া আধ্যাত্মিকতার জন্য যে সত্ত্বগুণের প্রশান্তি প্রয়োজন, তা এদেশের কটি মানুষের আছে? সমগ্র দেশ জুড়ে নিরুদ্যম প্রাণহীন জড়ত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে সন্ন্যাসী লিখলেন—"যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা ; চাই—সর্বদা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩১

পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।·· সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর।···রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?···ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ইহাও নিশ্চিত।"[১]

'উদ্বোধন'-পত্রিকার এই সূচনাপ্রবন্ধে স্বামীজী চেয়েছিলেন—"এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা"[২]···সেই সহায়তার সার্থকতার ভিত্তিতেই বর্তমান বিশ্বসভ্যতার পরিপূর্ণতা।

* * *

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সূচনার দু'মাস আগে 'উদ্বোধনে' 'বর্তমান ভারত' পরিসমাপ্ত। স্বাভাবিকভাবেই এ গ্রন্থের সূচনায় বর্তমান ভারতের ভাষাভঙ্গিমার রেশ থেকে গেছে। "সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দন-বিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ, পার্শ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে ভগ্নমৃন্ময়-প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্তত শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা, মধ্যে মধ্যে সমধর্মী শরীর গো-মহিষ-বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনরাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।"[৩] সামান্য অদল বদল হলেও আজ অবধি ভারতবর্ষের এই সঠিক চিত্র।

আজও অধিকাংশ শক্তিশালী বিদেশী জাতির চোখে আত্মকলহ-

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩২-৩৪

৩ তদেব : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃঃ ১৪৭

পরায়ণ আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যমহীন ভারতবাসীর প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ করুণার মনোভাবই প্রধানতঃ দেখা যায়। অন্যদিকে বিদেশী সভ্যতার আপাতপ্রবলতায় একদল লোক যেমন এদেশে তাদের অন্ধ অনুকরণে মত্ত, তেমনি আর একদল লোক যা কিছু বিদেশী তাকে ঘৃণার সঙ্গে বর্জনীয় মনে করেন। স্বামীজীর মতে—'দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না।"[১]

একাধিক বিদেশী শক্তির পদানত হয়েও ভারতবর্ষ কেমন করে তার সভ্যতার ধারা বজায় রেখেছে, তার উত্তরে স্বামীজী দেখিয়েছেন— "প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে।"[২] সেই ভাবটি অনেকসময় আমাদের স্বদেশবাসীরাও ধরতে পারেন না, বিদেশীদের তো কথাই নেই। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে ঈষৎ ব্যঙ্গ ও তীব্র শ্লেষে স্বামীজী বলছেন—"তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে, এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরা বেশ করে বোঝ—যাহা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু, তোমরা হে ইউরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে 'হাঁসেন হোঁসেন' করছ।"[৩]

বহুদিনের পরাধীন জাতির আত্মবিশ্বাসের অভাবই তাকে অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করে। বিশেষত রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে আমাদের অনুকরণপ্রিয়তা বোধ হয় সবচেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সেকালের ও একালের অনুকরণবিশারদদের ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে আজও সমান উপভোগ্য এবং ভারতীয় আদর্শের চিরন্তনতায় স্বামীজীর অবিচল আস্থার পরিচায়ক—"ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার

১, ২, ৩ বাণী রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : পৃঃ ১৪৯, ১৫০, ১৫১

সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড়ে চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী—উনি চীন জাপানে পর্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী ক'রে ক্রিশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড কুড়িহাত রাবণ নড়াতে পারেন নি, ও কি এখন পাদ্রী ফাদ্রীর কর্ম!! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন?"[১]

* * *

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা—শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। স্বামীজীর ভাষায় "ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক।"[২] যা মানুষকে বিবিধ কর্মে প্রবৃত্ত করে। আর 'মোক্ষ' মানে—"মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না।"[৩] ইহকাল বা পরকালের ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তিলাভই মোক্ষ। "এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই।"[৪]—ধর্মীয় দর্শনের দিক থেকে স্বামীজীর এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। আর এই মুক্তিতত্ত্বের উপরে নির্ভর করেই ভারতীয় চিন্তাধারা, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছিল। প্রাচ্য সভ্যতার মূল যে ভারতীয় সভ্যতা (যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে গ্রীক সভ্যতা) তার নিজস্ব প্রকৃতিটি অনুধাবন না করলে অন্য সভ্যতার সঙ্গে পার্থক্যের কারণও ঠিক ধরা যায় না।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫২

২, ৩, ৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫২

শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে ভারতীয় আদর্শে শিক্ষার্থী ও ব্রহ্মচারী শব্দ দুটি একার্থক। আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজয়িত্ব একই কথা। "আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য বিনা তা কেমনে হয়, বলো ? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্যের আবশ্যক তত নাই..."[১]

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য বোধ এবং ভারতীয় অদ্বৈতবাদের অদ্বয় উপলব্ধি—বিভিন্ন দিক থেকে একই সত্যে উত্তরণের চেষ্টা। কিন্তু অদ্বৈতবাদ যেমন সচেতনভাবে নিখিল-বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করেছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও তেমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সচেতনতায় পৌঁছায় নি। তবু পরিণামবাদের বিচারে এ দুই সভ্যতার অন্তর্নিহিত মিলটুকু স্বামীজীর দৃষ্টিতে সার্থক-ভাবে ধরা দিয়েছে।[২]

য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার উপকরণ সম্বন্ধে স্বামীজী বস্ত্র-বয়নের উপমায় বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন—"ইউরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হ'ল উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ ; এর তুলো হচ্চে—সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা-জাতের মিশ্রণে এক মহা-খিচুড়ি জাত। এর টানা হচ্ছে যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড় ; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোন বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ।"[৩]

"অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র—আর্য সভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে বর্ণাশ্রমাচার, এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিবারণ।"[৪]

"ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো।

১, ২, ৩, ৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৯৬, ১৯৭, ২০৭, ২১০-১১

আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। ইউরোপের সভ্যতায় উপায় তলওয়ার; আর্যের উপায় বর্ণবিভাগ; শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান—বর্ণবিভাগ; ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।"

মোক্ষকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় সভ্যতার পার্থিব জীবনধর্মকে বর্ণাশ্রমাচারের দ্বারা সংহত করার প্রয়াস সম্বন্ধে অনেকেই একমত হবেন। কিন্তু জন্মগত সুবিধাবাদ বর্ণাশ্রমকে যে নির্মম অত্যাচারে পরিণত করেছে, তার সঙ্গে তুলনায় ইউরোপীয় তলওয়ারের সংঘাত অনেক সহনযোগ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বর্ণাশ্রমের জন্যই ভারতে ধনীদরিদ্রের বা কায়িকভাবে দুর্বল-শক্তিমানের প্রভেদ ততটা মাথা তুলতে পারে নি। ভারতীয় সভ্যতার মূলে রয়েছে স্বাঙ্গীকরণের প্রয়াস, য়ুরোপীয় সভ্যতায় প্রভাবিত ও আমূল রূপান্তরিত করার আগ্রহ।

বিবেকানন্দসাহিত্যে বহুবিঘোষিত ভারতের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে এযুগে কারু কারু মনে সংশয় দেখা দিতে পারে। লোকায়তদর্শনের অনুরাগী কেউ কেউ ভারতবর্ষকেও জড়বাদী চিন্তার দেশরূপে প্রতিপন্ন করতে পারলে আশ্বস্ত হ'ন—সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় মনীষা একদিকে যেমন ঈশ্বরকেও যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা অস্বীকার করার সাহস রেখেছে, অন্যদিকে তেমনি পুরাকাল থেকে বেদান্তের অদ্বৈত-প্রত্যয় পরমসত্যকে বাক্যমনের অগোচররূপে নামরূপের পরপারে নির্দেশ করে এসেছে।

তবু সাধারণভাবে ভারতীয়দের আচার-আচরণে যে দুর্বল লোলুপতা ও হীনমন্যতা দেখা যায় তার কারণ কি? অপরপক্ষে য়ুরোপীয়দের বস্তুপ্রধান মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের আচার-আচরণে যে সরল নীতিবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা দেখা যায়, তারই বা উৎস কোথায়?

---

১ বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২১১

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'পথের সঞ্চয়'-গ্রন্থের 'যাত্রার পূর্বপত্র' রচনাটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। বাহান্ন বছর বয়সে য়ুরোপ-যাত্রাকালে কবির অন্তরে পাশ্চাত্যসভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে যে বক্তব্য দেখা দিয়েছিল, প্রাসঙ্গিকবোধে তার আংশিক উদ্ধৃতি—"য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে থাকে তখন আর তাহার সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। পাঁচজনে যাহা বলে ষষ্ঠ ব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই তখন যুক্তির স্থান গ্রহণ করিয়া বসে।

এ কথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে কোনো মঙ্গল দেখি না কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে ; বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।"[১]

এরপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে টাইটানিক জাহাজডুবির সময়ে য়ুরোপীয় যাত্রীদের "আত্মত্যাগের আশ্চর্য উদাহরণ স্থাপন করে প্রশ্ন করেছেন—"আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই ? এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে ?"[২]

জ্ঞানের রাজ্যে নিত্য নব আবিষ্কারে, মানবকল্যাণের জন্য নিত্য নব আত্মদানে য়ুরোপ প্রতি মুহূর্তে তার অজস্র প্রাণশক্তির উদাহরণ দিয়ে চলেছে। এমন কি সুদূর বিদেশে যদি কোনো সত্যের সন্ধান সে পায়, তা হলে একজন য়ুরোপীয় যে ত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বারা সে সত্যকে অনুধাবন করে, রবীন্দ্রনাথ রামমোহন-অনুগামী হ্যামারগ্রেন এবং বিবেকানন্দ-অনুগামী নিবেদিতার[৩] মধ্যে তার উজ্জ্বল উদাহরণ দেখেছেন।

১, ২ রবীন্দ্ররচনাবলী : দশম খণ্ড : জন্মশতবার্ষিক সং : পৃঃ ৮৬৩, ৮৬৫

৩ "ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করিয়া কিরূপ

"...এই দুটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার মধ্যে আত্মদান করিয়াছেন যেখানে তাঁহাদের জীবনের কোনো পূর্বাভ্যস্ত সহজ পথ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না ; যেখানে তাঁহাদের হৃদয়মনের আজন্মকালের সংস্কার পদে পদে কঠোর বাধা পাইয়াছে ; যেখানে কেবল যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা নহে, পদে পদে আত্মোৎসর্গের পথ তাঁহাদের নিজেকে খনন করিয়া চলিতে হইয়াছে—কেননা, তাঁহাদের প্রবেশ চারি দিকেই অবরুদ্ধ।

"সত্যকে ভক্তি করিবার এই ক্ষমতা, এবং সত্যের জন্য দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করিবার এই শক্তি, এ যে তাঁহাদের জাতীয় সাধনা হইতেই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এই আশ্চর্য শক্তি কি বস্তু-উপাসনার দ্বারা কেহ লাভ করিতে পারে? ইহা কি যথার্থই আধ্যাত্মিকতা নহে? এবং জিজ্ঞাসা করি এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই

আপাতদৃষ্টিতে য়ুরোপের এই প্রাণশক্তিকে আধ্যাত্মিকতারই একটি দিক বলে মেনে নিলেও বিবেকানন্দ যে 'মোক্ষ' ও 'ধর্মে'র পার্থক্যের কথা বলেছেন, সেদিক থেকে য়ুরোপের সাধনাকে আমরা ধর্মের পরিচায়করূপে অবশ্যই স্বীকার করব, কিন্তু সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মার স্বাধিকারের সত্য বলে মেনে নিতে পারব না। য়ুরোপে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের আদর্শ যেমন দেখানো যেতে পারে, ভারতে তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য সর্বত্যাগের আদর্শ জাতীয় জীবনের প্রধান সুর। তাছাড়া আধ্যাত্মিকতার স্তরগত তারতম্যের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। য়ুরোপের কর্মমুখর সভ্যতার অসাধারণ মনোবলের কথা স্বীকার করেও বলা যায় তা ভারতীয় পরাবিদ্যাসম্মত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকাশ নয়। অপরপক্ষে ভারতীয় সভ্যতায়

অদ্ভুত আত্মত্যাগের দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।" রবীন্দ্ররচনাবলী : দশম খণ্ড : পৃঃ ৮৬৬

১ তদেব পৃঃ ৮৬৬-৮৬৭

ব্যবহারিক জীবনের সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরমপ্রজ্ঞাই এ সভ্যতাকে আজ অবধি ধারণ করে আছে। হ্যামারগ্রেন বা নিবেদিতা তাঁদের য়ুরোপীয় ধৈর্য ও একমুখীনতাকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁরা যে পরিমাণে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করতে পেরেছেন, সেই পরিমাণেই তাঁদের সিদ্ধি। য়ুরোপীয় বলে নয়, ভারতীয়করণের দ্বারাই তাঁদের অধ্যাত্মচেতনার সার্থকতা।

য়ুরোপ-পরিক্রমাকালে স্বামীজী সে দেশের ঐশ্বর্য ও মহিমায় যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি শুনতে পেয়েছেন সব আনন্দ-কলরোলের অন্তরালে গোপন বেদনার দীর্ঘশ্বাস। স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন—"জড়শক্তির লীলাভূমি য়ুরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করে আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে।"[১] তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতা আগ্নেয়গিরির উপরের প্রতিষ্ঠিত নগরী—যে-কোনো মুহূর্তে অগ্নি-উদগীরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। স্বামীজীর এ-বক্তব্য কেবল তদানীন্তন য়ুরোপ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য একথা মনে করার কারণ নেই, পরবর্তীকালের দুই মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত য়ুরোপও আসন্ন পরামাণুযুদ্ধের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে গুণতে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করে চলেছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগ্রাহিতায় বিবেকানন্দের আন্তরিকতাও সমান লক্ষণীয়। পাশ্চাত্যের অগ্রগতির সম্বন্ধে ঈর্ষ্যাকাতর ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর নির্দেশ—"এ সংসার—'দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর' কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দু-শ হাত দিয়ে দেখছে; আমরা—'গোঁসাইজী যা পুঁথিতে' লেখেন নি—তা কখনই করব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা, খালি চীৎকার হচ্ছে; বস্! কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি চেয়ে দেখ না। আপনা-

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৫১-৫২ দ্রঃ

আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।"[১] রহস্যচ্ছলে দু' সভ্যতার মূল পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী লিখছেন—"দেবাসুরের গল্প তো জানই। দেবতারা আস্তিক—আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে—পরলোকে বিশ্বাস রাখে। অসুররা বলছে—ইহলোকে এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকে সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সেকথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই তো দেখি মনিষ্যির মতো, দেবতাগুলো তা অনেকাংশে হীন। এখন বোঝ যে, তোমরা দেবতার বাচ্চা আর পাশ্চাত্যেরা অসুরবংশ, তা হলেই দু-দেশ বেশ বুঝতে পারবে।"[২]

পাশ্চাত্যে নারীর সম্মান স্বামীজীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। ভারতবর্ষে বহুযুগের পদদলিত নারীসমাজের তুলনায় পাশ্চাত্যের নারীজাতির স্বাতন্ত্র্য ও কর্মশক্তি স্বাভাবিকভাবেই নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ বিবেকানন্দের পক্ষে মর্মগ্রাহী হয়েছিল—"ক্যাথলিক য়ুরোপের মেরীপূজা, আধা বামাচার রকমের ; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ, শক্তিপূজা, বামাচার,—মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেস্টান্ট তো ইউরোপে নগণ্য—ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে ধর্মে জিহোবা যীশু ত্রিমূর্তি—সব অন্তর্ধান, জেগে বসেছেন 'মা'! শিশু-যীশু-কোলে 'মা'। লক্ষস্থানে লক্ষরূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা' 'মা' 'মা'! বাদশা ডাকছে 'মা', জঙ্গ বাহাদুর সেনাপতি ডাকছে 'মা', ধ্বজাহস্তে সৈনিক ডাকছে 'মা', পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে 'মা', জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকছে 'মা', রাস্তার কোণে ভিখারী ডাকছে 'মা', 'ধন্য মেরী' 'ধন্য মেরী' দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।

"আর মেয়ের পূজো। এ শক্তিপূজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তিপূজো কুমারী সধবাপূজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক কল্পনা প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তিপূজো। তবে আমাদের পূজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণমাত্র ; এদের দিনরাত, বারমাস।"[৩]

১, ২, ৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬৮ ; ১৯০-৯১

ফরাসীজাতি য়ুরোপের অগ্রণীরূপে বিবেকানন্দের বিমুগ্ধ শ্রদ্ধার কেন্দ্র। য়ুরোপের নবজন্মবর্ণনাপ্রসঙ্গে (স্বল্পকথায় সরল ভঙ্গিমায় এই নবজন্ম (Renaissance)—বিবরণও অপূর্ব) পারি ও ফ্রাঁসের কথা বিশেষভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে 'পারিপ্রদর্শনী'র অভিজ্ঞতা এদিক থেকে সহায়ক হয়েছে। "এই পারি নগরী সে. ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ-নগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ—না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউ ইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই ফরাসী মানুষ। ধন থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও থাক—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক ম'রে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।"[১]

অনেকটা বাঙালীচরিত্রের সঙ্গে মেলে বলেই কি স্বামীজী ফরাসীদের অতো ভালোবেসেছিলেন?

* * *

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধারার তুলনামূলক আলোচনায় দৈনন্দিন জীবনচর্চা থেকে আরম্ভ করে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-বিচার, রীতিনীতি ধর্মকর্ম—সর্ববিষয়ে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী পাঠককে সরস বৈদগ্ধ্যে মুগ্ধ করে রাখে। এদিক থেকে দু'একটি উদাহরণ পাঠকের কাছে নিবেদন করি।

পরিচ্ছন্নতা-সম্বন্ধে দুই সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গী—"আমরা দিব্যি স্নান করে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইউরোপে ময়লা গায়ে না নেয়ে একটি ধপধপে পোষাক পরলে। এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগাগোড়ায় তফাত—হিন্দুর সেই যে অন্তর্দৃষ্টি তা আগাপাস্তলা সমস্ত কাজে। হিন্দু—ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতি—

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৯৩

সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিন্দুর পরিষ্কার শরীর হলেই হ'ল, কাপড় যা তা হোক! বিলাতির কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিন্দুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতির মেজে কারপেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল! হিন্দু করছেন ভেতর সাফ, বিলাতি করছেন বাইরে সাফ।"[১]

জীবনদৃষ্টির পার্থক্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের হাস্যরসমিশ্রিত একটি উদাহরণ—"আয়ু, বল, বীর্য, এদের আর আমাদের, অনেক ভেদ; আমাদের বল, বুদ্ধি, ভরসা—তিন পেরুলেই ফরসা; এরা তখন সবে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী[২] বিজ্ঞ ডাক্তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা কি প্রায় নিরুৎসাহ বৈরাগ্যবান হয়? হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে আশা বিশ্বাস পূরো থাকে। ওলাওঠা রোগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারোগী মরবার সময় পর্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে। অতএব সেই জন্যই কি ভারতের লোক সর্বদাই মরণ আর বৈরাগ্য বৈরাগ্য করছে?"[৩]

আমিষ-নিরামিষ প্রসঙ্গে স্বামীজীর হাসিঠাট্টার বিশেষ ভঙ্গী—"পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। একপক্ষ বলছেন যে মাংসাহারে যত রোগ; অপরপক্ষ বলছেন, ও গল্পকথা, তা হলে হিঁদুরা নীরোগ হত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত, রোগে লোপাট হয়ে যেত এতদিনে। একপক্ষ বলছেন যে ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরে বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপরপক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৭১

২ এক্ষেত্রে বিদেশী। স্বামীজী তখন য়ুরোপ-আমেরিকায় ভ্রমণরত।

৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬৫-১৬৬

এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড় বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। একপক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই. তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক।"[১]—অবশ্য মাংসাহারকে স্বামীজী রজোগুণাত্মক কর্মের পক্ষেই প্রশস্ত মনে করতেন, সত্ত্বগুণীদের পক্ষে নিরামিষ আহারই নির্দেশ করে গেছেন।[২]

সমগ্র 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' জুড়েই এমনি লঘু ভঙ্গীতে গুরু বিষয়ের অবতারণা। কিন্তু কোথাও এ রচনাকে বাকসর্বস্ব মনে হয় না। প্রতিটি বিষয়ের পিছনে আছে তীক্ষ্ণতম পর্যবেক্ষণ ও সুদীর্ঘ মননের ইতিহাস। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এই কারণেই স্বামীজীর গ্রন্থচতুষ্টয়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

* * *

মননের গভীরতার সঙ্গে বাচনের সরসতার এমন মিলনে বিবেকানন্দের পরে যোগ্য উত্তরসূরী প্রমথ চৌধুরী। অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভঙ্গীতে সওয়াল জবাবের প্রাধান্যের জন্য একটু কৃত্রিমতা এসে পড়েছে, তবু সরস গদ্যভঙ্গীর অন্তর্লীন পরিহাসবৈদগ্ধ্যে বাংলা-ভাষার তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। একথা আজকের দিনে পুনরুক্তি করতে হলো—কারণ, প্রমথ চৌধুরী-শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়নে নেতিবাচক প্রবণতাই দুর্ভাগ্যবশত বেশী।

বক্তব্য-নিবেদনে স্বামীজীর আপাত লঘুভঙ্গী আবার যখনই প্রয়োজন দার্শনিক জিজ্ঞাসাও ফুটিয়ে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদ—Evolution Theory (স্বামীজীর পরিভাষায় 'পরিণামবাদ') সম্বন্ধে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। স্বামীজীর মতে এই মতবাদ য়ুরোপে নূতন হ'লেও ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান। তবে ইউরোপীয় evolution (এভোল্যুশন) বহির্মুখী, ভারতীয় পরিণামবাদ অন্তর্মুখী।

"পূর্বে বলেছি যে আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে,

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৭৪, ১৭৫

শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদাভাবটা ভুল; ওসব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, মাটি পাথর গাছপালা জন্তু মানুষ দেবতা এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে, অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌঁছুলেন, বল্লেন যে, সমস্তই সেই একের বিকাশ।...এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এখন বুঝেছে—এদের রকম দিয়ে—জড় বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে।..."[১]

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে য়ুরোপীয় ভারততাত্ত্বিকেরা যখন আর্য-অনার্য-দ্বন্দ্বের কল্পনায় মত্ত, স্বামীজী তখন প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য মন্থন করে এ মতবাদের অসারতা প্রমাণে কৃতসঙ্কল্প। বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণ মহাভারতের পৌরাণিক যুগ অবধি কোথাও এ জাতীয় সংঘাতের বিবরণ নেই। রামায়ণের বানর বা রাক্ষস কাউকেই রামচন্দ্র পদানত করতে চান নি, বিশেষত বানরদের তো নয়ই। রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাদের কারণ রাজনৈতিক প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা নয়। রাবণের রাজ্য ও সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী বই কম নয়। সেদিক থেকে বরং আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বন্যজাতিদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার স্মরণীয়। অপরপক্ষে সভ্যতার স্তরভেদ অনুসারে ভারতবর্ষ সব অশিক্ষিত ও অসভ্য জাতিকেই গ্রহণ করে ধীরে ধীরে উচ্চতর স্তরে উপনীত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে—কোনো আরণ্যক জাতিকেই বিনষ্ট করে নি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র পরিশিষ্টে স্বামীজী য়ুরোপ ও এশিয়ায় মুসলমান ও খ্রীষ্টান-বিজয়ের ইতিহাস অবলম্বনে দেখিয়েছেন যে, খৃষ্টধর্মের অনুগামীদের চেয়ে ইসলামের অনুসারীরা অন্য জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতিরক্ষায় উদারতর।[২]

* * *

'প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যে'র এই তুলনামূলক আলোচনার পিছনে স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীকে আধুনিক জীবনসংগ্রামের

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২০০

২ তদেব : পৃঃ ২১০-১৩

উপযুক্ত করে তোলা। যে ব্যক্তি বা জাতি ধর্মের নামে আলস্য ও জড়তাকে প্রশ্রয় দেয় তার ইহকালই নষ্ট, পরকাল তো দূরের কথা।

"অহিংসা ঠিক, নির্বৈর বড় কথা; কথা ত বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং' ইত্যাদি।... বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্যপ্রকাশ কর, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক!...অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহাউৎসাহে অর্থোপার্জন করে, স্ত্রী পরিবার দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নয়—আবার 'মোক্ষ!'

...আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'।"[১]

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের মধ্যে পৌরাণিক যুগের শ্রীকৃষ্ণ ও ঐতিহাসিক যুগের বুদ্ধই বিবেকানন্দমানসে উজ্জ্বলতম। লক্ষণীয়—দু'জনেই ক্ষত্রিয়—বিবেকানন্দ নিজেকে যে বংশোদ্ভূত মনে করতেন। শ্রীকৃষ্ণজীবনে পরমজ্ঞান, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অদ্ভুত কর্মকুশলতা, অনন্তপ্রীতি—এ সব কিছুর সংমিশ্রণ স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত করেছে। ভারতীয় জীবনাদর্শের চিরসারথি ও চিরসখা এই মহানায়ক কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম-কোলাহলের মধ্যস্থলে বসেই পরম-সত্যের মন্ত্রবাণী উচ্চারণ করেছেন। বিবেকানন্দজীবনের ঝটিকাবর্তের অন্তরালে তন্ময়ধ্যানের উপলব্ধিতে তাঁর স্বভাবস্থিতি লক্ষণীয়। সত্ত্বগুণের অর্থ যে নিরুদ্যম জড়তা নয়, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও নবভারতের বিবেকানন্দ-জীবন।

'মোক্ষ' ও 'ধর্মে'র যে পার্থক্য স্বামীজী আগে বুঝিয়েছেন সেই

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৫৩

সূত্রে তাঁর মন্তব্য—'মুক্তিকামের 'ভাল' অন্যরূপ, ধর্মকামের 'ভাল' আর একপ্রকার। এই গীতাপ্রকাশক শ্রীভগবান এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি, 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব' ইত্যাদি ধর্মলাভের উপায় ভগবান দেখিয়েছেন। অবশ্য কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলই বা ; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয় ? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল মন্দ মিশ্রকর্ম করা ভাল নয় ? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।"[১]

ভাষার ক্ষেত্রে যেমন স্বামীজী ভিক্টোরীয় যুগের শুচিবাইগ্রস্ততাকে অনায়াসে অবহেলা করেই সবল মনুষ্যত্বের সজীবতা সঞ্চার করেছেন, জাতীয় জীবনে রজোগুণসঞ্চারের আগ্রহেও তেমনি ভালো-মন্দের প্রচলিত মাপকাঠিকে অনায়াসে অবজ্ঞা করেছেন। তবু মূল্যবোধে তিনি যে অবিচল, সেকথা 'প্রাচ্য' আদর্শকে 'দেবতা' ও 'পাশ্চাত্য' আদর্শকে 'অসুরের' সঙ্গে তুলনাতেই পরিস্ফুট। নিষ্কাম আত্মোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া যথার্থ আধ্যাত্মিকতা হতেই পারে না—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যেখানে তা আছে সেখানেই যথার্থ আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু আদর্শের সেই তুঙ্গশিখরে পৌঁছুবার আগে সদসৎ-মিশ্রিত কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের যাত্রা। বিচারশীল মন ক্রমে 'সৎ'-আদর্শের অনুবর্তী হয়ে পরম সত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছয়।

* * *

'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দুই গ্রন্থেরই ভাষাশৈলী মোটামুটি এক। তবু 'পরিব্রাজকে'র ভাষায় তৎসম শব্দ বা সমাসবদ্ধ পদের বাহুল্য, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এসে স্বামীজীর চলতিভাষা আরো

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১:৪-৫৫

স্বচ্ছন্দ, দেশজ শব্দ ও রীতিতে সমৃদ্ধ, পাঠক ও লেখকের অন্তরঙ্গতাও গভীরতর।

দুটি গ্রন্থেই লেখনভঙ্গী এসেছে চিঠিপত্রের অন্তরঙ্গতা থেকে। 'পরিব্রাজকে' যেমন 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে উদ্দেশ করে 'স্বামীজী'—সম্বোধন, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' তা না থাকলেও উদ্দিষ্ট পাঠক 'উদ্বোধনের' কর্তৃপক্ষ এবং তাঁর গুরুভাইয়েরা—একথা বেশ বোঝা যায়। স্বামীজীর পত্রসাহিত্যের রচনারীতিই এক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু সীমাবদ্ধ পত্রের চেয়ে দীর্ঘবিস্তারী প্রবন্ধ-রচনায় স্বামীজীর ব্যক্তিসত্তা ও বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার দুয়েরই বহু বিচিত্র ও অতলান্ত প্রকাশ পাঠকের প্রত্যাশাকে আরো বেশী তৃপ্ত করে। সেই সঙ্গে বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের আরো বৃহত্তর দানের সম্ভাবনার প্রশ্ন মনে জাগায়। কিন্তু যা হতে পারতো তার আলোচনা সমালোচকের দায় নয়, যা হয়েছে তার সৌভাগ্যকে উপলব্ধি করাই সমালোচকের কর্তব্য। সেদিক থেকে 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অমর সৃষ্টি।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র আলাপচারী ভঙ্গীকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনদৃষ্টির দার্শনিক পার্থক্য; দ্বিতীয়ত দুই জীবনধারার দৈনন্দিন ও সামাজিক পটভূমিকায় বিচার; তৃতীয়ত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দুই সভ্যতার আদর্শ বিচার। কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রাচ্য সভ্যতার জন্মভূমি ভারতের মানুষ হিসাবে প্রাচ্য আদর্শের প্রতি স্বামীজীর পক্ষপাত। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণশক্তির সঙ্গে স্বামীজীর রজোগুণাদর্শের মিলটুকুও লক্ষণীয়। এ দুই সভ্যতার মিলনসাধনই তাঁর বিশ্বপরিক্রমার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-গ্রন্থে নিপুণভাবে সাধিত।

উত্তর কলকাতার চলতি ভাষাভঙ্গীকেই স্বামীজী 'পরিব্রাজকে' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' ব্যবহার করেছেন। এর ফলে একটু অতিরিক্ত আঞ্চলিকতা তাঁর ভাষায় সঞ্চারিত। পরিবর্তনশীল মুখের ভাষা স্বল্পসময়ের ব্যবধানেই অপ্রচলিত শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আরো

কিছুকাল পরে স্বামীজীর চলতিভাষা কলকাতার লোকের কাছে পুরানোকালের ঠেকতে পারে। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে স্বামীজী যা চেয়েছিলেন—"ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়"—সেই আদর্শ তাঁর চলতিভাষার গ্রন্থগুটিতে সার্থকভাবে প্রমাণিত। কালস্রোতে এ ভাষার ইস্পাতধর্মে কখনো মরচে পড়বে না—এ বিশ্বাস সকলেরই। হয়তো আধুনিক যুগের চলতিভাষায় আধুনিক শব্দ, উচ্চারণ বা প্রবাদ-প্রবচন দেখা দেবে এইমাত্র।

বিবেকানন্দের দেহাবসানের পরে কিছুকাল বাংলাসাহিত্যে তাঁর সাধনা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমকালীন সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও অন্যতম। ১৩১৫ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রমানসে স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়-আদর্শ কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, সেই উদ্ধৃতির দ্বারা এ প্রবন্ধের বক্তব্য সমাপন করি। এ প্রবন্ধে রামমোহন, রানাডে ও বিবেকানন্দকে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন-সাধক রূপে বর্ণনা করতে গিয়ে বিবেকানন্দপ্রসঙ্গে লিখেছেন, "অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হয়েছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছেন। ভারিতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"[১]

বাংলাসাহিত্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র অসাধারণত্বে যাঁরা গুণমুগ্ধ

১ সমাজ : পূর্ব ও পশ্চিম : রবীন্দ্ররচনাবলী : ত্রয়োদশ খণ্ড : শতবার্ষিক সংস্করণ : পৃঃ ৫৫

তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ অন্যতম।[২] বিবেকানন্দের কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি এ বিষয়টি বাংলার নানা লেখককে আকৃষ্ট করেছে, নানা জনে নানাভাবে এ দুই সভ্যতার পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন , ভবিষ্যতেও করবেন। কিন্তু প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনায়, ভাষারীতিতে ও বক্তব্যস্থাপনে যে সিদ্ধি বিবেকানন্দ আয়ত্ত করেছিলেন, তা চিরকালের শ্রদ্ধা ও সমাদরের বস্তু হয়ে থাকবে।

১ উদ্বোধন : সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা : কুমুদবন্ধু সেনের 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা' প্রবন্ধ এবং এই বইয়ের পৃঃ ২৮-২৯-এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২ প্রমথ চৌধুরী : 'আমরা ও তোমরা'—প্রবন্ধ

অন্নদাশংকর রায় : পথে প্রবাসে

দেবেশচন্দ্র দাশ : ইয়োরোপা

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

১

'পত্রাবলী'

বাংলা গদ্যের রূপান্তরের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট-ভূমিকার কথা সুবিদিত। সাহিত্যের আনন্দ-অমৃত যে সব অনুভূতির মাধ্যমে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়, তার মধ্যে হাস্যরস অন্যতম, আর সে ক্ষেত্রেও স্বামীজীর ভূমিকা অনন্যসাধারণ। বস্তুত বাংলা-সাহিত্যে হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ লেখকদের পাশাপাশি তাঁর রসবোধ ও প্রকাশ-কুশলতা। কিন্তু জাতীয় পুনরুজ্জীবনে তাঁর স্বদেশমন্ত্রের মন্দ্রধ্বনির বিস্তারে তাঁর এই সহজাত রসিক সত্তাটির কথা আমাদের মনে থাকে না। অথচ বিবেকানন্দ-ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয়ে তাঁর কৌতুক, পরিহাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ এবং আনন্দদৃষ্টি (হিউমার) যেমন অবশ্য লক্ষণীয়, তেমনি তাঁর সাহিত্যিক সত্তার উপলব্ধিতেও বিশেষ সহায়ক।

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রধান লেখকরূপে বাংলাসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের আগে যে সব রচনার পরিচয় পাই, তাতে হাস্যরসের অবকাশ বা প্রয়োজন দেখা যায়নি। কিন্তু সবার অগোচরে যে সাহিত্যিক-সত্তা তাঁর 'পত্রাবলী'তে বিকশিত হয়ে উঠছিল, সেই পত্র-সাহিত্যেই তাঁর সহজাত হাস্যরস-সৃজনশক্তির প্রকাশ সূচনা। এ শক্তির মূলে তাঁর পৌরুষদীপ্ত আত্মপ্রত্যয়। সে পৌরুষ কেবল যে অসঙ্গতিই দেখিয়ে দেয়, তা নয়, সেই সঙ্গে মানুষের সব অপূর্ণতার কথা জেনেই তাকে মহত্তর পরিণামের পথে চালিত করে। ফলে লঘু বা তীব্র যে সুরেই তাঁর হাস্যরস ধ্বনিত হোক,—তার আড়ালে রয়েছে একটি মরমী সত্তা।

পত্রসাহিত্যে স্বামীজী ইংরেজী ও বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। সাধু ও চলতি দু' ধরনের গদ্যেই তাঁর পত্রাবলী সমৃদ্ধ।

তবে চলতি-ভাষায় যে নৈপুণ্য পরবর্তীকালে তাঁকে বাংলা-গদ্যের বন্ধন-মুক্তিতে সহায়তা করেছে, সেই চলতি-ভাষার ভূমিকা-রচনার দিক থেকে পত্রাবলীর গুরুত্ব অসামান্য। আর এই চলতি ভাষায় লেখা চিঠিগুলির মধ্যেই তাঁর মুক্ত হৃদয়ের উজ্জ্বল প্রতিফলন হাস্যরসের নানা ভঙ্গিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু যেমন তিনি নিজে, স্বামীজীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। নিজের বা পরের বা অন্য যে কোনো বিষয়ের কথা তিনি লিখুন না কেন, প্রকাশভঙ্গীটি যেখানে তাঁর নিজস্ব মুখের কথার মতো, সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বটি স্বভাবতই আরো প্রত্যক্ষ এবং আরো মুগ্ধকর। সবার আগে তেমন একটি উদাহরণ পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করি,—"বাবুরামের লম্বা পত্র পড়লাম। বুড়ো বেঁচে আছে—বেশ কথা। তোমাদের আড্ডাটি নাকি বড় malarious (ম্যালেরিয়াগ্রস্ত)—রাখাল আর হরি লিখছেন। রাজাকে আর হরিকে আমার বহুত দণ্ডবৎ লাট্টিবৎ ইষ্টিকবৎ ছতরীবৎ দিবে। আমার বহুত চিঠি লেখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture (লেকচার) ফেকচার তো কিছু লিখে দিই না। একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ যা মুখে আসে, গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজপত্রের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই। একবার ডেট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মধো'—তোর পেটে এতও ছিল!"[১]

উত্তর কলকাতার শিমলা পাড়ার তরুণেরা—বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণী সেকালে যে বাংলা কথা বলতেন, উদ্ধৃত পত্রাংশে স্বামীজীর সেই ভঙ্গীটি—তাঁর কথাবার্তার স্বভাবসরস ভঙ্গীটি এক্ষেত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'দণ্ডবৎ' থেকে দণ্ডের নানা প্রতিশব্দ এসে কথা ও কল্পনার যুগপৎ খেলা এমন এক খেয়ালরসের পরিচয় বহন করে যা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪৫৫, ১৮৯৪ (গ্রীষ্মকাল)।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং পরিশীলিত বাগ-বৈদগ্ধ্যের পরিচয়বাহী। আবার নিজের বক্তৃতা সম্বন্ধে নিজেই অমন পরিহাস করতে পারা—সেও খুব উঁচু দরের আত্মবিশ্বাসেই সম্ভব। উদ্ধৃত চিঠিটির কিছুদিন পরেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা আর একটি চিঠিতে আমেরিকায় স্বামীজীকে যে মনন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, তার বিবরণ দিতে গিয়ে যে নির্ভীক দৃঢ়সংকল্প যোদ্ধার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে, তাতে একই সঙ্গে কৌতুক পরিহাস ও বেপরোয়া মনোভাবের সার্থক সংমিশ্রণ—"শশী প্রভৃতি যে ধূমক্ষেত্র মাচাচ্ছে, এতে আমি বড়ই খুশী। ধূমক্ষেত্র মাচাতে হবে, তার কম চলবে না। কুছ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধূমক্ষেত্র মেচে যাবে, 'ওয়াহ্ গুরুকা ফতে'। আরে দাদা, 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'; ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড় লোক তৈরী হয়ে যায়।···বলি মোহন, মিশনরী-ফিসনরীর কর্ম কি এ ধাক্কা সামলায়, এখন মিশনরীর ঘরে বাঘ সেঁধিয়েছে। এখানকার দিগগজ দিগগজ পাদ্রীতে ঢের চেষ্টা বেষ্টা করলে—এ গিরি গোবর্দ্ধন টলাবার জো কি! মোঘল পাঠান হদ্দ হল—এখন কি তাঁতীর কর্ম ফার্সি পড়া, ওসব চলবে না ভায়া, কিছু চিন্তা ক'রো না। সকল কাজেই একদল বাহবা দেবে, আর একদল দুষমনাই করবে। আপনার কার্য করে চলে যাও—কারুর কথার জবাব দেবার আবশ্যক কি?"[১]

শব্দ নির্বাচনে স্বামীজীর অপক্ষপাতিত্ব চলতি ভাষার পক্ষে একটি বড়ো গুণ। এ বিষয়ে প্যারীচাঁদ বা হুতোমের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা। কিছুটা এই বেপরোয়া ভাব হুতোমের রচনাভঙ্গীতেও মেলে—কিন্তু সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র হওয়ার ফলে হুতোমের রচনায় নেতিবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রাধান্য। অন্যপক্ষে স্বামীজীর লেখায় ইতিমূলক প্রেরণার ফলে কঠোর বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গও শেষ অবধি জ্বলন্ত বিশ্বাসেরই অনুরূপ।

'কুছ পরোয়া,' 'ওয়াহ্ গুরুকা ফতে', 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' 'মোগল পাঠান হদ্দ হল' প্রভৃতি প্রয়োগে নানা ভাষার অব্যর্থ প্রয়োগ যেমন, তেমনি আবার প্রবাদ-প্রবচনের সুপ্রয়োগও লক্ষণীয়।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৪৮২

হাস্যরসের অন্যতম প্রধান উপকরণ প্রবাদ প্রবচনের যথাযোগ্য ব্যবহার। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ দুজনারই দক্ষতা প্রণিধানযোগ্য।

কথায় কথায় কল্পিত কোনো ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বক্তব্য প্রকাশও চলতি ভাষার একটি প্রধান গুণ। 'মধো, তোর পেটেও এত ছিল!' 'বলি মোহন' 'রামচন্দ্র'! 'ন্নিধে পেলা' এ জাতীয় কথাগুলির নিজস্ব ব্যঞ্জনা আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তায় শোনা যায়।

স্বামীজী সেই ভঙ্গীটি অবিকল তাঁর লেখার ভাষায়ও সঞ্চার করেছেন। আমাদের ঘরোয়া কথায় এক এক যুগে এই সম্বোধনের নামটি হয়তো এক এক রকম, তবে মূলত স্বল্পবুদ্ধি এবং অন্যের কথায় চালিত ব্যক্তিরাই এর লক্ষ্যস্থল।

যে 'জীব শিব' মন্ত্র তিনি রামকৃষ্ণদেবের কাছে লাভ করেছিলেন, যে মন্ত্রের প্রচার ও জীবনময় উদ্‌যাপনে ব্যাকুলতা তাঁর লেখার মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের স্পর্শ এনে দিয়েছে, তারই অন্যতম উদাহরণ—"মুক্তি ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে—দুনিয়ায়—পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ (পরোপকারের জন্যই সাধুদের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্যই তা উৎসর্গ করবেন)। তোমার ভাল করলেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নেই। 'হে ভগবান, হে ভগবান'। আরে ভগবান হেন করবেন, তেন করবেন—আর তুমি বসে বসে কি করবে?···তুই ভগবান, আমি ভগবান। মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব করছে; আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন?"[১]

সমাজে সংসারে নানাভাবে মানুষের এই বুদ্ধির দৌড় দেখতে দেখতে তীব্র ব্যঙ্গে তাঁর শাণিত লেখনী প্রচলিত হিন্দুয়ানির ভণ্ডামিকে জর্জরিত করেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা একটি পত্রে 'বিমলা' ও

১ বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৭৪, ১৮৯৫, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা।

'শশী সাণ্ডেল'নামে দু'জনের উপলক্ষে স্বামীজীর ভাষাভঙ্গী—[শশী সাণ্ডেলের] "পুঁথি পড়ে বিমলা অবগত হয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র, এবং তাদের প্রকৃতিতে আসল ধর্ম হবার জো-টি নাই। কেবল ভারতবর্ষের একমুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন তাঁদের ধর্ম হতে পারবে। আবার তাদের মধ্যে শশী আর বিমলাচরণ—এরা হচ্ছেন চন্দ্রসূর্যস্বরূপ। সাবাস, কি ধর্মের জোররে বাপ! বিশেষ বাঙলা দেশে ঐ ধর্মটাই বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা তো আর নাই। জপতপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র।"[১]

উল্লেখিত শশী সাণ্ডেলের লেখা একখানি 'আধ্যাত্মিক' বিষয়ে বাংলা বই ছাপানোর জন্য আমেরিকা থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় কিনা, এই বিমলার চিঠির জিজ্ঞাস্য। অথচ ব্রাহ্মণকুলমাহাত্ম্যে এদেশে বা বিদেশে আর সকলেই যে ঘৃণ্য, সেইটি এঁদের মজ্জাগত ধারণা। দুনিয়াশুদ্ধ লোককে যত ঘৃণা করা যাবে, তারা ততই প্রণাম ঠুকে এঁদের মহিমা বাড়াবেন, এমন স্পর্ধিত প্রত্যাশার ক্ষেত্রে স্বামীজীর মন্তব্য—"যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম হতে পারে না, যদি এদেশে ধর্ম প্রচার করা ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহায্য গ্রহণে আবশ্যক কি? বিমলা সিদ্ধান্ত করেছে যে, যখন ভারতশুদ্ধ লোক শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলার পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে দেয় না, তখন ভারতের সর্বনাশ উপস্থিত। কারণ, শশীবাবু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন এবং বিমলা তৎপাঠে নিশ্চিত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহ পবিত্র নাই। এ রোগের ঔষধ কি?"[২] এরপর এ চিঠিতে ধর্মব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্যের তীব্রতা আক্রমণের মতো শোনালেও মনে রাখতে হবে যে, স্বামীজীর পত্রাবলীতে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য দুই প্রান্তেরই ধর্মধ্বজীদের উদ্দেশে তাঁর সমান ধিক্কারবাণী। তথাকথিত লোকাচারকে যারা

১, ২ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : 'ভাব্‌বার কথা' রসরচনাগুচ্ছে 'কুব্জব্যাল ভট্টাচার্য' স্মরণীয়।

ধর্মের সঙ্গে একাত্ম করে চালাতে ইচ্ছুক, সেই ধর্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ধারকবাহকদের চিন্তার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তিনি যখন লেখেন —"…'দেহি দেহি' চুরি বদমাশি—এরা আবার ধর্মপ্রচারক। পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে, 'ছুয়ো না ছুঁয়ো না'—আর কাজ তো ভারি—আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহ'লে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে? ১৪ বার হাতে মাটি না করলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ?'—এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ দু'হাজার বৎসর ধরে। এদিকে ¼ of the People are starving (সিকি ভাগ লোক অনাহারে রয়েছে)।…"[১]

এই বিমলা ও তাঁর গুরু শশী সাণ্ডেল প্রসঙ্গেই স্বামীজীর সেই বেদনাহত হৃদয়ের তিক্ত কঠোর বাস্তবদর্শী মন্তব্য—"ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান, ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই—এখন ভাতের হাঁড়িতে…।"[২]

বাংলাসাহিত্যে স্বামীজীর এই জাতীয় মন্তব্য অমর হয়েছে এদের মধ্যে ভারতীয় ভাবজীবনের দুর্বলতা সম্বন্ধে অসামান্য স্পষ্টোক্তির দক্ষতায়। ধর্মের স্বরূপ তিনি আপন গুরুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, আপন সাধনায় উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের নামে যে কপটতা চলে, বিশেষত জাতিভেদের গোঁড়ামির মূলে ধর্ম সম্বন্ধে যে ভ্রান্তধারণা তার বিরুদ্ধে এমন নির্মম কশাঘাতই প্রয়োজন। তবু, এই শশী সাণ্ডেলের দারিদ্র্যমোচনে সহায়তার জন্য এ চিঠিতেই অনুরোধ রয়েছে।

তাঁর মতো মুক্তপুরুষের জীবন ও আচরণ আমাদের প্রথাবদ্ধ জীবনযাত্রায় এতো বড়ো বিস্ময় যে, সাধারণের সমালোচনা তাঁকে

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৭৫

২ তদেব : পৃঃ ৫১-৫২

চিরকাল শুনতে হয়েছে এবং তাঁর বীরেশ্বর সত্তার বৈশিষ্ট্যে সে সব উপেক্ষাও করে এসেছেন। এ জাতীয় সমালোচনা-প্রসঙ্গে সে যুগের হিন্দুয়ানির উৎকট মনোভাব যে একদল শিক্ষিত বাঙালীকে পেয়ে বসেছিল, তাঁদের কথা মনে রেখে স্বামীজীর মন্তব্য—"লোকে যা হয় বলুকগে। 'লোক না পোক'।...Orthodox (গোঁড়া) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন কালে, বা আচারী হিন্দু কোন কালে? I do not pose as one (আমি সেরকম বলে নিজেকে জাহির করি না।) বাঙালীরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে এখানে পরিপোষণ করছে—অহহ !!...তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে—না? বাঙালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি?...বাঙালী!...আহার গেঁড়ি গুগলি, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুর জল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্র মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর। ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস, ভগবানের মুখ দেখ।"[১]

যুগের বদলে আজ হয়তো পরিবেশ একটু ভিন্ন, কিন্তু যে তমোগুণী অলস বাক্‌সর্বস্বতার বিরুদ্ধে স্বামীজীর সংগ্রাম—তার প্রয়োজন আজও সমান রয়েছে। নিরর্থক অকরুণ সমালোচনায় বাঙালী মনের প্রবণতার কথা জেনেই স্বামীজীর এই ভর্ৎসনা, অথচ এই বাংলা ও বাঙালীর কল্যাণ-চিন্তা তাঁর হৃদয় ভরে রেখেছিল। বাঙালীর সৌন্দর্য, বাঙালীর হৃদয়, বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুবই উঁচু। অন্যদিকে বাঙালীর দুর্বলতা যে কোথায়, সে কথাও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে সমকালীন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের সমালোচনাকে প্রলাপবাক্যের বেশী মর্যাদা দেননি।

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ১৬৮-১৬৯ : ১৮৯৫, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা। ব্যঙ্গের প্রকাশ হিসাবে 'অহহ' ধ্বনি প্রয়োগ মৌখিক ভাষার প্রভাবের দিক থেকে লক্ষণীয়।

সেবাই যে যুগধর্ম, এ কথাটি তাঁর বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, কবিতায়, চিঠিপত্রে নানাভাবে বারংবার প্রকাশিত। স্বামী অখণ্ডানন্দ বহরমপুরে সমষ্টিরূপে ভগবানের সেই সেবাব্রত উদ্‌যাপন করছিলেন দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের অন্নের ব্যবস্থা করে। এ-উপলক্ষে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখতে গিয়ে স্বামীজীর বক্তব্যপ্রকাশের সস্মিত ভঙ্গীটি গুরুতর দার্শনিক প্রজ্ঞাকে সহজ রসবোধের স্পর্শে উজ্জ্বল করে তোলার নিদর্শন—"ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুরঘর, আলোচাল, কলামূলো এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম, দেশগত ধর্ম, পরোপকারই সর্বজনীন মহাব্রত—আবালবৃদ্ধবনিতা আচণ্ডাল, আপশু সকলেই এ ধর্ম বুঝিতে পারে। শুধু Negative (নিষেধাত্মক) ধর্মে কি কাজ হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না। তাতে আসে যায় কি, তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, চার ঘণ্টা গান কর, আট ঘণ্টা বাজাও—মধু, তা কার কি? ঐ যে কাজ, অতি অল্প হলেও ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বলবে, লোকে তাই শুনবে। এখন 'রামকৃষ্ণ ভগবান' লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কর্ম—কথায় কি চিঁড়ে ভেজে।"[১]

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মিলনসাধনের জন্য ভগিনী নিবেদিতার আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি। এ দুই চিন্তাধারার মূলগত পার্থক্যের দিকটা মনে থাকলে বোঝা যায় এ মিলন তখন অসম্ভবই ছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম (জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্ম সমাজ) কর্তৃপক্ষ গোড়ায় আপত্তি জানালেন রামকৃষ্ণদেবকেই নিয়ে। 'ব্রহ্ম' ছাড়া ব্রাহ্মসমাজ গঠনের প্রস্তাব তাঁরা কোন দৃষ্টিতে নিতেন, সে কথা ভাবা যেতে পারে। সে যাই হোক, স্বামীজীর পাশ্চাত্য পরিক্রমায় শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ খুবই কম উচ্চারিত—বিশ্বজনীন বেদান্ত-প্রচারই সে দেশে স্বামীজীর মুখ্য প্রচেষ্টা; আর তাঁর ভারতীয়

---

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩৬৬-৬৭ : ১০ই জুলাই ১৮৯৭, স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা।

পটভূমিকায় রচনা ও বক্তৃতাবলীতে ধর্ম ও সভ্যতার মানদণ্ড স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁর জীবনে ভারতীয় অধ্যাত্ম ঐতিহ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। ব্যক্তিগত গুরুভক্তির কথা বাদ দিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তাৎপর্য স্বামীজী যেভাবে অনুধাবন করেছিলেন তাতে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণভাবধারা প্রচারের প্রয়োজন। সমাজসেবা, দেশসেবা প্রভৃতি এই ভাবধারারই পরিপোষকমাত্র, প্রধান লক্ষ্য হতে পারে না।

সরলা ঘোষালকে লেখা পত্রটিতে ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের মনোভাব-প্রসঙ্গে স্বামীজীর তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ সমগ্র পত্রটিকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংগ্রামী ভঙ্গীর অন্যতম সার্থক নিদর্শনে পরিণত করেছে। 'পত্রসাহিত্য' অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে অচেতন সাহিত্য সৃষ্টি। সেই কারণেই এক হিসাবে সাহিত্যিকের অন্তরতম পরিচয়ের অভ্রান্ত সাক্ষ্য হিসাবে এবং তাঁর লেখকসত্তার নিজস্ব রূপটি নির্ধারণে পত্রসাহিত্যের বিশেষ সার্থকতা। আবার স্বামীজীর রচনাবলীতে হাস্যরসের তীব্র আঘাত-শক্তির সঙ্গে গভীর মরমী দৃষ্টির মিলনের দিক থেকেও আলোচ্য পত্রটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

"যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টিয়ানদের অনন্ত নরক-ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে দেখতে বৃদ্ধ হ'তে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া অনেকদিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরু ঠাকুর সর্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন সেইটি মনে পড়িল :

> 'মনের মানুষ হয় যে জনা
> নয়নে তারে যায় গো জানা,
> সে দু এক জনা,
> সে রসের মানুষ উজান পথে
> করে আনাগোনা।'

"তারপর যে-সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়কড়, কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়, প্রাণ যায়-যায়, কণ্ঠে ঘড়ঘড় ইত্যাদি আর একটি ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিল ?

"এই যে প্রবলতরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড় পর্বত যেন ভেসে যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে ! বলি, ও-রকম দেশ-হিতৈষিতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ও-রকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে, আপনারা জানেন, আমি তো কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্ন-বিচার, এত নাক সিঁটকানো, কে জানে কার কি মতিগতি। আমার যেন মনে হয়, ও সব গ্লাস কেসের মধ্যে ভাল, কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে ততই কল্যাণ।"[১]

ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এখানে কোনো ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের প্রকাশ নয়। আদর্শের সংঘাতের ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যের সাধুতা নিয়েই এক্ষেত্রে প্রশ্ন। মানব-কল্যাণে যাঁরা অগ্রসর হতে চান, তাঁরা অনেক সময়ই পন্থা নিয়ে অনর্থক কলহের ফলে উদ্দেশ্যটিই ভুলে বসে থাকেন।

উদ্ধৃত পত্রাংশে 'গুরুঠাকুর' শব্দটির সচেতন প্রয়োগ, তথাকথিত 'গুরুবাদ'-বিরোধীদের আঘাতের সমুচিত উত্তর হিসাবেই ব্যবহৃত। অন্যমতের গুরুবাদকে অস্বীকার করে স্ব স্ব মতপ্রাধান্যের গুরুগিরি ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই আজ দেখা যায়। গুরুবাদের বিরোধীই এক-সময় 'গুরু' নামে আখ্যাত হয়ে থাকেন তথাকথিত ভক্তবৃন্দের দ্বারা।

বস্তুতঃ যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবসেবার আদর্শে সমাধি-প্রত্যাশী বিবেকানন্দের সেবাব্রত গ্রহণ, তাঁকে বাদ দিয়ে সঙ্ঘের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার প্রস্তাবটিই স্ববিরোধিতার চরম দৃষ্টান্ত। রামকৃষ্ণ-অনুপ্রাণিত বিবেকানন্দ অন্য সব মতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : অষ্টম খণ্ড, ১ম সংস্করণ পৃঃ ৫৬

করলেও কারুর উপরে মত চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াসকে সর্বতোভাবে পরিহার করেছেন। তাঁর নিজের আদর্শ ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রেও সে কথাই প্রযোজ্য।

মানবসেবাব্রতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ কেন্দ্রটি এত দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে থাকার ফলে সেবাধর্মের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ভূমিকা কীভাবে প্রসারিত হয়েছে, সেকথা সুপ্রমাণিত। আর স্বামীজীর ভাষায় যাঁদের 'বুক-ধড়ফড়' 'কলিজা ছেঁড়-ছেঁড়,' 'প্রাণ যায় যায়', ইত্যাদি তাঁদের চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতাও ইতিহাসের সামগ্রী। কিন্তু এই আদর্শগত সংঘাতের ফলে জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বিবেকানন্দ-মানস-ধাতুর যে শব্দ-কণিকা ঝরে পড়েছে, তা চলিত বাংলার প্রাণশক্তি ও বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস-সৃষ্টির জীবন্ত প্রতীক।

আঘাতে প্রতিঘাতে চিন্তা ও সিদ্ধান্তের অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরতে বিবেকানন্দের গদ্য ভঙ্গিমার নিপুণ তীক্ষ্ণতা আমাদের সেই 'সাফ ইস্পাতে'র উপমাটি মনে পড়িয়ে দেয়, 'যা এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।'

স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' নানা দিক থেকে তাঁর সাহিত্যিক-সত্তাকে প্রকাশ করেছে—তাঁর অনন্যসাধারণ গদ্যভঙ্গিমা, মানব ও বিশ্বের সর্বস্তরে প্রসারিত তাঁর উদার প্রেমিক হৃদয়, নির্মম ভর্ৎসনায় রুদ্র ও নির্মোহ আদর্শবাদে অবিচল তাঁর সংগ্রামী অনুপ্রেরণা, উপলব্ধির গভীরতম স্তরে তাঁর কবিদৃষ্টি ও মনীষার আত্মপ্রকাশ, আর সেই সঙ্গে ক্ষুরধার শাণিত ব্যঙ্গের উজ্জ্বল হাস্যরসদীপ্তি। 'পত্রাবলী' এবং অন্যত্র—অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীজীর হাস্যরসের মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যঙ্গপ্রতিভায়।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসের স্রষ্টা পরিমল গোস্বামী তাঁর 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আলোচনাটির প্রথমাংশ প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধৃত করছি—'সামাজিক বিষয়ে যুক্তিবাদী হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সোজাসুজি ব্যঙ্গ বর্ষণ করেছেন অর্থহীন আচার-নিষ্ঠদের উপর। এবং

তাঁর ব্যঙ্গ কোথাও মৃদু নয়। এদেশে সত্য ব্যঙ্গ, অর্থাৎ কিছু ঘুরিয়ে ব্যঞ্জনাধর্মী ব্যঙ্গ রচনার দ্বারা ব্যঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুব যে সফল হয় এমন আমার মনে হয় না। এদেশে বিবেকানন্দের মতোই খর-আক্রমণ প্রয়োজন।

'সোজা আক্রমণ ও সাহিত্যগুণ, দুইয়ের মধ্যে একটা রফা করা অসম্ভব নয়; এবং অনেকেই যে তা সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছেন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দ।

'উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই যদি একমাত্র প্রেরণা হয়, তাহলে তর্কের খাতিরে বলা চলে, লাঠিই সবচেয়ে উপযোগী। এবং একথায় অতিরঞ্জন নেই। আমাদের দেশে সাহিত্যের আক্রমণ অপেক্ষা লাঠির আক্রমণ বেশি কার্যকর, একথা আমি স্বীকার করি।

'কিন্তু ব্যঙ্গকে সাহিত্যের সীমানায় থাকতে হলে লাঠি অথবা অন্যান্য নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র অচল, একথা সাহিত্যিকেরা স্বীকার করে থাকেন। তবে ব্যঙ্গ-সাহিত্য যদি লাঠি অথবা অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রের কাছাকাছি হয়, তবে আপত্তি থাকা উচিত নয়। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যঙ্গ লাঠির নিকট আত্মীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"[১]

পরিমল গোস্বামী ব্যঙ্গ শব্দটি ইংরেজী 'satire' শব্দের প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে কৌতুকহাস্য বলতে তিনি ইংরেজী Humour (হিউমার), Wit (উইট) Joke (জোক) সব কিছুকেই বুঝিয়েছেন। আমাদের মনে হয় কৌতুক বলতে ইংরেজী 'জোক' শব্দটিই যথার্থ, 'হিউমার'কে কৌতুক বললে অনেক কম বলা হয়। বাংলাসাহিত্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর' অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'হিউমারে'র উদাহরণ—অবশ্য এ গ্রন্থে হাস্যরসের অন্যান্য সব স্তরই মিশিয়ে আছে। 'হিউমার' একদিকে হাস্যরসের আলোকে আত্মদর্শন আর একদিকে জীবনের গভীরতম করুণার উপলব্ধিকে হাস্যরসে মূর্ত করা। সকালবেলার শিশিরবিন্দুতে সূর্যের উদ্ভাসন—এর যোগ্য উপমা। 'হিউমার' শব্দটির যথার্থ বাংলা প্রতিরূপ এখন অবধি চোখে পড়ে নি।

---

১ আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় : পরিমল গোস্বামী : পৃঃ ৬২-৬৫ দ্রঃ

'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র মধ্যে জীবন-উপলব্ধির একটি মাত্রাগত পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের একাঙ্ক নাট্যসঙ্কলন দুটির স্বাদের পার্থক্য এদিক থেকে স্মরণীয়। পরিমল গোস্বামী কৌতুক থেকে ব্যঙ্গের ক্রমপর্যায়ের একটি রেখাচিত্র (Chart) ক'রে স্বামীজীর হাস্যরসের ব্যঙ্গ-প্রাধান্য সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করেছেন, সেটি অনুসরণ ক'রে আমরা একটি রেখাচিত্র দাঁড় করাতে পারি—

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
১০০	৯০ + ১০	৭৫ + ২৫	৫০ + ৫০	২৫ + ৭৫	১০ + ৯০	১০০

উপরে সংগীতের স্বরগ্রামের মতো কৌতুক থেকে ব্যঙ্গে পরিণতিকে সাত ভাগে ভাগ ক'রে পরিমল গোস্বামী কৌতুক ও ব্যঙ্গের মাত্রাবিভাগ বোঝাতে চেয়েছেন।[১]

'সা'—কৌতুকহাস্যের পরিপূর্ণ অবস্থা, 'নি' ব্যঙ্গহাস্যের চরম রূপ। 'সা'-তে ব্যঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত, 'নি'-তে ব্যঙ্গই সব। 'সা' থেকে 'মা' পর্যন্ত কৌতুকহাস্যের প্রাধান্য ও ব্যঙ্গহাস্যের ক্রম-উপস্থিতি। 'মা'-তে কৌতুক ও ব্যঙ্গ সমান সমান। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য'

১ সা—বিশুদ্ধ কৌতুক; রে—কৌতুক ও সামান্য ব্যঙ্গ (৯০+১০); গা—কৌতুকের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্যঙ্গ (৭৫+২৫); মা—কৌতুক ও ব্যঙ্গ সমান সমান (৫০+৫০); পা—ব্যঙ্গপ্রধান, এতে বিশুদ্ধ কৌতুক ক্ষীয়মাণ (২৫+৭৫); ধা—প্রায় সবটাই ব্যঙ্গ; নি—পূর্ণ ব্যঙ্গ (১০০)। পরিমল গোস্বামীকৃত স্বরগ্রামের এই অর্থ। পরিমলবাবু 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যার সম্পাদকরূপে দীর্ঘকাল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং 'ঘুঘু' 'স্মৃতিচিত্রণ' 'যখন সম্পাদক ছিলাম', 'আমি যাদের দেখেছি' প্রভৃতি নানা গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন। একদা তাঁর সম্পাদিত ব্যঙ্গগল্প-সঙ্কলন 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী' পাঠকসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল। তাঁর পুত্র হিমানীশ গোস্বামী বর্তমান বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসস্রষ্টা।

এর যথার্থ উদাহরণ। পরিমল গোস্বামীর মতে স্বামীজীর লেখায় 'মা' থেকে 'নি' অবধি ব্যঙ্গপ্রধান হাস্য-রসেরই প্রাধান্য।

স্বামীজীর এই ব্যঙ্গপ্রধান হাস্যরসের উদাহরণ হিসাবে পরিমলবাবু 'পত্রাবলী' থেকে ১৮৯৪-তে মঠের গুরুভাইদের উদ্দেশে লেখা একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন—'আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা সীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু ক'রে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হ'ল, কাল তার উপর ভেঁপু হ'ল, পরশু তার উপর চামর হ'ল, আজ খাট হ'ল, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হ'ল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হ'ল—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরেজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐরকম বেলকোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতো-খেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

'যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নরনারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ, তার পুজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট ব'সব কি আধ ঘণ্টা ব'সব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই

ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, একথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশময়।'[১]

উল্লিখিত অংশে স্বামীজীর ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে পরিমলবাবুর মন্তব্য—'ভদ্র আক্রমণের ভাষা এর চেয়ে চড়া বোধ হয় আর হয় না।' সমগ্র চিঠিটি পড়লে স্বামীজীর ব্যঙ্গ, বেদনা ও বিপ্লবী অনুপ্রেরণার যে অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়, তা শুধু আক্রমণ বললে অনেক কম বলা হয়, এ আক্রমণ একাত্ম ভালবাসার আত্মোৎসর্গেরই প্রস্তুতি। উদ্ধৃত অংশের পরেই আছে—'যাক, তোদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন, যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই।'[২]

সাহিত্যের জগতে যাঁরা Satirist বা ব্যঙ্গ রচয়িতারূপে পরিচিত তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গে স্বামীজীর ব্যঙ্গহাস্যের মূল পার্থক্য ওইখানে।

'পত্রাবলী' থেকে বিশুদ্ধ কৌতুকের উদাহরণরূপে পরিমলবাবু ১৮৯৪ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজীর চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন—'বিমলা—কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা—এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার হিন্দুধর্মে এখন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। আমাকে প্রতিষ্ঠা হইতে সাবধান হইবার জন্য অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাঁহার গুরু শশীবাবুর সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা লিখিতেছেন। শিব, শিব! যাঁহার বড় মানুষ শ্বশুর তিনি কিছুই পারেন না, আর আমার তিন কালে শ্বশুর মোটেই নাই!!'[৩] এই পত্রটি সামগ্রিকভাবে দেখলে এতে কৌতুকের চেয়ে তীব্র ব্যঙ্গের উদাহরণই বেশী।

১, ২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : ১ম সং : পৃঃ ৪৭-৪৮

৩ তদেব : পৃঃ ৫১

স্বামীজীর মুখের কথায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদাহরণরূপে পরিমল গোস্বামী স্বামীজীর আলাপচারী থেকে সেই বিখ্যাত গোরক্ষা-প্রচারকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের উদাহরণ দিয়েছেন, যার চরম ব্যঙ্গ হলো—'গোরু যে আমাদের মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?'[১] বস্তুতঃ স্বামীজীর কথাবার্তায় ও চিঠিপত্রে কৌতুক, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, মৃদুহাস্য থেকে অট্টহাস্য—নানাভাবে তাঁর আনন্দময় সত্তা বিকীর্ণ। মাঝে মাঝে তাঁর হাস্যরস সমাজ-সংসারের হৃদয়হীনতা ও বুদ্ধিহীনতার তীব্র প্রতিবাদে অনিবার্য তিক্ত স্বাদ নিয়ে আসে, কিন্তু কখনোই মানব-প্রেমের চিরন্তন সত্য থেকে দূরে সরে আত্মকেন্দ্রিক দংশন-পিপাসায় নিজেকে চরিতার্থ করে না। যে দেশে শত শত মানুষ দুর্ভিক্ষে অনাহারে মরে, সে দেশে গোমাতার সেবায় সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের অতি আগ্রহ এবং মানুষের সেবায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছা—এ দুই ভাবের আশ্চর্য বৈপরীত্যই স্বামীজীর মন্তব্যের কারণ। স্বামীজীর 'ব্যঙ্গের লাঠি' এখানে কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদের চৈতন্যলোকে ফিরে আসার সঠিক ওষুধ। আলাপচারীতে বা চিঠিপত্রে এজাতীয় মন্তব্যের উদাহরণ অজস্র। তবে সাহিত্যিক শিল্পরূপের দিক থেকে স্বামীজীর ব্যঙ্গরসসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভাব্‌বার কথা' নামে ব্যঙ্গচিত্র বা নক্‌শাজাতীয় রচনাগুচ্ছ। সমকালীন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সরস মন্তব্য প্রকাশের বিশেষ ভূমিকা বাংলাসাহিত্যে পত্রপত্রিকার বিশিষ্ট ঐতিহ্য। 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম যুগেই সাহিত্যসচেতন বিবেকানন্দ এজাতীয় রচনার দ্বারা পত্রিকাটিকে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : ১ম সং : পৃঃ ৯

২

'ভাব্‌বার কথা'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনার ক্ষেত্রে 'ভাবের ঘরে চুরি' সম্বন্ধে বারংবার সাবধান করেছেন। বাইরে একরকম ভাব দেখিয়ে মনে মনে অন্য রকম অভিসন্ধি পোষণ করাই—ভাবের ঘরে চুরি। 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় এই ভাবের জগৎ সম্বন্ধে স্বামীজী ছোট ছোট কাহিনীর রূপরেখায় আমাদের কথা ও কাজের দুস্তর অসংগতির প্রতি তর্জনীসংকেত করেছেন। 'ভাব্‌বার কথা' নামে এই লেখাগুলি পড়তে পড়তে এজাতীয় রচনায় স্বামীজীর স্বভাবসিদ্ধ কুশলতা একদিকে যেমন বিস্ময় জাগায়, আর একদিকে তেমনি এদের সংখ্যাল্পতার জন্য প্রত্যাশী পাঠককে ব্যথিতও করে। অবশ্য 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' স্বামীজীর সরস বাগ্‌বৈদগ্ধ্য অনেক পরিমাণে আমাদের আশ্বস্ত করে। তবু, 'ভাব্‌বার কথার অম্ল-মধুর 'টিপ্পনী' জাতীয় রচনার চাহিদা সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় সব যুগেই রয়েছে। 'ভাব্‌বার কথা' রসরচনাগুচ্ছ একাধারে তাঁর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রতিভার যুগ্ম সম্মেলন। পত্রিকা চালাতে হলে শুদ্ধমাত্র গুরুভার প্রবন্ধ পাঠকের মনের উপরে না চাপিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক হাস্য পরিহাসের দ্বারা পাঠক-সমাজকে সচেতন ও ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলা যে প্রয়োজন একথা স্বামীজী ভালোভাবেই জানতেন। 'ভাব্‌বার কথা'-জাতীয় ব্যঙ্গরচনা বা 'পরিব্রাজকে'র মতো ভ্রমণ-কাহিনীর সেইজন্যই আবির্ভাব।

ভাব্‌বার কথা'র[১] প্রথম চারটি ব্যঙ্গ-কথিকার মূল ব্যঞ্জনা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। অবশ্য স্বামীজীর অধ্যাত্মচিন্তার মূলসূত্র আমরা ইচ্ছা করলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন আমাদের ইহজীবনেরও সব প্রান্তকেই স্পর্শ করে এবং নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত

১ উদ্বোধন, প্রথম বর্ষ, ১৩০৫, ১০ম ও ১৪শ সংখ্যায় এই নামে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়।

করে—এদিক থেকে জগতের ইতিহাসে আধ্যাত্মিক গুরুদের মধ্যে তাঁর স্থান অনন্য। সবার আগে এবং সবার পরিণতিতে তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধিই প্রধান লক্ষণীয়। বিবেকানন্দ-সাহিত্য-প্রসঙ্গে, এমন কি তাঁর সাহিত্যের ব্যঙ্গরসের অনুধাবনেও এই মূলসূত্রটি আমরা দেখতে পাবো।

সুর-তাল-লয়-জ্ঞানহীন ভক্তের ভগবানকে গান শোনাবার চেষ্টা; সাধনভজনহীন ভোলাচাঁদের শরণাগতি সম্বন্ধে আত্মপ্রচার; বেদান্তবাদী ভোলাপুরীর ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমানের অন্তরালে আত্মসর্বস্বতা এবং এবং রামচরণের গুরুগিরি—এসব কয়টি কাহিনীই 'ব্যঙ্গের লাঠি'। তবে স্বামীজীর নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গীর রসায়নে প্রত্যেকটি গল্পের ব্যঞ্জনা শেষ অবধি মানুষের মন মুখ এক করার সাধনা, ভাবের ঘরে খাঁটি হওয়ার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে আত্মপ্রতারণায় আমরা জগতের কর্তব্য ফাঁকি দিতে চাই, সে প্রতারণায় কিন্তু ঈশ্বর প্রতারিত হ'ন না। যথার্থ ভক্ত বা শরণাগতের প্রতিটি কাজে ও চেষ্টায় যে সততা, নিষ্ঠা ও শ্রম দেখা যায়, তার মূলে ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। সে আত্মনিবেদন যথার্থ কি না তার কষ্টিপাথর বিবেকানন্দের মতো জগদ্‌গুরুদের সাধনাজনিত সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্তের কথায় আসার আগে আমরা ভাব্‌বার কথা'র প্রথম গল্পটি স্মরণ করি—

'ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শনলাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদান-প্রদান-সামঞ্জস্য করিবার জন্য গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোণে থাম হেলান দিয়া চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পূজারী পহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চৌবেজীর কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে 'উথায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণ-বর্ণ

ঢুলুঢুলু দুটি নয়ন ইতস্তত বিক্ষেপ করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়ামাজার,ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডীকরণ করিতেছে। সম্বিদানন্দ-উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ পুরুষকে মর্মাহত চোবেজী তীব্রবিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"বলি বাপু হে, ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার ক'রছ!" ক্ষিপ্র উত্তর এল—"সুর তালের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্চি!" চোবেজী—"হুঁ, ঠাকুরজী আমার এমনই আহাম্মক কি না! পাগল তুই আমাকেই ভিজুতে পারিস নি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?"

সুরের সাধনায় স্বামীজীর সিদ্ধি তাঁর জীবনকাহিনী-পাঠকমাত্রেরই পরিচিত। এই গল্পটির পটভূমিতে স্বামীজীর সেই সংগীতসাধকরূপটি সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর ভাষায় 'ভাবরাজ্যের রাজা' শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণদেব সুকণ্ঠ সংগীততন্ময় সাধক। বিশেষত সংগীতের ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশে তিনি ভক্ত ও সাধকদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনে কতখানি সহায়ক হ'তেন, সেকথা 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃতে'র পাতায় বিধৃত। কিন্তু বেসুর বেতাল গান শুধুমাত্র উচ্ছ্বাসের জোরে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কখনো বরদাস্ত করতেন না। সুরে তালে ভাষায় কোনো ত্রুটি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্বীকৃতি প্রকাশ পেতো। শিল্পের জগতে পূর্ণতার সাধনা ঈশ্বরসাধনার অঙ্গ। সাধনার উপকরণে ত্রুটি ঘটলে পূজাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বেসুরো গায়কের মন ভেজাবার চেষ্টা তাই এমন হাস্যকর ব্যর্থতায় পরিণত।

জাতীয়-মানসের পুনরুজ্জীবনের সঙ্কল্প নিয়ে 'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 'উদ্বোধনে'র পাতায় স্বামীজীর 'ভাব্‌বার কথা' রচনাগুচ্ছ সেই মানস-সঞ্জীবনেরই আর একটি পন্থা। আদর্শবাদ যেমন উচ্চমার্গের প্রবন্ধ-নিবন্ধের দ্বারা প্রচার করা সম্ভব, তেমনি আবার বিচারবিশ্লেষণের আর এক অঙ্গ হিসাবে হাস্যরসে নিপুণ

প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ আদর্শের যাত্রাপথে সম্ভাব্য অসঙ্গতিগুলি দেখিয়ে দেওয়াও প্রয়োজন। এই সব অসঙ্গতি আমাদের সমাজে সংসারে চিন্তায় ধারণায় নানাভাবেই ছড়িয়ে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে মূল আদর্শকে আচ্ছন্ন করে এদের শাখাপ্রশাখা জীবনের মূল সত্যকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। তখন এদের বিরুদ্ধে সংস্কারবাদী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি—নানান ধরনের মনীষীরাই সমবেত হন। বাংলা-সাহিত্যে ও সমাজে রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের কথা আমরা এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে পারি। উচ্চতম মননশক্তির সঙ্গে সূক্ষ্মতম হাস্যরসের যোগের দিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনেক পূর্বসূরীর সঙ্গেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মাননার অধিকারী। 'ভাব্‌বার কথা'র[১] এই রচনাগুচ্ছ তার অন্যতম প্রমাণ।

প্রথম গল্পটিতে বেসুরো গায়কের ভক্তির আতিশয্যকে স্বামীজী পরিহাসের দ্বারা নিরস্ত করতে চেয়েছেন, পরের তিনটি গল্প-কণিকায় আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক রাজ্যের আরো কয়েকটি অসঙ্গতির প্রতি পাঠকদের সচেতন করেছেন। বস্তুত গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে এ গল্পগুলির অন্তর্নিহিত সমাজসমালোচনার কঠোরতা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে মর্মভেদী হ'বার কথা। কিন্তু পরিবেশন-নৈপুণ্যে নির্মম সত্য-নির্দেশকে স্বামীজী আনন্দমাধুর্যে মণ্ডিত করে শেষ অবধি হাস্যরসেই সার্থক করেছেন, সমালোচনার অম্লস্বাদ কোনো তিক্ততা-সৃষ্টির অবকাশ রাখে নি।

এ সব রচনায় স্বামীজী বঙ্কিমচন্দ্র বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'কমলাকান্ত' বা 'পঞ্চানন্দ' (ওরফে পাঁচু ঠাকুর)-জাতীয় অন্য কারু ভূমিকা গ্রহণ না করে কল্পিত কোনো চরিত্র বা নামের অবলম্বনে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। ভোলাচাঁদ, ভোলাপুরী বেদান্তী, কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—এ-জাতীয় চরিত্র। আর নামঅবলম্বনে বক্তব্য নিবেদনের রসিকতা—'বলি রামচরণ!'

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

'ভাব্‌বার কথা' গল্পগুচ্ছের দুটি কেন্দ্রীয় গল্প। প্রথম গল্পটির সঙ্গে আর তিনটি ছোট ছোট গল্প—প্রথম গল্পটির ভাষ্যটীকা অর্থেও এদের নেওয়া চলে। দ্বিতীয় প্রধান গল্পটি লক্ষ্ণৌর ইমামবাড়ায় দুই রাজপুতের কাহিনী। তার পরে আর দুটি গল্প—তাদের একটি স্পষ্টত প্রধান গল্পটির ব্যাখ্যা। বেশ বোঝা যায়, স্বামীজী এ গল্পগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের জড় চিত্তবৃত্তিকে সজোরে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, তাই এদের নাম 'ভাব্‌বার কথা।'

বেসুরো গায়কের উদাহরণটির শেষ কথা—'পাগল তুই, আমাকেই ভিজুতে পারিসনি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?'—পর পর তিনটি মন্তব্যধর্মী গল্পেই নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। গীতার 'মামেকং শরণং ব্রজ'—একমাত্র আমার শরণাগত হও—এই উপদেশের প্রয়োগ যে কেবল মুখের কথায় নয়, জীবনের সাধনায় সত্য হয়ে ওঠে, সে কথা আমরা ক'জনে মনে রাখি? ফলে ভক্তির বাইরের আবরণ অনেক সময়ই স্বার্থসাধনের ছদ্মবেশ হয়ে দাঁড়ায়। যথার্থ আত্ম-নিবেদন না থাকলে সর্বপাপ থেকে তিনি রক্ষা করবেন—এমন আশা বাতুলতা। ঈশ্বরের শরণাগতির প্রকাশ জীবনে বচনে মননে সমানভাবে দেখা না দিলে শুধুমাত্র গীতার বাণীর পুনরাবৃত্তি কারু মহত্ত্বের প্রমাণ হতে পারে না। আধ্যাত্মিক আদর্শের এ অসঙ্গতি স্বামীজী ভোলাচাঁদের ধরন-ধারণের মধ্য দিয়ে এইভাবে ফুটিয়েছেন—'ভগবান অর্জুনকে বলেছেন: তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার ক'রব।'[১] ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুশী; থেকে থেকে বিকট চীৎকার: আমি প্রভুর শরণাগত, আমার ভয় কি? আমার কি আর কিছু করতে হ'বে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথাগুলি খুব বিটকেল আওয়াজে বারংবার বলতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার উপর মাঝে

---

১ মূল শ্লোকটি গীতায় এইভাবে রয়েছে—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। ১৮।৬৬ স্বামীজী এখানে মূলভাবটি অবলম্বনে সহজ করে লিখেছেন।

মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আছে যে, তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এ ভক্তির জোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু-চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়! কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলি, ঠাকুরজী কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলিনি!!'

প্রসঙ্গত মনে করা যায়, ভোলাচাঁদ-জাতীয় মানুষদের নমুনা স্বামীজীর সমকালীন সমাজে তাঁর পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যেই মিলতো। আবার এক হিসাবে সব কালেই একদল বাক্‌সর্বস্ব অনুগামী দেখা যায়, যাঁরা ভক্ত বলে পরিচিত হতে পারেন, অথবা রাজনৈতিক বা সামাজিক দল-বিশেষের অনুরক্তও হতে পারেন। বিশেষ আদর্শ-বাদকে তাঁরা আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির ধ্বজা হিসাবেই ব্যবহার করে থাকেন, সে আদর্শবাদের কোনো পরিচয় তাঁদের জীবনে দেখা যায় না। কিন্তু বুলি আওড়াতে তাঁরা সব সময় মজবুত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এমন কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা তাঁর দেহাবসানের পরে মনে করতেন, তাঁদের আর আলাদা সাধনভজনের দরকার নেই; কারণ তাঁরা স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখেছেন, আর জপ তপ সাধন ভজনের দরকার নেই। অথচ দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্তানেরা—বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রমুখ সবাই তাঁদের গুরু-মহারাজের দেহত্যাগের পরে সুদীর্ঘ সুকঠোর তপস্যায় গুরুর কাছে পাওয়া সাধনসম্পদ অন্তরের মণিকোঠায় চির উজ্জ্বল করে রেখেছেন। আবার তাঁদের সেই ধ্যান-তপস্যার আদর্শই নবযুগের তরুণচিত্তে বিবেকবৈরাগ্যের বহ্নিসঞ্চার করে চলেছে, সে-কথা বর্তমান ভারতের ইতিহাস।

আদর্শবাদের নামে আচার-আচরণের অসঙ্গতি কেমন করে মানুষকে প্রবঞ্চিত করে, তার প্রমাণস্বরূপ ভোলাচাঁদের দল অবশ্য আধ্যাত্মিক-আদর্শে বিশ্বাসী ভারতবাসীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী মেলে। এরা শুধু অন্যদের ঠকায় না, নিজেরাও ঠকে; হয়তো কখনো কখনো না জেনে বুঝেও ঠকে। ভোলাচাঁদের বিটকেল

আচরণ যেমন অসহনীয়, তেমনি তার মধ্যে একটু নির্বুদ্ধিতাও আছে। তার ধারণা তার ধাপ্পা অন্যেরা বুঝতে পারছে না, এমন কি ভগবানও না। শুধু 'শরণাগত' শব্দটি উচ্চারণ করলেই বুঝি সব পাপ থেকে উদ্ধার মেলে। যথার্থ শরণাগতির সঙ্গে এই মৌখিক ভক্তি-ঘোষণার যে আকাশ-পাতাল তফাত সেকথা ভোলাচাঁদ কতটা বুঝতে পারে সন্দেহ। এদিক থেকে স্বামীজীর তীব্র বিশ্লেষণের আলোকে সমাজে আর এক শ্রেণীর যথার্থ জ্ঞানপাপী দেখা যায়। চতুর মতলববাজ এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ মানুষের মূঢ়তাকে সম্বল করেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করে থাকে। এ-জাতীয় চরিত্রের একজনকে স্বামীজী 'রামচরণ' নামে সম্বোধন করেছেন—"বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, তার ওপর নেশা-ভাঙ এবং দুষ্টামিগুলিও ছাড়তে পার না, কি করে জীবিকা কর, বল দেখি?' রামচরণ—'সে সোজা কথা, মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।' "

'রামচরণ ঠাকুরজীকে কি ঠাওরেছেন?' এত অল্প কথায় একটি গোটা চরিত্রের ব্যঙ্গধর্মী চিত্রায়ণ স্বামীজীর হাস্যরসের বৈদগ্ধ্য ও নৈপুণ্যের অসামান্যতার নিদর্শন। নিষ্কর্মা উপদেষ্টাদের মুখোশ এমন নির্মমভাবে খুলে দিয়ে স্বামীজী মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সে মহাব্রতে এ ধরনের উদাহরণের বিশেষ উপযোগিতা সেকালে তো ছিলই, একালেও অনেকখানি। লোকচরিত্র-অনুধাবনে স্বামীজীর অপূর্ব দক্ষতা রামচরণের চাঁচাছোলা জবাবটির মধ্যে রূপায়িত। এ ধরনের মানুষ সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই নিজেকে এবং সকলকে প্রতারণা করে চলেছে বলেই হয়তো এত সোজাসুজি বলতে পারলো—'আমি সকলকে উপদেশ করি।' একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এসব মানুষের শ্রোতাও একজন জোটে। নিজের জীবনে যার কোনো সমস্যা সমাধানেরই যোগ্যতা নেই, সে অনায়াসে আর সকলকে পথ দেখাবার চেষ্টা করে। হয়তো বহুজনের বোকামি একজনের ভরণপোষণের কারণ হতে পারে, কিন্তু আর সবাইকে

ঠকানো গেলেও অন্তর্যামীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। রামচরণ, কি ঠাওরেছেন?—যাই তিনি ঠাওর করে থাকুন, ঈশ্বরকে নয়।

'ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী'—ওই 'বেজায়' কথাটির মধ্যে স্বামীজীর কলকাতা-কেন্দ্রিক আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর মুচ্‌কি হাসির আভাসটুকু ফুটে উঠেছে। বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের যাঁরা শ্রেষ্ঠ রসিক তাঁরা নিজের নিজের বর্ণ বা শ্রেণীকেই বিদ্ধ করেছেন সবচেয়ে বেশী। বিদ্যাসাগরের স্বনামে ও বেনামে রচনাগুলির (হাস্যরসের দিক থেকে বেনামী রচনাগুলিই বেশী মূল্যবান) আক্রমণের লক্ষ্য মূলত এদেশের ব্রাহ্মণসমাজ—যে সমাজের একজন তিনি নিজে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী যে 'বাবু'-সমাজের উচ্চাশার চরমলক্ষ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সেই সমাজে এবং তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য প্রধানত এই বাবুসমাজ। শরৎচন্দ্র তথাকথিত উচ্চবর্ণ সমাজের হৃদয়হীনতাকে যেমন ফুটিয়েছেন তেমনি দেখিয়েছেন অজ্ঞতা-কুসংস্কার-দলাদলি-ঈর্ষ্যায় আচ্ছন্ন এই সমাজের হাস্যকর দিক। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী, তবু 'বেজায় বেদান্তী' ভোলাপুরীর স্বার্থপর ধর্মাচরণের অর্থহীনতাকে তিনিই সব থেকে কঠোর আক্রমণ করেছেন। সমাজচেতনার বিচারে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের আবির্ভাব অনেক সময় এইভাবেই হয়ে থাকে। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের উৎস নিজের মধ্যে, তারপরেই নিজের জনদের মধ্যে। এর আগের উদাহরণগুলিতে স্বামীজী যথার্থ ভক্তির আদর্শ খুঁজতে গিয়ে তথাকথিত ভক্তদের ফাঁকি দেখিয়েছেন, এবার দেখালেন তথাকথিত জ্ঞানীর আত্মপ্রবঞ্চনা। সাধুর ভেকধারী যারা "সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরে" তমোগুণে ডুবে থাকে তাদের ফাঁকি সম্বন্ধে স্বামীজীর সব সময় তীব্র মতামত। পরিব্রাজক অবস্থায় একবার এক গাছতলায় ধ্যানের ছলে নিদ্রারত সাধুকে দেখে বিরক্ত স্বামীজী লোকটির দুই কাঁধে জোয়াল জুড়ে দিয়ে তার তমোগুণ দূর করার প্রস্তাব করেছিলেন। সংসারের সুখদুঃখে উদাসীন থেকে এ-জাতীয় সাধুরা যখন নিজেদের সামান্য সুখসুবিধার অভাবে ভ্রূকুটি করতে থাকেন, তখন ভোলাপুরী বেদান্তীর গল্পটি স্মরণীয়।

"ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না ; তিনি সুখদুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো মরে ঢিপি হয়ে যায়, তাতেই বা তাঁর কি ? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন ! তাঁর সামনে বলবান দুর্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরী 'আত্মা মরেনও না মারেনও না'—এই শ্রুতিবাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান। কোনও প্রকার কর্ম করতে ভোলাপুরী বড়ই নারাজ। পেড়াপীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজন্মে ওসব সেরে এসেছেন !"—সন্ন্যাসধর্মের মহৎ আদর্শ অযোগ্যের জীবনে ও ব্যবহারে কতখানি বিপরীত ব্যঞ্জনা নিয়ে আত্মপ্রতারণা হয়ে দাঁড়ায়, সেকথা ভারতীয় সন্ন্যাসীদের সর্বস্তরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই তাঁর লেখায় এত সহজ ও সরসরূপে ধরা দিয়েছে। 'বেজায় বেদান্তী'র অনুপ্রাসে একই সঙ্গে কৌতুক, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের মিশ্রণ !

স্বামীজীর বর্ণনায় ভোলাপুরীর ভাবভঙ্গী একালের পাঠকদের শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বর্ণিত এক সাধুবাবার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে এই সাধুবাবার সঙ্গে শ্রীকান্তের দেখা এবং কিছুদিন এঁর শাগরেদিও সে করেছে। শরৎচন্দ্রের নিজের জবানবন্দী অনুসারে প্রথম জীবনে তিনি একাধিকবার সাধুদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, আর 'শ্রীকান্তে'র কথা অনুযায়ী সে নিজেও বার চারেক সাধু হয়েছে। 'শ্রীকান্ত' বা শরৎচন্দ্রের মতে সাধুদের অধিকাংশের চরিত্রেই ভোজনের প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি থাকলেও অন্য বিষয়ে নিরাসক্তি সহজেই চোখে পড়ে। তবে তিনি যে সাধুবাবার সঙ্গে ছিলেন, তার সঙ্গে বিহারের গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে বিঠোরা-গ্রামে এসে যখন তাঁবু গাড়লেন, তখন একদিন—"দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন কিছু বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন—বলিলেন, 'এ-গ্রামটা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়, সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক হবে না ; সুতরাং কালই এ-স্থান ত্যাগ

করতে হবে।' যে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম।"[১]

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে আধুনিক যুগের সেবাব্রতী সন্ন্যাসী বজ্রানন্দের ভোজন সম্বন্ধে উদারতার বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের সস্নেহ সমর্থন লক্ষণীয়। কিন্তু প্রথম পর্বের সাধুবাবা অনেকটাই 'ভোলাপুরী'-জাতীয়। 'বিঠোরা' গ্রামের লোকজনদের তাদৃশ ভক্তির অভাবে বিরক্ত হলেও 'ছোট বাঘিয়া' গ্রামে এসে যখন বসন্ত মহামারীভয়ে ভীত নরনারীদের কাছে তিনি ভক্তি ও ভোজ্য সামগ্রী প্রচুর পেতে লাগলেন, তখন সেখানেই দিনকয় থেকে গেলেন। শ্রীকান্তের জবানীতে, "প্রাণের ভয়টা ইঁহাদের নিতান্তই কম—'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' ত আছেই; কিন্তু কি করিলে অনেকদিন জীবেৎ এ খেয়াল নাই।"[২] গ্রামাঞ্চলের আধুনিক শিক্ষাবর্জিত ভোজনবিলাসী সাধুর এ উদাহরণ নিশ্চয়ই একমাত্র নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে শরৎচন্দ্র এই সাধুবাবার সরল স্নেহপ্রবণ ও বৈরাগ্যরঞ্জিত ব্যক্তিত্বটিও অল্প কথায় সুন্দর ফুটিয়েছেন।

তবে স্বামীজীর গল্পের ভোলাপুরী হয়তো 'ন জায়তে ম্রিয়তে' ([আত্মার] জন্ম মৃত্যু নেই) জাতীয় কথা বলতে বলতে আগেই মহামারী-আক্রান্ত গ্রামটি ছেড়ে যেতেন। বেদান্তের এ-জাতীয় ভ্রান্ত প্রয়োগ সম্বন্ধে সাবধান করবার জন্যই স্বামীজীর এই কথিকাটির সৃষ্টি। যে সেবাধর্মের প্রবর্তনে স্বামীজী ভারতীয় সন্ন্যাসী-সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, আজ তাঁর প্রবর্তিত রামকৃষ্ণসঙ্ঘ এবং সেই সঙ্ঘের অনুসরণে ভারতের সর্বপ্রান্তে অধিকাংশ সাধুসমাজ মানবকল্যাণের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অগ্রসর হয়ে এসেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, শরৎ-চন্দ্রের অন্যতম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণসঙ্ঘের স্বামী অখণ্ডানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং 'স্বামী বেদানন্দ' নামে সঙ্ঘের সারগাছিকেন্দ্রে ও বৃন্দাবন সেবাশ্রম-কেন্দ্রে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে

১, ২ শ্রীকান্ত: প্রথম পর্ব: পৃঃ ১৩৮; পৃঃ ১৪০: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রকাশিত 'অখণ্ড' সংস্করণ।

স্বামীজীর সেবাধর্মে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'বজ্রানন্দ-চরিত্রে তাঁর এই সন্ন্যাসী ভাইটির প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের অন্তরালে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজসমালোচক নিহিত থাকেন। সাধারণ মানুষ যেখানে সামান্য ঠাট্টা ইয়ার্কি বা রঙ্গব্যঙ্গ করেই ক্ষান্ত হয়, শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক সাহিত্যিকের কলমে সেখানে চরিত্র ঘটনা ও মন্তব্যের সমবায়ে সমাজমানসের অন্তরালবর্তী পুঞ্জিত গ্লানির হাস্যরসের রসায়নে মূর্ত হয়ে ওঠে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুধর' (ডমরুচরিত) অথবা পরশুরামের 'গণ্ডেরীরাম' 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্' ('গড্ডলিকা') এ-জাতীয় চরিত্রচিত্রণের দৃষ্টান্ত। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'তে 'নিমচাঁদ' একটি অমর উদাহরণ।

'ভাব্‌বার কথা'-রসরচনাগুচ্ছের প্রথম চারটি রচনার তাৎপর্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'ভাবের ঘরে চুরি'। মানুষ মনে করে যে তার বাইরের হাব-ভাবই বুঝি লোকে বিশ্বাস করে, ভিতরের মানুষটি চিরকাল আড়ালে থেকে যায়! কিন্তু সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন বিচারশীল মনের কাছে এ সব ফাঁকি সহজেই ধরা পড়ে। অন্তর্যামী ঈশ্বর তো সবই দেখতে পান, অথচ ঈশ্বর বা ধর্মের নাম ক'রে প্রতারণার চেষ্টাই জগতে সবচেয়ে বেশী চলে। তার কারণ আমরা বহিরঙ্গ আচার-অনুষ্ঠানকে ধর্মের অন্তরতম সত্যের জায়গায় বসিয়েছি। মূল উদ্দেশ্য ভুলে গেলে ধর্মাচরণও কতখানি হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে, তার ব্যাখ্যাসমন্বিত উদাহরণ রয়েছে 'ভাব্‌বার কথা'র শেষ তিনটি রচনায়। এর মধ্যে লক্ষ্ণৌর ইমামবারায় দুই রাজপুতের মহরম দেখতে আসার বর্ণনাটি ভাবে ভাষায় রঙে রসে বাংলাসাহিত্যে উঁচুদরের মোজেয়িক (mosaic) শিল্পকর্ম। গল্পটির শেষ দিকে রাজপুত জোয়ানদের 'আসল দেবতা' চিনতে পারার ঘটনায় রঙ্গব্যঙ্গের উচ্ছ্বসিত নির্ঝর। শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের গল্পপরিসমাপ্তির নৈপুণ্য এবং সমগ্র গল্পটির ভাষাগত বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য বাংলাসাহিত্যে অভিনব রসসৃষ্টির দৃষ্টান্ত। এ গল্পে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে স্বামীজীর অনায়াসকৃতিত্বে শব্দশিল্পী-রূপে তাঁর নতুন এক পরিচয়। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত যে ফারসীতে

কৃতবিদ্য ছিলেন, সেকথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্বামীজী নিজেও ইসলামের ভাষাগত ঐতিহ্য ভালোভাবেই বাংলাসাহিত্যে ব্যবহার করতে পেরেছেন—এ গল্পটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

"লক্ষ্ণৌ সহরে মহরমের ভারী ধুম! বড় মসজেদ ইমামবারায় জাঁকজমক রোশনির বাহার দেখে কে! বে-সুমার লোকের সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, কেরানী, য়াহুদী, ছত্রিশ বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, ছত্রিশ বর্ণের হাজার জাতের লোকের ভিড় আজ মহরম দেখতে। লক্ষ্ণৌ সিয়াদের রাজধানী, আর হজরত ইমাম্ হাসেন হোসেনের নামে আর্তনাদ গগন স্পর্শ করছে—সে ছাতিফাটানো মর্সিয়ার কাতরানি কার বা হৃদয় ভেদ না করে? হাজার বৎসরের প্রাচীন কারবালার কথা আজ ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছে।"—এ পর্যন্ত গল্পটির চালচিত্র আঁকা হ'ল। এর পর গল্পের দুই নায়কের প্রবেশ।

"এ দর্শকবৃন্দের ভিড়ের মধ্যে দূর গ্রাম হ'তে দুই ভদ্র রাজপুত তামাসা দেখতে হাজির। ঠাকুর-সাহেবদের—যেমন পাড়াগেঁয়ে জমিদারের হ'য়ে থাকে—'বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ'। সে মোসলমানি সভ্যতা, কাফ-গাফের বিশুদ্ধ উচ্চারণসমেত লুস্করী জবানের পুষ্পবৃষ্টি, আবা-কাবা চুস্ত-পায়জামা তাজ-মোড়াসার রঙ্গ-বেরঙ্গ সহরপসন্দ ঢঙ্গ অতদূর গ্রামে গিয়ে ঠাকুর-সাহেবদের স্পর্শ করতে আজও পারেনি। কাজেই ঠাকুররা সরল-সিধে, সর্বদা শিকার ক'রে জমামরদ কড়াজান্ আর বেজায় মজবুত দিল্।"

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ভাষার শব্দগ্রহণে স্বামীজী কোনো দ্বিধা ছিল না। কতো অনায়াসে আরবী-ফারসী শব্দের যথাযোগ্য ব্যবহারে তাঁর এই বর্ণনায় এক দৃপ্ত পৌরুষ সঞ্চার করেছেন—সেকথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

গোঁয়ার-গোবিন্দ এ দুই রাজপুতকে নিয়ে এবারে স্বামীজীর গল্প-উপস্থাপনায় চরম নৈপুণ্য—"ঠাকুরদ্বয় তো ফটক পার হ'য়ে মসজেদ মধ্যে প্রবেশোদ্যত, এমন সময় সিপাহী নিষেধ করলে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলে যে, এই যে দ্বারপার্শ্বে মুরদ খাড়া

দেখছ, ওকে আগে পাঁচ জুতো মার, তবে ভিতরে যেতে পাবে। মূর্তিটি কার? জবাব এল—ও মহাপাপী ইয়েজ্বিদের মূর্তি। ও হাজার বৎসর আগে হজরত হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে, এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজ্বিদ-মূর্তি পাঁচ জুতায় জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কিন্তু কর্মের বিচিত্র গতি। উল্টা সমঝ্‌লিরাম—ঠাকুরদ্বয় গললগ্নীকৃতবাস ভূমিষ্ঠ হ'য়ে ইয়েজ্বিদ মূর্তির পদতলে কুমড়ো গড়াগড়ি করে গদ্‌গদস্বরে স্তুতি—'ভেতর ঢুকে আর কাজ কি, অন্য ঠাকুর আর কি দেখ্‌ব? ভল্‌ বাবা অজিদ্‌, দেবতা তো তুঁহি হ্যায়, অস্‌ মারো শারোকো কি অভি তক্‌ রোবত।' (ধন্য বাবা ইয়েজ্বিদ্‌, এমনি মেরেচো শালাদের —কি আজও কাঁদছে !!)"

স্বামীজীর হাস্যরসের অন্তরালে যে বৈদান্তিক সত্তাটি নির্লিপ্তভাবে জগৎ-ব্যাপারকে লক্ষ্য করে যায়, তারই ভাষাগত রূপায়ণ—'কর্মের বিচিত্র গতি'। এ জগতে কী থেকে কী হয়ে দাঁড়ায়, তার রহস্য বোঝা প্রায় অসম্ভব। অনেক সময় অসম্ভবের কল্পনাতেই হয়তো জগতের অর্থ ঠিক ঠিক ধরা পড়ে। 'অ্যালিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' —(আজব দেশে অ্যালিস) বইটি এজন্য স্বামীজীর এত প্রিয় ছিল। আলোচ্য গল্পে ইয়েজ্বিদের দুষ্কৃতির কথা শুনে রাজপুতদ্বয় কোথায় তার উপরে রাগ করবে, জুতো মারবে (প্রহরীর প্রস্তাবটিও কম হাস্যকর নয়) তা না ক'রে ওই মূর্তির পদতলেই ভক্তিতে লুটিয়ে পড়ল, (স্বামীজীর ভাষা-প্রয়োগ—'কুমড়ো গড়াগড়ি', 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' —হাস্যরস-সৃষ্টিতে এ সব বিশিষ্ট বাক্যাংশ, প্রবাদ প্রভৃতির অমোঘ ব্যবহারে তাঁর সহজাত পারদর্শিতা গল্পটির হাস্যরসকে অনেক গুণে বাড়িয়ে তুলেছে)—এ ঘটনা কর্মের গহন গতিও যেমন প্রমাণ করে, সমস্ত জগৎ জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাতের মধ্যে যে হাস্যরসের দিকটি আপনি উদ্ভাসিত হয়, তাও তেমনি ফুটিয়ে তোলে। রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শের প্রভাব যতই থাক, আমাদের দেশেই রাবণ বা দুর্যোধনকে বীরোত্তম (hero) মনে করার মতো লোকও আছে।

সেদিক থেকে রাজপুতদেরও 'ইয়েজিদ'কেই দেবতা মনে হওয়ায় সরল যুক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় হাস্যরস (humour) পাঠকচিত্তকে আন্দোলিত করে যায়।

হাস্যরসের গল্প পরিবেশন-নৈপুণ্যের উচ্চতম কারিগরির অপেক্ষা রাখে। স্বামীজী গল্পটি যেখানে শেষ করেছেন, সেখানে হাস্যরসিক হিসাবে তাঁর 'ওস্তাদের মার'। হাজার বছর আগে মার খাওয়ার জন্য 'আজও কাঁদছে'—এই মন্তব্যে সমগ্র ঘটনাটির বিপরীত ব্যাখ্যায় রাজপুতদের বিচিত্র সিদ্ধান্ত যে অফুরন্ত হাস্যরস সৃষ্টি করে, তার কৃতিত্ব যেমন, তেমনি কৃতিত্ব গল্পটিকে আর কোনো ব্যাখ্যা করতে না যাওয়ায়। যথার্থ রসিকই জানেন, শ্রেষ্ঠ শিল্প ঠিক জায়গায় থামতে জানা।

মহরমের গল্পটির পরে স্বামীজী অনেকটা রূপক-ব্যাখ্যার মতো হিন্দুধর্মপ্রসঙ্গে একটি কাহিনীর আভাস দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গনৈপুণ্যের তীব্রতম আত্মপ্রকাশ তৃতীয় গল্পটিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ফলে শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (স্বামী কৃষ্ণানন্দ) প্রমুখ হিন্দুধর্মের প্রাচীন সংস্কার-সমূহের আধুনিক ব্যাখ্যাতারা দেখা দিয়েছিলেন। এঁদের চিন্তাধারায় স্বদেশের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা অবশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু আধুনিক জীবন ও জগতের প্রয়োজনীয় রূপান্তর-সাধনে এঁদের আপত্তি এবং যাবতীয় প্রাচীন সংস্কারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার কষ্টকর বা হাস্যকর প্রয়াস কিছু দিনের মধ্যেই শিক্ষিত সমাজকে এঁদের প্রতি বিমুখ করে তোলে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ—কেউই এ-জাতীয় চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন না। এঁদের যুক্তি, সমালোচনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ একদিকে যেমন স্মরণীয়, তেমনি স্মরণীয় ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবক্তারূপে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতায় রচনায় কথোপকথনে ও পত্রাবলীতে এঁদের বিরুদ্ধে নির্মম ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ। বিশেষত 'পত্রাবলী'তে 'বিমলা ও শশী সাণ্ডেল'-প্রসঙ্গ আমরা আগে পেয়েছি।[১] 'ভাব্‌বার কথা'র শেষ গল্পটিতে ওই-জাতীয়

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : ১ম সং : পৃঃ ৭৪

চরিত্রেরই একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি স্বামীজীর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতে আঘাতে রূপায়িত।

"গুড়গুড়ে কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—মহাপণ্ডিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর তাঁর নখদর্পণে। শরীরটি অস্থিচর্মসার; বন্ধুরা বলে তপস্যার দাপটে, শত্রুরা বলে অন্নাভাবে! আবার দুষ্টেরা বলে, বছরে দেড়কুড়ি ছেলে হ'লে ঐরকম চেহারাই হয়ে থাকে।"

ছোট ছোট বাক্যের আক্রমণাত্মক হুল ক্রমে অগ্রসর হয়ে এ মহাপণ্ডিতের সমগ্র চরিত্রটিকেই কী নির্মম পরিহাসে জর্জরিত করেছে, সেটি এখানে লক্ষণীয়। মন্তব্যগুলি খুবই কঠোর, কিন্তু মহাদম্ভের প্রতীক 'গুড়গুড়ে' সেকালের প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালী পণ্ডিতের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। আর কোনো ভাষায় তার পাণ্ডিত্যের অসারতা ও মানসিক দৈন্য এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা যেত না।

এর পর সেকালের 'বৈজ্ঞানিক' ধর্মপ্রবক্তারূপে গুড়গুড়ে ভট্চায —"কৃষ্ণব্যাল মহাশয় না জানেন এমন জিনিসটিই নাই, বিশেষ টিকি হ'তে আরম্ভ ক'রে নবদ্বার পর্যন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির গতাগতি-বিষয়ে তিনি সর্বজ্ঞ। আর এ রহস্যজ্ঞান থাকার দরুন দুর্গাপূজার বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকা হ'তে মায় কাদা, পুনর্বিবাহ, দশ বৎসরের কুমারীর গর্ভাধান পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে তিনি অদ্বিতীয়।"

পরিমল গোস্বামী যাকে 'ব্যঙ্গের লাঠি' বলেছেন, এ সেই লাঠি, যার পিঠে (বা মনে) এসে পড়ে, সে এ জীবনে ভুলতে পারে না। স্বভাবতই সেযুগের হিন্দুয়ানির ধ্বজাধারী 'বঙ্গবাসী'-জাতীয় পত্রিকা স্বামীজীর বিরুদ্ধতা সবসময়ই করে গেছে। এ-জাতীয় 'বৈজ্ঞানিক' হিন্দুধর্মের প্রবক্তাদের 'প্রমাণপ্রয়োগ' সম্বন্ধে স্বামীজীর ব্যঙ্গোক্তি আরো নির্মম—"বলি, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম হয় না, ভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া ধর্ম বুঝবার আর কেউ অধিকারীই নয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার কৃষ্ণব্যালগুষ্টি ছাড়া বাকী সব কিছুই নয়, আবার কৃষ্ণব্যালদের মধ্যে গুড়গুড়ে !!!" বংশগত অহংকারের এই কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে এ-জাতীয় শাণিত আক্রমণই যথাযোগ্য কর্তব্য।

প্রাচীন পদ্ধতির অর্থহীন পুনরাবৃত্তিকে যারা 'বৈজ্ঞানিক' অপব্যাখ্যা দ্বারা আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল এবং তার দ্বারা সমাজের সর্ববিধ প্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরোধী হয়ে উঠেছিল, তাদের চেলাদের সম্বন্ধে স্বামীজীর কটাক্ষ—"মেলা লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে, লোকগুলো একটু চমচমে হয়ে উঠছে, সকল জিনিস বুঝতে চায়, চাকতে চায়, তাই কৃষ্ণব্যাল মহাশয় সকলকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, মাভৈঃ, যে-সকল মুস্কিল মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে, আমি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করছি, তোমরা যেমন ছিলে তেমনি থাক। নাকে সরষের তেল দিয়ে খুব ঘুমোও। কেবল আমার বিদায়ের কথাটা ভুলো না। লোকেরা বললে—বাঁচলুম, কি বিপদই এসেছিল বাপু! উঠে বসতে হবে, চলতে ফিরতে হবে, কি আপদ!! 'বেঁচে থাক কৃষ্ণব্যাল' ব'লে আবার পাশ ফিরে শুলো।"

প্রাচীন প্রথানুবর্তনের প্রাণহীনতা থেকে দেশকে মুক্ত ক'রে নতুনভাবে ধর্ম ও স্মৃতির অনুশাসনগুলির পরিবর্তন যে একান্ত প্রয়োজন, সেকথা স্বামীজী বিশেষভাবে উপলব্ধি করতেন। তাই পাণ্ডিত্যের নামে এ-জাতীয় আত্ম-প্রবঞ্চনাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেন নি। অথচ অতীত জীবনধারার যা কিছু মহৎ ও প্রাণবেগ-সম্পন্ন তার সঙ্গে সমকালীন জীবনধারাকে যুক্ত ক'রে তিনি জাতীয় জীবনে নবজাগরণ আনতে চেয়েছিলেন। বস্তুত স্বামীজীর সমস্ত আন্দোলনই ভবিষ্যৎমুখী। শাস্ত্রের নামে অর্থহীন সংস্কারের দাসত্ব চিরস্থায়ী রাখতে যারা সচেষ্ট হয়েছিল এবং যারা সব চিন্তাভাবনা বিসর্জন দিয়ে এ-জাতীয় গুরুদের অনুসরণ করতে চলেছিল, তাদের স্বামীজী রাজপুতদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন—'ভল্ বাবা "অভ্যাস" অস্ মারো ইত্যাদি।' বিচার-বিশ্লেষণহীন গড্ডলিকা-স্রোতে ভেসে যাওয়া আমাদের হাজার বছরের জাতীয় অভ্যাস। যে সব চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি আমাদের নতুন ক'রে ভাবতে ও কাজ করতে বলে, তাদের প্রতি সহজেই আমাদের সন্দেহ ও বিরক্তি। সুতরাং যে নবজাগরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সূচিত হয়েছিল, দ্বিতীয়ার্ধে

তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও কম হয় নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিবেকানন্দ অবধি আমরা অতীত ও বর্তমানের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এবং সমকালীনের সঙ্গে ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ-প্রচেষ্টা দেখতে পাই। কৃষ্ণব্যাল-গোষ্ঠী ওই "অভ্যাস"-দেবতাকেই আসল দেবতা মনে ক'রে যতই আমাদের ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করুন, বিবেকানন্দের 'উত্তিষ্ঠত'-মন্ত্রের আহ্বানই জাতীয় চিত্তে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। হিন্দু বা বৈদিক ধর্ম ও সমাজের মূল ধারাটিকে অবলম্বন ক'রে স্বামীজী সে ধারাকে প্রসারিত বিশ্ববোধে পরিণত করেছেন। 'চিকাগো-বক্তৃতা'র প্রথম বক্তৃতাটি সেই নিত্য-বহমান ভারতীয় জীবনদর্শনের প্রতীক।

কিন্তু হিন্দুধর্ম বলতে আমরা নির্দিষ্টভাবে কোনো একটি আদর্শকে নির্দেশ করতে পারি কি? বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে আধুনিক হিন্দুচেতনা গড়ে উঠেছে। এতে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মিশে রয়েছে একান্ত বহিরঙ্গ ধর্মীয় প্রথা, উদার ব্রহ্মবোধের সঙ্গে সংকীর্ণ ছুঁৎমার্গ, উচ্চতম নৈতিকতার পাশাপাশি প্রাত্যহিক জীবনে চরম অসাধুতা। ফলে শাস্ত্র বলতে লোকে বাইরের কতগুলো আচার-বিচারকেই চিরকাল প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। মন্দিরের অন্তরতম দেবতা চোখের আড়ালে থেকে গেছেন।

হিন্দুধর্মকে "এক গগনস্পর্শী মন্দিরে"র সঙ্গে তুলনা ক'রে সে মন্দিরের দেব-দেবী-বর্ণনায় স্বামীজী লিখছেন—"বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম হতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূয্যিমামা, ইঁদুরচড়া গণেশ, আর কুচোদেবতা ষষ্ঠী, মাকাল প্রভৃতি,—নাই কি?" এই সব দেবতারা ছাড়া রয়েছে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রমুখ শাস্ত্র—এ সবে "ঢের মাল আছে যার এক-একটা কথায় ভববন্ধন টুটে যায়।" কিন্তু ভববন্ধন-মোচনের চিন্তা খুব কম লোকই ক'রে থাকে। বেশীর ভাগ মানুষ এই মন্দিরের ভিতরে না গিয়ে বাইরে দোরের পাশে এক মূর্তির পায়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এই দেবতার—"পঞ্চাশ মুণ্ডু, একশত হাত, দু-শ পেট, পাঁচ-শ ঠ্যাঙওয়ালা মূর্তি" এবং এঁর নাম "লোকাচার"। আর সব দেবতাকে মানলেও চলে, না মানলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আসল পুজো

এই লোকাচারের। এও সেই লক্ষ্ণৌয়ের ইমামবারার দরজার বাইরে ইয়েজিদের মূর্তি, আর আমরা সবাই রাজপুত ঠাকুরসাহেবের দল, এঁকে পেন্নাম করেই জীবন সার্থক মনে করছি। 'ভাব্‌বার কথা'র দ্বিতীয় গুচ্ছের এই দ্বিতীয় রচনাটি ঠিক গল্প নয়, তবে ব্যঙ্গরস-সৃষ্টিতে এ রূপকটিও সহায়ক। এই রূপক গল্পটি অভ্যাসের বশে আমরা হাজার বছরের চিন্তা যেমন ছাড়তে পারছি না, তেমনি ছাড়তে পারছি না লোকাচারের দাসত্ব—এ মনোভঙ্গীর ব্যঙ্গ রূপায়ণ।

এক হিসাবে স্বামীজীর এই ব্যঙ্গচিত্রটির আলোকে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনের সত্যটি আরো গভীরভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম মূলত এই লোকাচার-দেবতার সঙ্গে। রামমোহনের বিরুদ্ধবাদীরা লোকাচারের যুক্তিতেই মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে একত্রে বেঁধে পোড়ানোর মহিমা গেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর লোকাচারের অনুরোধে-বালবিধবার বাধ্যতা-মূলক জীবনযন্ত্রণার হৃদয়হীনতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে তথাকথিত উচ্চবর্ণের দল তাঁর কথায় কান দেয় নি। বাংলাসাহিত্যে—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই লোকাচার ও নিত্যধর্মের দ্বন্দ্বই মূল সমস্যা। স্বামীজীর বর্ণনায় 'লোকাচার'-দেবতার যে বিচিত্র রূপ ফুটেছে, তাতে সমাজ ও ধর্মাদর্শের অসঙ্গতিই বীভৎস আকৃতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। এমন এক একটি সমাজ-সমালোচনার আপাত-হাস্যময়তার অন্তরালে অনেকদিনের চোখের জল স্তব্ধ হয়ে থাকে।

'উদ্বোধনে' প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি সমালোচনা—'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি'। ম্যাক্সমূলরের বিখ্যাত রামকৃষ্ণজীবনীর এই সমালোচনায়ও স্বামীজীর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গনৈপুণ্য যথাস্থানে নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর নিজস্ব যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। প্রতিপক্ষকে এমন ক্ষমাহীন আক্রমণের প্রত্যাঘাত স্বাভাবিক। একদিকে গোঁড়া হিন্দুসমাজ আর একদিকে আধুনিকমনা ব্রাহ্মসমাজ—এ দুইদলেই স্বামীজীর বিরুদ্ধতা যে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল, তার

অন্যতম কারণ আমরা এজাতীয় সমালোচনার ভাষা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি।

ব্রাহ্মনেতাদের রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আপত্তির একটি সূত্র তাঁর নিষ্কাম দাম্পত্যজীবন; আর একটি সূত্র সমাজের দৃষ্টিতে হীন ও পতিতদের সম্বন্ধে তাঁর অতি উদারতা। বেশ্যা, মাতাল, সেকালের অভিনেতা অভিনেত্রীর দল,—কেউ তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত হয় নি। ব্রাহ্মসমাজ যে সুরুচি ও সুনীতির আদর্শ নিয়ে শিক্ষিতসমাজকে গড়ে তুলতে চাইছিলেন, তার পক্ষে এজাতীয় লোকদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া কঠিন ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের বহিরঙ্গ জীবনই তার সর্বস্ব পরিচয় নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষের সেই অন্তরবাসী সত্তাটিকে যথার্থ অনুভব করতে পারতেন বলেই সাধারণের দৃষ্টিতে হীন পতিত অনেককেই তিনি অসাধারণ আধ্যাত্মিকস্তরে উন্নীত করতে পেরেছিলেন। এই সব কথা মনে রেখেই স্বামীজীর সমালোচনা—

"অপর অভিযোগ এই যে, তিনি বেশ্যাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন না। ইহাতে অধ্যাপকের উত্তর বড়ই মধুর; তিনি বলেন, শুধু রামকৃষ্ণ নহেন, অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকেরাও এ অপরাধে অপরাধী। ···আরও অভিযোগ, মদ্যপানের উপরও তাঁহার তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। হরি! হরি! 'একটু মদ খেয়েছে বলে সে লোকটার ছায়াও স্পর্শ করা হবে না'—এই না অর্থ? দারুণ অভিযোগই বটে! মাতাল, বেশ্যা, চোর, দুষ্টদের মহাপুরুষ কেন দূর দূর করিয়া তাড়াইতেন না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁ-র সুরে কেন কথা কহিতেন না! আবার সকলের উপর বড় অভিযোগ—আজন্ম স্ত্রী-সঙ্গ কেন করিলেন না!!

"আক্ষেপকারীদের এই অপূর্ব পবিত্রতা এবং সদাচারের আদর্শে জীবন গড়িতে না পারিলেই ভারত রসাতলে যাইবে! যাক রসাতলে, যদি ঐ প্রকার নীতিসহায়ে উঠিতে হয়!"[১]

উদ্ধৃত এই মন্তব্যের শেষ পঙ্‌ক্তিটি তিক্ততার বশে হাস্যরসের সীমা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ষষ্ঠ খণ্ড: চতুর্থ সং: পৃঃ ১৩-১৪

ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তার আগে অবধি বহিরঙ্গ সদাচারের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে স্বামীজীর বিদ্রূপমিশ্রিত মন্তব্যগুলি তথাকথিত সমালোচকদের যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা পদে পদে ফুটিয়ে তুলেছে। অথচ প্রথম জীবনে নরেন্দ্রনাথ সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের বেশ কয়েকজনেই ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

নীতিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নিছক নীতিবাগীশ হওয়াই আধ্যাত্মিকতা নয়। এদেশের শুচিবাইগ্রস্ত হিন্দুমহিলারা এ বিষয়ে যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নীতির ধ্বজাধারীরা। জীবনের যে গভীরে আলোক-পাত হলে নিমেষে সব অন্ধকার দূরে চলে যায় সে আলোর কথা এঁদের ধারণায় আসে নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো পরম আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেই গিরিশচন্দ্র, কালীপদ, সুরেনবাবু, বিনোদিনী প্রমুখ নানাজনের অন্তর্লোকে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। সাধারণ দৃষ্টিতে হীন ও পতিতদের প্রতি হিন্দুসমাজের নির্মম অবজ্ঞার ঊর্ধ্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের করুণা ও দিব্য-প্রেমের অভিষেক সেদিন কী অসাধ্য সাধন করেছিল, আজ দিনে দিনে তার মর্ম আমাদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

নীতিবোধের দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো শুচিতাসম্পন্ন ও প্রখর অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তিত্বও সেকালে আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। নীতিহীনের স্পর্শমাত্র তাঁর অসহ্য ছিল। অথচ 'ভাবের ঘরে চুরি' না করে আপন দুর্বলতা ও অপূর্ণতা নিয়ে যে তাঁর কাছে এসেছে তাকে তিনি সব দিক থেকে আশ্রয় দিয়ে পরম সত্যের পথিক করে তুলেছেন। সুতরাং তাঁর শেষজীবনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষই তাঁর কাছে এসে আনন্দলোকের অমৃতসংবাদ পেয়ে গেছে। মানবকল্যাণের এই মহত্তর আদর্শের তুলনায় গণ্ডীবদ্ধ নীতিবাগীশদের আচরণ বিবেকানন্দের কাছে একান্ত পরিহাসযোগ্যই মনে হয়েছে। ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যদের অধিকাংশ আধ্যাত্মিক ভঙ্গিমা উপলব্ধিবিহীন প্রার্থনা ও ভাষণ তাঁর কাছে—'ছাঁদি ভাষায় সানাইয়ের পোঁ-র সুরে

কথা'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অথবা যীশুখৃষ্ট অথবা বুদ্ধদেব—যাঁদের সমুদ্রবৎ হৃদয় সর্বমানবের আশ্রয়স্বরূপ—তাঁরাই বিবেকানন্দের নমস্য। এ উদারতাকে যাঁরা অপরাধ ব্লে মনে করেন, তাঁদের বুদ্ধি ও বোধগত সঙ্কীর্ণতার উপরে রাগ করেই স্বামীজীর মন্তব্য, 'যাক রসাতলে'। যদি ঐজাতীয় নীতিবোধের নামাবলীই জাতির একমাত্র উদ্ধারের পন্থা হয়, তাহলেই জাতির অধঃপতন। প্রেম, করুণা ও সহানুভূতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা জাতির মানস-সমুন্নতি অসম্ভব। অথচ দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উদারতাকে ব্রাহ্মসমাজের কেশব-অনুচর প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী অথবা সেকালের হিন্দুধর্মপ্রবক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি ('সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণবিষয়ক পত্রটি স্মরণীয়)—এঁরা সকলেই ভুল বুঝে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শের এই অন্তর্গূঢ় উদারতা ও করুণাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে ম্যাক্সমূলর স্বামীজীর শ্রদ্ধাভজন। অপরপক্ষে ব্রাহ্ম সমালোচকদের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য—'যদি ঐপ্রকার নীতিসহায়ে' দেশের উন্নতি করতে হয়, তার চেয়ে মানুষকে ভালোবেসে আপন করে রসাতলে যাওয়াও ভালো।

মন মুখ যাদের এক নয়, তাদের প্রতি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো স্বামীজীও তীব্রতম আঘাতে সমুদ্যত। বরং এ বিষয়ে গুরুর চেয়ে শিষ্যের ভূমিকা প্রখরতর। 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' (১২৯৬)-পত্রিকায় স্বামীজী একদা 'ঈশা-অনুসরণ' নামে 'ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট' বইটির অনুবাদ শুরু করেছিলেন। স্বামীজীর মতে দাস্যভক্তির অপূর্ব উদাহরণ এ গ্রন্থটির যথার্থ ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শের সঙ্গে সেকালে ধর্মপ্রচারক পাদরীদের আচার আচরণের পার্থক্য কী ধরনের, সে সম্বন্ধে ওই অনুবাদের সূচনা-অংশের মন্তব্যটি স্মরণীয়—"এখন আমরা খ্রীষ্টিয়ান রাজার প্রজা। রাজ-অনুগ্রহে বহুবিধ-নামধারী স্বদেশী বিদেশী খ্রীষ্টিয়ান দেখিলাম। দেখিতেছি যে মিশনরী মহাপুরুষেরা 'অদ্য যাহা আছে খাও, কল্যকার জন্য ভাবিও না' প্রচার করিয়া আসিয়াই আগামী দশ বৎসরের হিসাব এবং সঞ্চয়ে ব্যস্ত—দেখিতেছি, 'যাহার মাথা রাখিবার

স্থান নাই' তাঁহার শিষ্যেরা—তাঁহার প্রচারকেরা বিলাসে মণ্ডিত হইয়া, বিবাহের বরটি সাজিয়া, এক পয়সার মা-বাপ হইয়া ঈশার জ্বলন্ত ত্যাগ, অদ্ভুত নিঃস্বার্থতা প্রচার করিতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান দেখিতেছি না।"[১]

'খ্রীষ্টিয়ান' আদর্শের মানদণ্ডটি এখানে সর্বদেশের ও সর্বকালের সাধকসমাজের মানদণ্ড। স্বামীজী অবশ্য বিশেষভাবে সেকালের প্রোটেস্টান্ট পাদরীদের কথা মনে রেখেই একথা বলেছিলেন। ক্যাথলিকদের সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে স্বামীজীর শ্রদ্ধাবোধ অনেক বেশী। তবু, সামগ্রিকভাবে খ্রীষ্টান পাদরীদের প্রচারধর্ম ও বাস্তব জীবনসাধনার দুস্তর পার্থক্য উদ্ধৃত অংশটিতে ব্যঙ্গে বিদ্রূপে উঁচুদরের জীবন-সমালোচনায় পরিণত। উচ্চতম আদর্শের পাশাপাশি আচরণগত তুচ্ছতা কত হাস্যকর হয়ে ওঠে তার উদাহরণরূপে আগের মুহূর্তে উচ্চতম ত্যাগের কথা, পরমুহূর্তে সঞ্চয় ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি সন্ধানী দৃষ্টির অসঙ্গতি স্বামীজী পাদরীদের বেশভূষার আড়ম্বর ('বিবাহের বরটি') এবং অর্থ-গৃধ্নুতা ('এক পয়সার মা-বাপ') প্রসঙ্গে চলতি ভাষায় বা উপমায় বিচিত্র বৈপরীত্যস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন। মহত্ত্বের মুখোশের অন্তরালে এই একান্ত তুচ্ছতার উদ্‌ঘাটন সত্যিকার হাস্যরসিকের শিল্পকর্ম। তবু ব্যঙ্গ বিদ্রূপেই স্বামীজীর বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকে না বলে তাঁর গুরুতর বিষয়বস্তুর অন্তরালে হাস্যরসিক প্রতিভার স্ফুরণ অনেক সময়ই পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়।

'উদ্বোধন'-পত্রিকায় 'প্রস্তাবনা'-লেখাটি পরবর্তীকালে 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থে 'বর্তমান সমস্যা' নামে সংকলিত। যুগসমস্যার পটভূমিকায় স্বামীজী 'উদ্বোধনে'র বিশেষভূমিকার কথা অসামান্য দক্ষতায় এ প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। এমন একটি গুরুতর বিষয়গম্ভীর রচনার মধ্যেও স্বামীজীর ব্যঙ্গবিদ্রূপের সহজাত কৃতিত্ব কীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতবর্ষে সত্ত্বগুণাশ্রিত সাধক

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬-১৭

মহাপুরুষেরাই সর্বজনমান্য। কিন্তু এজাতীয় সাধক সব সমাজেই বিরল, ভারতবর্ষেও অতি অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে এজাতীয় গুণের সমাবেশ। কিন্তু সমাজে এ জাতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার কথা জেনে অনেক মানুষই বাইরে ত্যাগী সেজে সমাজের প্রণাম কুড়াতে এগিয়ে আসেন। জীবনবোধের এই অসঙ্গতিকে স্বামীজী তাঁর মন্দ্রকণ্ঠে বিদ্রূপমিশ্রিত ভর্ৎসনায় এইভাবে ধ্বনিত করেছেন—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে ; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে ; যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে ; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই ?"[১]

এ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি-বিশেষ নয়,—সমস্ত ভারতবাসী। আবার ঠিক এই কথাগুলি বিশেষভাবে আজকের বাঙালী-সমাজের উদ্দেশ্যেও সমান প্রযোজ্য। বহুযুগের উদ্যমহীনতায় অভ্যস্ত ভারতীয়দের জীবন ও চিন্তার অসঙ্গতিকে নির্মম অঙ্গুলি-সংকেতে চিহ্নিত করে স্বামীজী আমাদের ভ্রান্ত আত্ম-তৃপ্তিকে আঘাত করে জাগাতে চেয়েছিলেন। একদা এ আঘাত, এই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ আমাদের বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের চিন্তাধারাকে অনেক পরিমাণে সঞ্জীবিত করে দেশে নবযুগের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু লক্ষণীয়, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও আমাদের মৌলিকতাহীন বিদ্যাচর্চা এবং উদ্যমহীন পূর্বপুরুষের গৌরব-কীর্তন প্রায় একই ধরনের মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। এই তমোগুণের অন্ধকার থেকে জাতীয় চিত্তের পুনরুদ্বোধনে স্বামীজীর চৈতন্য-সঞ্চারী ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ আজও সমান প্রয়োজনীয়।

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৩

সর্ববিষয়ে পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে যারা ইহজীবনে কাল কাটাতে চায়, তাদের উদ্দেশে স্বামীজীর নিগূঢ় ব্যঙ্গ দেখা দিয়েছে 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধটিতে। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তায় এ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জ্বল উদাহরণ। আমরা এ প্রবন্ধে জ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্যের একটি অংশ গ্রহণ করে তাঁর ব্যঙ্গ-নৈপুণ্যের দিকটি লক্ষ্য করবো।

স্বামীজীর সমকালে হিন্দুয়ানি বা বিশেষ করে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য প্রচারে বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। এই ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয় জ্ঞানচর্চায় ব্রাহ্মণদের চিরকালীন একাধিপত্যের ধারণা। এই ধারণা যাঁদের, তাঁদের সম্বন্ধে স্বামীজী কতো মৃদু ব্যঙ্গে এঁদের দম্ভ ও অহংকারের অসারতা ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁর ভাষাভঙ্গী থেকেই বিচার্য। "একদল আছেন, যাঁহাদের বিশ্বাস—প্রাচীন মহাপুরুষদিগের অভিপ্রায় পূর্বপুরুষপরম্পরাগত পথে তাঁহারাই প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সকল বিষয়ের জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট ভাণ্ডার অনন্ত কাল হইতে আছে, ঐ খাজনা পূর্বপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহারা উত্তরাধিকারী, জগতের পূজ্য।"[১] এক্ষেত্রে পূর্বপুরুষেরা জ্ঞানী ছিলেন এই অধিকারেই একালের উত্তরাধিকারীদেরও সমান জ্ঞানী হওয়ার দাবি করে বসার ভঙ্গীটুকু দেখার মতো। অবশ্য পৃথিবীতে খুব কম জাতিই এ ধরনের পূর্বপুরুষ দেখাতে পারেন। যাঁরা পারেন না তাঁদের সম্বন্ধে কি বক্তব্য? স্বামীজীর ভাষায়—"...তাঁহাদের উপায়—কিছুই নাই।"[২] সুতরাং জগতের আর সব জাতের লোকেদের একমাত্র কর্তব্য ব্রাহ্মণচরণসেবা। স্বামীজী অবশ্য এদেরও উদ্ধারের উপায় দেখিয়েছেন—কোনো কোনো "সদাশয়" ব্যক্তির বিধান—"আমাদের পদলেহন কর, সেই সুকৃতিফলে আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে।"[৩] অর্থাৎ এ জন্মে না হলেও অন্য জন্মে ব্রাহ্মণ হতে হবে, তবে জ্ঞান, তবে মুক্তি!

কিন্তু সে সব আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ব্রাহ্মণদের জানা ছিল

১, ২, ৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৯

বলে মনে হয় না, তার বেলায়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উত্তর স্বামীজীর ভাষায়—"পূর্বপুরুষেরা জানিতেন বই কি! তবে লোপ হইয়া গিয়াছে, এই শ্লোক দেখ—।"[১] ওই "জানিতেন বই কি" অবধিই একালের পণ্ডিতদের তৃপ্তি, নূতন কোনো জ্ঞানচর্চার বা আবিষ্কারের চেষ্টা না করে আমাদের ব্রাহ্মণ্য-শাসিত প্রাচীন বিদ্যা এভাবে চর্বিতচর্বণের আলস্যেই মগ্ন।

প্রবন্ধটির শেষদিকে স্বামীজী পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ বা বিচারহীন গুরুবাদ—এ দুয়েরই সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের স্বাভাবিক ভ্রান্তির প্রতি অম্লমধুর ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন—"···বোধ হয়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া ভক্তেরা মহাজনদিগের অভিপ্রায়—তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান করেন···।"[২] এই মন্তব্যটির নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি সজাগ পাঠকের কাছে পরম বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হবে। অনেক সময়েই দেখা যায় মহাপুরুষদের বাণী বা আচরণের যথার্থ মর্মোদ্ধার না করতে পেরে ভক্তেরা বিপরীত কোনো ভাবাদর্শকেই বড়ো করে তোলেন। ফলে দেবতার সামনেই তাঁর প্রিয় আদর্শের বলি হয়ে যায়, তথাকথিত ভক্তের দ্বারাই মহাপুরুষের চরম অবমাননা ঘটে। মহাপুরুষের জীবনাদর্শ অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতেই সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছিত হয়।

৩

'বর্তমান ভারত'

বাংলা গদ্যভঙ্গিমায় স্বামীজী সাধু ও চলতি দু' জাতীয় ভাষাতেই সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। হাস্যরসের ক্ষেত্রেও এ দু' ভাষায়ই তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার সুচারু প্রকাশ। তবে সাধু ভাষায় তাঁর হাস্যরস স্বভাবতই রচনাগাম্ভীর্যের আড়ালে আপাতপ্রচ্ছন্ন। মনোযোগী

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ৩৯-৪০

পাঠক না হলে তাঁর বক্তব্যের অন্তর্লীন ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আবার সজাগ পাঠকের কাছে এজাতীয় রসসৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। 'ভাব্‌বার কথার প্রবন্ধগুলি অবলম্বনে আমরা স্বামীজীর সাহিত্যে হাস্যরসের নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছি, এবারে সাধু ভাষায় তাঁর অমর রচনা 'বর্তমান ভারত' নিবন্ধটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা যাক।

বাস্তবিক, ইতিহাস-দর্শনের এই বেদান্তসূত্র-প্রতিম গ্রন্থটির মধ্যে কোথাও হাস্যরসের অবকাশ আছে, এ কথা মনে করা কঠিন। কিন্তু ইতিহাস তো জীবনেরই সৃষ্টি। আনন্দময় বিবেকানন্দ ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসধারার অন্তরালে সময়, জীবন ও আদর্শের নানা বিচিত্র সংঘাতে যে হাস্যকর অসংগতিগুলি অনুভব করেছেন, নির্মল অথচ নির্মম কৌতুকের সঙ্গে তা পাঠকের দৃষ্টিগোচর করেছেন।

'বর্তমান ভারতে'র সূচনার দিকে পুরোহিত শক্তির প্রাধান্যকালে রাজশক্তির প্রসঙ্গে স্বামীজী দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্যশক্তি পরিচালিত রাজশক্তি আদর্শের দিক থেকে দৈব-আশ্রিত ঋষিদের মতামতের উপরে নির্ভরশীল। ঋষি-মুনিদের লেখা গ্রন্থাদি তাঁদের রাজ্য-পরিচালনার নির্দেশক। কিন্তু ওসব নির্দেশ কার্যকালে কতটুকু মানা হতো, সন্দেহের বিষয়। অধিকাংশ রাজাই পুরোহিত ছাড়া অন্যান্য প্রজাদের উপর স্বেচ্ছাচারী শোষক মাত্র।

প্রসঙ্গটি স্বামীজীর ভাষায়—"পুস্তকাবদ্ধ নিয়ম ও তাহার কার্যপরিণতি, এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক। একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোকত্ব—অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।"[১]

গুরুগম্ভীর ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের অন্তরালে স্বামীজী রাজা-রাজড়াদের মতিগতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে মন্তব্য করেছেন, তা

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২২৩

একদিকে যেমন সত্য, আর একদিকে তেমনি বাস্তব ঘটনা উপলক্ষে নিদারুণ ব্যঙ্গ। দু'চারজন রাজা বা সম্রাটের মহানুভবতার উদাহরণের দ্বারা অধিকাংশ রাজা-রাজড়ার অনাচার অত্যাচার ঢাকা দেওয়া যায় না।

এই মন্তব্যের পরেই রাজ-শাসিত দেশ প্রসঙ্গে স্বামীজী গণচেতনার দিক থেকে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু সে প্রশ্নটিও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসের ভিয়েনে চাপিয়ে পাঠকের কাছে পরিবেশিত। রাজা—তিনি যত বড়ো বা যত ভালোই হোন না কেন, প্রজাদের ক্রমে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারলেই তাঁর যথার্থ কৃতিত্ব। যে রাজার আমলে প্রজার কোনো বক্তব্য বা স্বাধীনতাই থাকে না, তাঁর দ্বারা প্রজার রক্ষা বা পালন হচ্ছে বলে আপাতত মনে হলেও আসলে অতিরিক্ত রাজশক্তির উপর নির্ভরশীল প্রজার অধঃপতনই হ'তে থাকে। বিষয়টি কি কেবল প্রাচীন ভারতপ্রসঙ্গেই স্বামীজীর মনে এসেছিল ?

এমনও হ'তে পারে যে, ইংরেজশাসনের মহিমা নিয়ে বিদেশী ও এদেশীদের অনেকেই যখন মোহগ্রস্ত, তখন স্বামীজী হয়তো মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, প্রজার স্বাধীন আত্মোন্নতি যে শাসনের দ্বারা হয় না, সে শাসন আসলে প্রজার মনুষ্যত্বহীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রসঙ্গটি স্বামীজী যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্বইতিহাসের সর্বকালেই সমান প্রযোজ্য।

"হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ববিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়।"[১]

সাধারণভাবে সর্ববিষয়ে সরকারের কাছে উদ্বাহু ও প্রত্যাশী আমাদের নাগরিকদের দিকে তাকালে স্বামীজীর সাবধানবাণী আজও

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২২৩-২২৪

আমাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের দিক থেকে সমান গুরুত্বপূর্ণ—"ঐ 'পালিত' 'রক্ষিত'ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্বনাশের মূল।"[১] স্বায়ত্ত-শাসনের স্বনির্ভরতা থেকে যে প্রভুর দল সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করেন, তাঁরা সমগ্র দেশে ও সমাজে একদল চির নাবালক সৃষ্টি করেন, শেষ অবধি যাদের বুদ্ধিহীনতায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বনাশ ঘটে থাকে। সুতরাং "দীর্ঘকায় শিশু" তৈরী করা সম্বন্ধে রাষ্ট্র-পরিচালকদের সব সময়ই সচেতন থাকতে হবে।

ভারতে মুসলমান-শাসন সম্বন্ধে স্বামীজী নানা দিক থেকেই প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। পুরোহিতদের প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে মুসলমান রাজাদের সময়ে প্রাচীন ভারতের মৌর্য, গুপ্তদের গৌরবময় যুগ অনেক পরিমাণে ফিরে এসেছিল। সেই সঙ্গে মুসলমান রাজ-শক্তির 'কাফের'-বিদ্বেষের সত্যটিও স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি মৃদু ব্যঙ্গে এইভাবে প্রকাশিত—"য়াহুদী বা ঈশাহী মুসলমানের নিকট সম্যক্ ঘৃণ্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র; কিন্তু কাফের মূর্তিপূজাকারী হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। সেই কাফেরের ধর্মগুরুদিগকে—পুরোহিতবর্গকে—দয়া করিয়া কোনও প্রকারে জীবনধারণ করিতে আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহাও কখন কখন; নতুবা রাজার ধর্মানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফের হত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন!"[২] বিনীত ভাষণের মৃদুভঙ্গিমা অত্যাচারী শাসকশক্তির নিষ্ঠুরতাকেও এখানে হাস্যরসের স্মিত আলোকে উদ্ভাসিত করেছে।

স্বামীজীর ইতিহাসদৃষ্টিতে ইংরেজের ভারতবিজয় মূলত বৈশ্যশক্তির ভারতবিজয়। ভারতে ইংরেজের রাজত্বের সময় থেকেই বিশ্বইতিহাসে বৈশ্যযুগের সূচনা। "...এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।"[৩]

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২২৩-২২৪

২ তদেব : পৃঃ ২২৬-২২৭

৩ তদেব : পৃঃ ২৩১

ইংরেজমহিমার ঐ সাড়ম্বর ঘোষণার আড়ালে কি স্বামীজীর সদাসজাগ ব্যঙ্গদৃষ্টির প্রকাশ রয়েছে? তরঙ্গের শীর্ষটি যত উঁচু হয়, ততই তার পতনের সম্ভাবনা। বৈশ্যযুগের উত্থানের মধ্যেই তার পতনসম্ভাবনা তো স্বামীজী তাঁর ইতিহাসদৃষ্টিতে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছেন!

ইংরেজের ভারতবিজয় খ্রীষ্টধর্মের ভারতবিজয় নয়, পাঠান-মোগলের ভারত-সাম্রাজ্যস্থাপনও নয়। স্বামীজীর দৃষ্টিতে তথাকথিত ধর্মপ্রচার, রাজশক্তির আড়ম্বর, ইংরেজের আত্মগৌরবঘোষণা—এ সব কিছুর আড়ালে রয়েছে বৈশ্যশক্তির সর্বস্ব-শোষণকারী ভূমিকা। "...এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা, এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"[১]

ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশে যারা এদেশে এসেছিল, একদিকে ভারতের সহজলভ্য কাঁচামাল, আর একদিকে বিজ্ঞানসৃষ্ট কলকারখানার উন্নতির দ্বারা একদিন তাদের বাণিজ্যতরী জগতের শেয়ার-বাজার দখল করে দুনিয়ার সোনার ভাণ্ডারটি নিজেদের করায়ত্ত করেছিল। রাজনীতি ও অর্থনীতির এই যুগল সম্মেলনকে স্বামীজী ইংরেজ রাজ-মহিমার স্বরূপবিশ্লেষণে আপাতস্তবের ভাষায় অনবদ্য রসসৃষ্টির কৌশলে প্রকাশ করেছেন। ইংরেজের আসল ধ্বজা তার কলকারখানার উন্নতি (চিমনি), তার আসল সৈন্যবাহিনী তার বাণিজ্য জাহাজগুলি, জগতের শেয়ারের বাজার হস্তগত করাতেই তাদের আসল বিজয়ক্ষেত্র, আর রাণী ভিক্টোরিয়া বাইরে রাণী হলেও, কোনো রাজা বা রাণী নয়, ইংলণ্ডের আসল রাজশক্তি তার সোনার ভাণ্ডার ('স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী')। এত সংক্ষেপে অর্থগূঢ় নাটকীয় সংলাপে স্বামীজী ইংরেজরাজত্বের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রতিটি শব্দ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে এ বাক্যটির যথার্থ রস উপভোগ করা সম্ভব। কিন্তু একবার অর্থবোধ হলে ভাষা ব্যবহারের নিপুণতম চাতুরী

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২০১

বিশ্লেষণকারী বিদগ্ধ পাঠকের সহর্ষ সাধুবাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। স্বামীজীর ভাষায় "ওলবাটা মুখ" ইংরেজ এ বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলে মর্মে জ্বলে যেত, সন্দেহ নেই।

বৈশ্যশক্তির ঐতিহাসিক অভ্যুদয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী তাঁর সাধু ভাষার অন্তর্নিহিত হাস্যরস সৃজনে যে বিশেষ সার্থকতা অর্জন করেছেন, তার আর একটি উদাহরণ ইতিহাসের পর্ব-পর্বান্তরের বর্ণনায় এভাবে প্রকাশিত—

"ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, 'আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে'—দিন কতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অস্ত্রবল না থাকিলে, বিদ্যাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ।' কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে [উহা] গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন! বৈশ্য বলিতেছেন, "উন্মাদ! 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্তশক্তিমান আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি—ইহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু প্যান করিবে কে? —আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।"[১]

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নবযুগের পট-পরিবর্তনকে স্বামীজী অপূর্ব কৌশলে অভিনব ব্যঞ্জনামণ্ডিত করেছেন। বৈশ্যের অভ্যুদয়, তার আপাতবিজয়, নির্মম শোষণ ও সর্বগ্রাসী পরিকল্পনার ভয়াবহতাসহ এ মন্তব্যে যেন কৌতুকনাট্যের নায়কোচিত ভূমিকায় উপস্থাপিত।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ : পৃঃ ২৩৯

রাজশক্তির অবসানে বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়ে অর্থই জগতের কেন্দ্রশক্তি-রূপে স্বীকৃত। বিদ্যা, বুদ্ধি, অস্ত্র, শক্তি, বীরত্ব, মনুষ্যত্ব এ সব কিছুই যখন অর্থশক্তির দাসত্ব স্বীকার করতে চলেছে, সেই সময়েই বিবেকানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থ বা কাঞ্চন বা টাকার সঙ্গে সব সম্বন্ধ অস্বীকার করে এক ঈশ্বরকেই মানবজীবনের চরম ও পরম সার্থকতা-রূপে ঘোষণা করলেন। তাঁর সেই অমৃত হাসিটি হয়তো বৈশ্যযুগের সব ঔদ্ধত্যের নীরব প্রত্যুত্তর!

ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, পৃথিবী, ইতিহাস—এ সবকিছুকে অবলম্বন করেই হাস্যরসের উপাদান জগতে ছড়িয়ে আছে। মানসপরিমণ্ডলের বিস্তারে যিনি যতো বড়ো, তাঁর কাছে এ জীবন তত অর্থবহ। জীবনের সেই গভীর অর্থে সুখ বা দুঃখ দুই-ই আছে। কিন্তু যিনি সুখদুঃখের পারে, তাঁর পক্ষেই এ জগৎ আনন্দময়।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বামীজী যখন ভারত ও বিশ্বের পটপরিবর্তন লক্ষ্য করে চলেছেন, তখন তাঁর এক একটি মন্তব্যে যেমন বিশ্লেষণীশক্তির সন্ধানী আলোকনিক্ষেপে অতীত ও বর্তমানের ঘটনারাজির অন্তর্নিহিত সত্য আত্মপ্রকাশ করে, তেমনিই দীপ্তবুদ্ধির বিকীর্ণ বিভায় সে ঘটনাবলীর অন্তর্লীন হাস্যকরতাও পাঠকের বোধশক্তিকে সমুজ্জ্বল আনন্দে পরিপূর্ণ করে। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে বণিকতন্ত্রের আবির্ভাব-ইতিহাসকে স্বামীজী যখন সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করেন—"প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং। বেণ রাজার ন্যায় তিনি সর্ব-দেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্ব-মাত্র দেখেন! সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাতেই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ।"[১] তখন স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিকাশকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে আপাতগম্ভীর ভাবাভঙ্গির পাশাপাশি তথাকথিত রাজা বা

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'বর্তমান ভারত'

নেতা জাতীয় ব্যক্তিদের নিজেদের সম্বন্ধে অতিশয়িত কল্পনার মূঢ়তাও সমান ব্যঙ্গে ধ্বনিত। স্বামীজীর ব্যঙ্গবিদ্রূপে সিদ্ধ কথনভঙ্গী ইতিহাসের পটপরিবর্তনকে পাঠকের অন্তরে নিগূঢ় হাস্যে গভীরতর ব্যঞ্জনায় স্থায়ীভাবে অঙ্কিত করে।

রাজার কাজ প্রজাপালন। কিন্তু দুনিয়ার বেশীর ভাগ রাজারাই নিজেদের পোষণ নিয়ে এত ব্যস্ত যে, প্রজার কথা ভাবার সময় তাঁদের অতি অল্পই মেলে। ভাগবতের গল্পে যেমন বেণ রাজা নিজেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের চেয়ে বড়ো মনে করতেন, আমাদের এ যুগের (রাজার বদলে) দলপতিরাও তেমনি নিজেদের মহিমায় এত মুগ্ধ থাকেন যে, অন্যের চোখে এর ফলে তাঁরা কতটা হাস্যকর হয়ে ওঠেন, সেকথা ভাবতেই পারেন না। এ-জাতীয় লোকেদের আত্মগরিমা নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কারু ইচ্ছার দাম দেয় না। পালন ও পীড়ন, রক্ষণ ও ভক্ষণ—এ দুয়ের পার্থক্য ঘুচে যায়।

সমাজের এমন অবস্থায় ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিপ্লব। কিন্তু সব দেশেই যে বিপ্লব সমান সার্থক অথবা সম্ভব, তা নয়। অত্যাচারীর অন্যায় শক্তিকে—"যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে···।[১] এমন জাতি বা সমাজের পক্ষে দাসত্বই বিধান। কিন্তু যেখানে সমাজশক্তি সচেতন সেখানে—"শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে নিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্য বিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।"[২]

অতি সংক্ষেপে এখানে রাজন্যশক্তির বিলোপ এবং মিউজিয়ম বা চিত্রশালিকায় স্থানপ্রাপ্তির বর্ণনাটি একই সঙ্গে হাস্য ও করুণরসের সম্মেলন। এককালে যে সিংহাসন দোর্দণ্ড রাজপ্রতাপের প্রতীক, আর এককালে তা সর্ব-ক্ষমতাহীন অতীতবস্তুরূপে কৌতূহল মেটানোর সামগ্রী মাত্র ; সব প্রতাপের শেষ অর্থহীনতা। বলাবাহুল্য, ফরাসী বিপ্লবকে উপলক্ষ্য করেই স্বামীজীর এ মন্তব্য।

১,২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'বর্তমান ভারত'

ইংরেজ-রাজত্ব-প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভবিষ্যৎদৃষ্টি 'বর্তমান ভারতে'র কয়েকটি স্থানে ভাষাগত গাম্ভীর্যে আত্মগোপন করে আছে। তারমধ্যে কোনো কোনোটিতে তাঁর হাস্যরসিক সত্তাও এক ঝিলিক বিদ্যুতের মতো খেলে যায়। যেমন ধরুন—"ইংরেজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে ভারত সাম্রাজ্য তাহাদের অধিকারচ্যুত হইলে জাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকার রক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরেজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূক রাখা।"[১]

যাঁরা পরাধীনযুগের ভারতবর্ষে বাস করার মর্মপীড়া অনুভব করেন নি, তাঁদের পক্ষে স্বামীজীর এ মন্তব্যের অর্থগ্রহণ করা কঠিন। কেমন করে শিক্ষাদীক্ষা, সুযোগসুবিধা, আয়ব্যয়, প্রভৃতি প্রতিদিনের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অবমাননার দ্বারা একটি জাতিকে হীন থেকে হীনতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে বিষয়ে ইংরেজ-মস্তিষ্ক অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেছিল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র 'তলোয়ারকর'-চরিত্রটি অনুধাবন করলে এ যুগের তরুণেরা পরাধীনতার আত্মগ্লানি কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন। এ সব সত্ত্বেও অবশ্য একালে এমন একদল প্রবীণের দেখা মেলে যাঁরা ব্রিটিশ যুগের গুণ-গরিমায় আত্মহারা। শিকলবাঁধা প্রাণীর অনেকদিনের অভ্যাসে শিকলপরাকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করা, আশ্চর্য নয়। কিন্তু স্বামীজীর অন্তরে ইংরেজের আত্মগৌরব ঘোষণার প্রয়াসে "যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয়"[২] হয়েছিল। কারণ, যথার্থ গৌরব কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আরোপিত অভিমানই প্রতি মুহূর্তে লাঘবের ভয়ে কম্পমান।

স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ইংরেজেরা যেসব জাতীয় গুণের দ্বারা ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করেছিল, সে সব গুণ যতদিন থাকবে, "ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল।…কিন্তু যদি ঐ সকল

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'বর্তমান ভারত'

গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীকৃত হয়, বৃথা গৌরব ঘোষণে কি সাম্রাজ্য শাসিত হইবে ?"[১] ইংরেজ শাসনের আসন্ন সংকট স্বামীজীর এই প্রশ্নেই উত্থাপিত। ওই অহঙ্কৃত শাসনব্যবস্থা ভারতের সাধারণ প্রজামণ্ডলী কখনই চিরকাল মেনে নেবে না। কিন্তু সব সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতালোভীদেরই ধারণা যে, নিজেদের মহিমা নানাভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করলেই তাদের 'তখত্ তাজ অচল রাজধানী'।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে চোখ ফিরিয়ে ইতিহাসের শাসন উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো শাসক শ্রেণীই নিজের আসন্ন অবসান কল্পনা করতে পারেনি। স্বামীজীর দৃষ্টিতে—"মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা।"[২] সব রাষ্ট্রশক্তির মূলে জনমনের সমর্থন। সেটি হারালে সব যুগের সব শাসকশ্রেণীরই বিদায় আসন্ন।[৩] কিন্তু আত্মগৌরবের মায়ায় আচ্ছন্নদৃষ্টি শাসকেরা কোনোকালেই সে কথা বুঝতে চায় না বা পারে না। বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ ইতিহাসের অন্তরালে মায়ার এই মোহিনীমূর্তিকে সন্ন্যাসীর নিরপেক্ষতায় লক্ষ্য করে মৃদু হাস্যে মানবভাগ্যের বৈচিত্র্যের কথা ভেবেছেন। জগৎরহস্যের অন্তরালে যে চিরহাস্যের উপাদান সঞ্চিত হয়ে আছে, সেকথা বুঝতে ঐতিহাসিককে বৈদান্তিক হতে হয়।

১,২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'বর্তমান ভারত'

৩ স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী—"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল।...এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে ; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিতেছে ; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।" (বর্তমান ভারত)

'বর্তমান ভারতে'র পাঠকেরা জানেন বৈশ্যশক্তি বলতে স্বামীজী সর্বপ্রথমে ইংরেজ শাসনকেই বুঝিয়েছেন।

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক অনায়াসে নিজেকেই হাস্যরসের উপাদান করে তোলেন। প্রচেষ্টাটি দুঃসাহসিক। অল্পবুদ্ধির শ্রোতার দল এ-জাতীয় হাস্যরসের নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টির কথা না বুঝে যা সূক্ষ্মবুদ্ধির হাসির উপাদান তাকেই উপহাসের বিষয় করে তুলতে পারে। বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত'কে কেবলমাত্র আফিঙখোর বলে মনে করার লোকই জগতে বেশী। কমলাকান্তকে তারিফ করতে হলে জীবনদৃষ্টির যে গভীরতার প্রয়োজন, সংসারের চলতিপথের পথিকদের মধ্যে অতি অল্পই সে দৃষ্টি মেলে।

স্বামীজীর রচনায় নিজেকে নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির উদাহরণ অনেক জায়গাই পাওয়া যায়। কারণ যে বলিষ্ঠ মনোভঙ্গী ও উদারতা থাকলে মানুষ অন্যকে নিয়ে সহৃদয় আনন্দ কৌতুকে মগ্ন হতে পারে, সেই মনোভঙ্গীই নিজের প্রতি প্রযুক্ত হয়ে উচ্চতর মার্গের হাস্যরস সৃষ্টি করে। 'বর্তমান ভারতে' এ জাতীয় হাস্যরসের একটি উদাহরণ —"কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝি কোন ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।"[১] (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ: দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ : পৃঃ ২২১-২২ : ১৩৬৩ সংস্করণ দ্রষ্টব্য) বলা বাহুল্য, এই অল্পবুদ্ধি বালকটি নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং !

সেকালের 'ইয়ং বেঙ্গল' (নব্যবঙ্গ) যারা ভারতীয় ভাবধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাচীন শাস্ত্র, সমাজ, রীতিনীতি সব কিছুর বিরুদ্ধতা করাই একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করতো, তরুণ নরেন্দ্রনাথ একদা কিছুটা সেই দলে ছিলেন। তারপর কখন নিঃশব্দে ভারতাত্মার অনুপ্রবেশ এই তরুণ তর্কপরায়ণ বিদ্রোহীদের অন্তরে ঘটেছে বলা কঠিন। ডিরোজিওর যুগের তরুণ বঙ্গ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগের তরুণ বঙ্গ অবধি এই অন্তরঙ্গ পরিবর্তনের ইতিহাস। ইংরেজ পণ্ডিত বা পাশ্চাত্য মনীষার অনুকরণ তখন জাতীয় ইতিহাসের স্বীকরণে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'বর্তমান ভারত' : পৃঃ ২৪৭

পরিণত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের পক্ষে তার মূল কারণ নিশ্চয় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। কিন্তু একদা তরুণ বয়সের চপল বিতর্কপরায়ণতাকে স্বামীজী নিজেই কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং স্নিগ্ধ হাস্যরসের আধার করে তুলেছেন, তাও এখানে লক্ষণীয়।

আর একদিক থেকে পাঠককে স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন, "ইহাই প্রবল বিভীষিকা।"[১] সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্যের এই অন্ধ অনুকরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো এই বিংশ শতাব্দীতেও কম বিভীষিকা নয়। ইতিহাসের বিশ্লেষণে স্বামীজী এ-জাতীয় মনোভাবের মূল কারণটি নির্মম ব্যঙ্গে প্রকটিত করেছেন।

শক্তিমানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া মানবস্বভাব। ইংরেজ বা পাশ্চাত্য সভ্যতা বলবান বলেই দুর্বল মনোভাবাপন্ন ভারতীয়দের এই অন্ধ অনুকরণস্পৃহা। তবে শুধু এই দেশের মানুষদের এ স্বভাব, তা নয়, দুনিয়া জুড়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতের মানুষদের এই মনোভাব। অনেকটা ধনী আত্মীয়ের পরিচয়ে দরিদ্রের গৌরব অর্জনের চেষ্টার মতো। উচ্চবর্ণের, উচ্চশিক্ষার ও উচ্চবিত্তের অহংকারে যে ভারতবাসীরা দরিদ্র জনগণের সঙ্গে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করে চলে, তাদের স্বামীজী ইতিহাসের এই সত্যটি তীব্র ব্যঙ্গের ভর্ৎসনায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে—দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত।"[২] এই মন্তব্যের বিস্তারেই 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদে স্বামীজীর স্বদেশ প্রীতির দীপ্ত বহ্নিমন্ত্র—"হে ভারত! ভুলিও না···!"[৩]

বহুযুগের যবনিকা পার হয়ে, মিথ্যা অহংকারে ও আত্মকলহে

১ বাণী ও রচনা : পৃঃ ২৪৭

২ তদেব : ৬ষ্ঠ : পৃঃ ২৪৮

৩ তদেব : পৃঃ ২৪৯

সমাচ্ছন্ন ভারতবর্ষের উদ্দেশে তাঁর নির্দেশ—"বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই···।"[১]

গণশক্তির সঙ্গে এই ঐক্যবোধ যে ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে একান্ত কাম্য, একথা নিশ্চিত জেনেই তথাকথিত কুলগৌরবের অহংকারে মত্ত উচ্চবর্ণদের চিন্তাধারায় অসারতা স্বামীজী চরম ব্যঙ্গের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন—"চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণ্য গৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশ মর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতট-মাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ জাতি, উহারা অনার্য জাতি !! উহারা আর আমাদের নহে !!!"[২]

'পরিব্রাজক'-গ্রন্থে স্বামীজী উচ্চবর্ণদের শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে বলেছেন! কারণ, জাতিভেদের মিথ্যা অহংকারে পরিপুষ্ট এই উচ্চবর্ণের দল এ দেশের সাধারণ মানুষের প্রগতির পক্ষে চিরকাল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের উচ্চস্তরের মানুষ ভেবে অহমিকার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সমগ্র দেশ যে শূদ্রদের ঘৃণা করতো, যুগে যুগে বিদেশীদের পদদলিত হয়ে সেই দেশের সব শ্রেণীর মানুষই শূদ্রস্তরে নেমে গিয়েছে। ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য—"ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে,[৩] ক্ষত্রিয়ত্ব রাজ-চক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব।"[৪]

চিন্তায়, চেষ্টায়, কর্মে, বাক্যে, মননে, স্বপ্নে যারা পরের অনুকরণরত, তারা কেউই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে দাবী করতে পারে না,

---

১, ২ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৮-৪৯।

৩ ব্রহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য—অধ্যয়ন অধ্যাপনা ইত্যাদি। শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা তখন অধিকাংশই বিদেশী ইউরোপীয় বা গৌর-অঙ্গ।

৪ তদেব : পৃঃ ২৪০

আসলে তারা পরের আজ্ঞাবাহী শূদ্রমাত্র। সেইজন্যই যে পার্সীরা ভারতবর্ষে বহুকাল থেকেই বাস করে আসছে ধনে মানে বিদ্যায় উন্নতির জন্য সেই পার্সীরা ইংরেজের কাছে সম্মান পেত, তাদের 'নেটিভ' বলে ধিক্কার দেওয়া হতো না। 'নেটিভ' বা দেশবাসী (আসলে এই পরাধীন দেশের অধিবাসী) বলে নিন্দিত হতো জাতি গৌরবের অহংকারে মত্ত হিন্দু সমাজ এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী। পার্সী, ইংরেজ বা য়ুরোপীয়—এদের সম্মান আমাদের অতি উচ্চকুলের ব্রাহ্মণদের চেয়ে তখন অনেক বেশী। আসলে নিজেকে বড়ো বলে অহংকার যারা করে, নিজের অগোচরেই তারা আরো শক্তিমানদের পদলেহন করে নিজের মনুষ্যত্ব খর্ব করতে থাকে। জাতির অহংকারে মত্ত ভারতবাসী ইংরেজ প্রভুদের পদতলে বিক্রীত দাসে পরিণত হয়েছিল। আর এই ইংরেজরাই ভারতবর্ষের নব ইতিহাস রচনা করে আর্য-অনার্য ভেদের গল্পকথা সৃষ্টি করেছিল। তথাকথিত উচ্চ-বর্ণেরা আর্য, আর নিম্ন বর্ণেরা অনার্য—এ কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তিই নেই। তবু রামায়ণকাহিনীকে আর্যদের অনার্যবিজয়, অথবা দেবাসুরের কাহিনীকে আর্য-অনার্য-সংঘাতরূপে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বরাবর করে আসছেন এবং আমাদের ভারতীয় পণ্ডিতেরা নির্বিচারে সেই সব অপতত্ত্ব স্বীকার করে নিয়ে ভারতবাসীকে বহুধাবিভক্ত করার সব চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। এর ফলে পাকিস্তানের মতো উত্তরভারত দক্ষিণভারতের বিভেদ দেখা দেওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। স্বামীজী কিন্তু আর্যদের ভারতবিজয় অথবা দাক্ষিণাত্যবিজয়—এই সব গল্পকথার কোনোটিই স্বীকার করেনি।[১]

---

১ প্রসঙ্গত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে স্বামীজীর মন্তব্য—"ঐ যে ইউরোপী পণ্ডিত বলেছেন, আর্যেরা কোথা হ'তে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন ওসব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐসব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।···কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখেছ, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন?"···

দক্ষিণাত্যের সভ্যতা সম্বন্ধে স্বামীজীর অতি উচ্চ ধারণা। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে 'দক্ষিণী সভ্যতা' অংশটি এবং 'আর্য ও তামিল' নামে প্রবন্ধটি এ বিষয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য। (বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ ও ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

যে বিদেশী পণ্ডিতের দল আর্য-অনার্য-সংঘাতের গল্প তৈরী করেছিল, তাদের ধারণা য়ুরোপের মতো ভারতবর্ষেও সংঘাতের মধ্য দিয়েই সভ্যতার সৃষ্টি। একদল আর একদলকে উৎখাত না করে কোনো রাষ্ট্র বা সভ্যতা গড়ে ওঠে না। স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষে বর্ণবিভাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আপাত অনুন্নতদের ধীরে ধীরে উন্নত করে তোলা। অন্যকে নাশ করে নয়, আপন করে নিয়ে তার সঙ্গে ঐক্যস্থাপন। তাই ভারতের ইতিহাসে প্রাচীনতম গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়েরা আপন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও এদেশে রয়ে গেছে। তুলনায় ইউরোপীয়েরা আদিম জাতিদের প্রায় সমূলে উৎখাত করেছে। "ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ ক'রে আমরা বেঁচে থাকবো! আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান ক'রব।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)।[১]

সুতরাং বিদেশীর শেখানো বিদ্যায় ভারতের আর্য হিসাবে আত্মগৌরবে যাঁরা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীদের অবজ্ঞা করতে শিখেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর কঠোর মন্তব্য —"আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র

"রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়॥ বটে, রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য ; লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজা সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কমতো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধুমিত্র। কোন্ গুহকের, কোন বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বলো না।" (বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২০৯-১০) একালের ঐতিহাসিক ও সমাজ-তাত্ত্বিকেরা এ প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড।

আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্যজাতি !! উহারা আর আমাদের নহে !!!"[১] (বর্তমান ভারত)

উদ্ধৃত মন্তব্যে প্রথম বাক্যের শেষে দুটি ও দ্বিতীয় বাক্যের শেষে তিনটি বিস্ময়বোধক চিহ্নে স্বামীজীর ক্রমবর্ধমান ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, বিস্ময়, বিরক্তি। এ অপশক্তির প্রভাব শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, জার্মানীর বিশুদ্ধ আর্যরক্তের ধারণার ক্ষেত্রেও কী বিষময় প্রভাব বিস্তার করেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এবং ইহুদী-নিধনের ব্যাপকতায় তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ভারতের ইতিহাসে অহেতুক জাতি ও গোষ্ঠী সংঘাতের এই প্রয়াসের দ্বারা বিভেদকামী ইংরেজ সরকারেরই লাভবান হবার সম্ভাবনা ছিল। আজকের ভারতেও যখন এ জাতীয় ধারণার ফলে সংঘাত বাধে, তখন অন্ধ বিদেশী অনুকরণের বিচারহীন মূঢ়তা সবচেয়ে হাস্যকর বলে প্রতিপন্ন হয়।

'পরিব্রাজক'

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্য রসের নিদর্শনরূপে 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের অনেক অংশই উদ্ধৃত করা চলে। গ্রন্থদুটির আলোচনাকালে আমরা কিছু কিছু অংশের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আগেই আকর্ষণ করেছি। আলোচ্য অধ্যায়ে আর একটু বিশদভাবে আমরা এ দুটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির হাস্যরসের দিকটি অনুধাবন করবো।

'পরিব্রাজক' ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা এবং পত্রসাহিত্য এই তিনদিক থেকেই হাস্যরসের বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভ্রমণকাহিনী হিসাবে এ গ্রন্থের আদ্যন্ত স্বামীজীর বুদ্ধিসমুজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর সমুদ্রযাত্রা থেকে আরম্ভ করে দেশদেশান্তর পরিভ্রমণে নিত্য নব নব কৌতুক অন্বেষণরত। ভ্রমণকাহিনীর তথ্যকেন্দ্রিকতা পরিহার করে স্বামীজী তাঁর দূরবিস্তৃত জীবনানুভব নিয়ে যখন পাঠকমনের একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন, তখন এ গ্রন্থে রম্যরচনার স্বাদ। আর

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড।

'উদ্বোধন'-সম্পাদককে এবং বেলুড়মঠের অন্যান্য গুরুভাইদের উদ্দেশে নানা সময়ের কিস্তিতে লেখা পত্র হিসাবেই এ ভ্রমণকাহিনী ধীরে ধীরে পূর্ণরূপ লাভ করেছে। এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' এবং 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী' উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ এ রচনাগুলিতে চিঠিপত্রের মেজাজই বজায় রেখেছেন। পরবর্তীকালে এগুলি গ্রন্থকারে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে 'পরিব্রাজক' পত্রসাহিত্য থেকে ধীরে ধীরে ভ্রমণসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে যদিচ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি তাঁর আকস্মিক ভ্রমণ পরিসমাপ্তির মতোই অসম্পূর্ণ। কিন্তু এ অপূর্ণতা মূল গ্রন্থের ভ্রমণরসকে ব্যাহত করে নি।

ভ্রমণকাহিনীতে সাধারণত ভ্রমণকারীই নায়ক। ক্বচিৎ কথনো লেখককে অতিক্রম করে কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ পরিবেশ হয়তো প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রমণকারীর ব্যক্তিত্বই তাঁর ভ্রমণকাহিনীকে গড়ে তোলে। স্বামীজীর আনন্দময় সতীর্থ-বৎসল চরিত্রটি তাই 'পরিব্রাজকের' প্রথম পঙ্ক্তি থেকেই দেখা দিয়েছে। 'নমো নারায়ণায়' বলে সম্বোধন শেষ করে স্বামীজী লেখা পাঠাতে দেরী হওয়ার কারণ-ব্যাখ্যায় লিখছেন—"আজ সাতদিন হ'ল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে, না হচ্চে, খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু—ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর—কুড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা অনন্ত 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে, এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর—তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে ক'রো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না—রাম হৃদয়ে ব'লে।"[১]

১ "হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি। হনুমান বলেছিল—'আমি তিথিনক্ষত্র জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি।'"—শ্রীরামকৃষ্ণ। (কথামৃত—৩য় ভাগ; ২২ অক্টোবর, ১৮৮২ তারিখের দিনলিপি।

স্মিত হাস্যে গৌরবান্বিত এই অংশটুকুর মধ্যে দার্শনিক ও ভক্ত সন্ন্যাসীর পরিচয়টি কতো অল্প কথায় পাঠকচিত্তকে সমুদ্ভাসিত করে, সেকথা ভেবে দেখার মতো। কাল থেকে অনন্ত কাল এবং কালাকালের বিচার থেকে কালাতীত ভক্ত মহাবীরের আদর্শ—এই মানসপ্রয়াণটুকু বিদগ্ধ হাস্যরসের সৃজনকৌশলে স্বামীজীর হাস্যরস সিদ্ধির সূচনা করেছে মাত্র। তারপর সমস্ত গ্রন্থটি জুড়ে স্বামীজী তাঁর এই বিশেষ ভঙ্গীটি সমান নৈপুণ্যে বজায় রেখেছেন। এ যে কত বড়ো গুণপনা, তা যাঁরা জাত-লেখক তাঁরাই কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন।

জাহাজে চড়ে সমুদ্র পার হওয়ার সঙ্গে স্বামীজী হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘনের তুলনা তাঁর চিঠিপত্রেও করেছেন। তবে 'পরিব্রাজকের' সূচনা-অনুচ্ছেদ এ উপমাটিকে ভক্তিরসে, বাস্তব বর্ণনায় এবং হাস্যরসের বিচিত্র মিশ্রণে যে রূপটি দিয়েছেন, সাহিত্যসৃষ্টির বিচারে সে উপমার গভীরতম রসসৃষ্টি পাঠকচিত্তকে আত্মীয়োপম আন্তরিকতায় ভরে দেয়।

মহাবীরের উল্লেখপ্রসঙ্গে উপমাটি শুরু হচ্ছে এই ভাবে—" 'ক সূর্যপ্রভবো বংশঃ'—থুড়ি, হ'ল না 'ক সূর্যপ্রভব বংশচূড়ামণি-রামৈকশরণো বানরেন্দ্রঃ' আর কোথা আমি দীন অতি দীন।" মহাবীরের আদর্শে বীরভক্ত স্বামীজীর এই ভক্তিজনিত দৈন্যবোধের নম্রতা যেমন পাঠককে মুগ্ধ করে, তেমনি পরমুহূর্তেই মহাবীরের সমুদ্র-লঙ্ঘনের সঙ্গে এযুগে স্বামীজীর সমুদ্র-লঙ্ঘনের বাস্তব পার্থক্যটুকু লক্ষণীয়—"তবে তিনি শতযোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হয়ে ওছল পাছল করে খোঁটাখুঁটি ধরে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি।" তারপরেই উপমাটি রামায়ণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে কৌতুকরসের বিচিত্রকল্পনায় জগতে যাত্রা করেছে—"একটা বাহাদুরি আছে—তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস-রাক্ষসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি।" রাক্ষস-রাক্ষুসী এক্ষেত্রে জাহাজের শ্বেতাঙ্গ সহযাত্রীদল!

রাক্ষস-রাক্ষুসী উপমাটির আর একটি সূত্র—"খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে খ্যাঁচ করে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায়—ভায়া একটু নধরও আছেন কি না।"

সহযাত্রী সতীর্থ স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে নিয়ে এই রঙ্গরসটুকু স্বামীজীর আনন্দময় ব্যক্তিত্বকে পাঠকচিত্তের একান্ত কাছাকাছি এনে দেয়। সমগ্র বর্ণনাটির মূলে রাক্ষসদের মাংসপ্রীতি—বিশেষ করে 'নরমাংস'প্রীতির ইঙ্গিত। সাহেব-মেমদের ছুরিকাঁটা হাতে খানাপিনা এবং স্বামী তুরীয়ানন্দের নধর দেহ—এ দুয়ের যোগাযোগ কল্পনার মজাটুকু সেকালে স্বামীজীর সতীর্থ বন্ধুদের কাছে নিশ্চয় খুবই উপভোগ্য হয়েছিল, একালের পাঠককেও তা উচ্চহাস্যে মুখরিত করে।

সমুদ্র লঙ্ঘনের উপমা এর পরে জাহাজে-চড়ার আনুষঙ্গিক সমুদ্রপীড়াকে নিয়ে দেখা দিয়েছে—"বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হ'তে হনুমানের সী-সিকনেস্[১] হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পণ্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের 'গোঁসাইজী' তো কিছুই বলছেন না। বোধ হয়—হয় নি; তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেইখানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু-ভায়া বলছেন, 'জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ করে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস করে পাতালমুখো হয়ে বলিরাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন।" রামায়ণের সিংহিকা রাক্ষসীর কাহিনীটিকে অবলম্বন করে সমুদ্রপীড়ার এই অভিনব ব্যাখ্যাটির কৌতুককল্পনা ও পুরাণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানের রসিকতাটুকু একই সঙ্গে পরম উপভোগ্য। সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্বামীজীর বুদ্ধিদীপ্ত ভাষাভঙ্গী—যে ভাষা আর কারো দ্বারা অনুকৃত হওয়া অসম্ভব।

১ Sea sickness (সমুদ্রপীড়া)

হাস্যরসের অন্যতম উপাদান খেয়ালী কল্পনা। সুকুমার রায় তাঁর 'আবোল তাবোল'কে বলেছেন খেয়ালরসের কাব্য। স্বামীজীর রচনায় মাঝে মাঝে এ জাতীয় খেয়ালীকল্পনা দেখা দিয়ে তাঁর হাস্যরসকে আরো বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে। সী-সিকনেসের ব্যাখ্যাটি কিছুটা ঐ-জাতীয়। এ বইয়ের হাঙ্গর শিকারের বর্ণনায় এ জাতীয় কল্পনার আর এক নিদর্শন।

বাচন ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হাস্যরসকে কীভাবে ফুটিয়ে তোলে তার উদাহরণরূপে স্বামীজীর দুটি বাক্যে দুটি হিন্দী বাকপদ্ধতির প্রয়োগ দ্রষ্টব্য—'মাফ করমাইয়ো ভাই—ভালা লোককে কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহো। কোথায় তোমার সাতদিন সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা দেবো, তাও কত রঙ চঙ মসলা বার্নিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল তাবল বকছি।" পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজীর পশ্চিম-ভারত-পরিক্রমা তাঁর এই ভাষাভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছে নিশ্চয়। তবে সাধারণভাবে স্বামীজীর বাংলা গদ্যে হিন্দী ও উর্দু শব্দের সুপ্রয়োগ ও সুরসিকপ্রয়োগ দুইই লক্ষণীয়।

ভ্রমণবৃত্তান্ত যাঁরা লেখেন, তাঁদের একদল অবশ্য যা চাক্ষুষ দেখেছেন, তাই নিয়েই লিখে থাকেন। কিন্তু আর একদল ভ্রমণ-সাহিত্য-প্রণেতা আছেন, যাঁরা কোথাও না গিয়ে শুধুমাত্র কল্পনা থেকে বই লিখে থাকেন। স্বামীজী এ জাতীয় একজন ভ্রমণবিশারদ লেখকের কাল্পনিক নাম দিয়েছেন 'শ্যামাচরণ'। এই শ্যামাচরণকে উপলক্ষ করে স্বামীজীর ব্যঙ্গ ও আনন্দদৃষ্টির (হিউমারের) মিলিত সৃষ্টি—'কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাসান গুজরাত' আজন্ম ঘুরছি। কত পাহাড়, নদ নদী, গিরি নির্ঝর, উপত্যকা অধিত্যকা, চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দালানে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলা প্রদীপ জ্বেলে—আঁবকাঠের তক্তায় ব'সে,

খেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে—হুবহু ছবিগুলি—চিত্রিত ক'রে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা।"

এর পরে শ্যামাচরণের ভ্রমণসীমা উল্লেখ করে স্বামীজী কাল্পনিক ভ্রমণবৃত্তান্ত-লেখকদের উপর মোক্ষম একহাত নিয়েছেন—"শ্যামাচরণ ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার করে একঘটি জল খেলেই বস্—সব হজম, আবার খিদে, সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্ধমান পর্যন্ত নাকি শুনতে পাই।"

ভাষাভঙ্গীর দিক থেকে স্বামীজীর শব্দনির্বাচন ও নব নব শব্দ-সংযোজন এ রচনার হাস্যরসসৃষ্টিকে কীভাবে ধ্বনিবৈচিত্র্যে ও ব্যঙ্গ-চিত্রে পূর্ণ করেছে তা লক্ষণীয়। হিন্দী দোঁহা থেকে আরম্ভ করে একে একে স্বামীজীর দেশদেশান্তর ভ্রমণের স্মৃতিবহ সংস্কৃত সমাসবদ্ধপদের মন্দ্রঝঙ্কারে রূপায়িত 'চিরনীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত' অথবা 'উত্তুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গ কল্লোলশালী' রূপমাধুর্য যেমন একদিকে, তেমনি আর এক দিকে নিতান্ত ঘরোয়া ক্রিয়াপদে 'দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম' ব্যবহারে লঘু গুরুর অভাবিত সংযোগে হাস্যরসের সহজাত উৎসারণ। তারপরের পঙ্ক্তিটিতেই সমাসবদ্ধ পদের অভিনব উপস্থাপনা—'কেরাঞ্চি-ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত', 'পানের পিক-বিচিত্রিত দ্বাল', 'টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত'—সে যুগের কলকাতার এই বিশেষণমালায় আপাত-গাম্ভীর্যের আবরণে কলকাতার ক্লিন্নতা যেমন পরিস্ফুট তেমনি ঘরে সূর্যের আলো পৌঁছায় না বলে দিনের বেলায় যাকে বাতি জ্বেলে লিখতে হয় সেই শ্যামাচরণের পরিবেশটিও ব্যঙ্গচিত্রশিল্পীর দক্ষতায় উপস্থাপিত। এ হেন শ্যামাচরণ ঐ অন্ধকার ঘরে বসেই কল্পনায় বিশ্বভ্রমণ সেরে ফেলেন; যদিও তার আসল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পশ্চিমে বর্ধমান পর্যন্ত। এই শেষ মন্তব্যটি আপাতনিরীহ হলেও এর বিদ্ধ করার এবং অট্টহাস্য-মুখরিত করার ক্ষমতা অসাধারণ! হিমালয়, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমির পরেই একেবারে 'বর্ধমান পর্যন্ত' সীমানির্দেশে কল্পনায় উড্ডীয়মান

বিমান মুখ থুবড়ি খেয়ে শ্যামাচরণের ভ্রমণবৃত্তান্তের আসল স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছে।

বাংলাসাহিত্যে সৌন্দর্যরস ও ভক্তিরসের অপূর্ব সম্মেলনের অন্যতম উদাহরণ 'পরিব্রাজকে' হৃষীকেশের গঙ্গা-বর্ণনা। সে বর্ণনার তন্ময়তার পাশাপাশিই গঙ্গাজল নিয়ে স্বামীজীর রঙ্গ-রসিকতা! বেলুড় মঠ থেকে মাদ্রাজ আশ্রমের জন্য গঙ্গাজল পাঠানো হয়েছিল একটি বড়ো জাতীয় পাত্রে। সেটিকে অবলম্বন করেই স্বামীজীর বুদ্ধিদীপ্ত সরস বাচনভঙ্গীর সানন্দ প্রকাশ—"তু-ভায়া বালব্রহ্মচারী 'জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা'; ছিলেন 'নমো ব্রহ্মণে', হয়েছেন 'নমো নারায়ণায়' (বাপ, রক্ষা আছে!), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমণ্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্‌নায় প্রবেশ।"

ছোট্ট বর্ণনাটির রসিকতার আড়ালে গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দজীর প্রতি কী অপরিসীম শ্রদ্ধা স্বামীজী প্রকাশ করেছেন, এবং সে প্রকাশও কী অপূর্ব রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমেই করেছেন—তা এখানে দেখবার মতো। ব্রাহ্মণবংশজাত স্বামী তুরীয়ানন্দ একদা ব্রাহ্মণ বলে প্রণম্য ছিলেন, এখন সন্ন্যাসী বলে প্রণম্য। 'নমো নারায়ণায়' সন্ন্যাসীদের পারস্পরিক অভিনন্দনের সম্বোধন। আকুমার ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত তুরীয়ানন্দজীর মুখমণ্ডলের দীপ্তির উপমা স্বামীজী 'কুমারসম্ভবে'র ব্রহ্মচারী যতিবেশে শিবের বর্ণনা থেকে আহরণ করেছেন—ব্রহ্মোপলব্ধির তেজদীপ্ত জ্বলন্ত অগ্নি সদৃশ মূর্তি! শ্রেষ্ঠ হাস্যরস কেমন করে মহৎকে মহত্তর করে তোলে তার অসামান্য উদাহরণ এই বর্ণনাটি। 'বাপ, রক্ষা আছে!' কথাটুকুর মধ্যে প্রায় সমবয়সী সতীর্থদের মধ্যে রঙ্গরসের আভাস!

এর পরে গঙ্গাজল নিয়ে আর এক দফা কৌতুকহাস্য—"খানিক রাত্রে উঠে দেখি মায়ের সেই বৃহৎ বদনাকার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ করে মা বেরুবার চেষ্টা করছেন। ভাবলুম সর্বনাশ। এইখানেই যদি হিমাচলভেদ, ঐরাবত ভাসান, জহ্নুর কুটীরভাঙা প্রভৃতি পর্বাভিনয় হয় তো—গেছি। স্তব স্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম—মা! একটু থাক, কাল

মাদ্রাজে নেমে যা করবার হয় ক'রো, সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রায় জহ্নুর কুটীর, আর ঐ যে চকচকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখণ্ডে তৈয়ারী, হিমাচল তো ওর কাছে মাখম। যত পারো ভেঙো, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহু, মা কি শোনে!"

মাদ্রাজের সেই সব ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে অবিচল আস্থাশীল পণ্ডিত-মণ্ডলীর আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে এই কৌতুক-কটাক্ষ বিশেষভাবে উপভোগ্য এই জন্য যে, তাঁদের মেধা ও মনীষার প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা আন্তরিক এবং এই আন্তরিকতার জন্যই তাঁর ওই সব ব্যঙ্গ এই অনড় অচল সংস্কারাচ্ছন্নতার প্রতি যত তীব্রই হোক না, শেষ অবধি নির্মল কৌতুকহাস্যেই তার যথার্থ পরিণাম!

গঙ্গার ঐরাবত ভাসানোর সঙ্গে 'হস্তী অপেক্ষা সূক্ষ্ম বুদ্ধি' পণ্ডিতের দল, অচল সংস্কারে আবদ্ধ ব্রাহ্মণসমাজ (হিমাচল তো ওর কাছে মাখম) প্রভৃতি মন্তব্যের মধ্যে হাস্যরসের খেয়ালী কল্পনার বিস্তার ও গঙ্গাবতরণ কাহিনীর সূক্ষ্ম অন্তঃসংযোগ স্বামীজীর হাস্যরসকে দুর্বার কলোচ্ছ্বাসে মুখরিত করে চলেছে।

কিন্তু এ সব কথায় মা গঙ্গা থামতে চাইলেন না। তখন স্বামীজী লালবেগের চেলাদের[১] ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় দেখালেন। মা তাতেও কিছু শোনেন না। তখন স্বামীজী ভয় দেখালেন—'তোমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ী পাঠাবো; ঐ যে ঘরটি দেখছ। ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে। আর তোমার ডাক হাঁক বন্ধ হয়ে যাবে। জমে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে।'[২]

এই কৌতুকশাসনের পর—'তখন বেটী শান্ত হয়।' অবশ্য কোনো উপায়ে স্বামীজী বদ্‌নাটিকে এমন অবস্থায় রেখেছিলেন, যাতে আর জল বেরুতে পারে নি।

১ জাহাজের মেথরদের।

২ Cold storage বা ঠাণ্ডাই ঘরে রাখলে জল আর বেরুতে পারবে না, বরফ হ'য়ে যাবে—এইটিই মনে হয় বক্তব্য।

কিন্তু ঘটনাটি উপলক্ষ করে স্বামীজীর ব্যঙ্গ একটি ছোট্ট মন্তব্যের শাণিত ঝলকে দেখা দিয়েছে—"বলি শুধু দেবতা কেন। মানুষেরও ঐ দশা—ভক্ত পেলেই—ঘাড়ে চড়ে বসেন।" সতর্ক না থাকলে সকলেই অন্যায় সুযোগ নিতে চায়!

ভাবতন্ময় বর্ণনার পরেই সকৌতুক মন্তব্যের সংস্থাপনে হাস্যরসের বিশেষ সার্থকতা সাধিত হতে পারে। এ-জাতীয় উদাহরণ 'পরিব্রাজকে' অজস্র। সমুদ্র বর্ণনায় শব্দাম্বুধি (স্বামীজীর কবিদৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ)[১] পার হয়ে 'সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি' ইংরেজদের সগর্ব পদচারণের বর্ণনার মাঝখানে হঠাৎ স্ত্রীপুরুষের সমবেত কণ্ঠে—"রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্'[২] মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! চমকিয়া চাহিয়া দেখি—

জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কার চেষ্টায় আছেন।"

ইংরেজদের মহিমা-বর্ণনায় স্বামীজী সাধুভাষায় যে ভাবে বাক্য-রচনা করেছেন, তার গাম্ভীর্য হঠাৎ তুরীয়ানন্দজীর অন্নপ্রাশনের অন্ন আবিষ্কারের চেষ্টার দ্বারা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ইংরেজ মহিমাবর্ণনায় সাধুভাষার ছদ্মগাম্ভীর্য অনেকসময় স্বামীজী নির্মম ব্যঙ্গের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন—'বর্তমান ভারতে' তার নিদর্শন আমরা দেখেছি! এখানে সচেতনভাবে ব্যঙ্গ না থাকলেও গুরুগম্ভীর বিষয় থেকে হঠাৎ লঘু বর্ণনায় প্রয়াণ হাস্যরসের নিজস্ব সার্থকতার দিক থেকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১ "কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ'। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পিছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা। নীল পট্টবাস-পরিধান।"

২ ইংল্যাণ্ডের জাতীয়-সঙ্গীত।

এরপরে তু-ভায়াকে নিয়ে স্বামীজীর আর একটি উচ্চাঙ্গের রসিকতা। "যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক ক'রে তুলতেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেণ্ড ক্লাশের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, "বড়ই শোচনীয়, বেজায় গুলিয়ে যাচ্ছে!"

সেকেণ্ড ক্লাশে আর দুটি বাঙালী ছেলের অবস্থাও সমুদ্রপীড়ায় শোচনীয় হয়ে পড়েছিল!

'বর্তমান ভারত' তখন কিস্তিতে কিস্তিতে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হচ্ছে। 'সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সেই লেখাটি শেষ করার জন্য তুরীয়ানন্দজীকে বলে দিয়েছিলেন, স্বামীজীকে তিনি যেন মাঝে মাঝেই মনে করিয়ে দেন। সমুদ্রপীড়ায় কাতর তুরীয়ানন্দজীকে স্বামীজী বর্তমান ভারতের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে চমৎকার শ্লেষের সাহায্যে লেখার জন্য পীড়াপীড়ির শোধ নিয়েছেন।

গঙ্গার চড়া প্রসঙ্গে স্বামীজীর লঘু আলোচনাভঙ্গী[১] আমাদের মনেই করতে দেয় না যে ভৌগোলিক নানা বিষয়ে কী দক্ষতা থাকলে তবে ও-ধরনের লেখা সম্ভব। গঙ্গার চড়ার মধ্যে দামোদর রূপনারায়ণের 'মুখ' "জেমস আর মেরী চড়া"র সর্বনাশা কীর্তিকাহিনী প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন—"দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজি নন, জাহাজ স্টীমার প্রভৃতি চাটনি রকমে নিচ্ছেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে "কাউন্টি অফ ষ্টারলিং" নামক এক জাহাজ ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল! ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার

---

১ "আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুরবেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বারবেলায় এইটে ঘটলে কি হ'ত, তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধহয় আর ফিরতেন না।"

আট মিনিটের মধ্যেই 'খোঁজ খবর নাহি পাই।'…ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি, প্রণাম করি।"[১]

নৌকা ও জাহাজের ক্রমবিবর্তন বর্ণনায়ও স্বামীজীর এই সরস ও লঘু আনন্দময় ভঙ্গী তাঁর বহুদর্শী অভিজ্ঞতার সাবলীল প্রকাশে পাঠক-চিত্তকে সহযাত্রী করে আপন অজান্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মণিমাণিক্যে পূর্ণ করে দেয়। জাহাজের ক্রমবিবর্তনে স্বামীজীর সময়কার যুদ্ধ-জাহাজ-প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য—"এখন জাহাজখানি ইস্পাতের ঢাল-ওয়ালা কেল্লা, আর তোপগুলি যমের ছোট ভাই। এক গোলার ঘায়ে, যত বড় জাহাজই হোক না ফেটে ফুটে, চৌ-চাকলা! তবে এই 'লুয়ার বাসর ঘর' যা লখিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবেন নি, এবং যা সাতালি পর্বতের উপর না দাঁড়িয়ে সত্তর হাজার পাহাড়ে ঢেউয়ের মাথায় নেচে নেচে বেড়ায়, ইনিও 'টরপিডো'র ভয়ে অস্থির। তিনি হচ্ছেন

১ এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কামনায় স্বামীজীকে তুরীয়ানন্দজী বলেছিলেন, "মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে"। স্বামীজীও বললেন, "তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।" পরদিন "তু-ভায়া আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মশায়, তার কি হল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও তো আপনি খাচ্চেন।' তখন অনেক যত্ন ক'রে বোঝাতে হ'ল যে—কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়; সেখানে খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় জেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে, বুঝি দেশাচার। দুধের বাটিতে যেই চুমুক দেওয়া—অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রু পরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললে, 'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে। এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা,—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই! আমি কলকেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে। তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল—বোঝা গেল না।"

কতকটা চুরুটের চেহারা একটি নল; তাঁকে তাগ করে ছেড়ে দিলে তিনি জলের মধ্যে মাছের মতো ডুবে চলে যান। তারপর যেখানে লাগবার, সেখানে যেই ধাক্কা লাগল, অমনি তার মধ্যের রাশীকৃত মহবিস্তারশীল পদার্থ সকলের বিকট আওয়াজ ও বিস্ফোরণ, সঙ্গে সঙ্গে যে জাহাজের নীচে এই কীর্তিটা হল, তার 'পুনর্মূষিকো ভব' অর্থাৎ লৌহত্বে ও কাঠকুঠত্বে কতক এবং বাকীটা ধূমত্বে ও অগ্নিত্বে পরিণমন !"

লখিন্দরের জন্য চাঁদসদাগরের নির্মিত লোহার বাসর ঘরের সঙ্গে যুদ্ধ জাহাজের তুলনা এবং যুদ্ধকালে এ জাহাজের পরিণতি—এ দুয়ের বর্ণনাতেই স্বামীজীর ভাষাবৈচিত্র্য এবং রসবৈদগ্ধ্য পাঠকচিত্তকে সানন্দ কৌতুকে পূর্ণ করে। ভাষাগত প্রয়োগবৈচিত্র্যে স্বামীজীর হাস্যরস-সিদ্ধির আর একটি উদাহরণ আধুনিক যন্ত্রযুগের অতিরিক্ত বিশেষকার্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ার কুফল প্রসঙ্গে মেলে—"মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি—লোপাপত্তি করে জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই একঘেয়ে কাজই কচ্ছে—এক এক দলে এক একটা জিনিসের এক টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে আজন্ম। ফল—ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মত একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুলমাস্টারি কেরানিগিরি করে এজন্য হস্তিমূর্খ জড়পিণ্ড তৈয়ার হয় !"

যে সব কাজে বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে, সেইসব কাজের প্রতি স্বামীজীর বীতস্পৃহা প্রকাশের কৌতুকময় ভঙ্গীটি এখানে অপূর্ব সরসতায় প্রকাশিত।

সেরা হাস্যরসিকের নিজেকে নিয়ে রঙ্গ বা ব্যঙ্গের ক্ষমতা কতখানি হতে পারে তার একটি উদাহরণ মেলে সেকালে প্রচলিত একটি জাহাজী আইনের বিশ্লেষণে। তখন একটি আইন ছিল যে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ (ভারতীয়) এমিগ্রাণ্ট অফিসারের সার্টিফিকেট ছাড়া জাহাজে

উঠতে পারবে না। পাছে এদেশের লোককে বাইরে বিক্রি করা বা ইচ্ছের বিরুদ্ধে কুলী করা হয়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা। এসময় প্লেগের ভয়ে আইনটি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ভদ্রলোকজাতীয় কৃষ্ণাঙ্গদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছিল। এই আইন নিয়ে স্বামীজীর মন্তব্য—"এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে; অর্থাৎ যে কেউ 'নেটিভ'[১] বাইরে যাচ্চে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক ছোট জাত; সরকারের কাছে সব 'নেটিভ'। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, সব এক জাত—'নেটিভ'। কুলীর আইন, কুলীর যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভে'র জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার! এক ক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব 'নেটিভে'র সঙ্গে সমত্ব বোধ করলেম।" এই অংশটুকু অবধি স্বামীজীর ঈষৎ ব্যঙ্গ 'নেটিভ' কথাটিকে অবলম্বন করে। তারপরেই নিজেকে নিয়ে তীব্রতম ব্যঙ্গ—"বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়াতে আমি তো চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।"

শোনা যায়, সেকালের পত্রপত্রিকায় কায়স্থশরীরে স্বামীজী সন্ন্যাস গ্রহণ সিদ্ধ কিনা এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল! নিজের সম্বন্ধে সেই নির্বোধ অবজ্ঞার প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করেই স্বামীজীর এ ব্যঙ্গ;—নিজের অসম্মানকেও অনায়াসে হাস্যরসে পরিণত করা! আর তার পরেই তথাকথিত ব্রাহ্মণত্বের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ 'ব্যঙ্গের লাঠি'-প্রয়োগ—"এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,—কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা! তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য!"

সেকালে য়ুরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের কল্যাণে যে আর্যত্বের দাবী সে দেশে দেখা দিয়েছিল, (বিশেষতঃ জার্মানদের "আর্যতত্ত্ব" কী ভয়াবহ

---

১ native—দেশবাসী। ইংরেজ আমলে নেটিভ বলতে অবজ্ঞার্থে ভারতবাসীকে বোঝাতো।

পরিণতি নিয়ে পরবর্তীকালে মারণযজ্ঞ সৃষ্টি করেছিল, সেকথা স্মরণীয়) আর তার ফলে আর্যদের ভারতে উপনিবেশস্থাপনের যে কাল্পনিক তত্ত্ব এদেশের নৃতাত্ত্বিকেরাও অন্ধের মতো অনুসরণ করে এসেছেন, সেকথা মনে রেখেই স্বামীজীর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এখানে একত্রে মিশ্রিত ! শ্বেতাঙ্গেরা আসলে আর্য—এই তত্ত্বে বিশ্বাসী একালের উন্নাসিকতম নীরদ চৌধুরীর সাহেবিয়ানা (তাঁর Continent of Circe বইখানি—স্বামীজীর কাছে অপূর্ব হাস্যরসের উদাহরণ হিসাবে নিশ্চয় স্বীকৃত হ'তো) দেখলে সেকালের—"পাকা আর্য"দের ধরণধারণ অনেকটা বোঝা যায় !

স্বামীজীর ভাষায়—"আর শুনি, ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই ; ওঁরা কালা আদমী নন। এদেশে দয়া করে এসেছেন। ইংরেজের মতো।" এখানে 'ওঁরা' অর্থে সেকালের হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বামনাইয়ের প্রবক্তারা ! আর্যদের আবির্ভাব যদি য়ুরোপ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে এই বামুনদের পূর্বপুরুষেরা সাহেবদেরই জ্ঞাতিভাই। সেই কথা মনে রেখে স্বামীজীর তীব্র বিদ্রূপ—"আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পরদা ইত্যাদি ইত্যাদি—ওসব ঐসব কায়েত ফায়েতের বাপ-দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতো। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজদের মতো ছিল, কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল !"

আক্রমণের ধরন দেখে মনে হয় শুধু সেকালের হিঁদুয়ানি নয়, তথাকথিত ব্রাহ্মদের উদ্দেশেও এখানে নির্মম ভর্ৎসনা। ইংরেজরাজ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে 'নেটিভ' করে দিয়ে এক আইনের আওতায় এনে ফেলেছিলেন। এজন্য ইংরেজ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বামীজী লিখছেন—"ধন্য ইংরেজরাজ ! তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ তো হয়েছেই, আরও হোক, আরও হোক।...দিশি সাহেবিত্ব ঘুচিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা

মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ! পালা প্লালা, সাহেবিতে কাজ নেই। নেটিভ কব্‌লা। সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত।"

স্বামীজীর এই বক্তব্য 'বর্তমান ভারতে' অন্যভাবে দেখা দিয়েছে। ইংরেজশাসনাধীন ভারতবর্ষের মানুষ সকলেই দাসত্ব করতে করতে 'শূদ্র' হয়ে গেছে, এদেশে আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অহংকার শোভা পায় না। (বর্তমান ভারত—'শূদ্র জাগরণ' অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) ইংরেজের বুটের তলায় সব জাতি ও বর্ণের গরিমা সমান হয়ে গেছে। ভেবে দেখলে ইংরেজ শাসনের সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি ভারতবাসীর মধ্যে এই দাসসুলভ মনোভাব-সঞ্চারে। স্বাধীনতা লাভ করেও আজ অবধি আমাদের জনসমাজের শৃঙ্খলাহীনতা লক্ষ্য করলে এই দাসসুলভ মনোবৃত্তির ঐতিহ্য বুঝতে পারা যায়। আত্মনির্ভর, দায়িত্বসম্পন্ন ও পরস্পর প্রীতিপূর্ণ আন্তরিকতায় ভরপুর জনসমাজ গড়ে তুলতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই দাসসুলভ মনোবৃত্তি পরিহার করা। তা না হলে সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়ে দেশবাসীর চেতনা ফেরানো অসম্ভব পরিকল্পনা। বিশেষভাবে স্মরণীয়, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আজ একদলীয় একনায়কতন্ত্রের বলি। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের অন্ধ আনুগত্য বরণ করা আত্মিক দাসত্বেরই ভয়াবহ পরিণাম।

বিষয়বস্তু হিসাবে ভারতীয় জাতিভেদের সঙ্গে আমেরিকার সাদা কালো-ভেদের তুলনা ভালোভাবেই চলে। স্বামীজীর মার্কিনী অভিজ্ঞতায় এই গায়ের রঙের জন্য লাঞ্ছনা ভোগের সকৌতুক বিবরণ চমৎকার ফুটেছে।[১] সেলুনে বা রেস্টুরেণ্টে প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্বামীজীর —'মার্কিন মুলুক'কে দেশের মত ভালো লাগতে লাগলো। এরপরে স্বামীজীর ব্যঙ্গের লাঠি—"যাক পাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড়

১ এ বইয়ের পৃঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য।

ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশী ইত্যাদি—বলে 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।' দাসজাতিতে পরিণত ভারতবাসীর আর্যামি নিয়ে অহমিকাকে এর চেয়ে নির্মম ব্যঙ্গ খুব কমই করা হয়েছে।[১]

তারপরেই স্বামীজীর গল্পচ্ছলে ব্যঙ্গ—"একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্।' কিন্তু মজাটি দেখেছ? জাতের বেশী বিটলেমিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেইখানে!"

জাতিভেদের শিকড় যে কেবল বামুনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, (শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' এই জাতিভেদ প্রথার ঘৃণ্যতম কুফল কৌলীন্যপ্রথার বিয়োগান্ত কাহিনী) তা নয়। তথাকথিত শূদ্রবর্ণের মধ্যেও অজস্র জাতিভেদ আছে। মুসলমানদের মধ্যেও কিছু পরিমাণে জাতিভেদ রয়েছে। তবে হিন্দু সমাজব্যবস্থার মতো জন্মগত কারণে মানুষের হীনতাকে চিরস্থায়ী করে রাখার অপচেষ্টা আর কোনো সমাজে নেই। সেকথা মনে রেখে স্বামীজী ডোমের জাতি নিয়ে অহঙ্কারকে এখানে ব্যঙ্গের উপাদানে পরিণত করেছেন। অপরপক্ষে তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করলে বুঝা যায়, তিনি এই ডোম, চাঁড়াল, মুচি, মেথর প্রভৃতি তথাকথিত হীনবর্ণের সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই ভবিষ্যৎ ভারতের অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করতেন।

যে জাহাজে স্বামীজী আমেরিকা যাচ্ছিলেন, তার মাঝি মাল্লাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান। এদের কর্মদক্ষতা ও আত্মপ্রত্যয় স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। এঁদের প্রসঙ্গেই 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে স্বামীজীর বিখ্যাত ভবিষ্যদ্দৃষ্টির বাণী—"নূতন ভারত বেরুক।"

আমাদের উচ্চবর্ণের উচ্চশিক্ষিত সমাজের যুগ যে বিগতপ্রায় সে কথা মনে রেখে স্বামীজী লিখেছেন—"আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরবঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন

১ স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ—"মোক্ষমূলর বলেছে আর্য
তাই শুনে সব ছেড়েছি কার্য।"

তোমরা 'ভম্‌ম্‌ম্‌' বলে ডম্ফাই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ?" ভারতের পরশ্রমজীবী উচ্চবর্ণের দলের প্রতি স্বামীজীর ধিক্কার এখানে কী বিদগ্ধ ব্যঙ্গে প্রকাশিত তা বিশ্লেষণযোগ্য।

একদা অস্পৃশ্যদের বলা হতো "চলমান শ্মশান।" স্বামীজী লিখছেন, আজ চলমান শ্মশান বলতে অতীতসর্বস্ব হয়ে যারা বেঁচে আছে সেই ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণদেরই বুঝায়। এদের উদ্দেশ্য করে লিখছেন—"তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্র-শালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা।"

স্বামীজীর চোখে হাজার হাজার বছর ধরে যারা কেবল পূর্বপুরুষের শাস্ত্রের নকল করে এসেছে তারা বেঁচে আছে বলে মনে হলেও আসলে মিউজিয়মের বিষয় হিসাবেই তাদের অস্তিত্বের মূল্য। হয়তো 'চলমান মিউজিয়ম' চিত্রশালিকা নামই তাদের পক্ষে ঠিক খাটে। তারপরেই শঙ্করাচার্যের 'মায়া' তার প্রহেলিকাসৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে স্বামীজীর কল্পনায় দেখা দিয়েছে, যে মায়া দড়িকে সাপ, বা সাপকে দড়ি দেখায়। এখানে মৃতকে জীবিত দেখাচ্ছে।

স্বামীজী যেখানে ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য দিয়ে সংস্কৃত ধাতুরূপের অতীত বুঝাতে লুঙ লঙ লিট একসঙ্গে বলে উচ্চবর্ণদের নির্দেশ করেন, তখন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসিকতার এমন সোনায় সোহাগা সম্মেলন সাহিত্যে চিরস্মরণীয় উদাহরণ হয়ে ওঠে—"তোমরা ভূত কাল—লুঙ লঙ লিট সব একসঙ্গে।...ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ—লোপ লুপ্‌।" অতীতকাল বাচক সব কটি রূপ দিয়েও স্বামীজীর ব্যঙ্গের তীব্রতা কমে নি। ব্যাকরণে 'ইৎ' শব্দের অর্থ অস্থায়ী অংশ, বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর ইৎ আর থাকে না। স্বামীজীর মতে এই উচ্চবর্ণেরা আজ সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, অতীতের বস্তু। ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেণীগত পরিণাম সম্বন্ধে এমন ব্যাকরণ ও

বেদান্তসিদ্ধ রসিকতা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া কঠিন। এক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কোনো কোনো রচনায় এর তুলনা মেলে।

কলকাতা থেকে বঙ্গোপসাগরে স্বামীজী প্রথম গেলেন মাদ্রাজ। স্বভাবতই ভারতের দক্ষিণী সভ্যতার নানা প্রসঙ্গ দেখা দিল। দাক্ষিণাত্য সভ্যতার প্রতি স্বামীজীর যেমন অগাধ শ্রদ্ধা, দক্ষিণীদের ধরণ-ধারণ নিয়ে তেমনি তাঁর রঙ্গরসের উপকরণ! উড়িষ্যা আর গুজরাটবাসী বামুনদের বর্ণনা করতে করতে স্বামীজী মাদ্রাজবাসী রামানুজপন্থী ব্রাহ্মণের কথায় এসেছেন—"সে রামানুজী তিলক-পরিব্যাপ্ত ললাটমণ্ডল—দূর থেকে যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়িতে চুন মাখিয়ে পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েছে, সে-তিলকের সাগরেদ রামানন্দী তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে, 'তিলক তিলক সব কোই কহে, পর রামানন্দী তিলক দিখত গঙ্গা-পারসে যম গৌদ্বারকে খিড়ক।' "

তিলকের কথা সকলেই বলে, তবু রামানুজী তিলক দেখলে স্বয়ং যম গঙ্গাপার থেকে বাড়ীর দুয়ার দেখেই যমরাজ পালিয়ে যান। এর পরেই হুতোমী ঢঙে স্বামীজীর মন্তব্য—"(আমাদের দেশে চৈতন্য সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া গোঁসাইকে দেখে মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল—এ মাদ্রাজী তিলক দেখলে চিতেবাঘ গাছে চড়ে!)" কৌতুকরসের এমনি সব বর্ণনায় স্বামীজী সিদ্ধহস্ত!

একটু পরে দেশে দেশে মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে লিখছেন—"ইউরোপে মেয়েদের গা দেখানো বড় লজ্জা; কিন্তু আধখানা গা আদুড় রাখতে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাকতেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক বা না থাক।"

স্বামীজীর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলেরও অমনি মাথা-জোড়া রামানুজী তিলক, তার উপর খালিপায়ে তিনি জাহাজে চাপলেন। চাকররা বুঝি বলেছিল, স্বামীজীদের সঙ্গে থেকে আলাসিঙ্গার জাতের দফা ঘোলা হয়ে এসেছে। স্বামীজী আর একটু রসান দিয়ে লিখছেন—

তাঁদের পাল্লায় পড়ে 'মাদ্রাজীদের জাতের দফা ঘোলা কেন, থকথকিয়ে এসেছে।'

এমনিভাবে কলকাতার শিমলে পাড়ার ছেলেছোকরাদের আড্ডার ভাষাকে বাংলা গদ্যে প্রায় হুবহু তুলে এনে স্বামীজী সিংহল প্রসঙ্গেও তাঁর কৌতুকভঙ্গীটি অপূর্ব শিল্পগুণে বিকশিত করেছেন—'এই সিংহল, লঙ্কা।' সিংহলপ্রসঙ্গে রামায়ণের যুদ্ধকাহিনী সিংহলীদের ঐতিহ্যে নাকি অনুপস্থিত। স্বামীজী সেকথাকেও ঠাট্টা করে লিখছেন—'আরে নাই বললে কি হবে? গোঁসাইজী পুঁথিতে লিখেছেন যে!' লোকে যেমন শাস্ত্রে বা সংস্কৃতে লেখা আছে শুনলেই ধ্রুবসত্য জ্ঞান করে, সিংহলীদেরও সেই ভাবে লঙ্কাবিজয়ের গল্পটিও মেনে নিতে বলা হয়েছে! যেন আমরা বললেই ওরা মেনে নেবে!—এ ধরনের মন্তব্য আসলে সমর্থিত হবে না জেনেই বলা এবং সেকথা জেনেই কৌতুক!

তারপর 'লঙ্কা' নাম নিয়ে শ্লেষালঙ্কারের সাহায্যে তখনকার সিংহলীদের বর্ণনা—"ওরা নিজের দেশকে বলে—সিংহল। লঙ্কা বলবে না, বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো—ঘাঘরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমানুষী চেহারা! আবার রোগা রোগা বেঁটে বেঁটে নরম নরম শরীর! এরা রাবণ-কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি!"

প্রায় আশি বছর আগের এ বর্ণনার সঙ্গে আজকের 'শ্রীলঙ্কা' বা সিংহলবাসীদের মেলানো যাবে না ঠিকই। কিন্তু বর্ণনাটির সরসতা ও ভঙ্গিমা বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের সার্থক প্রকাশ। এর পরেই সিংহলীদের বাঙলাদেশ থেকে উৎপত্তি প্রসঙ্গ নিয়ে স্বামীজীর রঙ্গরস—"বলে—বাঙলাদেশ থেকে এসেছিল—তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর বিরহের জ্বালায় 'হাসান হোসেন' করেন—ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে।"

এ বর্ণনাটি অনেকের মনেই রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুকরণকারীদের কথা জাগিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এমন মনে হলেও এ ধারণা যুক্তিসম্মত নয় বলেই আমাদের ধারণা। প্রথমত স্বামীজী যে সময় লিখছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের অনুসরণকারী এমন কোনো দল ছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের চলনে বলনে কমনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে পৌরুষ ও দীপ্তি কিছু কম ছিল না। তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান তো স্বামীজী তাঁর 'সঙ্গীতকল্পতরু'তে দিয়েছেনই, সেই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিকরসের গান, দেশ প্রেমের গানও বেশ কয়েকটি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসঙ্গীত তিনি স্বয়ং রামকৃষ্ণ-দেবকে শুনিয়েছেন। তাই মনে হয় মেয়েলীপনার এই অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নয়, সাধারণভাবে মেয়েলী স্বভাবের পুরুষদের সম্বন্ধে। তাছাড়া কবি, পাঁচালী, টপ্পার প্রভাবে বাংলার পরিমণ্ডলে প্রেমের গানের ছড়াছড়ি অনেকদিন থেকে। রবীন্দ্রনাথ বরং সেই প্রেমের গানের স্থূল রুচিকে অনেক মার্জিত ও গভীর রূপ দিয়ে আমাদের প্রেমের গানের ধারাকে উন্নত সাহিত্যে পরিণত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান স্বামীজী একাধিক ক্ষেত্রে গেয়েছেন, এমন সাক্ষ্য আছে। সাহিত্যের নাম করে মেয়েলীপনা একালেও মাঝে মাঝে বেশ দেখা যায়। স্বামীজী যে পৌরুষের উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন তার পক্ষে এ জাতীয় মনোভঙ্গী অবশ্যই পরিহাসের বিষয়।

এরপর সিংহলে বাঙালীদের উপনিবেশস্থাপনের হাস্যরসময় উপস্থাপনা, সিংহলীদের অহিংসার ধরণ বুঝাতে গিয়ে 'অহিংসা পরমোধর্ম' বিষয়ক গল্প[১], স্বামীজীর সভার সময় 'অহিংস' বৌদ্ধদের আচরণ—এ সব কিছুর মধ্যে স্বামীজীর যে রসিকমনটি সদা সর্বদা হাস্যরসের উপাদান আহরণ করে চলেছে, তা ভ্রমণসাহিত্যের পক্ষে নানা রঙের আলোর সমন্বয়ে বিচিত্র চলচ্ছবি।

কলম্বো থেকে এডেন অবধি যাত্রাপথে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় জীবনধারার পার্থক্য প্রসঙ্গে স্বামীজীর ভাষা সব কুণ্ঠাবর্জিত তীব্রতায়

---

১ 'ভ্রমণকথা : পরিব্রাজক' অধ্যায় : পৃঃ ৩৭৮ দ্রঃ

কিছু সাফ কথা শুনিয়েছে। যেমন সস্ত্রীক প্রোটেস্টাণ্ট আমেরিকান পাদ্রী যোগেশ-প্রসঙ্গ—"যোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে, ছেলে মেয়েতে ছটি সন্তান, চাকররা বলে—খোদার বিশেষ মেহেরবানী—ছেলেগুলির সে অনুভব হয় না বোধ হয়।…যাহোক প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মে উত্তর-ইউরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রীপুরুষ না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিতকুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি।"

সুয়েজখালে যাবার পথে হাঙ্গর শিকারের বর্ণনাটি[1] বাংলা-সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক বর্ণনার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। এটির আলোচনা আমরা আগেই করেছি। সমগ্র ঘটনাটি স্বামীজী এমনভাবে রসিয়ে করেছেন, যাতে বাংলাসাহিত্যের যে কোনো সরস রচনা সংকলনে আমরা এটিকে স্থান দিতে পারি। দু' একটি জায়গা বর্ণনার বিশেষত্বের দিক থেকে উল্লেখ করি।

হাঙ্গরের দর্শন পাবার জন্য জাহাজশুদ্ধ যাত্রীদল উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে—"আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধরফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো—অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'।

প্রথম 'বাঘা' হাঙর টোপ ছাড়িয়ে পালালো, দ্বিতীয় থ্যাবড়ামুখো হাঙর টোপের দিকে এগিয়ে গেল—টোপটি 'থ্যাবড়া'র দৃষ্টিতে কী আকর্ষণীয়—'আহা ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিকঝিক করে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত দূর ছুটছে, তা 'থ্যাবড়া'ই বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা-এক জায়গায়! আসল ইংরেজী শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বড়শির চার ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে রঙ বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে।' এ বর্ণনার কবিত্ব ও রসিকতা যুগপৎ মুগ্ধ

১ 'ভ্রমণকথা: পরিব্রাজক' অধ্যায়: পৃঃ ৩৯৮-৯৯ দ্রঃ

ও অট্টহাস্যমুখরিত করার মতো। 'আসল ইংরেজী শুয়োরের মাংস'-কথাটির মধ্যে নিহিত আরো কিছু ছিল কি ?

ভ্রমণকথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে স্বজাতির উদ্দেশে স্বামীজীর রসিকতাময় মৃদু ভৎ‌র্সনা—য়ুরোপের বিষয়ে বারান্তরে বিশদ করে 'বলবার রইল'—এ কথা লিখতে গিয়েই মন্তব্য—"অথবা বলে কি হবে ? বকাবকি বলা কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙালীর) মতো কে বা মজবুত।"

কনস্টান্টিনোপলের পথে স্বামীজীর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন 'পেয়র হিয়াসান্থ'— এটি তাঁর ক্যাথলিকধর্মের সন্ন্যাসী হিসাবে থাকাকালের নাম। পরে গৃহীজীবনে ইনি 'মস্যিয় লজয়ন'। স্বামীজী কিন্তু এঁর সাধুভাবে মুগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসী নামেই ডাকতেন। এঁর তিরিক্ষিমেজাজের আমেরিকান গৃহিণী প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি চুটকি গল্প—"একবার গিন্নি এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি বিবাহ না করে অমুকের সঙ্গে বাস করছ, তুমি বড় খারাপ।' সে অভিনেত্রী ঝট করে জবাব দিলে, আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি। আইন মত বে না হয় নাই করেছি ; আর তুমি মহাপাপী—এত বড় একটা সাধুর ধর্ম নষ্ট করলে !! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠছিল, তা না হয় সেবা-দাসী হয়ে থাকতে ; তাকে বে করে গৃহস্থ করে তাকে উৎসন্ন কেন দিলে ?'[১] 'পচাকুমড়ো শরীরে'র কথা শুনে যে দেশে হাসতুম, তার আর এক দিক দিয়ে মানে হয়—দেখছ ?"

আনন্দময় বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে 'ভূস্বর্গ-সমাবেশ' প্যারিস এগজিবিশন-ভাঙার দৃশ্য—'দুএকটা প্রধান ছাড়া এগজিবিশনের সমস্ত বাড়ীঘরদোরই কাটকুটরো ছেঁড়া ন্যাতা, আর চুনকামের খেলা বইত নয়—যেমন সমস্ত সংসার !'

অস্ট্রিয়ার সানব্রান রাজপ্রাসাদে নেপোলিয়নের ছেলে[২] কোথায়

---

১ এ অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নহার্ড হওয়া আশ্চর্য নয়।

২ 'ভ্রমণকথা : পরিব্রাজক' অধ্যায় : পৃঃ ৬০৭ দ্র

থাকত, কোথায় শুতো সেসব দেখার জন্য 'লেগলঁ' নাটকে সারা বার্নার্ডের অভিনয় দেখে মহা উৎসাহীরা রক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। রক্ষীর চোখে নেপোলিয়নের ছেলের কোনো মহিমা বা সম্মানই নেই। কিন্তু ফরাসীদের মুখে 'এগলঁ' বা 'গরুড়শিশু'র মহিমা শুনে, 'মুখ হাঁড়ি করে গজগজ করতে করতে ঘর দোর দেখাতে লাগলো ; কি করে, বকশিশটা ছাড়া বড়ই মুস্কিল ।...রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে স্বদেশপ্রিয়তা প্রকাশ করলে, হাত কিন্তু আপনা হতেই বকশিশের দিকে চলল।'

৫

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ভ্রমণকথার গল্পরসের দিক থেকে 'পরিব্রাজকে' হাস্যরসের উপকরণ স্বভাবতই বেশী এসেছে। কিন্তু উচ্চতম মননের সহজতম প্রকাশ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সেদিক থেকে বিস্ময়কর। 'প্রাচ্য 'ও পাশ্চাত্যে'র হাস্যরসের দিকটি আমরা সামান্যভাবে আগে আলোচনা করেছি। এখন আরো বিশদ আলোচনার চেষ্টা করি।

প্রথমেই লক্ষণীয়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র সমগ্র রচনাভঙ্গীটিই হাস্যরসের উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিক থেকে দেখলে 'পরিব্রাজকে'র চেয়েও হাস্যরসের অন্তঃস্রোত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রকাশভঙ্গীতে সবসময় অন্তর্লীন হয়ে আছে। সূচনা অংশটুকু বাদ দিলে এ বইয়ের আদ্যন্ত এক প্রাণোচ্ছল মনীষী-হৃদয়ের সদানন্দময় বহিঃপ্রকাশ।

তবে 'পরিব্রাজকে'র মতো ঘটনা, চরিত্র, চুটকি গল্প 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' স্বাভাবিকভাবেই নেই। সমগ্র বইটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলগত পার্থক্য ও ঐক্য নিয়ে মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ। এ ধরনের বই বাংলাসাহিত্যে সেই প্রথম লেখা হলো। অথচ এত হালকাচালে এ বইয়ের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে যে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে

অনেকেই ধারণা করতে পারেন না। ইতিহাস, সমাজচেতনা, নৃতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান—এ সব কিছুর সঙ্গে এসে মিলেছে বিশ্বভ্রমণকারী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আবার সে অভিজ্ঞতার সরসতম আত্মপ্রকাশে এ বই বাংলা চলতি গদ্যের সেরা নমুনা হিসাবে বাংলা-সাহিত্যে অক্ষয় আসন অধিকার করে আছে।

স্বামীজীর মননজাত হাস্যরসের উদাহরণ আমরা তাঁর 'ভাব্‌বার কথা' এবং 'বর্তমান ভারত' বই দুটি থেকে আগে আলোচনা করে দেখিয়েছি। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' সেই বুদ্ধি ও মনীষার যুগপৎ সম্মেলন কথায় কথায় হাস্যরসের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে অগ্রসর।

বুদ্ধির প্রথম চমকটি লাগে যখন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র প্রথম সূচনায় দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদের মধ্যে প্রাচ্যের চোখে পাশ্চাত্য এবং পাশ্চাত্যের চোখে প্রাচ্যবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনার গুরু গাম্ভীর্যের পরেই স্বামীজী লেখেন—"এই তো গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি লোকের কথা।"[১] এতক্ষণ এত গম্ভীরভাবে বুদ্ধিহীনদের দৃষ্টিভঙ্গীই আলোচনা হচ্ছিল !!

তারপর ভারতাত্মার সন্ধানী বিবেকানন্দের মন্তব্য—"আমাদের রীতিনীতি যদি এত খারাপ, তো আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার কি ত্রুটি হয়েছে?···তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ।"

এই বুদ্ধির দরকার বিদেশীর চেয়ে ভারতবাসীরই বেশী। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের নেতা কেশবচন্দ্রের অনুসরণে একদা 'যীশু' নিয়ে তাঁর অনুচরেরা বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলেন। যীশুর ধর্মের মহত্ত্ব স্বীকার করেই বলা যায়, স্বামীজী যীশুর একজন শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ও অনুসরণকারী হয়েও খ্রীষ্টধর্মের অন্ধ অনুসরণের কোনো সার্থকতা দেখতে পান নি। সেই কথা মনে রেখে তাঁর মন্তব্য—'ওহে বাপু,

১ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-গ্রন্থের হাস্যরসের আলোচনায় সব উদ্ধৃতির জন্য বাণী ও রচনা : ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন।' অল্প কথায় ভারতাত্মার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অচল প্রতিষ্ঠার কথা স্বামীজী রঙ্গব্যঙ্গের ভাষায় আমাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন।

একালের ভারতবাসীর দুর্দশার কারণ স্বামীজীর মতে ধর্ম নয়, ধর্মের অভাব! শারীরিক ও মানসিক জড়তাই আমাদের প্রধান শত্রু।—"আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোঁক গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথমে ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; শেষ—'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশশুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান।'

এই শেষ মন্তব্যে পাঠকদের 'ভাব্‌বার কথা'র চোবেজীর উক্তি মনে পড়বে, 'ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?' ভারতীয় ইতিহাসের দেড় হাজার বছরের উত্থান-পতনকে স্বামীজী এই কটি বাক্যের ব্যঙ্গ-রসানে সংক্ষেপে ধরে দিয়েছেন, আর তাঁর সস্নেহ ভর্ৎসনার অন্তরে স্বদেশপ্রীতির নির্ঝরটি আপনি উৎসারিত হয়ে চলেছে।

পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের শেখবার অনেক কিছুই আছে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর সাবধানবাণী—"আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে।" তারপরেই একটি উদাহরণ—"বলি—

খাওয়াতো সব দেশেই এক ; তবে আমরা পা গুটিয়ে বসে খাই, বিলাতিরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি ; তা বলে কি এদের মতো ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকতে হবে ? আমার ঠ্যাং যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে—টনটনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি ? কাজেই পা গুটিয়ে, এদের খাওয়া খাব বই কি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মতো করে—পা গুটিয়ে আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে। বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে ? শক্তিমান পুরুষ যে পোশাকই পরুক না কেন, লোকে মানে, আর আমার মতো আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না !" গভীর বক্তব্যের উপস্থাপনে ভঙ্গীর সরসতা পাঠক ও লেখকে কতটা আত্মীয়তাস্থাপন করতে পারে উদ্ধৃত অংশটুকু তার পরিচায়ক।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে দু'দেশের তুলনামূলক আলোচনা স্বামীজীর কৌতুকরসায়িত বুদ্ধিদীপ্তি—"আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে ; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদ্‌রোগে ফুসফুসরোগে এদের বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা কি প্রায় নিরুৎসাহ, বৈরাগ্যবান হয় ? হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে আশা-বিশ্বাস পুরো থাকে। ওলাউঠা রোগী গোড়া থেকেই মৃত্যুভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারোগী মরবার সময় পর্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে সে সেরে উঠবে। অতএব সেইজন্যেই কি ভারতের লোক সর্বদাই 'মরণ মরণ' আর 'বৈরাগ্য বৈরাগ্য' করছে ?" বিজ্ঞ-ডাক্তারের মন্তব্যটি নিজে বৈরাগ্যবাদী সন্ন্যাসী হয়ে স্বামীজী যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে সেরা হাস্যরসিকের নিজেকে বা নিজের মতবাদ নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির উঁচুদরের ক্ষমতার প্রকাশ। খুব কম মানুষই নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ বা কার্টুন (ব্যঙ্গচিত্র) সইবার শক্তি রাখেন।

খাওয়াদাওয়া প্রসঙ্গে স্বামীজীর নিজের পছন্দ ও বাঙালীর জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে হুঁশিয়ারী—"নানান দেশ দেখছি, নানান রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল-ঝোল-চচ্চড়ি-শুক্তো-মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না।" রসনারসের এমন উদার স্বীকৃতির আর এক উদাহরণ আছে রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা'র 'নিমন্ত্রণ' কবিতায়। তবে সে নিমন্ত্রণের আহার্য-তালিকা এমন ঘরোয়া স্বাদের উদাহরণ নয়, আর একটু রজোগুণসমৃদ্ধ।

স্বামীজীর মতে—"আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব-বাঙলায়, ওদের নকল কর যত পারো।···তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্বনেশে ময়দার তালে হাতে-মাটি দেওয়া ময়রার দোকানদার সর্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম বাঁকড়ো ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্ত-বাটা দেয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও ট্যাইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে 'সইভ্য' হচ্ছে!!" স্বামীজীর এ অভিযোগে কল্পনার লীলাভঙ্গীতে বর্ণনার মাধুর্য কীভাবে বিচিত্র হাস্যরসময়রূপ ধারণ করে তার নিদর্শন।

বিভিন্ন জাতির বেশভূষার উদ্ভব, বিবর্তন ও বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে বহু তথ্য স্বামীজী পর পর মজার গল্পের মতো সাজিয়ে দিয়েছেন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'। এর পেছনে কী বিস্তর পড়াশুনো ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে তা আগে মনেই হয় না। প্রসঙ্গটি শুরু করেছেন 'সধবার একাদশী'র বিখ্যাত উক্তি 'ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝ্‌বো ক্যামনে?' দিয়ে। স্বামীজীর মন্তব্য—'শুধু ব্যাতনে নয়, 'কাপড়' না দেখলে ভদ্র অভদ্র বুঝবো ক্যামনে' সর্বদেশে কিছু না কিছু চলন।

নানাদেশের নানান রীতির তুলনায় স্বামীজীর ভাষা হাস্যরসের জোয়ার তুলে এগিয়ে গেছে। একটি উদাহরণ—"ইংরেজ ও আমেরিকানরা কথাবার্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। সে

'ঠ্যাঙ' বলবার পর্যন্ত জো নেই। ফরাসীরা আমাদের মতো মুখখোলা ; জার্মাণ রুশ প্রভৃতি সকলের সামনে খিস্তি করে।"

ইতালির নবজাগরণ ও ভারতের নবজাগরণের পাশাপাশি তুলনা —"ইতালি বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু। আকবর হ'তে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত আবার নানা কারণে পাশ ফিরে শুলো।"

সভ্যতার শীর্ষনগর পারি বা প্যারিস (স্বামীজী দুটি উচ্চারণই নিয়েছেন) প্রসঙ্গে স্বামীজী সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত। প্যারিসে ইন্দ্রিয়-চর্চার অবাধ স্রোত সম্বন্ধে স্বামীজীর দুটি মন্তব্য—"লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউ ইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ ; তবে তফাৎ এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া ; বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাত।···

"বলি, মেছবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে—সেটা কেমন আহাম্মকি ? তেমনি এ পারি।"

ফ্রান্সের জনপ্রিয় নর্তকীদের নাচ প্রসঙ্গে—

"ইংরেজ ওলবাটা মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটার হলে আর দোষ নেই। এ কথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্বত্র, ও গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।"

ভাষাব্যবহারে শুচিবাই থেকে একেবারে মুক্ত হওয়ার ফলে স্বামীজীর চলতি গদ্যের পৌরুষ ও গতিবেগ কী দুর্ধর্ষ শক্তিলাভ

করেছে, উপরের উদ্ধৃতিগুলি তার প্রমাণ। সামান্য দু'চার কথায় বিভিন্ন জাতির তুলনার মধ্য দিয়ে স্বামীজীর হাস্যরসের বিজয় বৈজয়ন্তী এমনিভাবে অগ্রসর।

সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবখানেই দেবতা ও অসুরের (দেবভাব ও পশুভাবের) লড়াই। এই লড়াইয়ে কেমন করে বিভিন্ন শ্রেণীর ইতিহাস গড়ে উঠছে, সে প্রসঙ্গে স্বামীজীর সমাজতন্ত্রী দৃষ্টি—"একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগলো—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি ক'রে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেইসব বিনিময় করতে লাগলো, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে।" সর্বহারা, পরশ্রমজীবী এবং ধনসঞ্চয়ী ব্যবসাদার এই তিনটি শ্রেণীর দ্রুতবর্ণনার সহজ নৈপুণ্যে স্বামীজী প্রায় একালের কার্টুন-চিত্রের ব্যঙ্গধর্ম এনে দিয়েছেন। তারপর স্বামীজীর দৃষ্টিতে সমাজসত্যের বিশ্লেষণ—"একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম ; যে পাহারা দিলে সে জুলুম করে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিল ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে ম'লো ! পাহারাওয়ালার নাম হল রাজা, মুটের নাম হল সওদাগর। এ দু'দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিস তৈরি করতে লাগলো, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগলো।" অর্থনীতি ও রাজনীতির যে সূত্রগুলি স্বামীজী এমন মজার ভাষায় বর্ণনা করেছেন, গবেষণাগ্রন্থরূপে তাই 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতত্ত্ব।'

নানা জটিল সূত্রের আবর্তন বিবর্তনে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠলো সে সম্বন্ধে স্বামীজীর সানন্দ কৌতুকময় গদ্যভঙ্গী—"ক্রমে এই সকল ভাব—প্যাঁচাপেঁচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্য গেরো হয়ে বর্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত-হলেন।" এই বর্ণনার শেষে স্বামীজীর

মন্তব্য—"সকল সমাজে এই নানারূপ ভগবান বিরাজ করছেন—সাধু-নারায়ণ, ডাকাত-নারায়ণ ইত্যাদি।" এমনি করে বিশ্বসভ্যতার প্রাঙ্গণে সব দেশের সঙ্গে স্বদেশের তুলনামূলক আলোচনা করতে করতে স্বামীজী বাংলার শিল্পকলা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একটু আকস্মিকভাবেই এই পরম রমণীয় আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ হাস্যরস যে মননের বৈদগ্ধ্যে ও মানবপ্রীতির উদার আন্তরিকতায়, তার অজস্র উদাহরণ তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন। বাংলাসাহিত্যে কালজয়ী হাস্যরসের উপস্থাপনে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আনন্দময় স্বরূপের উদ্ভাসন।

বাংলাসাহিত্যে বিবেকমন্ত্র : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'

সাহিত্যের শৈলীবিচারে লেখকের ব্যক্তিত্ব যে মুখ্যভূমিকা নিয়ে থাকে, সেকথার সংহত রূপায়ণ 'The Style is the man.'—এই সুপ্রচলিত বাক্যটি। বাংলা অনুবাদে বলা যায়—'শৈলীই ব্যক্তি।'

কথাটি প্রথম দৃষ্টিতে এত সুপ্রযুক্ত ও অব্যর্থ মনে হয় যে, একে বিশ্লেষণের কথাই আমরা ভাবি না। এক্ষেত্রে 'the man'-বা ব্যক্তি-সত্তাটির অর্থ কি দাঁড়ায়? লেখকের ব্যক্তিত্বের সমস্ত অংশই কিছু লেখায় প্রতিভাত নয়। লেখার জগতে যে ব্যক্তিত্ব, প্রতিদিনের জীবনে ও আচরণে সে ব্যক্তিত্বের পরিচয় নাও থাকতে পারে।

প্রমথ চৌধুরীর মতো নিপুণ নৈয়ায়িকও অন্তরে অন্তরে রোমান্টিক কল্পচারী হওয়ার ফলে বাস্তবজীবনে ব্যবহারিক সিদ্ধিতে পিছিয়ে যেতে পারেন। অক্ষয় বড়ালের মতো নারী ও প্রকৃতির রহস্যমুগ্ধ কবিও দৈনন্দিন জীবনে সাবধানী সংসারীর ভূমিকা যথাযথ পালন করেন। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো মর্ত্য ও অমর্ত্যের সেতুবন্ধনে সুদূরপ্রসারী অন্যমনা দৃষ্টি এই দেনাপাওনার জগতে জমিদারী দেখাশোনায় নূতন প্রতিভার পরিচয় দেন। (শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' দ্রষ্টব্য।) মোটের উপর মানবব্যক্তিত্বের সবটা নয়, বিশেষ কোনো দিক লেখকের রচনায় Style বা শৈলী হয়ে ধরা দেয়। লেখককে অতিক্রম করে তাঁর নিহিত সত্তা রচনার ক্ষেত্রে এক অভিনব জাদু সৃষ্টি করে। অনেক সময় লেখকও বাল্মীকির মতো অবাক হয়ে ভাবেন: 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'—এ আমি কী বলেছি? সেইসঙ্গে প্রশ্ন—কেমন করেই বা বলেছি?

কিন্তু এমন লেখকও মাঝে মাঝে দেখা যায়, যাঁদের রচনাগত ব্যক্তিত্ব এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিত্বে কোনো পার্থক্য নেই। অন্তরে বাহিরে যে বিদ্যুৎ ও বৈচিত্র্য তাঁরা জীবনে প্রকাশ করেন, তাঁদের রচনায়ও তার অবিকল ছায়াপাত। বাস্তব ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক

ব্যক্তিত্বে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। 'The Style is the man'[১] কথাটিকে ঘুরিয়ে বলা চলে—'The Man is the style' ('ব্যক্তিই শৈলী')। বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই শ্রেণীর লেখক।

মুখের ভাষায় সাহিত্যকে জীবন্ত করতে চেয়েছিলেন বলে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্বামীজী 'ভাব্‌বার কথা'র ব্যঙ্গরচনাগুচ্ছ, 'পরিব্রাজকের' ভ্রমণকাহিনী এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র তুলনামূলক সভ্যতাবিচার করেছেন। আবার গভীর মননের গাঢ়বন্ধ বাণীরূপ দিয়েছেন 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'বর্তমান সমস্যা', 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধে এবং 'বর্তমান ভারত'-নামে ভারত-ইতিহাসের দার্শনিক বিশ্লেষণে। একদিকে অদ্বৈত বেদান্তের গুহানিহিত ধ্যানমূর্তি আর একদিকে কর্মে পরিণত বেদান্তের লোকপাবনী গঙ্গাধারারূপে সর্বস্তরের সর্বজনের অন্তরঙ্গতা—সাধু ও চলতি গদ্যে বিবেকানন্দের দ্বৈতসত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাছাড়া তাঁর অমর পত্রসাহিত্য তো রয়েছেই। একহিসাবে তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টার অধিকাংশই পত্ররচনার অন্তরঙ্গ আলাপচারী। তাছাড়া আছে তাঁর ইংরেজী ও বাংলা কবিতা—যা ভাবে ও কল্পনায় বিবেকানন্দ-মনোমন্দিরের মূল চাবিকাঠি। বিবেকানন্দপ্রতিভার ভাস্বর প্রতিফলন বিবেকানন্দ-সাহিত্য।

* * *

অদ্বৈত-আশ্রম-প্রকাশিত বিবেকানন্দ-রচনাবলীর (The Complete Works of Swami Vivekananda) ভূমিকা লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ৪ঠা জুলাই, ১৯০৭—স্বামীজীর দেহাবসানের পাঁচবছর পরে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের এর চেয়ে ভালো কোনো পরিচায়িকা সম্ভব নয়। প্রথম সংস্করণ ইংরেজী

১ তুলনীয়—"Literary art, that is, like all art which is in any way imitative or reproductive of fact—form or colour or incident—is the representation of such fact as connected with soul, of a specific personality, in its preferences, its volition and power."—'Appreciation': 'Style': Walter Pater.

রচনাবলী ছিল চারখণ্ডে বিভক্ত। পরবর্তী সংগ্রহে সমৃদ্ধ হয়ে রচনাবলীর আটটি খণ্ডে এখন তা বিধৃত। বাংলা অনুবাদে ও মৌলিক রচনায় মিলে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র দশখণ্ডের পরিকল্পনা হয় বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে প্রকাশিত হয়ে এই রচনাবলী যে অভাবিত জনসমাদর লাভ করে, তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের একটি অন্তরতম আকাঙ্ক্ষা এতকাল পূরণের অপেক্ষায় ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার ষষ্ঠ খণ্ডটিতে রয়েছে স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা এবং অসমাপ্ত একটি বাংলা গল্প ও অনুবাদ (ঈশা-অনুসরণ)। আমাদের মনে হয়, স্বামীজীর মৌলিক রচনারূপে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি এই খণ্ডটিতে সংযোজিত হওয়া এখন প্রয়োজন। প্রথমটি স্বামীজীর প্রাক্‌সন্ন্যাসযুগের রচনা 'সংগীতকল্পতরু' গ্রন্থের (প্রথমসংস্করণ, ১৮৮৭) ভূমিকা 'সঙ্গীত ও বাদ্য'। দ্বিতীয়টি তাঁর পরিব্রাজক-জীবনে আলমোড়ার পথে ধ্যানোপলব্ধিজাত মনন—'শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন' (১৮৯০)।[১] তাছাড়া হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থটির 'শিক্ষা' নামে যে সংক্ষেপিত অনুবাদ স্বামীজী তাঁর পিতৃবিয়োগের পর করেছিলেন বলে মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন এবং 'বসুমতী' কার্যালয় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত বলে যে বইটি এতকাল প্রচারিত হয়ে আসছিল, সেই মূল্যবান অনুবাদগ্রন্থটিও এখন 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।[২] শেষোক্ত অনুবাদটি বাংলা রচনাবলীর সঙ্গে ষষ্ঠখণ্ডেই স্থান পেলে ভালো হয়। স্বামীজীর প্রথমজীবনে কৃত 'গীতগোবিন্দের' অনুবাদের কথাও মহেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনীতে আছে—আশা করি কালক্রমে সেটিও আবিষ্কৃত হয়ে বিবেকানন্দ-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে বিবেকানন্দ মৌলিক রচনা ও অনুবাদ এ দুয়ের দ্বারাই সংযুক্ত। তিনি নিজে অনুবাদ করেছেন এবং তাঁর ইংরেজী ভাষণ বা রচনা বাংলায় অনূদিত হয়েছে। অনেকে একথা মনেও রাখেন না যে, স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ', 'কর্মযোগ' বা 'ভারতে বিবেকানন্দ' প্রভৃতি বই মূলে ইংরেজীতেই সৃষ্টি। এ সব রচনার অনুবাদে স্বামীজীর সাধু গদ্যরীতি বিস্ময়কর নৈপুণ্যে অনুসৃত। সাধারণভাবে বিবেকানন্দের ইংরেজী রচনার অনুবাদে এই রীতিই পরবর্তীকালেও গৃহীত।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যপাঠের ফল আত্মিক জাগরণ—উপনিষদের ভাষায় 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।' "যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে সদা আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে কোনকালে বলবান হবে না, যে আপনাকে সিংহ জানে সে 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জারাদিব কেশরী'।"[১]—এই আত্মবিশ্বাসকে স্বামীজী বর্তমান ভারতের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় মনে করতেন।

"বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশকোটি দেবতায় এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহার সবগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কথনই মুক্তি হইবে না।"

"আমি পাশ্চাত্ত্য দেশে যাইয়া কি শিখিলাম? খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়-গুলি যে মানুষকে পতিত ও নিরুপায় পাপী বলিয়া নির্দেশ করে, এই-সকল বাজে কথার অন্তরালে উহাদের জাতীয় উন্নতির কি কারণ দেখিলাম?—দেখিলাম ইওরোপ ও আমেরিকা উভয়ত্র জাতীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে মহান্ আত্মবিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। একজন ইংরেজ বালক তোমাকে বলিবে, 'আমি একজন ইংরেজ—আমি সব করিতে পারি।' আমেরিকান বালকও এই কথা বলিবে—প্রত্যেক ইওরোপীয় বালকই এই কথা বলিবে। আমাদের বালকগণ এই কথা বলিতে পারে

১ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ১২২

কি ? না, পারে না ; বালকগণ কেন, তাহাদের পিতারা পর্যন্ত পারে না। আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই জন্যই বেদান্তের অদ্বৈতভাব প্রচার করা আবশ্যক, যাহাতে লোকের হৃদয় জাগ্রত হয়, যাহাতে তাহারা নিজ আত্মার মহিমা জানিতে পারে। এই জন্যই আমি অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া থাকি···।"[১]

এই আত্মবিশ্বাসের অভয়মন্ত্র-উচ্চারণের পরেই স্বামীজীর যে বাণীটি স্বাভাবিকভাবে মনে পড়ে, মানবজাতির উদ্দেশে তা চিরসংগ্রামের আহ্বান—'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।' 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতার এই চরণটিতে বিবেকানন্দ-জীবন-সাধনার সংহত রূপায়ণ। সম্প্রতি আবিষ্কৃত স্বামীজীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন' রচনাটির চিন্তাসূত্রের অন্যতম বাণী—'জীবন কি ? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু।'[২] ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালোবাসা।'[৩] বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে সুখ ও দুঃখ দুইই পরিবর্তনশীল মায়িক সত্য। তবু দুঃখ ও মৃত্যুর তোরণ-দ্বারেই মানুষ অনন্তজীবন-রহস্যের মুখোমুখি হয়। বিবেকানন্দের ধ্যাননেত্রে মহাকালী সেই দুঃখরূপিণী পরম সত্যের প্রতিমা।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও শক্তিসাধনার কালী-উপাসনায় যে অন্তরঙ্গ যোগ বাংলাদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে সাধিত বিবেকানন্দ তার আধুনিক উত্তরাধিকারী। ফলে একই সঙ্গে সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মার অভয়বাণী ও অকল্যাণের সঙ্গে চিরসংগ্রামের প্রতিজ্ঞা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রধান দুটি সুর। আবার এ দুটি সুরের মূলে রয়েছে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে বিবেকানন্দের নিরন্তর প্রয়াস। 'বর্তমান ভারতে'র শেষ প্রার্থনায় তিনি শিখিয়েছেন—"আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে,

১ বাণী ও রচনা : ৫ম খণ্ড : কুম্ভকোণম্ বক্তৃতা : ভারতে বিবেকানন্দ : পৃঃ ৭৯-৮০

২ এ বইএর পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য।

৩ The Master As I Saw Him

আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'[১]

দ্বিতীয় বার আমেরিকাযাত্রার প্রথম দিনটিতে জাহাজ তখনও গঙ্গাবক্ষে ; —এক দিব্যপ্রেরণায় স্বামীজী বলেছিলেন—"Yes ! the older I grow, the more everything seems to me to lie in manliness. Do even evil like a man ! Be wicked, if you must, on a great scale." "হ্যাঁ, বয়স যত বাড়ছে, তত আমার মনে হচ্ছে মনুষ্যত্বই সব। অন্যায় করলেও মানুষের মতো কর ! শয়তান যদি হতেই চাও, খুব বড়ো দরের শয়তান হও।"[২]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' এই কথাটি আরো বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত—"একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে ? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে ? মানুষে নাম-যশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে ?

"মানুষ হও রামচন্দ্র। অমনি দেখবে ওসব বাকি আপনা আপনি গড়-গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ি ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।"[৩]

অর্থাৎ বড়ো দরের অন্যায় করাটাই তিনি মনুষ্যত্ব মনে করতেন না। কিন্তু যাদের মানসিক হীনতা অন্যায় করবার সাহসও রাখে না, তাদের চেয়ে সাহসী অন্যায়কারী তাঁর কাছে বেশী সমাদৃত। আবার যথার্থ আত্মসত্যে প্রতিষ্ঠিত নির্ভীক মানুষের কাছে কোনো অন্যায়ের চিন্তাই তো আসতে পারে না। অমৃতসত্যের সেই অভয়বাণী শোনাতেই বাংলাদেশ ও বাংলাসাহিত্যে বিবেকানন্দের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল।

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৯

২ The Master As I Saw Him : Sister Nivedita's Complete Works : Vol I : p. 122

৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৬২

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংঘাতে দুই ধরনের রক্ষণশীলতা আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনপন্থী একদল উটপাখির মতো অতীতের বালুভূমিতে মুখ গুঁজে শাস্ত্র ও গুরুবাদের দোহাই দিয়ে সব যুক্তি ও বিজ্ঞানকে নিজেদের অন্ধসংস্কার অনুযায়ী পরিবর্তিত করতে উৎসুক ; আর একদল নবীনপন্থী চান যে-কোনো আধুনিক মতবাদের প্রশ্নহীন অনুকরণে স্বজাতি ও স্বদেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভুলে আত্ম-অবলোপ। সভ্যতার সংঘাতে এমন সংকট দেখা দেওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু স্বামীজী এই সংঘাতের সুফলের উপরেই জোর দিয়েছেন। যে ভুলভ্রান্তি বা সাময়িক আত্মবিস্মৃতি দেখা দিয়েছে, তার উপরে তুলে ধরেছেন মানুষের ভুল করার অধিকার। মানুষই ভুল করে, কারণ মানুষই জৈবসত্তার উপরে স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। "যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয় ; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই।··· মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি ?"[১]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল রস কি ? সাহিত্যতত্ত্বে যে নবরসের কথা বলা হয়, তাতে ধর্মীয় সাহিত্যের মূলে রয়েছে শমভাব। সে সাহিত্যের পরিণাম শান্তরস। কিন্তু স্বদেশ ও বিশ্বের বহু বিচিত্র ভাবধারার আবর্তে গড়ে-ওঠা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল প্রেরণায় শান্তরসের অনুভূতি কিছু পরিমাণে থাকলেও আধ্যাত্মিকতার সংগ্রামী রূপটিই তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে।

বীররসের মূলে রয়েছে উৎসাহ। সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রেরণামন্ত্র 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—যেটি তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার আদর্শবাণীরূপে নির্বাচন করেছিলেন, সেই মন্ত্রটি অধ্যাত্ম আদর্শের পরিপূর্ণতার জন্য মানবচিত্তের জাগরণের আহ্বান। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার সংলাপে ধর্মরাজের মুখে এই আহ্বান ধ্বনিত। বীরত্বের আদর্শের "দিক থেকে কায়িক ও মানসিক দু'ধরনের বীরত্বের কথাই

---

[১] ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৪

আমরা ভাবতে পারি। ভারতবর্ষের আদর্শ ছিল সত্যলাভের জন্য সর্বদুঃখবরণের নির্ভীকতা। সাধারণভাবে যাকে 'বীররস' বলা হয়, বিবেকানন্দ-সাহিত্যে তা আছে সন্দেহ নেই। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র বীররস এই কারণেই স্বামীজীকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে। তবু, 'বীররস'ই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূল রস নয়। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের লক্ষ্য মানবজাতির আত্মিক জাগরণ। সে জাগরণের মূলে রয়েছে মনুষ্যত্বের সাধনা—আর এই মনুষ্যত্ব-উপলব্ধিই বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অন্তরতম রসোপলব্ধি। বিবেকানন্দ-সাহিত্য-পাঠ আমাদের মনুষ্যত্ব থেকে মুমুক্ষুত্বলাভের পথে প্রেরণা দেয়, একথা যেমন সত্য, তেমনি, সুখ-দুঃখ, জন্মমরণ, দেবাসুরের চিরদ্বন্দ্বের পটভূমিকায় এই মনুষ্যমহিমার উপলব্ধির জগতে আহ্বান করে। 'Manliness' বা মনুষ্যত্বের প্রেরণাকে পাশ্চাত্য humanism (মানবিকতা) কথাটির দ্বারা আংশিকভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু মানবসত্তার অপূর্ণতার স্বীকৃতি সে মানবিকতাবাদে নেই। অপূর্ণ বলেই মানুষের পূর্ণতার প্রয়াস, আর সে পরমপূর্ণতা মানুষেরই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তার—এই উপলব্ধি বিবেকানন্দ-সাহিত্যকে প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদী, প্রেমিক ও সন্ন্যাসী—সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের প্রেরণার আধারে পরিণত করেছে। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের মূলরস যে মনুষ্যত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত, সে জাতীয় রসবাদ অতীতের সাহিত্যচিন্তায় মেলে না। নির্দিষ্ট মতবাদের গণ্ডীকে অতিক্রম করাই সব মহৎ সাহিত্যের ধর্ম।

যে 'মানব'-চিন্তা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র, সে মানুষের যেমন বিশেষ কোনো দেশকাল নেই, তেমনি আর এক অর্থে সে মানুষের আবির্ভাব এই ভারতবর্ষেই। সে মানুষ জগতের অধীশ্বর হয়েও পরমসত্যের প্রেরণায় সর্বত্যাগী, বিশ্বের মুক্তিকামনায় আপন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত বিসর্জনকারী। বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বিবেকানন্দের সেই 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র আহ্বান—

Awake, arise, and dream no more !
This is the land of dreams, where karma
Weaves unthreaded garlands with our thoughts
Of flowers sweet or noxious—and none
Has root or stem, being born in naught, which
The softest breath of truth drives back to
Primal nothingness. Be bold and face
The Truth ! Be one with it ! Let visions cease,
Or, if you cannot, dream then truer dreams,
Which are Eternal Love and Service Free.[১]

ওঠো জাগো আর স্বপ্ন নয়,
স্বপ্নের এই জগতে ভালো মন্দ নানাফুলের বিনিসুতোর মালা
গেঁথে চলেছে আমাদের কর্ম। মূলহীন বৃন্তহীন সেই পুষ্পরাশি
পরমসত্যের মৃদুতম স্পর্শ পেলে আদিম শূন্যতায়
বিলীন হয়ে যায়। অভী হও, নির্ভয়ে সত্যের মুখোমুখি
দাঁড়াও! সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও। সব কল্পনা থেমে যাক!
আর যদি তা না পারো, তবে অনন্ত প্রেম ও নিষ্কাম সেবার
মহত্তর স্বপ্নই দেখো।

মহত্তম সত্যের সেই আহ্বানই—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'; 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'[১] কবিতায় 'জাগো বীর'[২]—বাংলাসাহিত্যের বিবেকমন্ত্র।

১ বীরবাণী : শতবার্ষিকী সংকলন : পৃঃ ৫৪

২ জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।
'নাচুক তাহাতে শ্যামা' : বীরবাণী

বিবেকানন্দের স্বল্পসীমার জীবনবৃত্তে যে অনন্ত তেজের ভাণ্ডার নিহিত ছিল, জীবনে, সাহিত্যে, ভাষায়, বিপ্লবে, জীবনসংগ্রামে ও পরম আত্মত্যাগে তাই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বিশ্বমানসে ও বাংলা ভাষায় আমাদের অন্তর্লোকে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে।

পরিশিষ্ট—১

ধর্ম মীমাংসা ও রামকৃষ্ণদর্শন[১]

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত

[প্রভুর[২] লীলাবসানের কিছুদিন পরে হিমালয়ে তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাধরকে[৩] সঙ্গে লইয়া আলমোড়ায় গমনকালে এক পান্থশালায় বসিয়া নরেন্দ্রনাথ গঙ্গাধরের খাতাতে তাঁহার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করেন। আলমোড়ায় শরচ্চন্দ্র[৪] ও আমাকে দেখাইলে আমি উহা লিখিয়া লই ; এবং কবচের মত যত্ন করিয়া রাখি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার কালে শরচ্চন্দ্রকে দিই, এবং তাঁহারও ইচ্ছা ছিল যে, দিব্যভাব লেখা সমাপ্তকালে ভক্তসমাজে প্রচার করিবেন। বিধিনির্বন্ধে পুনরায় আমার নিকট আসায়, আমি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিতেছি।

…আচার্যপাদ নরঋষি নরেন্দ্রনাথ যিনি আমাদের শিরোমণি এবং যাঁহারই প্রসাদে আমরা অচিন্ত্যচরিত প্রভুর মহিমা যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার ধর্ম-মীমাংসা এবং রামকৃষ্ণ-দর্শন ব্যাখ্যার প্রারম্ভে সেই মহাশক্তিরই উপাসনা করিতেছেন।][৫]

In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ এক রকমের গঠন। যেমন ক্ষুদ্র আত্মা চেতন শরীরে আবৃত, সেইরূপ বিশ্বাত্মা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি, বাহ্যজগতে আবৃত ; শবোপরি শিবা—কল্পনা নহে ; যেমন মনের ভাব এবং অক্ষর বা কথা ভেদ করা যায় না, একের অন্য আবরণ—সেইরূপ। কল্পনাদ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া বলা যায় মাত্র। কেহ কথা বিনা চিন্তাও করিতে পারে না। অতএব In the beginning there was the word, and the word was with God and the word was God.

বিশ্বাত্মার এই প্রকাশভাব অনাদি অনন্ত। অতএব নিত্য সাকার ও নিত্য নিরাকার মিলিয়া আমরা জানি দেখি ইত্যাদি।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত (অনুশীলন) : শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল : ২য় সং : পৃঃ ২৫৯

২ শ্রীরামকৃষ্ণদেব

৩, ৪ স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সারদানন্দ

৫ বন্ধনীচিহ্ন বর্তমান লেখকপ্রদত্ত। এই অংশে 'দিব্যভাব' অর্থে লীলাপ্রসঙ্গের 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ' পর্ব। স্বামীজীর এই রচনাটি সম্বন্ধে এ-গ্রন্থের 'সাধু গঙ্গ' ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায়

অথ ধর্ম মীমাংসা

১। দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহা আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন মনুষ্যের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মুহূর্তে যেথায় আছে, পরমুহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে।

২। এই নিরন্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েই হইতেছে।

৩। এই নিয়মের অধীনে প্রতি পত্র, শিরা ও পল্লব, এবং তাহাদের সমষ্টি-স্বরূপ বৃক্ষ। প্রতি শরীর, মন ও আত্মা ও এবম্প্রকার বহু মনুষ্যের সমষ্টি-স্বরূপ সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে।

৪। এই প্রকার বহু সমাজের সমষ্টিস্বরূপ এই মনুষ্য-জগৎ।

৫। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কতকগুলিকে আমরা শুভ এবং কতক-গুলিকে অশুভ মনে করি। (পূর্বপক্ষ হইতে পারে, শুভাশুভ কি? এবং যথার্থ বোধ কি না?) প্রস্তাব, মনুষ্যকে হিতাহিত, শুভাশুভ, উত্তমাধম জ্ঞানবিশিষ্ট জীব সিদ্ধান্ত করিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

৬। ঐ সকল পরিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টি-বোধ, পরকাল-বোধ এবং কর্ম-বোধ-জনিত যে সকল মানসিক পরিবর্তন সমষ্ট্যাকারে বিস্তাররূপে কার্যে পরিণত হইয়া মনুষ্যের জীবনে এবং সমাজে অন্য সর্বপ্রকার অনুভূতি ও অনুমান অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে তাহার নাম ধর্ম।

৭। পদার্থ দ্বারা, বস্তুগত ধর্ম দ্বারা, অদৃষ্ট দ্বারা, পুরুষদ্বয়ের সংঘর্ষ দ্বারা, সর্বশক্তিমান একমাত্র আত্মা দ্বারা, এবং জানি না আরও কত প্রকারে এই জগতের উৎপত্তি অনুমিত হইয়াছে। অবশ্যম্ভাবী ফল, ঈশ্বরানুগ্রহে খণ্ডিতব্য ফল, স্বাধীন, ঈশ্বরাধীন, অদৃষ্টাধীন ইত্যাদি বহু প্রকারে কর্মের ফল অনুমিত হইয়াছে, এবং এই সকল বিভিন্ন অনুমানের ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধর্ম হইয়াছে।

৮। সমাজের বিভিন্ন, উচ্চ-নীচ অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত দেখা যায়।

এবং 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা : শ্রীরামকৃষ্ণ' অধ্যায় দুটিতে আলোচনা এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭০ সংখ্যার লেখকের 'বিবেকানন্দমানসের উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহভাজন গৃহী ভক্ত। এক সময় সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে বন্ধু স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে নানাস্থানে তপস্যা করেন। এই সময় তাঁর নাম ছিল স্বামী কৃপানন্দ। উত্তরকালে গৃহজীবনে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বামী সারদানন্দের অমর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র নানা মূল্যবান উপকরণে বৈকুণ্ঠনাথের সহায়তা ছিল।

৯। প্রত্যেক ধর্ম অপরগুলিকে উপধর্ম ও ভ্রমমাত্র বোধ করেন। পূর্বে তরবারি দ্বারা, এক্ষণে যুক্ত্যাদি দ্বারা এই ভ্রম সংশোধিত হয়।

১০। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ী—এবং পণ্ডিতদিগেরও মত এই যে, মনুষ্যজাতি যে প্রকার নিম্নাবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উঠিতেছে, সেই প্রকার ভ্রম হইতে সত্যে উঠিতেছে—যিনি যে মতটি মানেন, সেইটি তাঁহার সত্যের সীমা।

অথ রামকৃষ্ণদর্শনং প্রবক্ষ্যামি

নমো রামকৃষ্ণায়

১। যে প্রকার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, জরা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সমষ্টি একটি জীবন, সেই প্রকার সর্বমনুষ্যের সমষ্টিস্বরূপ এই বিরাট মনুষ্যের অর্থাৎ মনুষ্য-জগতের একটি জীবন আছে। হইতে পারে ইহা সান্ত অথবা অনন্ত।

২। প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্তন উক্ত জীবনের এক এক অবস্থাস্বরূপ।

৩। যেমন বৃদ্ধ যদি বলে—আমার বাল্যাদি অবস্থা অসত্য, তাহা হইলে যেমন উন্মত্ত-প্রলাপিত হয়, সেই প্রকার কোন বিশেষ ধর্ম অবস্থাগত মনুষ্য-সমাজের অগ্রবর্তী অবস্থাকে অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বকে ভ্রান্ত বলা উন্মত্ত প্রলাপ।

৪। কারণম্ এব কার্যমনুপ্রবিশতি—কারণই কার্যস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। হইতে পারে, পূর্ববর্তী কারণ কিছু নূতন পদার্থও গ্রহণ করিয়া কার্য হয়; তাহা হইলেও কারণটা তাহার মধ্যে থাকিল।

৫। অতএব প্রত্যেক পূর্ব অবস্থা পরের অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান, প্রত্যেক পূর্ব ধর্মমত পরধর্মমতের মধ্যে বিদ্যমান।

৬। অতএব যদি মনে কর, তুমি পূর্বের ধর্মবিশ্বাস হইতে উচ্চতর বিশ্বাসে আসিয়াছ, পূর্বের বিশ্বাসকে ঘৃণা করিও না; বরং ভক্তিভরে প্রণাম কর, তাহাও সত্য।

৭। ধর্মপরিবর্তন মিথ্যা হইতে সত্যাতে গমন নহে। পরন্তু এক সত্য হইতে সত্যান্তরে গমন।

৮। যেমন আমরা কোন পোলে (খুঁটিতে) উঠিতে গেলে, নিম্নস্থান হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত স্থানে উঠি, কিন্তু এই সমস্ত স্থানের সমষ্টিই পোল। সেই প্রকার এই সকল ধর্মমতের সমষ্টিস্বরূপ সত্য ধর্ম; এবং এই সকল ঈশ্বর-ভাবের সমষ্টিই ঈশ্বর।

৯। অতএব প্রত্যেক ধর্মই সত্য, এবং পরে যে সকল ধর্ম সমাজে বিস্তৃত হইবে, তাহাও সত্য।

১০। অতএব ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, অব্যয়, এবং আরও কত কি তা জানি না।

১১। এই পৃথিবীলোকে যত ভাব হইয়াছে, এবং সম্ভব, এবং অনন্ত জগতে যত হইবে, এবং অন্যান্য লোকে যত আছে এবং সম্ভব ; ভূলোক দ্যুলোক এবং অনন্তলোকে যত রূপ আছে এবং হওয়া সম্ভব, এবং ভাব, রূপ, গুণ যে প্রকার মনুষ্যজীবের মানসিক বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হয়, সেই প্রকার উচ্চতর এবং তম চিদাত্মা জীবসমূহ যদি থাকে, এবং তাহাদের মানসিক বৃত্তিতে, যদি আরও কত প্রকারের মনুষ্যের জ্ঞান এবং কল্পনাতীত ভাবাদি থাকে ; এই সকলের সমষ্টি বিরাট পুরুষের নাম ঈশ্বর।

১২। পূর্বপক্ষ—ঈশ্বরে তাহা হইলে স্বরূপ ব্যাঘাত, সগুণ ব্যাঘাত ইত্যাদি দোষ কি বর্তমান ?

১৩। ভীত হইও না, ধীরভাবে পর্যালোচনা কর, মনে কর—একটি শক্তি কোন একটি বস্তুর উপর গতিকর্মের চেষ্টা করিতেছে,—কেবল একটি, তাহা হইলে গতি অসম্ভব। ইহা নিশ্চিত, ততোধিক শক্তি এক নির্দেশে কার্য করিলেও হইবে না ; কিন্তু বিভিন্ন অর্থাৎ ব্যাহতভাবে কার্য করিলে (Contrary and Contradic·ory) হইবে, অপিচ প্রত্যেক শক্তি ঠিক তাহার প্রতিরূপ প্রতিঘাত শক্তির দ্বারা ব্যাহত হয়, ইহাও সত্য। (3rd law of Newton)

১৪। সমস্ত জগৎ চলিতেছে।

১৫। অতএব বিশ্বময় এই ব্যাঘাত বর্তমান ; এবং ইহাই বিশ্বের জীবন।

১৬। জীবন কি ? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু।

১৭। যে মহাশক্তি ব্যাঘ্রের হননেচ্ছার স্রষ্টা, তাহাই হরিণের পলায়নেচ্ছার স্রষ্টা নতুবা বহু-ঈশ্বর-প্রসঙ্গ দোষ হয়।

১৮। প্রত্যেক মনেতে কি কাম, শান্তি, ক্রোধ, প্রীতি ইত্যাদি বিপরীতের যুগ্ম বর্তমান নহে ?

১৯। অতএব পূর্ব পূর্ব ধর্মসকল এক শ্রেণীর কার্য এবং তাহার কারণ কেবল পর্যালোচনা করিয়াছে, অপরগুলি করে নাই।

২০। পূর্বপক্ষ—এক শ্রেণীর কার্য যে প্রকার দয়া, ধর্ম ইত্যাদি যথার্থ সৎ ; অপর শ্রেণী—অর্থাৎ পাপ ইত্যাদিই মায়িকসত্তা অর্থাৎ তাহার অভাবমাত্র।

২১। উত্তর—তাহা হইলে আমাদিগেরও উল্টাইয়া বলিবার অধিকার আছে ; যথা পাপই সত্তা, পুণ্যাদি মায়িক।

২২। সত্তা উভয়েই সমান, কার্য উভয়েরই এক প্রকারের। অতএব কারণও এক প্রকারের।

পরিশিষ্ট—২

'সঙ্গীতকল্পতরু' ও স্বামীজীর 'গানের খাতা'

['বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণের সূচনায় 'সঙ্গীতকল্পতরু' প্রসঙ্গে যে আলোচনা ছিল, এ সংস্করণে তা পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেইসঙ্গে নবলব্ধ কিছু তথ্যও সংযুক্ত। 'সঙ্গীতকল্পতরু'র সাহিত্যিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বর্তমান লেখকই সামান্য আকারে হ'লেও আলোচনার সূত্রপাতকারী। এ গ্রন্থের সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে পাঠকবৃন্দ শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর আলোচনা-গ্রন্থ দুটি দেখবেন। 'সঙ্গীত-কল্পতরু'-র ভূমিকা-রচয়িতা কে, এ প্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (১ম খণ্ড) থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য—"বিভিন্ন কারণে মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ দত্ত বা স্বামী বিবেকানন্দই ইহার লেখক। এই বিষয়ক যুক্তিগুলি আমরা পর পর উপস্থিত করিতেছি। স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে বলা হইয়াছে, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন একখানি বাংলা গানের পুস্তকের জন্য। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন যে, নরেন্দ্রনাথ বাঁয়া, তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি যন্ত্রের বাজনা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, উহা বড়তলার বৈষ্ণবচরণ বসাক প্রকাশ করেন ও উহার একখানি পুস্তক বেলুড় মঠের পুস্তকাগারে আছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু লিখিয়াছেন, প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনাদ্বারা তিনি সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন কি, কোন দরিদ্র পুস্তক প্রকাশককে তিনি ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন।' (পৃঃ ৮০) ইংরেজী জীবনী এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যবৃন্দের সম্মিলিত রচনা The Life of Swami Vivekananda এবং শ্রীপ্রমথনাথ বসুর উদ্ধৃতিটি তাঁর "স্বামী বিবেকানন্দ" নামে জীবনীগ্রন্থ থেকে গৃহীত।]

'সঙ্গীতকল্পতরু'র সূচনাপৃষ্ঠা—

সংগীত-কল্পতরু*

নানাবিধ বাদ্যাদি শিক্ষা, স্বরলিপি ও সঙ্গীত সম্বন্ধে
বিস্তর শিক্ষাপ্রদ বিষয় সহ জাতীয়, ধর্ম্ম-
বিষয়ক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক,
সামাজিক, প্রণয়, বিবিধ
এবং নানাবিষয়ক
গীত সংগ্রহ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ,
ও
শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক
কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

১১৮নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
আর্য পুস্তকালয় হইতে
শ্রীচণ্ডীচরণ বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

'সঙ্গীতকল্পতরু'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১২৯৪ সালে। এই সংস্করণে 'বিশেষ কথা'-শীর্ষক একটি ছোট্ট সূচনা লিখেছেন শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক —"সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে যদিও ভূরি ভূরি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু নানারূপ বাদ্যশিক্ষা, সঙ্গীতশিক্ষা, সুর, আলাপ ও বিবিধ সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সহ একাধারে নানা দেশীয় প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণের গাথা একত্রে সমাবেশিত এরূপ সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনকারী পুস্তক অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। 'সঙ্গীতকল্পতরু' আজ সেই অভাব-পূরণের জন্য জনসমাজে প্রকাশিত হইল।

প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, ইহার সঙ্কলনকার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অলঙ্ঘনীয় কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্ত আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূরণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।…"

পাঠকসমাজে এই সঙ্গীতসঙ্কলনটি কি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ ১২৯৪ সালের মাঘ মাসেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, ১২৯৫-এর জ্যৈষ্ঠে তৃতীয় সংস্করণ।

সঙ্কলনটির বিষয়বিভাগের মধ্য দিয়ে সমকালীন শিক্ষিত সমাজের রুচি ও প্রবণতার সুন্দর নিদর্শন মেলে। প্রথমেই জাতীয় সঙ্গীত। হেমচন্দ্রের "বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে"—কবিতাটি দিয়ে সূত্রপাত। এই বিভাগের অনেকগুলি গানের তলায় শুধু 'হিন্দুমেলা' লেখা। মনে হয়, এগুলি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর প্রেরণায় অনুষ্ঠিত 'হিন্দুমেলা'য় গাওয়া হ'ত। সেকালের জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'কালরাত্রি পোহাইল উদিত সুখ তপন', 'ভব পদে লই শরণ'; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত সন্তান', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অয়ি বিষাদিনী বীণা', 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ', মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন' প্রভৃতি অনেক গান এ সঙ্কলনে সংগৃহীত।

এই সঙ্কলনকালে ভারতের নবজাগ্রত স্বদেশচেতনা নরেন্দ্রনাথের অনুভূতি-লোকে সর্বাগ্রে দেখা দিয়েছে। পরবর্তী জীবনে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হলেও স্বদেশপ্রেম তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান সুর।

জাতীয় সঙ্গীতের পর ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গানের উপস্থিতি স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ দু'জনেই এই সাধক কবিদের গানের অনুরাগী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম যে গান দুটি শুনিয়েছিলেন—বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের 'যাবে কিহে দিন আমার' এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশী'র 'মন চল নিজ নিকেতনে' গান দুটি এ সঙ্কলনে গৃহীত। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' এবং 'কালী কালী বলোরে আজ' গান দুটির নির্বাচন লক্ষণীয়।

জাতীয় এবং ধর্মবিষয়ক সঙ্গীতের পরে শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত, কৃষ্ণবিষয়ক

সঙ্গীত, বৈষ্ণবদিগের গান, বিবিধ ধর্মসঙ্গীত, খ্রীষ্টানী সঙ্গীত, মুসলমানি গান, পৌরাণিক সঙ্গীত, ঐতিহাসিক সঙ্গীত, সামাজিক সঙ্গীত, প্রণয় সঙ্গীত, বিবিধ সঙ্গীত, নানাবিষয়ক সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়বিভাগের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতরচনায় বিষয়বৈচিত্র্যের একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় সঙ্কলন এই 'সঙ্গীত-কল্পতরু'।

বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারে 'সঙ্গীতকল্পতরু'র তৃতীয় সংস্করণ বইটি আদ্যন্ত হাতের লেখায় পরিমার্জিত। খুব সম্ভব এ হস্তাক্ষর স্বামীজীর নিজের। কিন্তু কোন সংস্করণের জন্য এ পরিমার্জনা? পরবর্তীকালে তো বইটির নাম হয়েছে 'বিশ্বসঙ্গীত'; এবং নরেন্দ্রনাথের নাম মুছে ফেলে গ্রন্থকার হিসাবে রয়েছে শুধু বৈষ্ণবচরণের নাম। সে যাই হোক, এই তৃতীয় সংস্করণের সংশোধনী হস্তাক্ষরটি যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হয়ে স্বামীজীর হাতের লেখা বলে নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়, তবে ঐ হস্তাক্ষরে সংশোধিত ভূমিকাটি পরম মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় সংস্করণের সূচনায় প্রথম পৃষ্ঠায় 'সঙ্গীতকল্পতরু' এই শিরোনামের উপর হাতে লেখা আছে—

কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে।

* * *

সঙ্গীতে যে সুখ পাই, সে সুখ কোথাও নাই,
এ সুখে বঞ্চিত যেই, বিফল জীবন তার।

"সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ জ্ঞেয়ঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ"

তার আগে গীতের সূচীতে (পৃঃ ৵০) শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' থেকে "The man that hath no......no such man be trusted". অংশ-টুকু হস্তাক্ষরে উদ্ধৃত। এ হাতের লেখাও স্বামীজীর ইংরেজী হস্তাক্ষরের মতো।

প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে যে সাধক ও কবিগণের জীবনীসংগ্রহ রয়েছে, তৃতীয় সংস্করণে সেটি 'সংগীত ও বাদ্য' ভূমিকার পরেই সন্নিবিষ্ট। তৃতীয় সংস্করণে ভূমিকা পরিবর্ধিত এবং পূর্ব সংস্করণের গানও কিছু বদলেছে, কিছু নূতন সংযোজিত। এই নব সংযোজনের মধ্যে আছে স্বামীজীর নিজের তিনটি

১ 'সাধু গঙ্গ ও স্বামী বিবেকানন্দ' অধ্যায়ে (পৃঃ ৯৭-৯৮) ভারতীয় সঙ্গীতপ্রসঙ্গে 'সঙ্গীত-কল্পতরু' থেকে উদ্ধৃত ভাবসৌন্দর্যমণ্ডিত অংশটি 'সঙ্গীত কল্পতরু'র প্রথম সংস্করণের সূচনায় 'সঙ্গীত ও বাদ্য' রচনায় ৮-৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গান—'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা' (ইংরাজী সুর—একতালা); 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি' (রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা), 'একরূপ-অরূপ-নামবরণ' (রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল)। রচয়িতার নাম 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত'। (পৃঃ ৫৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য।)

অন্যান্য গানের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' (রাগিণী—তিলককামোদ, তাল—ঝাঁপতাল), রবীন্দ্রনাথের 'গহনকুসুমকুঞ্জ মাঝে', 'বল গোলাপ মোরে বল' 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে', 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' প্রভৃতি আজকের দিনের পাঠকের কাছে আগ্রহজনক।

সর্বশেষে বাংলায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতরচনা সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত উদ্ধৃত করে তাঁর এ যুগের ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি উদাহরণ পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, রাজা রামমোহনের 'ব্রহ্মসঙ্গীত' বাংলায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত-রচনার সূচনা।

বাংলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-রচনা সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অভিমত—"আমাদের দেশে সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার স্রোত যে প্রকারে বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়।

যাহা হইয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। প্রাচীনেরা কোন পথ অবলম্বন করিয়া ঐ সকল রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, লোকে সে বিষয়ের কোনও অনুসন্ধান করে না। কেবল তাঁহারা যেগুলি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে। যদি কেহ ঐ সকল পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অপর দিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সঙ্গীতের বহুল চর্চা থাকায় প্রায় সকল গীতই হিন্দি ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। গায়কমণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দীভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না; অনেক গায়ক সেই রাগ, সেই তাল, কেবল ভাষা বাঙ্গালা গীত লজ্জাকর মনে করেন। ইঁহারা সঙ্গীতের মূল সূত্রসকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। নাম লইবার ইচ্ছা সকলেরই বলবতী; বাঙ্গালা গাহিলে লোকে আদর করিবেনা, ওস্তাদমণ্ডলী অবজ্ঞা করিবেন, এই ভয়ে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন। কিন্তু

এই কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকামালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেন বাঙ্গালা খেয়াল হইবে না? ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে সকল বাঙ্গালা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ? আবার এদেশে যদি সঙ্গীতের চর্চা সমধিক হয়, যদি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন নূতন রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গীত হয় তাহা হইলে হিন্দি গানও বাঙ্গালাভাষায় না গাহিলে চলিবে না।

এই সর্বলোকসুখপ্রদ সর্বসন্তাপহারী মোক্ষপ্রদ সঙ্গীতশাস্ত্র কি এতই সহজ যে, চিরকাল অভিজ্ঞ (?) কুসংস্কারান্ধ "ওস্তাদজি" দিগের হস্তে পড়িয়া থাকিবে? আমরা দেখিয়াছি যে, বীজগণিত এবং শব্দ শাস্ত্রের অতি সূক্ষ্মতত্ত্বসকল ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। অলঙ্কার, ন্যায় এবং মনোবিজ্ঞানের সহিত ইহার প্রাণে প্রাণে মিল, তাহা বাহুল্যভয়ে বিস্তার করিলাম না।..."[১]

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বাংলায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের রচয়িতাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। 'সঙ্গীত কল্পতরু'র তৃতীয় সংস্করণে বিধৃত নরেন্দ্রনাথ দত্তের গান তিনটির মধ্যে 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি', এবং 'একরূপ-অরূপ-নাম বরণ' গান দুটি ছাড়া তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সংগীত 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' বাংলা ধ্রুপদী সঙ্গীতের আর একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

'স্বামীজীর গানের খাতা'

বছর তিনেক আগে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদক স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজের কাছে খবর পেলাম স্বামীজীর গানের খাতা একটি পাওয়া গেছে। ছোট বিবর্ণ মলাটের সেই খাতাটির মধ্যে স্বামীজীর নিজের হাতে কিছুটা কালিতে, বেশির ভাগ পেন্সিলে স্বামীজীর স্বরচিত গান এবং অন্য-রচিত গান লেখা রয়েছে। অনেকগুলির স্বরলিপি স্বামীজী করেছেন, কিছু আবার স্বরলিপি-হীন। এ খাতায় গোড়ার দিকে কিছু অংশ অন্যের হাতে লেখা। তথ্যগত তাৎপর্যের দিক থেকে গায়ক বা সুরগুণিতদের কাছে এ খাতাটির মূল্য অনেক বেশী। কিন্তু স্বামীজীর মানসলোকের পরিচয়ের দিক থেকে এবং স্বামীজীর স্ব-কৃত স্বরলিপির দিক থেকে এ খাতাটি সাহিত্যের কারবারীদের কাছেও মূল্যবান উপাদান।

১ সঙ্গীতকল্পতরু: প্রথম সংস্করণ; পৃঃ ৩৫-৩৬

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ এই খাতাটি সম্বন্ধে সচিত্র বিবরণ সহ তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সমগ্র খাতাটি অবিকল ছাপিয়ে দেবেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি দিয়ে সে খাতার পরিচায়িকা তৈরী হবে। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজকে অনুরোধ করবেন সে বইয়ের ভূমিকা লিখতে। জানুয়ারী মাসে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হয় নি। খাতাটি ভালোভাবে সম্পাদনা করে এখন প্রকাশিত হ'লে পাঠক সমাজের অশেষ উপকার হবে।

পরিব্রাজক জীবনে দক্ষিণভারতে থাকার সময় স্বামীজী অনেকবারই মাদ্রাজে সহপাঠী বন্ধু মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে ছিলেন। প্রথমবার আমেরিকা যাবার আগে স্বামীজী এই বন্ধুর মাদ্রাজের বাড়ী থেকেই খেতরী হয়ে আমেরিকা যান। এই গানের খাতাটি তিনি গান শেখার জন্য মন্মথবাবুর মেয়েকে দিয়ে যান।

খাতাটির প্রথম পৃষ্ঠায় কালিতে লেখা একটি গান। গানটির উপরে 'নটের গীত' একথা লেখা থাকায় মনে হয় এটি কোনো নাটকের বা পরিকল্পিত নাটকের গান।

'নটের প্রথম গীত

রাগিণী কেদারা তাল চৌতাল

বন্দে পরম পুরুষায়, অনাদি অনন্ত অব্যক্তরূপায়।
বিশ্ব সুদৃশ্য অতি চমৎকার, হয় রচনা যাঁহার,
পাইবে ত্রাণ, কররে গান, কৃপানিধান দেবদেবতায়।
অনন্ত অভ্রান্ত অশোক অভয় সদাসর্বজনাশ্রয়।
অতি মহান জগতঃ ত্রাণ, স্বসমান শিবস্বরূপায়ঃ।

এই গানের 'ত্রাণ' পাঠটি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর। প্রথম লাইনে 'অনন্ত' কেটে 'অচিন্ত্য', চতুর্থ লাইনের 'অচিন্ত্য' কেটে 'অনন্ত' লেখা আছে। এই গানটির তলায় প্রথমে পেন্সিলে

'Narendranath Dutt
22nd Jan 86 Friday' লেখা আছে।

লেখাটির উপরে অপটু হাতে কালি বোলানো। তবে মূলটি নরেন্দ্রনাথেরই স্বাক্ষর। তারিখ অনুসারে লেখাটি স্বামীজীর কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ

অসুখের সময়কার। উপরের গানটি স্বামীজীর ছাত্রাবস্থায় লেখা ('হরিশ্চন্দ্র'-বিষয়ক ?) নাটকের সূচনা বলে অনুমিত। সেক্ষেত্রে এ গানটি স্বামীজীর ছাত্রাবস্থায় লেখা গান। সুতরাং এটিকেই আমরা স্বামীজীর প্রথম রচিত গান বলতে পারি। বিরুদ্ধ সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের এই অনুমান।

স্বামীজীর নিজের লেখা তিনটি গান (এর মধ্যে দুটি স্বরলিপিসহ) এ খাতায় আছে। তার উপরে আছে গানগুলি কীভাবে গাওয়া হবে সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ ছবি-সহ 'উদ্বোধন' (আশ্বিন, ১৩৮২) পত্রিকায় যে প্রতিলিপি ছেপেছিলেন তা থেকে একটি গান উদ্ধৃত করি—

নাহি সূউ উ উ র্য্য নাহি জ্যোও ও ও তি নাহি শশাঙ্ক সুউউউন্দর
ভাসে এ ব্যোমে ছায়া আ আ-সম ছবি বি ই শ্বর চরা আ আ আ চর।
অস্ফুট অ অ মন আ আ আকাশে জগৎ সং ং ং সার ভা আ আ সে—
ওঠে-এ ভাসে-এ ডো ও ও বে-এ অহং স্রো ও তে নিরন্তর অ ॥
ধীরে ২ ছায়াদল মহালয়ে এ প্রবে এ এ শিল—
বহে মাত্র অ আমি ই ই ই আমি ই ই এই ধারা অনু উ ক্ষণ
সে ধারা-ও বন্ধ হলো-ও শূন্যে শূন্য অ অ অ মিশাইল—
অবা আ ঙ্ মনস গো ও চর বোঝে অ প্রাণ বোঝে এএএ-যার

এ গানটির স্বরলিপি স্বামীজী দেন নি। পরবর্তীকালে কিছু পাঠান্তরও ঘটেছে। (দ্র বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড) অন্য দুটি গানের পাঠান্তরও বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর প্রবন্ধে উল্লিখিত। এর মধ্যে 'একরূপ অরূপ' গানটির 'যেই সূর্য সেই কিরণ' স্থলে আদি পাঠ 'সেই সূর্য সেই কিরণ' এবং পরে প্রথম 'সেই' কেটে—'যেই' পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়। 'তাথেইয়া তাথেইয়া' গানটির আদি পাঠে শুরু হচ্ছে 'তাথীয় তাথীয় নাচে ভোলা' দিয়ে।

স্বামীজীর এই ব্যক্তিগত গানের খাতায় তাঁর গানের রুচির বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে কৌতূহলজনক। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বাংলা ও হিন্দী বেশ কিছু গান এ খাতায় রয়েছে। ব্রহ্মসংগীত তো আছেই। একটি অসমাপ্ত ব্রহ্মসঙ্গীত—

'রে বি হ অ র মম মন—চিদানন্দাকাশে ব্রহ্ম অ সহবাসে—সুখে কর অ বিচরণ যোগ পক্ষপুটে করি আরোহণ'—গানটি আর কারো রচনা বলে প্রমাণ পাওয়া না গেলে স্বামীজীর রচিত অসমাপ্ত গান হতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত ত্রৈলোক্যনাথে সান্যালের 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে' গানটি স্বরলিপিসহ এ খাতায় আছে। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব এবং স্বামীজীর বিশেষ প্রিয় গান এটি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে স্বরলিপিসহ 'আমরা যে শিশুঅতি' এবং 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্রতপন' (স্বরলিপি নেই) গান দুটি লক্ষণীয়। বিশেষত 'তাঁরে আরতি' গানটির উপরে লেখা 'একরূপ অরূপ' সুর। এক্ষেত্রে স্বামীজীই রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের 'তাঁরে আরতি' ও 'একরূপ অরূপ' দুটি গানেরই সুর 'বড়হংস সারঙ্গ' (স্বামীজীর গানের খাতায় 'বড়সারঙ্গ' লেখা)। এ দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বামীজী নিজে গাইতেন এবং 'সঙ্গীত কল্পতরু'তেও দিয়েছেন।

এই গানের খাতাটিতে স্বামীজীর গান সংগ্রহের বৈচিত্র্যের নমুনাহিসাবে কিছু গানের প্রথম চরণ উল্লেখ করি—'যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী', 'জল কো পানি' (লক্ষ্ণৌ ঠুংরী); 'হৃৎকমলমঞ্চে দোলে করালবদনি'; 'পরবত পাথার ব্যোমে জাগো', 'ময় গোলাম, ময় গোলাম তেরা'; 'ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে', 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি'; 'চন্দন চর্চিত নীল কলেবর'; 'জাগ মা কুলকুণ্ডলিনী'; 'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো'; 'বিশ্ব ভুবন রঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি'।

বাংলাসাহিত্যের দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের সংগীতসংকলন হিসাবে এই গানের খাতাটির অশেষ মূল্য। এতে অন্যকে গান শেখানোর জন্য সংকলন বা স্বরলিপি বা সুরপ্রসঙ্গ থাকলেও কোন গানগুলি স্বামীজীর বিশেষ প্রিয় তা বুঝতে এই খাতাটি বিশেষ সহায়ক। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর সস্নেহ অনুরোধে এ খাতাটি নানাভাবে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, সেকথা মনে রেখে 'সঙ্গীত কল্পতরু' সম্বন্ধে আলোচনায় সহায়ক হিসাবে বর্তমান সংস্করণে এই সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকাটুকু সংযুক্ত।

পরিশিষ্ট—৩

শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' ও বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি'

স্বামী বিবেকানন্দের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'সখার প্রতি' কবিতাটি পাক্ষিক[১] পত্রিকা 'উদ্বোধনে'র মাঘ, ১৩০৫, প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায়

[১] প্রথম বর্ষ থেকে নবম বর্ষ অবধি 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রিকা ছিল। দশম বর্ষ (মাঘ, ১৩১৪—পৌষ, ১৩১৫) থেকে 'উদ্বোধন' মাসিকরূপে প্রকাশিত।

(১৫ই মাঘ) প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাটি দু'বার মুদ্রিত হয়েছিল। তার কারণ, 'সখার প্রতি' কবিতার পাঠভেদ। একটি মুদ্রণে সমগ্র কবিতাটির কয়েকটি চরণ বর্জিত এবং 'পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম' স্থলে 'লক্ষ্যহীন' পাঠ। অন্য মুদ্রণে বর্তমানে প্রচলিত পাঠ এবং 'লক্ষ্যহীন' স্থলে 'পক্ষহীন' পাঠ।

বর্তমানে কবিতাটির পাণ্ডুলিপির যে প্রতিচ্ছবি 'বাণী ও রচনায়'[১] রয়েছে, তাতে ভালভাবে লক্ষ্য করলে 'পক্ষহীনে'র পক্ষ অংশটির জায়গায় 'লক্ষ্য' পুনর্লিখনের চেষ্টা দেখা যায়। এটি স্বামীজীর নিজের সংশোধন কি না বলা কঠিন। কিন্তু আমরা যে মুদ্রণটিতে পুরো কবিতাটি পেয়েছি, সেইটিই এখন প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত এবং মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তার মিলই বেশী।

কবিতাটিতে বিবেকানন্দজীবনসাধনার সংক্ষেপিত রূপায়ণ এবং গভীরতম উপলব্ধির অনবদ্য আভাসন। সমগ্র কবিতাটি পর্যালোচনা করতে গেলে এ কবিতার পটভূমিতে বেদান্তবাদী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী-সত্তার আদি প্রেরণা আচার্য শঙ্করের কথা স্বভাবতই মনে জাগে। শঙ্করাচার্য থেকে বিবেকানন্দ—ভারতীয় মানসে বেদান্ত-উপলব্ধির অবিচ্ছিন্ন ধারায় আধ্যাত্মিক সাধনার তুঙ্গশিখর যেমন বারংবার আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে, তেমনি বিস্মিত করে অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশে এ দুই মহাসাধকের বাণীসৌন্দর্য। ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবের সৌন্দর্য কেমন করে কবিতা হয়ে ওঠে, এক উপনিষদে তার অজস্র প্রমাণ। সে প্রমাণ শঙ্করাচার্যের নির্বাণষট্‌ক, কৌপীনপঞ্চক, দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র, বিবেকচূড়ামণি—এমনি সব স্তোত্র ও মন্ত্রমালায় ভাব ও ভাষার অনন্ত ইঙ্গিত নিয়ে প্রকাশিত। বিশেষভাবে 'বিবেকচূড়ামণি'র ভাব, ভাষা ও প্রেরণা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে কতোভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁর বাণী ও রচনাবলীতে তার অনেক উদাহরণ। স্বামীজীর একটি অবিস্মরণীয় পত্র থেকে সে-বিষয়ে উদাহরণ স্মরণ করি।

স্বামীজীর 'পত্রাবলী'তে স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লেখা ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০ তারিখের পত্রটিতে[২] বুদ্ধ ও শঙ্করপ্রসঙ্গ অপূর্ব বিশ্লেষণে ব্যাখ্যাত। এই পত্রটিরই প্রান্তভাগে পরিব্রাজক অখণ্ডানন্দকে স্বামীজী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে 'বিবেকচূড়ামণি'তে আচার্য শঙ্কর যা লিখেছেন, তার তিনটি শ্লোক তুলে দিয়েছেন :

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড : ২য় সংস্করণ : পৃঃ ৩১৫-৩১৬

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষমশনং
পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভী-
র্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং
দিগ্বাস্তু শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং
ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি ॥
বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্
ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা
যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুষক্তবাহ্যঃ ॥
দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্ ॥
[বিবেকচূড়ামণি, ৫৩৮-৪০ শ্লোক]

এই উদ্ধৃতির সঙ্গে স্বামীজী অংশটির ভাবানুবাদও দিয়েছেন—'ব্রহ্মজ্ঞের ভোজন, চেষ্টা বিনা উপস্থিত হয়—যেথায় জল, তাহাই পান। আপন ইচ্ছায় ইতস্ততঃ তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন—তিনি ভয়শূন্য, কখন বনে, কখন শ্মশানে নিদ্রা যাইতেছেন ; যেখানে বেদ শেষ হইয়াছে, সেই বেদান্তের পথে সঞ্চরণ করিতেছেন। আকাশের ন্যায় তাঁহার শরীর, বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত ; তিনি কখন উলঙ্গ, কখন উত্তম বস্ত্রধারী, কখনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ, কখন উন্মত্তবৎ, কখন পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছে।'

এই ভাবানুবাদটুকুর পরে পরম স্নেহের গঙ্গাধরের উদ্দেশে স্বামীজীর সানুরাগ কৌতুকে নির্দেশ—'গুরুচরণে প্রার্থনা করি যে তোমার তাহাই হউক এবং তুমি গণ্ডারবৎ[১] ভ্রমণ কর।'

১ স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে 'সুত্তনিপাতে'র গণ্ডারসুত্ত থেকে কিছু অংশ অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন। "তুমি যে 'সুত্তনিপাত' হইতে গণ্ডারসুত্ত তর্জমা লিখিয়াছ, তাহা অতি উত্তম।" (উল্লেখিত পত্র)

ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসীর জীবন ও আদর্শের দিক থেকে 'বিবেকচূড়ামণি'র প্রভাব স্বামীজীর জীবনে ও মননে নানাভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বামীজীর উদ্ধৃত অংশটির সামান্ত পরেই 'বিবেকচূড়ামণি'র একটি শ্লোকে স্বামীজীর পরিব্রাজকজীবনের চিত্রটিই যেন জীবন্তরূপে প্রতিভাত—

> ক্বচিন্ মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
> ক্বচিদ্ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
> ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
> শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥

[বি. চূ. ৫৪২]

—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনো দেখায় অজ্ঞের মতো; কখনো তিনি বিশিষ্ট বিদ্বান, কখনো মহারাজার মতো তাঁর বিত্ত-বিভব, কখনও ভ্রান্তবৎ, কখনো সৌম্য, কখনো অজগরবৃত্তি নিয়ে নিশ্চেষ্ট, কখনো তিনি সম্মানিত, কখনো অপমানিত, কখনো বা (লোকসমাজে) একান্ত অপরিচিত—এইভাবে (সর্বাবস্থায়) সর্বদা পরমানন্দে তিনি বিচরণ করেন।

পরিব্রাজকজীবনে দুটি গ্রন্থ স্বামীজীর সঙ্গে থাকতো—গীতা এবং Imitation of Christ (ঈশানুসরণ)। সেই সঙ্গে অনুমান করা চলে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত আচার্য শঙ্করের উত্তরাধিকার—বিশেষভাবে 'বিবেকচূড়ামণি'—তিনি হৃদয়ে বহন করে চলেছেন।

পরিব্রাজকজীবনের আগে স্বামীজী যখন 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' এই নামেই লিখছেন, তখনও 'বিবেকচূড়ামণি'র প্রভাব তাঁর রচিত গানে ছায়াপাত করেছে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাকের সংগৃহীত 'সঙ্গীত-কল্পতরু'র তৃতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) নরেন্দ্রনাথের তিনটি গান সঙ্কলিত—'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা' (ইংরেজী সুর—একতালা); 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি' (রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়ঠেকা), 'একরূপ-অরূপ-নামবরণ' (রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল)। 'বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে 'প্রলয়' শিরোনামে 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি' গানটি একদিক থেকে স্মরণীয়। অবশ্য 'প্রলয়' ও 'সৃষ্টি' (একরূপ-অরূপ-নামবরণ) কাশীপুরে থাকাকালে স্বামীজীর সমাধি-লব্ধ অনুভূতিরই প্রকাশ।[৫] কিন্তু পূর্বসূরী শঙ্করাচার্যের সাধনোপলব্ধির

৫. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৯ম খণ্ড: স্বামি-শিষ্য-সংবাদ: ৩য় ও ১৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি'-গানটির ভাষাভঙ্গীর সাদৃশ্য এক্ষেত্রে আমাদের লক্ষণীয়। 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর'—এ অংশটি 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং'—এই উপনিষদ্শ্লোকের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমাদের অন্বিষ্ট 'বিবেকচূড়ামণি'র ভাবসাদৃশ্য গানটির পরবর্তী অংশে লক্ষণীয়।

অস্ফুট মন-আকাশে, জগৎসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ॥

'বিবেকচূড়ামণি'তে 'অহংজ্ঞানের আশ্রয় শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ-বর্ণনায়'[১] শ্লোক :

প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন নির্বিশেষঃ।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষবস্থা-
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ॥ [বি. চূ. ১৩৫]

—কারণ ও কার্য থেকে ভিন্ন, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ নির্বিশেষ পরমাত্মা অখিল স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎকে প্রকাশ করে বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে জাগ্রৎ আদি অবস্থায় 'আমি' 'আমি' এই বলে যেন নিজেকে প্রকাশ করছেন।[২]

'বিবেকচূড়ামণি'র উদ্ধৃত শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধ এক্ষেত্রে আমাদের অভিনিবেশযোগ্য—পরমাত্মা সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপে জাগ্রৎ আদি অবস্থায় 'আমি' 'আমি'—এই বলে নিজেকে প্রকাশ করে লীলারত। স্বামীজীর "বহে মাত্র 'আমি আমি' এই ধারা অনুক্ষণ"—আমাদের ধারণায়—আত্মোপলব্ধির এই মুহূর্ত।

অবশ্য তারও পারে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—অদ্বৈতানুভবের তুঙ্গশিখরে গানটির পরিসমাপ্তি।

স্বামীজীর পূর্বোল্লেখিত গান দুটি—'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি' এবং 'একরূপ-অরূপ-নাম-বরণ' ১৮৮৬ সালের রচনা বলে মনে হয়। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর সংগৃহীত স্বামীজীর ব্যক্তিগত 'গানের খাতা'র এ দুটি গানের স্বরলিপিসহ পাঠ

১, ২ স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত 'বিবেকচূড়ামণি' দ্রষ্টব্য। এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'বিবেক-চূড়ামণি'র উদ্ধৃতি ও অনুবাদের প্রধান উৎস এই গ্রন্থখানি।

স্বামীজীর স্বহস্তে লেখা রয়েছে।[১] ১৮৮৭-র শিবরাত্রিব্রতের দিন সকালে বরাহনগর মঠে মাষ্টারমশাই শ্রীতারক (স্বামী শিবানন্দ) ও শ্রীরাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)—এ দু'জনের কণ্ঠে নরেনের সদ্য-রচিত 'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা' গানটি শুনতে পান। 'গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতেছেন।' (কথামৃত : ৪র্থ ভাগ : ২১শে ফেব্রুআরি, ১৮৮৭ সালের দিনলিপি।) এ গানটিও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ-সংগৃহীত স্বামীজীর 'গানের খাতা'য় রয়েছে।

উপরের গান তিনটির পরে ১৮৯৪ খ্রীঃর গ্রীষ্মকালে স্বামীজীর আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটির প্রথম দিকের অংশ ('একা আমি, হই বহু, দেখিতে আপনরূপ'—অবধি পাঠ) পাওয়া যায়। এ কবিতাটি প্রথমে ভক্ত-ভগবানের লীলাসম্বন্ধে সূচিত হ'লেও শেষ অবধি অদ্বৈতবাদী চেতনায় উত্তীর্ণ।[২]

বাংলায় লেখা স্বামীজীর খুব সম্ভব পরবর্তী কবিতা প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা (১৫ই মাঘ, ১৩০৫) 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত 'সখার প্রতি'। এর এক বছর পরে দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১লা মাঘ, ১৩০৬-সংখ্যার 'উদ্বোধনে' 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতাটি প্রকাশিত। প্রকাশকালের এতটা পার্থক্য থেকে স্বভাবতই মনে হয় 'সখার প্রতি' আগে লেখা।

স্বামীজীর অনুভবে ও সে অনুভবের বাণীরূপে আচার্য শঙ্করের প্রভাবের একটি বিশেষ উদাহরণ তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতা। পরিব্রাজকজীবনের দুটি অধ্যায় তাঁর জীবনে। প্রথমবার ভারতপরিক্রমান্তে আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড-য়ুরোপ-ভ্রমণ, দ্বিতীয়বার ভারত পরিক্রমান্তে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা-য়ুরোপ-ভ্রমণ। প্রথমবারে যাত্রা শুরু হয়েছিল একাকী, দ্বিতীয়বারে নানা সঙ্গী থাকলেও শেষ অবধি বেলুড় মঠে একা ফিরে আসা। প্রথমবারের অভিজ্ঞতার পটভূমিতেই তাঁর জীবনদর্শন 'সখার প্রতি'তে প্রকাশ করেছেন :

১ স্বামীজীর 'গানের খাতা'র সামনের পাতায় 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' নামে ইংরেজী স্বাক্ষর এবং তারিখ ২২শে জানুআরি, ১৮৮৬। এ প্রসঙ্গে এই 'গানের খাতা'টি অবলম্বনে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর কয়েকটি সুলিখিত সচিত্র প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-পত্রিকার গৌরব। এই প্রবন্ধগুলি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'লে পাঠকসমাজের বিশেষ উপকারে লাগবে।

২ উদ্বোধন, পঞ্চম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১লা আষাঢ়, ১৩১০-সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ। স্বামীজীর দেহাবসানের পরে তাঁর চিঠিপত্র থেকে আবিষ্কৃত।

যোগ-ভোগ গার্হস্থ্য সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার ;···

বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মতো, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্মতরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর, পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।
অসহায়—ছিন্নবাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—

উদ্ধৃত চরণগুলির শেষ দিকে 'শোন বলি'—বিবেকচূড়ামণির 'শৃণু সখে' সম্বোধনটি স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ায়। আচার্য শঙ্করের মতোই তিনি সত্যসন্ধানীর কাছে একাধারে গুরু ও বন্ধু ; আর শঙ্করের আত্মোপলব্ধি স্বামীজীর অন্তরে প্রেমের মহাসত্যে রূপান্তরিত। গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী সেই কথাটি মনে করিয়ে লিখেছিলেন—"'প্রীতিঃ পরমসাধনম্।'—আবার সাধন কি ? —সকলে প্রেম। স্বামীজী বলেছেন 'এক তরী করে পারাপার।'"[১]

স্বামীজীর ভাষায় সেই এক তরী কি ?

মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।

কিন্তু জীবনের যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় চরম জ্ঞান করুণার অশ্রুতে পরিণত হয় একদিক থেকে দেখলে তাই তো 'মায়া'। 'সখার প্রতি'-র সূচনায় সে কথা স্বামীজী আশ্চর্য কয়টি বিপরীত উদাহরণে উপস্থাপনা করেছেন :

আঁধারে আলোক-অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান ;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্ ?

আচার্য শঙ্কর মানুষের এই অন্তর্নিহিত অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝাতে গিয়েই শিষ্য ও সখার উদ্দেশে বলেছেন :

অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্ বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।

---

১ 'স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র' : ১১।৬।১৬ তারিখের পত্র দ্রষ্টব্য।

ততোঽনর্থব্রাতো নিপততি সমাদাতুরধিক-
স্ততো যোঽসদ্‌গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে॥

—অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন ব্যক্তি যাকে যা নয় তাকে তাই বলে ভুল করেন। বিবেকের (পৃথক্‌করণের) অভাবেই (প্রকৃত) সর্পে (মিথ্যা) রজ্জুবুদ্ধি স্ফুরিত হয়। এই ভুলের বশে কেউ যদি (প্রকৃত) সাপকে দড়ি ভেবে গ্রহণ করে, তবে তো তার মহাবিপদ। শোনো বন্ধু, মিথ্যাকে গ্রহণ করাই বন্ধন। [অদ্বৈত-বেদান্তের প্রসিদ্ধ উদাহরণ 'রজ্জুতে সর্পভ্রম'। এখানে শঙ্কর 'সর্পে রজ্জুভ্রম' দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন।]

স্বামীজী 'সখার প্রতি' সম্বোধনে কোনো গুরুভ্রাতাকে বিশেষভাবে উদ্দেশ করেছেন, এই প্রচলিত ধারণায় না গিয়ে আমরা একথাও ভাবতে পারি যে, আচার্য শঙ্করের 'শৃণু সখে'—এই সম্বোধন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি তাঁর সমকালীন ও ভবিষ্যতের সব পাঠকবর্গের উদ্দেশেই 'সখা' সম্বোধন করেছেন। সব আর্ত জিজ্ঞাসুর কাছেই তাঁর নিবেদন 'শোন বলি, মরমের কথা।'

'সখার প্রতি' কবিতার একটি মিশ্র উপমা কবিতার ইতিহাসে অতুলনীয়। সে উপমায় 'সংসার-জলধি' উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র সম্বল—'স্বার্থহীন প্রেমে'র কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী লিখেছেন :

যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি দুঃখসুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার,
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?

আপাতদৃষ্টিতে 'বুদ্ধিরথে' 'জলধি' উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টা অসঙ্গত মনে হতে পারে। কিন্তু কবির ভাষায় উপমাগত মিশ্রণ এখানে দোষ নয়, গুণই হয়ে উঠেছে। স্বয়ং শেকস্‌পীয়র যখন 'হ্যামলেটে'র সংশয়দোলায়িত হৃদয়ের বাণীরূপে—'to take arms against a sea of troubles' লেখেন—তখন সমস্যার সিন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের চেষ্টার অসম্ভাব্যতা আমাদের বিস্মিত করে না। বরং যুদ্ধক্ষেত্র ও সমস্যা-জর্জরিত হৃদয়সিন্ধু—এ দুয়ের অন্তরতম মিল পাঠককে আরো মুগ্ধ করে।

আর 'পক্ষহীন বিহঙ্গমে'র বৃথা পলায়নের চেষ্টাই কি আমাদের সংসার থেকে পলায়নের সব চেষ্টার ব্যর্থতার অনিবার্য উপমা নয়? এ জগৎকে ভালোবেসেই জগৎকে উত্তীর্ণ হতে হবে। সেক্ষেত্রে বুদ্ধি নয়, হৃদয়ই সব চেয়ে বড়ো সহায়।

'পক্ষহীন বিহঙ্গম' কথাটিতে একটু বিরুদ্ধতা রয়েছে। তাই হয়তো কেউ কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে ও 'উদ্বোধনে' 'লক্ষ্যহীন' করতে চেয়েছিলেন এই শব্দটিকে। কিন্তু তাতে আরো অর্থহীন হয়ে পড়তো বক্তব্য। বিরোধাভাসসহ 'পক্ষহীন বিহঙ্গম'ই আমাদের বুদ্ধিনির্ভর সমাধানপ্রচেষ্টার যোগ্য প্রতীক।

স্বামীজীর উপমায় 'পক্ষহীন বিহঙ্গমে'র পলায়নচেষ্টার মতো 'বুদ্ধিরথে' সিন্ধুতরণের অসম্ভাব্যতা আরো স্পষ্টভাবে মানবজীবনের গভীরতম সঙ্কটকে প্রকাশিত করে। ঠিক কোন্ উপায়ে সংসাররূপ মহাসিন্ধু আমরা উত্তীর্ণ হবো?

নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্মানমাত্ম-
ন্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্ বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ।
জনিমরণতরঙ্গাপারসংসারসিন্ধুং
প্রতর ভব কৃতার্থো ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ॥ [বি. চূ. ১৩৬]

সংযত মনে এবং শুদ্ধবুদ্ধির সহায়ে এই দেহে (এই জীবনে) আত্মস্বরূপকে 'আমিই সেই শুদ্ধ আত্মা'—এইভাবে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর এবং এর ফলে জন্মমরণের তরঙ্গসমাকুল অপার সংসারসাগর উত্তীর্ণ হও; ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে কৃতার্থ হও।

আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিতে যে মুক্তি (সংসার-সিন্ধু-উত্তরণ) শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধিতে লাভ করা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সেই মুক্তির এক তরী বা উপায় 'স্বার্থহীন প্রেম'। দু'জনের দৃষ্টিতেই সংসার জলধি বা সিন্ধু। দু'জনেই ব্রহ্মসংস্থের দৃষ্টিতে বিশ্বজনের মুক্তির উপায়-অন্বেষণে ব্যাকুল। শঙ্করের নির্দেশ—'সংসার-সিন্ধুং প্রতর'—স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন—'এক তরী করে পারাপার।' শুদ্ধ জ্ঞানই কখন শুদ্ধ প্রেমে জগৎ-সংসারকে নিয়ে মুক্তির অভিলাষী।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলতে গিয়ে আচার্য শঙ্করের বাণী :

ন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মণোর্ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥

—যথার্থ জ্ঞানের ফলে যিনি জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এবং ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কখনো ভেদ দর্শন করেন না, তিনিই জীবন্মুক্ত।

আচার্যের দৃষ্টিতে ব্রহ্মোপলব্ধির পরম সত্য :

বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র
বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং। [বি. চূ ৩৯৪]

—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে আর বেশী কি বলবো? জীব স্বয়ং ব্রহ্মই

'সখার প্রতি'র শেষ চার পঙ্ক্তিতে স্বামীজী ভারতবর্ষের চিরন্তন ব্রহ্মোপলব্ধির সত্যকে তাঁর নিজস্ব 'প্রেম'-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করে নবযুগের সাধনমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন :

ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

(বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড)

সমস্ত জীবই ব্রহ্ম, তাই সকলের প্রতি প্রসারিত প্রীতির দ্বারা, সকলের সেবার দ্বারা বিরাটের উপসনাকে স্বামীজী তাঁর উদ্দিষ্ট শিষ্য বা সখাদের কাছে আদর্শরূপে স্থাপন করেছেন। আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ- অদ্বৈতচেতনার এ দুই মহান ঋষির ভাবগত যোগসূত্ররূপে এখানে শ্রীরামকৃষ্ণবাণী স্মরণীয়—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাধ্যমেই স্বামীজীর অদ্বৈত-সাধনার সঙ্গে যোগ।

ব্রহ্ম, জীব, জগৎ—এই তিনের মধ্যে এক ব্রহ্মসত্যকেই কোনো ঋষি জগতের কাছে ঘোষণা করে অনন্ত সত্যের আবরণ মোচন করতে পারেন, আবার কোনো ঋষি জীব ও জগৎকে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফিরে ফিরে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। 'সখার প্রতি'র বিবেকানন্দ সেই অনন্ত প্রেম ও করুণার অধীশ্বর। আচার্য শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি' স্বামীজীর সাধনা ও উপলব্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক। মানুষের সহজাত 'অনন্তের অধিকার'কে যিনি যেভাবে মনে করিয়ে দেন, তিনিই একাধারে মহাজ্ঞানী মহাপ্রেমিক। আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ—দুই 'কবির্মনীষী'র অন্তরঙ্গ যোগটুকু আমাদের লক্ষণীয়।

নির্ঘণ্ট*-১

(ব্যক্তি নাম)

* শ্রী তাপসকুমার ভট্টাচার্য সংকলিত ।

নির্ঘণ্ট-২

(গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি)

হ

নির্ঘণ্ট-৩